অর্থতত্ত্ব

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

(কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা,

'Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ, ১ম ও ২য় খণ্ড), 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান' 'প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান, প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ
১৯৬২

মূল্য : ১০ টাকা ৫০ ন. প. মাত্র

মুদ্রাকর :
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অর্থতত্ত্ব পুস্তকখানি বহুদিন পূর্বে নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত ইহার পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া এই সংস্করণ প্রকাশ করা হইল। যতদূর সম্ভব নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে বি-এ. ও বি-কম. পরীক্ষার্থীদের জন্য পুস্তকখানি লিখিত হইল। নূতন ও পুরাতন পাঠ্যসূচী পুস্তকের প্রথমেই দেওয়া হইল। ছাত্র-ছাত্রীগণের সুবিধার জন্য অধ্যায়গুলির শেষে সংক্ষিপ্তসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলি সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে বর্ণানুক্রমিক সূচীও দেওয়া হইল। আশাকরি, ছাত্র-ছাত্রীগণ এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ
কলিকাতা-২৬
২৮, আষাঢ়, ১৩৬৯
ইং ১৩. ৭. '৬২

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী

THREE-YEAR DEGREE COURSE

Economics—Pass

PAPER I

SYLLABUS

Economic Theory with special reference to Pricing and Factor Pricing—Subjectmatter and scope. Consumer Behaviour. Production. Costs. The firm and the Market. Price—Determination under different market forms. Factor—Pricing.

PAPER II

Economic Theory with special reference to Money, Banking, Trade and Finance—Monetary Systems. Banking. Monetary theory. Monetary Policy. Income. Employment and Output. Economic Fluctuations. Government Finances. Taxation. Expenditure. Public Debts. Fiscal Policy. International Trade. Balance of Payments. Foreign Exchange.

THREE-YEAR B. COM. COURSE

Economic Theory

SYLLABUS

Economics—Subjectmatter and Scope, Consumer Behaviour, Production, Factors of Production—Costs of Production—Organisation of Production—Monopoly and Combinations.

The Firm and the Market—Perfect and Imperfect Competition. Factor Pricing—Wages, Interest, Profits and Rent.

Monetary Systems—Banking and Central Banking—Monetary Theory—Income, Employment and Output—Value of Money—Inflation and Deflation.

Monetary Policy—National and International—International Economic Institutions.

International Trade and Foreign Exchange—International Values—Balance of Payments—Exchange Rate, Determination Exchange Control—Devaluation.

Government Finance—Taxation, Public Expenditure—Public Debts, Economic Fluctuations—Causes and Remedies. Unemployment—Fiscal Policy and Monetary Policy.

Economic Systems—Capitalism, Socialism, Communism. The State and Economic Activities—Economic Planning.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায় (ক)

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বর্তনের কারণ, সুদের হার হ্রাস পাইয়া কি একেবারে বিলীন হইতে পারে? সুদ প্রদান করিবার যুক্তিযুক্ততা, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্নাবলী।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

অর্থতত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অবতারণা

(Introduction)

অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ণয়—Definition of Economics.

ভারতে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য অনুসারে অর্থকে অনর্থের মূল বলা হয়, কিন্তু এই ভারতেই আবার ইহাও স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে যে, ধনই ধর্মসাধনের একটি উপায় এবং এই ধর্ম হইতেই স্থায়ী সুখ লাভ হয়—"ধনাদ্ ধর্মস্ততঃ সুখম্।" বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে শুধু ভারতে কেন সর্বত্রই অর্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলে সম্যক অবহিত হইয়া অর্থকে তাহার ন্যায্য সম্মান প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ বুঝিয়াছে যে, অর্থের অপব্যবহার অনর্থের কারণ হইলেও অর্থ মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির একান্ত অপরিহার্য উপাদান।

অ্যাডাম্ স্মিথ-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Adam Smith.

অর্থতত্ত্ব বা ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা-নিরূপণ এক দুরূহ ব্যাপার। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানী অ্যাডাম্ স্মিথ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করেন। ১৭৭৬ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাতির সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান' (An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ধন বা সম্পদ আহরণ করাই হইল

মানুষের সকল কর্ম প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং কিভাবে সম্পদ উৎপাদিত হয় ও কি ভাবে এই উৎপাদিত সম্পদ মানুষের ভোগ-ব্যবহারে ব্য হয়—ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। পরবর্তী লেখক জন ষ্টুয়া মিলও স্মিথ-প্রদত্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন।

য়্যাডাম্ স্মিথ-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞানে সংজ্ঞা নির্দেশ কালে তিনি ধন বা সম্পদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরো করেন। কারলাইল, রাস্‌কিন প্রভৃতি মনস্বিগণ ধনবিজ্ঞানের এই নিছক বস্তুবাদী সংজ্ঞার কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সম্পদ আহরণ করা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার একমাত্র অনুপ্রেরণা নহে। সম্পদ আহরণ মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও ইহাকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলা যায় না, কার মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূলে যে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি থাকে সেগুলির সম্যক বিশ্লেষণ না করিতে পারিলে মানব-চরিত্রের পূর্ণ পরিচ পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, উপরি-উক্ত সমালোচকগণ বলেন যে, য়্যাডা স্মিথ বর্ণিত নিছক সম্পদ আহরণকারী শাস্ত্র রুচিবোধসম্পন্ন সভ্য মানবে আলোচনার বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই জন্য কারলাইল রাস্‌কিন প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রকে একটি 'অকেজো শাস্ত্র' (Disma Science) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Alfred Marshall.

য়্যাডাম্ স্মিথ-প্রদত্ত সংজ্ঞার ত্রুটি দূর করিয়া ধনবিজ্ঞানের একটি সুষম সংজ্ঞ নির্দেশের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্ত্য ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রে ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শাল এই শাস্ত্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন বর্তমানে তাহার সংস্কার সাধিত হইলেও অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে তাহা প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্শাল বলেন অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী— মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে ও কিভাবে সেই উপার্জিত অর্থ তাহা বিবিধ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করে। মানুষমাত্রই অভাবে দাস। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাবের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও তীব্রত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অভাব মোচনের উপাদান অনায়াস-লভ

নহে। প্রত্যেকটি অভাব মোচনের জন্য মানুষকে একক অথবা সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে এবং একমাত্র পরিশ্রমলব্ধ ফলের দ্বারাই তাহার অভাব মোচন হইতে পারে। আদিম মানবের অভাব ছিল স্বল্প—তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব মোচন করিত। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বকীয় প্রচেষ্টার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আর তাহার অভাব মোচন হইতে পারে না। তাই তাহারা সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা তাহাদের অপরিসীম বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিয়া অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছামত সামগ্রী আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা অভাব মোচন করে। সুতরাং বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন করা—কেননা অর্থ ব্যতীত কেহই তাহার বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না। কোন মানুষই তাহার স্বকীয় প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার অপরিসীম অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিতে পারে না। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। এইজন্যই একজনের পরিশ্রমলব্ধ ফল অন্যের পরিশ্রমলব্ধ ফলের সহিত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। নতুবা অভাবের সম্পূর্ণ মোচন বা তৃপ্তি হইতে পারে না। আর এই বিনিময়ের বাহন হইল অর্থ। অর্থ দ্বারা মানুষ তাহার বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় এবং এইজন্যই অর্থতত্ত্ব বা ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল অর্থ। ধনবিজ্ঞান বা অর্থতত্ত্বে আমরা মানুষের শুধুমাত্র সেই কর্ম-প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করি যে প্রচেষ্টাগুলি শুধুমাত্র অর্থ-উপার্জনের জন্যই পরিচালিত হয়। নৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচেষ্টাগুলির উপযোগিতা অস্বীকার না করিলেও সেগুলিকে অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থের উপার্জন ও উপার্জিত অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও অর্থই ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র। অর্থ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব মোচনে অসমর্থ। অর্থ অভাব-মোচনের উপাদান সংগ্রহ করে মাত্র। সুতরাং অর্থ উপকরণ মাত্র—ভোগ্যবস্তু নহে। মানুষের প্রয়োজনেই অর্থের সৃষ্টি ও অবস্থিতি। অর্থ বাঞ্ছিত সামগ্রী

হইলেও মানব জীবনের উদ্দেশ্য বা চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে মানুষ তাহার বাঞ্ছিত সামগ্রী আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। এইরূপে অভাব দূরীভূত হইলে মানুষ উন্নততর জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং অর্থতত্ত্ব আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, অর্থতত্ত্ব একদিকে যেমন ধন বা সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে অপরদিকে ইহা সেইরূপ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ মানব জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে অর্থতত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে ধন-উপার্জন ও ধন-ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচেষ্টা হইল অর্থতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই প্রচেষ্টা অর্থদ্বারা পরিমাপযোগ্য বা বিনিময়যোগ্য হওয়া চাই। তৃতীয়তঃ, অর্থতত্ত্ব একটি সমাজ-বিজ্ঞান—এই বিজ্ঞানে সমাজবদ্ধ মানুষের অভাবমোচন সম্পর্কিত সম্মিলিত প্রচেষ্টার আলোচনা হয়। চতুর্থতঃ, মানুষ যে অভাব মোচনের জন্য সব সময়ে স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কার্য করে তাহা সত্য নহে। সুতরাং মার্শালের পূর্ব-সূরিগণ অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া এই শাস্ত্রের যে নিছক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অধ্যাপক মার্শাল তাহা দূর করিয়া ধনবিজ্ঞানকে একটি জনকল্যাণের সহায়ক সমাজবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

ক্যানান্-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Cannan.

মার্শালের পরবর্তী কালে অধ্যাপক ক্যানান্, রবিন্‌স্, বোল্‌ডিং কেয়ার্ণক্রস্, প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ বিভিন্নভাবে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ক্যানানের মতে ধনবিজ্ঞানে পার্থিব মঙ্গল বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ আলোচিত হয় (a study of the causes of material welfare) কিন্তু ক্যানান্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ—কেননা পার্থিব সম্পদের সহিত মানুষের মঙ্গলের সম্পর্ক সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। এমন অনেক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা আছে যদ্দ্বারা পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু এই সম্পদ-বৃদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হইতে পারে। মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ লাভবান্ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয় না। অপরপক্ষে প্রকৃত কল্যাণ সবসময়ে

পার্থিব সম্পদের উপর নির্ভর করে না। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করা, দরিদ্র ও আতুরকে সাহায্য করা, শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকের কার্য—সমাজের প্রকৃত হিতসাধন করিলেও অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নহে—সুতরাং ঐগুলি অর্থ-তত্ত্বের বিষয়বস্তু-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্যানান্-প্রদত্ত সংজ্ঞার প্রধান ত্রুটি হইল যে, তিনি বস্তুর উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উপযোগিতা-নিরপেক্ষভাবে বস্তুর উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

রবিন্‌স্-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Lionel Robbins.

রবিন্‌সের মতে মানুষের অভাব অপরিসীম, কিন্তু অভাব মোচনের উপাদান সীমিত এবং এই সীমিত উপাদানগুলি আবার বৈকল্পিক ব্যবহারযোগ্য। ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের সেই আচরণ যে আচরণ দ্বারা বৈকল্পিক ব্যবহারযোগ্য সীমিত উপাদানে মানুষ তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিবার প্রয়াস পায়। ("Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.")

রবিন্‌সের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, মানুষের অভাব অসীম, সেজন্য তাহাকে অত্যাবশ্যকীয় অভাব ও কম গুরুত্বপূর্ণ অভাবের মধ্যে বাছাই করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভাব অসীম হইলেও অভাব মিটাইবার সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষ যদৃচ্ছা ভোগ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই স্বল্প পরিমাণ অভাব মিটাইবার সামগ্রীগুলি এত বিভিন্ন ভোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে, এই দ্রব্যগুলির সমগ্র চাহিদা পরিমাণ একান্তভাবেই অপূরণীয়। অপরপক্ষে বিভিন্ন ব্যবহার ক্ষেত্রে এই দ্রব্যগুলির উপযোগিতার গুরুত্ব অনুসারে মানুষ এই দ্রব্যগুলির ভোগ-ব্যবহার করে। রবিন্‌সের মতে শুধু অভাব অপরিসীম বলিয়া বা অভাব মোচনের সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা অথবা দ্রব্যগুলির বিভিন্ন ভোগ-ব্যবহার এককভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে না। উপরি-উক্ত তিনটি অবস্থার একত্র সমন্বয় ঘটিলে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং রবিন্‌স পূর্বতন কল্যাণ-বাদী ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা পরিহার করিয়া ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রকে মানুষের দৈনন্দিন

জীবনের দুইটি বাস্তব অভিজ্ঞতার (অভাবের সীমাহীনতা ও অভাব মোচনের সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা) ভিত্তিতে রূপদান করেন।

রবিন্‌স-প্রদত্ত ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞার ত্রুটি হইল যে, এই সংজ্ঞানুসারে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অতি সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ হয়। ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধু ব্যক্তিগত আচরণ আলোচনায় সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু সমগ্রভাবে মানুষের সামাজিক বা সংঘবদ্ধ আচরণ ও ইহার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার আলোচনা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু অভাব মিটাইবার উপাদানগুলির দুষ্প্রাপ্যতা আলোচনা করা ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—অভাব পূরণের সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা দূর করিয়া মানুষের হিতসাধন করা ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

কেয়ার্ণক্রস্‌-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Cairncross.

মূলতঃ রবিন্‌স-প্রদত্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া কেয়ার্ণক্রস্‌ ধনবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সাহায্যে তিনি ধনবিজ্ঞানের সামাজিক রূপ পুনঃ স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ("Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange.")

কেয়ার্ণক্রস্‌-প্রদত্ত উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। ইহা মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু এই আচরণ কোন সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের নহে—ইহা সমাজদ্বারা প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের আচরণ। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই আচরণেরও একটি সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। এই আচরণ শুধু সীমিত উপাদান দ্বারা মানুষ কি প্রকারে তাহার অপরিসীম অভাব মোচন করে—ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সীমিত উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাব মোচনের জন্য ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রীর বৈকল্পিক ব্যবহার অর্থাৎ সামগ্রী বাছাই করিবার প্রয়োজন হয়। এই বাছাই বা পছন্দ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে হয়—নতুবা স্বল্প উপকরণ দ্বারা অফুরন্ত অভাব পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত পছন্দের কোন স্থান নাই; কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। এইজন্যই সমাজে শ্রমবিভাগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেইজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং মানুষের অভাব-মোচনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার ফল এই বিনিময়-কার্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধনবিজ্ঞানে বিনিময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুতরাং কেয়ার্ণক্রসের মতে ধনবিজ্ঞানের সমস্যা হইল তিনটি, যথা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা, বাছাই বা পছন্দ ও বিনিময়। একমাত্র অর্থের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বাছাই ও বিনিময় সম্ভব হয়। শেষ বিশ্লেষণে কেয়ার্ণক্রস্ বলেন মানুষের কার্যকলাপে অর্থ যে অংশ গ্রহণ করে, সেই অংশটি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু। ("Economics studies the part played by money in human affairs.")

এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ধনবিজ্ঞান যে নিছক অর্থ সম্পর্কিত আলোচনা করে ইহা ভুল। অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র—ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে না। মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে যে সমস্ত উপাদান সাহায্য করে, অর্থ তন্মধ্যে অন্যতম হইলেও একমাত্র উপাদান নহে।.

উপরি-উক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে, মার্শাল-প্রদত্ত ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা একেবারে পরিত্যাজ্য নহে। রবিনস্ বা কেয়ার্ণক্রস্ যে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মার্শাল ধন বা সম্পদ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বৈকল্পিক ব্যবহারযোগ্য সীমিত উপাদান সাহায্যে মানুষ কিভাবে তাহার অসংখ্য অভাব মোচনের প্রয়াস পায়—ইহা মার্শাল মানুষের সম্পদ আহরণ প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা ও আধুনিক সংজ্ঞার মধ্যে বিশেষ কোন মূলগত পার্থক্য নাই বলিলেও চলে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু—Scope of Economics.

মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলিকে দুই দিক দিয়া আলোচনা করা চলে। প্রথমতঃ, এই শাস্ত্র অর্থনৈতিক বিষয় ও ঘটনাগুলিকে যথাযথভাবে আলোচনা

করে। মানুষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত করে, অর্থতত্ত্বে তাহা অবিকৃতভাবে আলোচিত হয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে একটি অ-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Positive Science) বলা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অর্থতত্ত্বের যে অংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মূলনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংগঠন-প্রণালী ও করধার্যনীতি বর্ণিত হয়, সেগুলিকে এই অ-প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু শুধু এই চলিত কার্যকলাপের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নহে। পরন্তু অর্থতত্ত্বে মানুষের এই চলিত কর্মপ্রচেষ্টার একটা আদর্শ মান অর্থাৎ মানুষের এই অর্থ নৈতিত প্রচেষ্টাগুলি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থতত্ত্বে যখন আদর্শ ব্যাংক-ব্যবস্থা ও আদর্শ করধার্যনীতির আলোচনা হয়, তখন অর্থতত্ত্ব নৈতিক বিজ্ঞানের (Normative Science) পর্যায়ে উন্নীত হয়। সুতরাং অর্থতত্ত্বের বিষবস্তু ব্যাপক—ইহা যুগপৎ মানুষের চলিত অর্থ নৈতিক আচরণ এবং এই আচরণের একটা আদর্শ মান স্থির করিবার প্রয়াস পায়। অর্থতত্ত্ব বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত হইলেও ইহার বিষয়বস্তুর কিয়দংশ কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সফল হইবার নিয়মকানুন, অথবা সরকারী হস্তক্ষেপ বা ভোগব্যবস্থা-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি এই কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু স্থির করিতে হইলে এই শাস্ত্র আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। একমাত্র এই আলোচনার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পরিধি নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মার্শালের কি মত ছিল সে সম্পর্কে পিগুর উক্তি প্রণিধান-যোগ্য। বুদ্ধিবৃত্তি উন্নয়নের ব্যায়াম অথবা নিছক সত্য আহরণের উপায় অপেক্ষাও অর্থতত্ত্বের উপযোগিতা নীতিশাস্ত্রের সহচরী ও চলিত আচরণের দাসরূপে অধিকতর সুস্পষ্ট। ("Economics is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic nor even as means of winning truth for its own sake but as a hand-maid of ethics and a servant of practice.") পিগুর মত বিশ্লেষণ করিলে অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্থির ধারণা করা যায়। মানুষের চলিত অর্থনৈতিক আচরণের আলোচনা এই শাস্ত্রের মুখ্য বিষয় হইলেও ইহা একমাত্র

বিষয় নহে। চলিত আচরণের আলোচনা দ্বারা যদি লাভবান্ না হওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ আলোচনার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। তাই ধনবিজ্ঞানিগণ শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ বা তৎসম্পর্কে সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করিয়া ক্ষান্ত হন না, কি উপায়ে চলিত আচরণগুলির ত্রুটি দূর করিয়া ও সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন করা যায় তৎসম্পর্কেও আলোচনা করেন।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এই শাস্ত্র ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্বন্ধে আলোচনা করে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিয়া কিভাবে ধনোৎপাদন ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ করা যায়, ধনবিজ্ঞানিগণ তাহাই আলোচনা করেন। এখন প্রশ্ন হইল যে, ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা-বর্জিত নিছক কতকগুলি মনঃকল্পিত মতবাদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ? মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে কি ধনবিজ্ঞানিগণের কোন বক্তব্য নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধনবিজ্ঞানিগণ শুধু জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে এই শাস্ত্রের আলোচনা করেন না—পরন্তু অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিয়া কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব তাহাও আলোচনা করেন। দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়-চক্র, স্বল্প উৎপাদন, মূল্যের উত্থান-পতন প্রভৃতি গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই সমস্যাগুলির সমাধান দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করাই হইল ধনবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়বস্তু। সুতরাং এই শাস্ত্রের পরিধি ব্যাপক।

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ধনবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু আরও বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের মাত্রা সর্বাধিক। সুতরাং বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে ধন-বিজ্ঞানের পরিধির কোন সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নয়।

অর্থতত্ত্ব কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত ?—Is Economics a Science ?

ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে কিনা এসম্পর্কে পূর্বে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিবার প্রথম আপত্তির কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই শাস্ত্রের আলোচনা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। য়ুটন্ বলেন যে, যদি ছয়জন ধনবিজ্ঞানী একত্রে মিলিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে সাত রকমের বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান বিষয়ে এইরূপ মতানৈক্য অস্বাভাবিক। কিন্তু উপরি-উক্ত যুক্তি ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার কারণ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। চিকিৎসক ও আইনজীবিগণের মধ্যেও মতভেদ হয়, কিন্তু সেজন্য চিকিৎসা বা আইনশাস্ত্রকে বিজ্ঞান না-বলা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রধানতঃ, অর্থ নৈতিক নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনবিজ্ঞানিগণের ব্যক্তিগত রুচি, রাজনৈতিক মতবাদ বা নীতিজ্ঞানের পার্থক্যের জন্য এইরূপ মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু অর্থ নৈতিক বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, মানুষ স্বাধীন জীব। সে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের এই অত্যধিক স্বাধীন সত্তার জন্য তাহার অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ এত জটিলতাপূর্ণ হয় যে, এই জটিলতার আবরণ ভেদ করিয়া ধনবিজ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত দুরূহ। ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান-পদবাচ্য না-করিবার পক্ষে এ যুক্তির সারবত্তাও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তি মানিয়া কাজ করে। বুদ্ধিজীবী প্রাণী হিসাবে মানুষ এরূপভাবে তাহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে তাহার অযথা কষ্ট বা অযথা ক্ষতি না হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে নির্দিষ্ট অবস্থায় সকল মানুষের নিকট হইতে একই প্রকার আচরণ আশা করা যায়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব, একথা বলা সমীচীন নহে।

ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে কিনা এসম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলেই ধনবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কিনা তাহা নির্ণয়

করা সহজ হইবে। 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা আহরণ করা হয় এবং সেইজন্য এই জ্ঞানকে বিশেষ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত সূত্র প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কেননা তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপ নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সাধারণ সূত্রও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া সাধারণতঃ যুক্তি মানিয়া চলে। এইজন্য মানুষের অর্থনৈতিক আচরণে মূলতঃ কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া ধনবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষা-কার্য করিতে পারেন। সুতরাং ধনবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণী-বিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে উহা প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সাধারণ সূত্র আছে। সুতরাং ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না-করিবার কোন সংগত কারণ নাই।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইলেও ইহা রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত নহে। তাহার কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর। যে বিষয়বস্তু লইয়া ধনবিজ্ঞানী আলোচনা করেন, তাহা বহুল পরিমাণে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আর এই বাহ্যিক পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-কোন সিদ্ধান্ত করা হউক

না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানী যদি মানুষের উপর দ্রব্যমূল্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না। তাহার কারণ মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক সূত্র ও ইহার প্রকৃতি—Nature of Economic Laws.

সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সূত্র থাকে। ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-কার্য দ্বারা আহরণ করেন। তবে অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন (hypothetical)। অর্থনৈতিক সূত্রগুলি কার্যকারণের ফলাফল প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণতঃ চাহিদা হ্রাস পায় ও মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট অবস্থায় সত্য অর্থাৎ ইহা শর্তাধীন। যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ যদি লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, অথবা আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহা-হইলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও হইতে পারে। সুতরাং অর্থ-নৈতিক এই সূত্রটি অনুমানসিদ্ধ মাত্র—সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থনৈতিক সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন—একথা অনস্বীকার্য। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির সূত্র-সমূহও অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন। রাসায়নিক দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজানের সংমিশ্রণে জল উৎপাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় হওয়া

চাই অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপ বর্তমান থাকিলেই দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হয়। তাপ ও চাপের পরিবর্তন ঘটিলে রাসায়নিকের সিদ্ধান্তও ধনবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল হয় না। সুতরাং এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের সূত্র ও রসায়নের সূত্র সমপর্যায়ভুক্ত বলিতে হয় এবং ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে।

ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলির সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির ন্যায় নিশ্চিত (exact) নহে। নির্দিষ্ট অবস্থায় দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হইবেই, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর সব সিদ্ধান্ত এরূপ অভ্রান্ত নহে বা হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানী অর্থের দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিমাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও অন্য নানা উদ্দেশ্য দ্বারা মানুষ কার্যে প্রণোদিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত মানব-চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির মত ধ্রুবসত্য হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক—Relation of Economics to other Social Sciences.

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—Economics and Sociology.

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল মানবজীবনের শুধু একটা দিক—মানুষ কি করিয়া প্রকৃতিদত্ত স্বল্প উপাদানে তাহার অসংখ্য অভাব পূরণ করিবার প্রয়াস পায়। এই শাস্ত্র মানবজীবনের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল মানুষের সমগ্র সামাজিক জীবনের আলোচনা। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর-বিস্তৃত। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও মানবজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ববিষয়ের আলোচনা হয় এই সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজ-বিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বলা হয়। ধনবিজ্ঞান

সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণের বিশেষ একটা দিক অর্থাৎ তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে, সুতরাং ইহা সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কিভাবে প্রগতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Economics and Political Science.

পূর্বে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক ব্যাপক হইয়াছে। অধুনা-ধনবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করে না, জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কিভাবে হওয়া উচিত সমগ্রভাবে তাহার আলোচনা করে। ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়-বস্তুর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক হইলেও উভয়শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার-সমস্যার দূরীকরণ, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান, ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোনও সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা—ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে রাষ্ট্র জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Economics and History.

ইতিহাসে আলোচিত হয় মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ ও মানব-সভ্যতার

বহুমুখী কাহিনী। মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কাহিনীও এই ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অতীত যুগে মানুষ কিভাবে তাহাদের অভাব মোচন করিত ইতিহাস পাঠে তাহা জানা যায় এবং এই ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান অর্থনৈতিক প্রয়াসগুলির প্রকৃতি ও সাফল্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়। নূতন অর্থনৈতিক সূত্র গঠনে ও তাহার সত্যাসত্য নিরূপণে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সহায়ক হয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান অর্থনৈতিক জীবন যুগোপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সার্থক হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহায়ক শাস্ত্র বলিয়া দাবী করিতে পারে।

ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Economics and Ethics.

কারলাইল প্রভৃতি মনীষিগণ ধনবিজ্ঞানকে একটি অকেজো শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার কারণ হইল যে, তখন ধনবিজ্ঞান শুধু অর্থ-আহরণ তথ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যে শাস্ত্র আলোচনায় মানবজাতির কোন কল্যাণ সাধিত হয় না, সে শাস্ত্রকে 'নৈরাশ্যজনক বিজ্ঞান' (Dismal Science) ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? অধ্যাপক মার্শালই সর্বপ্রথম এই শাস্ত্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহাকে একটি সমাজবিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত করেন। ধনবিজ্ঞানে মানুষের চলিত অর্থনৈতিক আচরণ আলোচিত হয় বটে, কিন্তু এই আলোচনা করিবার একটা উদ্দেশ্য আছে। চলিত আচরণ ঠিকপথে পরিচালিত হইতেছে, না বিপথগামী হইতেছে—ইহা জানিবার নিমিত্ত এই আচরণগুলির বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। এইরূপে ব্যাখ্যাত হইলে আচরণগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া আদর্শ আচরণের মান স্থির করা সম্ভব হয়। ধনবিজ্ঞানে শুধুমাত্র চলিত আচরণগুলির আলোচনা হয় না, কিরূপে চলিত আচরণগুলিকে একটি আদর্শ-মানে উন্নীত করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তথা সমগ্র জীবনকে মঙ্গলময় করা যায় ইহাই হইল ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আর অর্থনৈতিক জীবনের এই আদর্শমান নির্ধারিত হয় নীতিশাস্ত্রের দ্বারা। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের সম্পর্করহিত ধনবিজ্ঞানের কোন সার্থকতা নাই।

ধনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব—Economics and Psychology.

ধনবিজ্ঞানের সহিত মনস্তত্ত্বের কিছু সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বতন ধনবিজ্ঞানিগণ হিতবাদী ও ভোগসুখবাদী (Utilitarians and Hedonists) দার্শনিকদের মতানুসরণে লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত করিতেন। মানুষ শুধুমাত্র স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়—আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মূলে একাধিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। তবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে মানুষ সর্বাধিক উপযোগিতা ও সর্বাধিক সন্তুষ্টি লাভের মনোভাব দ্বারা কার্যে উৎসাহিত হয়। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের উপর মনস্তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি—Methods of Analysis.

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ব্যাপারেও প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইহার একটি হইল অবরোহ পদ্ধতি ; (Deductive Method) অপরটি হইল আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method)। অবরোহী পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত পূর্বে নির্ধারিত করিয়া পরে তথ্যের সাহায্যে সেই পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। সুতরাং অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সিদ্ধান্ত করা হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্ প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ ধনবিজ্ঞান আলোচনা ক্ষেত্রে প্রধানতঃ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রথমে অর্থনৈতিক তথ্যগুলি সুসংবদ্ধ করিয়া এই তথ্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সূত্র গঠন করা এবং এইরূপে স্থিরীকৃত সূত্রগুলির সত্যতা অপর তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা।

উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতি সম্পর্কে বলা চলে যে, অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ বা অপর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গঠিত কোন সিদ্ধান্ত ত্রুটিহীন নহে। অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতি সম্পর্কে এই কথা বলা চলে যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যখন যে পদ্ধতির সাহায্যে দ্রুত সত্য সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়, তখন সেই

পদ্ধতিই অবলম্বন করা সমীচীন। এই কারণে ধনবিজ্ঞানী মার্শাল এই উভয় পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

বর্তমানে গণিত ও পরিসংখ্যান শাস্ত্রের (Mathematics and Statistics) বিভিন্ন পদ্ধতি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ধনবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে গাণিতিক ও পরিসংখ্যান মূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গাণিতিক ধনবিজ্ঞান (Mathematical Economics) ও পরিসংখ্যানভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Statistical Economics) নামক দুইটি প্রায় সম্পূর্ণ শাস্ত্র জন্মলাভ করিয়াছে।

বর্তমানে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (Partial Equilibrium analysis) ও সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (General Equilibrium analysis) পদ্ধতি নামে দুইটি পৃথক পদ্ধতির সাহায্যে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়।

আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতিতে মাত্র একটি বিষয়ের ভারসাম্যের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হয়, যেমন একটি দ্রব্যের দাম বা যে কোন একটি শিল্প। সামগ্রিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের নিজস্ব ভারসাম্য এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিত অপরাপর বিষয়ের ভারসাম্যের আলোচনা করা হয়। বাজারে একটি দ্রব্যের মূল্য আর একটি দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভরশীল এবং একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অনুরূপভাবে অপর দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। সমগ্রভাবে এই মূল্য, চাহিদা ও যোগানের যে পরিবর্তন হয় তাহা একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করা এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যের যথাযথ মূল্য এরূপভাবে নির্ধারণ করা যাহাতে সকল শিল্পেই ভারসাম্য থাকে—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটিকে সামগ্রিক ভারসাম্য পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিটি অতি জটিল বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল প্রতিটি শিল্প অথবা দ্রব্যের বাজারের ভারসাম্যের সর্ত (Conditions of equilibrium) পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই কারণে মার্শাল একটি দ্রব্যের মূল্য অথবা ইহার চাহিদা বা যোগান আলোচনা কালে অন্য দ্রব্যের মূল্য অথবা চাহিদা বা যোগান অর্থাৎ অপরাপর অবস্থা অপরিবর্তনশীল বলিয়া (Other things remaining constant) ধরিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু আসল কথা হইল যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ধারণা কতদূর প্রয়োজ্য তাহা চিন্তার বিষয়। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক

অবস্থা স্থিতিশীল (Static) নহে, ইহা গতিশীল (Dynamic)। গতিশীল সমাজে ভারসাম্য আসিতে পারে না—আসিলেও সে ভারসাম্য স্বল্পস্থায়ী হয়। সুতরাং তত্ত্ব হিসাবে ভারসাম্য তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য না হইলেও অর্থ-নৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইহার কিছু উপযোগিতা আছে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ—Sub-divisions of Economics.

অধুনা ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিস্তৃত ও জটিল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রকে কতিপয় সুসংবদ্ধ বিভাগে ভাগ না করিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এইজন্য ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়াছেন—যথা, ১। উৎপাদন (Production), ২। বিনিময় (Exchange), ৩। বণ্টন (Distribution), ৪। ভোগ (Consumption) ও ৫। সরকারী আয়-ব্যয় (Public Finance).

উৎপাদন—মানুষ পরিশ্রম-প্রয়োগে কিভাবে ধনোৎপাদন করে ও অভাবকে দূরে রাখে ইহাই উৎপাদনের বিষয়বস্তু।

বিনিময়—উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কি কারণে ও কিভাবে বিনিময় হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের হার অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং বিনিময়ের বাহক ও বিনিময়ের প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি সম্পর্কে এই অংশে আলোচনা হয়।

বণ্টন—কিভাবে উৎপাদিত ধন উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হইয়া ব্যক্তিগত ভোগের সহায়তা করে, ইহাই এ-অংশে আলোচিত হয়।

ভোগ—উৎপাদিত ধনদ্বারা মানুষ তাহার পছন্দ প্রয়োগ করিয়া কিভাবে অভাব মোচন করে, এই অংশে তাহার আলোচনা হয়।

সরকারী আয়-ব্যয়—রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ আহরণ করিয়া বিভিন্ন কাযের জন্য ব্যয় সংকুলান করে—ইহাই এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ধনবিজ্ঞান—Micro-Economics and Macro-Economics.

দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করা যাইতে পারে, যথা, ব্যক্তির দিক দিয়া এবং সমষ্টির দিক দিয়া। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

যখন বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথকভাবে উহাদের আচরণ ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা করা হয় তখন এই আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়সমূহকে ব্যষ্টিগত ধনবিজ্ঞান (Micro-Economics) বলা হয়। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয় তাহা হইলে এই আলোচনাকে সমষ্টিগত ধনবিজ্ঞান (Macro-Economics) বলা হয়। সুতরাং ব্যষ্টিগত দৃষ্টিকোণ-সম্ভূত ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিল্পের সংগঠন ও উহাদের দোষ-ত্রুটি প্রভৃতি আলোচিত হয়। আর সমষ্টিগত ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মোট উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, মোট চাহিদা ও ভোগ এবং মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ।

ব্যষ্টিগত ধনবিজ্ঞান ও সমষ্টিগত ধনবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও এই উভয়পদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণাংগ বিবরণ জানা যায় না।

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের দিক হইতে বিচার করিলে সমষ্টিগতভাবে ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতির গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতেই বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করা ও কর স্থাপন করা হয়।

সম্পদ ও কল্যাণ—Wealth and Welfare.

সম্পদের সহিত মানব-কল্যাণের কি সম্পর্ক, এ বিষয়ে ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনবিজ্ঞানে কল্যাণ অপেক্ষা সম্পদতত্ত্ব অধিকতরভাবে আলোচিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ধনবিজ্ঞান যে মানব-কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন একটি নিছক বস্তুবাদী শাস্ত্র এ-কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কারণ ধনবিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া একাধিক ধন-বিজ্ঞানী সম্পদ অপেক্ষা মানব-কল্যাণের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সম্পদ হইল উপকরণমাত্র—মানুষের প্রয়োজনেই সম্পদের সৃষ্টি ও অবস্থিতি। সম্পদ বাঞ্ছিত সামগ্রী হইলেও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সম্পদ মানব-

কল্যাণ সাধনে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু সম্পদ ও কল্যাণ সমার্থক নহে পরন্তু উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ধনবিজ্ঞানে সম্পদের অর্থ হইল দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণের জন্য উৎপন্ন বিক্রয়-যোগ্য সামগ্রী, অপর পক্ষে কল্যাণ বলিতে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বুঝায়। সম্পদ ও কল্যাণের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সম্পদ হইল বাস্তব উপযোগিতা-সম্পন্ন দ্রব্য আর কল্যাণ হইল বস্তু-নিরপেক্ষ মানসিক অবস্থা। সুতরাং কল্যাণ সম্পদ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ মানব-কল্যাণ সম্পদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নহে। সম্পদের বৃদ্ধি হইলে যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে—ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অপর পক্ষে যাহা দ্বারা কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা ধনবিজ্ঞানে সম্পদ বলিয়া পরিগণিত নাও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাদক দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য উৎপন্ন মাদক দ্রব্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু ইহার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধিত হয়। সহরাভ্যন্তরে ঘনবসতি অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করিলে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু কারখানা দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া লোকের স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি নষ্ট করে। ইহাতে কল্যাণ সাধিত হয় না।

অপর পক্ষে প্রচুর মুক্ত বায়ু, জল ও সূর্যালোক প্রভৃতি প্রকৃতির দান মানব-কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইলেও দুষ্প্রাপ্যতা নাই বলিয়া সম্পদ-পর্যায়ভুক্ত নহে। পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের জন্য পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, উন্নততর সামাজিক পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু এই সমস্ত গুণগুলিও সম্পদ বলিয়া আখ্যা পায় না।

বিত্তশালী হইলেই যে মানুষের মানসিক অবস্থা উন্নততর হইয়া কল্যাণ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিত্তশালী সমাজে যে পরিমাণ নীচতা ও নৈতিক অবনতি বিদ্যমান তাহা বিত্তহীন সমাজে বিরল। শান্তিময়, সরল ও উচ্চস্তরের জীবন যাপন সম্পদের উপর নির্ভরশীল নহে।

কিন্তু উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সম্পদের সহিত কল্যাণের কোন সম্পর্ক নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্পদ উপকরণ মাত্র, মানব জীবনের চরম

উদ্দেশ্য নহে। দারিদ্র্য মানব জীবনের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষকে অবশ্যম্ভাবী অবনতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রচুর সম্পদ উৎপাদন। সত্য বটে সম্পদের অপব্যবহার নানাবিধ কুফল সৃষ্টি করে, কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের যদি যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। পার্থিব সম্পদের অভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক মংগল ব্যাহত হয়। ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন ব্যক্তির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু নীতিবাক্য দান করিয়া তাহাকে উন্নত করা সম্ভব নয়। এইজন্য চাই প্রচুর সম্পদ। সম্পদ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জনকল্যাণ সাধিত হয় না। সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া যদি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে এই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে এই অসম বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য সমগ্র কল্যাণ ব্যাহত হয়। এই জন্যই বর্তমানে সম্পদ-উৎপাদন অপেক্ষা সম্পদ-বণ্টন ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র হইতে ক্রমশই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। জনকল্যাণ সাধন করাই হইল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বর্তমান রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি একদিকে যেরূপ নানাভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, অপরদিকে তদ্রূপ ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করিয়া অসম বণ্টন ব্যবস্থা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে চিকিৎসালয় স্থাপন ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তার করিতেছে। এই সমস্ত কল্যাণকর কার্য সম্পদ ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং সম্পদ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—Value of the Study of Economics,

ধনবিজ্ঞানের পর্যালোচনা অসার ও অবাস্তব মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। বস্তুতঃ এই শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা সমাজ নানাভাবে উপকৃত হইতে পারে। যদিও বলা হয় যে, মানুষ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীবন যাপন করে না, তথাপি এ কথা অবিসংবাদী সত্য যে, ক্ষুন্নিবৃত্তি না হইলে মানুষের উন্নততর

জীবন-যাপন আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং যে শাস্ত্রে এই ক্ষুন্নিবৃত্তির যথাযথ উপায়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়, সে শাস্ত্রের আলোচনাকে অসার ও অবাস্তব বলা কোন মতে সমীচীন নহে।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। ধনবিজ্ঞানের আপাতঃ আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল সম্পদ। এই সম্পদই হইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার দ্বারা কি প্রকারে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ধনবিজ্ঞানিগণ তাহাই আলোচনা করেন। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব-কল্যাণের প্রধান সহায়ক শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধনবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও জটিল সমস্যা পর্যালোচনা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। ধনবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও উচ্চস্তরের চিন্তাধারার প্রয়োজন হয় তাহা মানুষকে যুক্তিবাদী করিয়া তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

শাসনকর্তৃপক্ষ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পক্ষে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা একান্ত অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উপরই সু-শাসকের জনপ্রিয়তা ও উপযোগিতা নির্ভর করে। কর-ধার্য করিবার ক্ষেত্রেও শাসনকর্তৃপক্ষের ধনবিজ্ঞানের কতকগুলি মূলসূত্রের সহিত পরিচিত হইতে হয়। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রনায়কগণের পক্ষে ধন-বিজ্ঞানের পর্যালোচনা অপরিহার্য। ব্যবসায়ীর পক্ষেও শিল্পসংগঠন এবং উৎপাদন ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শিল্প-ব্যবসায়ের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যবসায়ী কখনও সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শ্রমিক নেতা যদি ধনবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচিত না হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শক্তিশালী পুঁজিপতিদের সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া শ্রমিক স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি অপেক্ষা ধনবিজ্ঞানের বাস্তব উপযোগিতা যে অধিকতর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র,

উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি ফলপ্রসূ বিজ্ঞান হইলেও এই বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান যখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে নানাপ্রকারে প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই এই বিজ্ঞানগুলির পর্যালোচনা সার্থক হয়। মানুষের সুখ-সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যুৎ-শক্তির আলোচনা সার্থক হয়, নতুবা এ আলোচনা নিরর্থক হইত। সুতরাং উন্নততর জীবন যাপনের পক্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্ণয়—

মানুষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে অর্থোপার্জন দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে, ধনবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। মানুষের অভাব অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময়। এই অভাব পূরণের জন্য তাহাকে পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব পরিতৃপ্ত করিতে হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে আমরা মানুষের সেই প্রচেষ্টাগুলি আলোচনা করি যাহার একটা আর্থিক মূল্য আছে। সমাজের অঙ্গীভূত মানুষ হিসাবেই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা আলোচিত হয়। অর্থ-উপার্জন ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইলেও ইহা আলোচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা।

বিষয়বস্তু—মানুষের চলিত অর্থনৈতিক আচরণ এবং এই আচরণগুলির ত্রুটি দূর করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন করা হইল এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত ?

অনেক লেখক ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিতে আপত্তি করেন, তাহার কারণ হইল যে, এই শাস্ত্রের আলোচনা সম্পর্কে সকল ধনবিজ্ঞানী একমত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রের আলোচনা সম্ভব নহে। উপরি-উক্ত দুইটি যুক্তিই খণ্ডনযোগ্য। ধনবিজ্ঞানিগণ অনেকক্ষেত্রে একমত নহেন ইহা সত্য, কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক সময় বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন

মত পোষণ করেন। ধনবিজ্ঞানী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণী-বিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। সুতরাং ধনবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও আবহবিদ্যার ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

অর্থনৈতিক সূত্র—

অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের অনুরূপ ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ, তবে ইহারা অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় সঠিক নহে। ধনবিজ্ঞান অর্থের দ্বারা মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টার পরিমাপ করিতে প্রয়াস পায়, সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক—

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান, সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির সহিত ইহার সম্পর্ক বর্তমান। ইতিহাস হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মান রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হইতেছে। নীতিশাস্ত্র বর্তমান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলিকে এক আদর্শমানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

সম্পদ ও কল্যাণ—

সম্পদের সহিত কল্যাণের সম্পর্ক সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। সম্পদ বৃদ্ধি হইলেই যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মাদক দ্রব্য প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানে সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু এজাতীয় দ্রব্যের বৃদ্ধিতে কল্যাণ সাধিত হয় না। ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ নাও হইতে পারে। অপরপক্ষে সেবামূলক কার্য, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইলেও ইহারা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

সম্পদের সহিত কল্যাণের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও বলিতে হইবে যে, মানব-কল্যাণ সাধনের জন্য সম্পদ অপরিহার্য। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে সম্পদের প্রচুর উৎপাদন ও

ন্যায়সংগত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি নানাভাবে সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—

ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল সম্পদ-সম্পর্কে আলোচনা। এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, কি প্রকারে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব-কল্যাণের সহায়ক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। ধনবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও জটিল সমস্যাসমূহের আলোচনা মানুষকে যুক্তিবাদী করিয়া তাহার বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে। রাষ্ট্রনায়ক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-নেতা প্রভৃতির পক্ষে তাঁহাদের নিয়মিত কার্য পরিচালনা করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচয় একান্ত আবশ্যক। যখন অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে প্রযুক্ত হয়, তখনই অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আলোচনা সার্থক হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানই হইল বিজ্ঞানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

প্রশ্নাবলী

1. Define the scope of Economics, and point out its relation to Sociology and Politics. (C. U. 1955)

2. Discuss the claims of Economics to be regarded as a science.

"Economics cannot be a science because economists differ." Discuss. (C. U. B. Com.,1946)

3. "The conclusions of Economics are not, like the conclusions of Mathematics, true for all time and under all conditions". Discuss (C. U. B. Com. 1948)

4. Define Wealth and discuss the relation between wealth and welfare.

5. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange" (C. U. B. Com. 1956)

6. What are the problems to which Economists attempt to find answers ? Explain the value of Economic studies.
(C. U. B. Com. 1957)

7. Discuss the statement that economics studies the part played by money in human affairs. (C. U. 1959)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় প্রাথমিক সংজ্ঞা

(Definition of some Economic Terms)

ধনবিজ্ঞানে আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি যেগুলির অর্থ সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ হইতে পৃথক। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান, সুতরাং এই শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রত্যেকটি শব্দের একটি সুস্পষ্ট অর্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ধনবিজ্ঞানে সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা ধনবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য।

দ্রব্য—Goods.

উপযোগিতা-সম্পন্ন যে-কোন জিনিসকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত জিনিস মানুষের অভাব দূর করিয়া তাহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারে, সেইগুলি দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। এই জাতীয় দ্রব্যের অনেকগুলি হয়ত নীতিশাস্ত্রের বিচারে হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ধনবিজ্ঞানে সেগুলি দ্রব্যপদবাচ্য। বাতাস, জল, আলোক প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে অর্থে দ্রব্য বলিয়া অভিহিত, অনুরূপ অর্থে মদ্যও তদ্রূপ দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। দ্রব্যগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১। প্রকৃতি-দত্ত অথবা অনায়াসলভ্য দ্রব্য—Free goods, ২। অর্থনৈতিক দ্রব্য—Economic goods ও ৩। জনসাধারণের বা জাতীয় দ্রব্য—Public or National goods। যে দ্রব্যগুলি অনায়াসলভ্য এবং যেগুলি ভোগ করিবার জন্য কোন প্রকার মূল্য প্রদান করিতে হয় না, সেগুলি হইল প্রকৃতিদত্ত দ্রব্য, যথা—নদীর জল, বায়ু প্রভৃতি। যে দ্রব্যগুলি পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, সেগুলি অর্থনৈতিক দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত। এই দ্রব্যগুলি বিনিময়যোগ্য। জনসাধারণের বা জাতীয় দ্রব্য হইল সেই সমস্ত দ্রব্য, যেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন নহে। সাধারণ-ব্যবহৃত পার্ক, যাদুঘর প্রভৃতিকে জনসাধারণের দ্রব্য বলা যাইতে পারে। একদিক দিয়া

দেখিতে গেলে জনসাধারণের দ্রব্যগুলিকে অনায়াসলভ্য দ্রব্য বলিয়া মনে হয়, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইগুলিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণ-ব্যবহৃত পার্ক ব্যক্তির পক্ষে অনায়াসলভ্য দ্রব্যের মতন। ব্যক্তি কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া বা মূল্য প্রদান না করিয়া ইহা ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু সমাজ বা সমষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্ত দ্রব্যের একটা উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচা আছে। সুতরাং এই দ্রব্যগুলি ব্যক্তির পক্ষে অনায়াসলভ্য হইলেও সমাজের পক্ষে অর্থনৈতিক দ্রব্যের মতন।

প্রকৃতি-দত্ত অথবা অনায়াসলভ্য সামগ্রী ও অর্থনৈতিক সামগ্রীর মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্য স্থায়ী বা মূলগত পার্থক্য নহে। ভূমি অতীতে অনায়াসলভ্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে ইহা অর্থনৈতিক দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রসৈকতে বালুকারাশি অনায়াসলভ্য হইলেও সহরাঞ্চলে গৃহ-নির্মাণক্ষেত্রে ইহা মূল্যবান অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এ স্থলে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলি উৎপাদন খরচা-নিরপেক্ষ। কোন দ্রব্যের উৎপাদন খরচা না থাকিলেও অর্থনৈতিক দ্রব্য হইতে পারে, অপর পক্ষে উৎপাদন খরচা-সমন্বিত হইয়াও দ্রব্যটি অর্থনৈতিক দ্রব্য পর্যায়ভুক্ত নাও হইতে পারে। চাহিদার তুলনায় দুষ্প্রাপ্যতাই হইল অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য। যদি কোন লোক সমুদ্রোপকূলে অকস্মাৎ মুক্তা পায় তাহা হইলে এই দ্রব্যটি তাহার পক্ষে অনায়াসলব্ধ হইলেও চাহিদার তুলনায় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সম্পদ বা ধন—Wealth.

অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ ধন বা সম্পদ বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে ধন বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়, যে সমস্ত দ্রব্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ধনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার উপযোগিতা থাকা চাই অর্থাৎ ইহার অভাব মোচন করিবার শক্তি থাকা চাই—নতুবা ইহাকে ধন বলা যায় না। কিন্তু শুধু মাত্র উপযোগিতা-সম্পন্ন দ্রব্যগুলি ধনপদবাচ্য হইতে পারে না। বাতাস, জল, সূর্যের আলোক প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও এগুলিকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলা হয় না,

—কারণ ইহারা অনায়াসলভ্য, ইহাদের পাইতে হইলে কোন প্রকার পরিশ্রমের বা মূল্যপ্রদানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা। যে সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে পরিশ্রম-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য বিনিময়ের মাধ্যমে একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, সে সমস্ত দ্রব্যই ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য বৃষ্টির জলকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলা যায় না, কেননা ইহা অনায়াস-লভ্য। কিন্তু সহরে কর্পোরেশন যে জল সরবরাহ করে তাহাকে অর্থনৈতিক অর্থে ধন বলা হয়। কারণ এই জল অনায়াস-লভ্য নহে। এই জল সরবরাহ করিতে পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, সেইজন্য ইহা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই দ্রব্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে অর্থনৈতিক অর্থে ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ ধন বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহার কোন উপযোগিতা নাই বলিয়া ইহা ধন-পদবাচ্য হইতে পারে না। অপর পক্ষে যোগানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, সাহারা মরুভূমিতে বালুকা ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না —কারণ চাহিদার তুলনায় ইহার যোগান অফুরন্ত। কিন্তু লোকালয়ে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত সহরাঞ্চলে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতার জন্য ইহা ধন বলিয়া পরিগণিত হয়।

ধনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability)। কোন দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য না হইলে বিনিময়যোগ্যও হইতে পারে না—সুতরাং ধনবিজ্ঞানের অর্থে সমস্ত ধনেরই হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চাই। হস্তান্তরযোগ্য বলিতে স্থানান্তরযোগ্য বুঝায় না। হস্তান্তরযোগ্যতার অর্থ হইল বিনিময় দ্বারা মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন।

ধনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধন বলিতে শুধুমাত্র বহিঃস্থ (External) দ্রব্যগুলিকে বুঝায়—কেন না একমাত্র বহিঃস্থ দ্রব্যগুলিই হস্তান্তরযোগ্য। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা দোষ-গুণগুলি ধন বলিয়া পরিগণিত হয় না—কারণ সেগুলি মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুতরাং হস্তান্তরযোগ্য নহে। এইজন্য সূত্রধর কর্তৃক নির্মিত টেবিল ধন বলিয়া পরিগণিত হইলেও সূত্রধরের কর্মদক্ষতা ধন নহে। টেবিল বহিঃস্থ দ্রব্য সুতরাং হস্তান্তরযোগ্য—কর্মদক্ষতা সূত্রধরের

অন্তর্নিহিত শক্তি—ইহা অবিচ্ছেদ্য—সুতরাং হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া ধন-বিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিতে বাস্তব (Material) এবং অবাস্তব (Non-material) উভয়বিধ দ্রব্য বুঝায়। খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় প্রভৃতি বাস্তব দ্রব্যগুলি যেরূপ মানুষের অভাব মোচন করে, শিক্ষকের বক্তৃতা, গায়কের গান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যগুলির খাদ্য, পরিধেয় বা আসবাবপত্রের মত কোন বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহারা মানুষের অভাব তৃপ্ত করে এবং সেই জন্য বিনিময়যোগ্য ও ব্যক্তিগত স্বত্বাধীন—সুতরাং অবাস্তব অর্থাৎ উপযোগিতা-সম্পন্ন কার্যগুলিকেও ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা ধনের সংজ্ঞা স্পষ্টতর করা যায়। চন্দ্রে যদি স্বর্ণখনি থাকিত তাহা হইলে সে স্বর্ণ পৃথিবীর লোকের নিকট ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না—কারণ এই স্বর্ণ মানুষের কোন উপকারে আসিতে পারে না ও হস্তান্তরের অযোগ্য। সূর্যের কিরণ প্রভৃত উপযোগী হইলেও ধন নহে—কারণ ইহা অনায়াসলভ্য এবং কোন ব্যক্তিবিশেষ ইহার মালিক হইতে পারে না। দার্জিলিং-এর আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হইলেও ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না এবং হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া বিনিময়ের অযোগ্য। কোন ছাত্র কর্তৃক অর্জিত বি. এ. উপাধিপত্রকেও ধন বলা যায় না—কারণ ইহা হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া বিনিময়যোগ্যও নহে।

ব্যক্তিগত ধন—Personal Wealth.

ব্যক্তিগত ধন বলিতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগাধিকারে যে সমুদয় দ্রব্য থাকে তাহা বুঝায়। নগদ অর্থ, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, গ্রন্থ বা অন্যান্য দ্রব্যের উপর রক্ষিত স্বত্ব, ব্যক্তিগত ধন-পর্যায়ভুক্ত। ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill of a business) প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত ধন গণনাকালে অবশ্য ব্যক্তিগত ঋণ বাদ দিতে হইবে। দক্ষতা, সংগঠন-শক্তি, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ-পর্যায়ভুক্ত নহে।

জাতীয় ধন—National Wealth.

সমস্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধনসমষ্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত হয়। এই ধনসমষ্টি হইতে বিদেশীয় প্রাপ্য ঋণ বাদ দিতে হইবে এবং একই ধন যাহাতে একাধিকবার গণনা না-করা হয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ধন জাতীয় ধনের অংশ হইলেও জাতীয় ধন ব্যক্তিগত ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নদী, পর্বত, সমুদ্র, প্রভৃতি কোনক্রমেই ব্যক্তিগত ধন নহে অথচ গঙ্গানদীকে ভারতের একটি প্রধান জাতীয় বলা ধন হয়। গঙ্গানদী প্রকৃতিদত্ত—ইহা ব্যক্তিগত মালিকানা-বহির্ভূত—সুতরাং ব্যক্তিগত ধনের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সমগ্র দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার উপযোগিতা অপরিসীম। ইহা ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ বলিয়া পরিগণিত হয়। অপর পক্ষে এই নদীকে পরিবহনযোগ্য রাখিবার নিমিত্ত জাতীয় সরকারের অনেক ব্যয় হয়।

উৎপাদন—Production.

অর্থতত্ত্ব আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষ কিভাবে ধন-উৎপাদন দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিয়া উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে। সুতরাং 'উৎপাদন' শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা হওয়া উচিত। সাধারণ অর্থে উৎপাদন শব্দটি নূতন কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করা বুঝায়। সাধারণতঃ বলা হয় যে, তাঁতি কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, স্বর্ণকার অলংকার প্রস্তুত করিতেছে, চর্মকার জুতা প্রস্তুত করিতেছে। সাধারণ অর্থে ইহারা সকলেই নূতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছে বুঝায়। কিন্তু অর্থতত্ত্বে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল যে, এই শব্দটির দ্বারা কোন দ্রব্য-উৎপাদন বুঝায় না—ইহার দ্বারা বুঝায় দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা। মানুষ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না—কারণ দ্রব্যগুলি প্রকৃতিদত্ত। মানুষ প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর তাহার পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যগুলির উপযোগিতা (Utility) বৃদ্ধি করে মাত্র—নূতন কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে না। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে উৎপাদনের অর্থ হইল নূতন উপযোগিতা বা অধিকতর উপযোগিতা (creation of new or additional utility) সৃষ্টি করা।

এই নূতন বা অধিকতর উপযোগিতা প্রধানতঃ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়। প্রথমতঃ, প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়। ছুতার মিস্ত্রি একটি গাছকে চেয়ার-টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া উপযোগিতা বৃদ্ধি করে—এই জাতীয় উৎপাদনকে আকারগত উপযোগিতা

(Form utility) বৃদ্ধি বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্থানপরিবর্তন করিয়াও দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন খনিজীবী (Miner) খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিতেছে—বণিক সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে কোন দ্রব্যকে দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাকে স্থানান্তরিত উপযোগিতা (Place utility) বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করা বলা হয়। তৃতীয়তঃ, কালগত উপযোগিতা (Time utility) বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন করা হয়। যাহারা কোন দ্রব্যের প্রাচুর্যের সময় সেই দ্রব্য আহরণ করিয়া ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় যোগান দেয়, তাহারাও উৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অর্থে যাহারা মৎস্য, মাংস, ফল ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে তাহারাও অর্থনৈতিক অর্থে উৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই অর্থে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও উৎপাদন-কার্যে ব্যাপৃত বলা চলে। দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিয়াও উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়—যেমন গৃহভৃত্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়া তাহার প্রভুর সাহায্য করে।

উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদনক্ষম শ্রম—Productive and Unproductive Labour.

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মানুষের সকল পরিশ্রমই কি উৎপাদনক্ষম? কোন পরিশ্রমই কি বিফল নহে? এই প্রশ্ন হইতেই ফলপ্রসূ ও নিষ্ফল শ্রমের পার্থক্যের আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। য়্যাডাম্ স্মিথের মতে যে পরিশ্রম দ্বারা বাস্তব কোন দ্রব্য অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট কোন দ্রব্য (Material goods) প্রস্তুত হয়, সেই শ্রমকেই ফলপ্রসূ শ্রম বলা যাইতে পারে—অন্য আর সব শ্রমই নিষ্ফল। য়্যাডাম্ স্মিথ-প্রদত্ত সংজ্ঞা পূর্বপ্রচলিত সংজ্ঞা হইতে ব্যাপকতর হইলেও এই সংজ্ঞা ত্রুটিবিহীন নহে। এই সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষক, উকিল, চিকিৎসক, গায়ক প্রভৃতি সমাজের বহু হিতকর কার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণের শ্রম নিষ্ফল শ্রমের পর্যায়ভুক্ত হয়, কারণ ইহারা কেহই কোন বাস্তব দ্রব্য উৎপাদন করেন না, অথচ ইহাদের কার্য ব্যতিরেকে কোন সমাজই চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, য়্যাডাম্ স্মিথের সংজ্ঞার আর একটি ত্রুটি হইল ইহার যুক্তির অসামঞ্জস্য। তাঁহার মতে জাহাজ-প্রস্তুতকারক বা হারমোনিয়ম-প্রস্তুতকারক

উৎপাদনক্ষম শ্রমিক, কারণ তাহারা আকারবিশিষ্ট বাস্তব-দ্রব্য প্রস্তুত করে। কিন্তু যে বণিক বা গায়ক পরিশ্রম দ্বারা নির্মিত জাহাজ বা হারমোনিয়ম ব্যবহার করিয়া তাহাদের কার্য সম্পাদন করে, য়্যাডাম্ স্মিথের সংজ্ঞা অনুসারে তাহারা অনুৎপাদনক্ষম শ্রমিক। এরূপ যুক্তি শিশুসুলভ বলা যাইতে পারে। যে বণিক নির্মিত জাহাজ ব্যবহার করিয়া পণ্য স্থানান্তর দ্বারা দ্রব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার শ্রম নিষ্ফল হইলে জাহাজ তৈয়ারী করিবার কি উপযোগিতা থাকিতে পারে? ভোগ-ব্যবহারের জন্যই দ্রব্য—বাস্তব ও অবাস্তব—প্রস্তুত হয়। যদি জাহাজ-ব্যবহারকারী অর্থাৎ বণিকের শ্রম অনুৎপাদনক্ষম হয়, তাহা হইলে জাহাজ-প্রস্তুতকারীর শ্রম কি প্রকারে উৎপাদনক্ষম হইতে পারে তাহা যুক্তি-বহির্ভূত।

অধুনা 'উৎপাদন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলিতে দ্রব্য ও কাজ—বাস্তব ও অবাস্তব—উভয়বিধ দ্রব্য উৎপাদন বুঝায়। সুতরাং যে শ্রমের দ্বারা কোনরূপ উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়, তাহাকেই উৎপাদনক্ষম শ্রম বলা হয়। কেবলমাত্র যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শ্রম আরব্ধ হয়, সেই উদ্দেশ্য যদি শ্রমদ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে নিষ্ফল শ্রম বলা হয়। এ সম্পর্কে টাউসিগ্ বলেন যে, যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা থাকে এবং লোকে মূল্য প্রদান করিয়া সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য-প্রস্তুতকারীর শ্রম উৎপাদনক্ষম শ্রম বলিয়া অভিহিত হইবে। এই অর্থে মদ্য-প্রস্তুতকারকের শ্রমও সার্থক শ্রম বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেবলমাত্র তস্কর, প্রবঞ্চক প্রভৃতির শ্রমই নিষ্ফল, কেন না তাহারা নূতন কোন উপযোগিতার সৃষ্টি করে না।

ভোগ—Consumption.

ধনবিজ্ঞানে 'ভোগ' বা সন্তুষ্টি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলিতে যেরূপ নূতন উপযোগিতার সৃষ্টি বুঝায়, নূতন দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় না, ভোগ বলিতেও তদ্রূপ উৎপাদন দ্বারা সৃষ্ট নূতন উপযোগিতার বিনাশ (destruction of utility) বুঝায়। মানুষ অভাব মোচনের জন্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার উপযোগিতা দ্বারা নিজের সন্তুষ্টি বিধান করে। সুতরাং ভোগ শব্দটি ধনবিজ্ঞানে উপযোগিতার বিনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনের উপাদান—Factors of Production.

উৎপাদন-কার্যে কতকগুলি সহায়ক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। এই সহায়ক সামগ্রীর সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইতে পারে না। সহায়ক সামগ্রীগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, ভূমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন (Organisation)। ভূমি বলিতে প্রকৃতিদত্ত সমুদয় পদার্থ ও সমুদয় নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়। শ্রম বলিতে মানুষের উৎপাদনক্ষম কর্মপ্রচেষ্টা বুঝায়। পূর্ব-পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত স্থায়ী দ্রব্যগুলিকে মূলধন বলা হয়। মেশিন, নানাজাতীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যেগুলি উৎপাদনে সাহায্য করে, তাহাদিগকে মূলধন বলা হয়। সংগঠন বা ব্যবস্থাপনাও হইল একজাতীয় শ্রম-নৈপুণ্য, যদ্দ্বারা ভূমি, শ্রম ও মূলধন সহযোগে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। সংগঠন-কার্য বলিতে অপর তিনটি উৎপাদনের উপাদানের যথাযথ সংমিশ্রণ ও উৎপাদন-কার্যের ঝুঁকি বহন বুঝায়। বর্তমান যুগে বড বহরের উৎপাদন-ক্ষেত্রে সংগঠন-কার্যের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রতিযোগিতা—Competition.

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা বলিলে কোন নীতিবিগর্হিত কার্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রকৃত অর্থ হইল স্বাধীনভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা। যখন বিভিন্ন জাতীয় ক্রেতা ও বিক্রেতা তাহাদের খুশীমত পারস্পরিক আদান-প্রদান করিতে পারে এবং এই স্বাধীন আদান-প্রদানের ফলে দ্রব্য ও কার্যের মূল্য নির্ধারিত হয়, তখনই তাহাকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বলা হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি কোন প্রকার প্রথা, পদমর্যাদা বা আইন দ্বারা নির্ধারিত না হইয়া অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যে শুধুমাত্র স্বার্থ-সাধনের পরিচায়ক তাহা নহে,—প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হইল অর্থনৈতিক জীবনে লোকের স্বাধীনভাবে তাহাদের বৃত্তি বা পেশা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা। প্রতিযোগিতা শব্দটি অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবহৃত হইলেও স্বাধীনভাবে বৃত্তিগ্রহণ করিবার অর্থে ইহাতে সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার দ্বারা মানুষ লাভবান্ হয়, আবার ক্ষতিগ্রস্তও হয়। প্রতিযোগিতা উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। প্রত্যেক উৎপাদক উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতার প্রিয় হইতে চায়, ফলে সমাজ লাভবান্ হয়। প্রতিযোগিতার ফলে নূতন নূতন উৎপাদন-কৌশল উদ্ভাবিত হয় যাহার ফলে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রতিযোগিতা সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক। প্রতিযোগিতার আর একটি সুবিধা হইল যে, একদিকে ইহা যেরূপ দক্ষ উৎপাদককে লাভবান্ করে অপরদিকে সেইরূপ অক্ষম ও অযোগ্য উৎপাদককে বিতাড়িত করিয়া যোগ্যের স্থান সৃষ্টি করে।

প্রতিযোগিতার সপক্ষে বহু যুক্তি থাকিলেও ইহা একেবারে দোষবিমুক্ত নহে। সমান পর্যায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুফল দান করিলেও যখন এই প্রতিযোগিতা অসম ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘঠিত হয়, তখন ইহা দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার রূপে দেখা দেয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অত্যধিক উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক অপব্যয় হয়। প্রতিযোগিতার প্রধান দোষ হইল যে, শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী প্রতিযোগিগণ অতিরিক্ত মোনাফার আশায় সংঘবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ও ক্রেতার ক্রয়-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিযোগিতা যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান্ হয়। এইজন্য প্রতিযোগিতা যাহাতে উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এইজন্য সমান স্তরের প্রতিযোগীদের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ থাকা উচিত। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যাহাতে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

স্থিতাবস্থা—Equilibrium.

ধনবিজ্ঞানের কতকগুলি জটিল প্রশ্নের সমাধানে 'স্থিতাবস্থা' শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইল এই স্থিতাবস্থা শব্দটির অর্থ নৈতিক তাৎপর্য কি? স্থিতাবস্থা বলিতে এমন একটি অবস্থা বুঝায়, যে অবস্থার পরিবর্তনের কোন প্রবণতা নাই। দ্রব্যমূল্য একদিকে যদি উৎপাদন-খরচার

সমান হয় ও অপরদিকে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়, তাহা হইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হয়। এই অবস্থায় ক্রেতার চাহিদা বা বিক্রেতার যোগান পরিবর্তন করিয়া কোন লাভ হয় না। এইরূপ অপরিবর্তনীয় অবস্থাকে ধনবিজ্ঞানে স্থিতাবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্থিতাবস্থা আবার সাময়িক বা স্থায়ী হইতে পারে।

উৎপাদন সামগ্রী ও ভোগ্য সামগ্রী—Production goods and Consumption goods.

যে দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পরোক্ষভাবে উৎপাদন-কার্যে সহায়তা করে, তাহাদিগকে উৎপাদন সামগ্রী বলা হয়। মেশিন বা কাঁচামাল প্রত্যক্ষভাবে ভোগে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনে সাহায্য করে মাত্র। যে সমস্ত সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হইয়া অভাব তৃপ্ত করে তাহাদিগকে ভোগ্যবস্তু বলা হয়, যথা, খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যগুলিও উৎপাদন-কার্যে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। খাদ্য শ্রমিককে কর্মক্ষম রাখে ও তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু মেশিনের মত প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সহায়তা করিতে পারে না।

উপযোগিতা—Utility.

ধনবিজ্ঞানে উপযোগিতার অর্থ হইল অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা। যে দ্রব্যের অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাকেই উপযোগী দ্রব্য বলা হয়। তবে এ-স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞানে অভাব-মোচনের অর্থ হইল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, যে দ্রব্যের দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় তাহা হয়ত নৈতিক দিক দিয়া ভোগ্যবস্তু নাও হইতে পারে অথবা সে দ্রব্যের কোন উপকারিতা না থাকিতে পারে, তাহা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সে দ্রব্যের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উপযোগিতা সব সময়ে প্রয়োজনীয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মদ্য-পানের ইচ্ছা নীতিবিরুদ্ধ ও স্বাস্থ্যহানিকর। কিন্তু প্রয়োজন মিটাইতে পারে বলিয়া ইহাকে উপযোগী বলা হয়। যে দ্রব্য যত অধিক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে, সে দ্রব্যের উপযোগিতাও তত বেশী। মূল্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে

এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার একটা অসম্পূর্ণ পরিমাপ করা সম্ভব হইলেও দ্রব্যটির দ্বারা যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্তসার

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় প্রাথমিক সংজ্ঞা

দ্রব্য—

উপযোগিতাসম্পন্ন অর্থাৎ অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন জিনিসকে দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্যকে অনায়াসলভ্য, অথবা অর্থ নৈতিক দ্রব্য, বা জাতীয় দ্রব্যে ভাগ করা হয়।

ধন বা সম্পদ—

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যথা,—১। উপযোগিতা, ২। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা, ৩। হস্তান্তর-যোগ্যতা ও ৪। বহিঃস্থ হওয়া চাই। ধন বলিতে বাস্তব (দ্রব্য) ও অবাস্তব দ্রব্য (কাজ) বুঝায়। ধন আবার ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন হইতে পারে।

উৎপাদন—

মানুষ নূতন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না—সে কেবলমাত্র পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যগুলিকে অধিকতর উপযোগী করে। এই উপযোগিতা-সৃষ্টিকে উৎপাদন বলা হয়। ছুতার মিস্ত্রী গাছকে রূপান্তরিত করিয়া চেয়ার-টেবিলে পরিণত করিতেছে। নূতন উপযোগিতা তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়, যথা,—১। আকার পরিবর্তিত করিয়া, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া ও ৩। ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করিয়া।

উৎপাদনক্ষম পরিশ্রম—

যে পরিশ্রম প্রয়োগ করিলে উপযোগিতা-সম্পন্ন দ্রব্য বা কাজ উৎপাদিত হয় এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্য বা কাজ অর্থের বিনিময়ে অপরে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে উৎপাদনক্ষম শ্রম বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদান—

উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী হইল ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপক অপর তিনটি উপাদানের যথাযথ সংমিশ্রণে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত করেন। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন উৎপাদন-কার্যই

ভোগ—

ভোগ বলিতে ব্যবহার দ্বারা দ্রব্যের উপযোগিতার বিনাশ বুঝায়। মানুষ উৎপাদন দ্বারা যে নূতন উপযোগিতা সৃষ্টি করে, ভোগব্যবহার, দ্বারা সেই উপযোগিতার বিনাশ হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Which of the following will you call wealth ? Give your reasons in each case. (a) A gold coin, (b) Gold ore in a mine, (c) Gold in the planet Mars, (d) An autograph of poet Rabindranath, (e) A healthful climate, (f) Executive ability, (g) A farm the ownership of which is under dispute, (h) A B A. diploma obtained by a graduate (C.U. 1942)

2. Discuss the merits of competition in the economic sphere and indicate some of its incidental defects.

(C. U., B. Com. 1945 and P. U 1951)

———

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক নীতি ও সামাজিক কাঠামো

(Economic Policy and Social Structure)

অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য—Aims of Economic Policy

বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত না হইলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। তাই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র কর্তৃক যে সকল নীতি নির্ধারিত ও কার্যকরী করা হয়, সেই নীতিগুলিকে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারত সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে শিল্প পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। অনুরূপভাবে শ্রম, মূলধন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ সম্পর্কেও কয়েকটি নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল—সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। এখন প্রশ্ন হইল এই সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন বলিতে আমরা কি বুঝি এবং কি উপায়ে এই কল্যাণ সাধন করা যায়। সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন যদি অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে এই কল্যাণ সাধনের প্রথম ও প্রধান উৎপাদন হইল **অভাব হইতে মুক্তি (Freedom from want)**। সচরাচর বলা হয় অভাবে স্বভাব নষ্ট করে। সুতরাং মানুষ হিসাবে পূর্ণাংগ জীবন যাপনের জন্য সকলের সব অভাব পূরণ হওয়া প্রয়োজন।

অভাব হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করা যদি সরকারী নীতির মৌলিক উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে এই মুক্তির জন্য সরকারকে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, সমগ্র জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে সরকারকে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full employment) ব্যবস্থা করিতে হইবে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু পূর্ণ কর্মসংস্থান করিলে চলিবে না, কর্মসংস্থান যাহাতে স্থিতিশীল হয়, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিতে ইহা বুঝায় না যে দেশে একেবারেই বেকারত্ব থাকিবে না। সব সময়েই কিছু ঋতুগত বেকারত্ব ও শিল্প ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন-জনিত বেকারত্ব দেশে থাকিবেই। কিন্তু ব্যবসায়চক্র-জনিত বেকারত্ব সরকারকে নিরোধ করিতে হইবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার এরূপভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করিবে যাহাতে নূতন নূতন কাজ ও স্থায়ী কাজ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক নীতির আর একটি উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা (raising standard of living)। এই উদ্দেশ্যটি অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য 'অভাব হইতে মুক্তি'র সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অভাব হইতে মুক্তি বলিতে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভোগ বুঝায় না, সেই সঙ্গে উন্নততর ভোগ্যের লক্ষ্যও বুঝায়। মানুষ সর্বদাই উৎকৃষ্টতর ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সব বিষয়েই সে উন্নততর সুযোগ-সুবিধা পাইতে চায়। অর্থনৈতিক নীতি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে জনসাধারণ এই উন্নততর জীবনযাত্রার মানের লক্ষ্যে পঁহুছিতে পারে এবং এই মান বজায় রাখিতে পারে। জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি লোকের প্রকৃত আয় (Real income) বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা মূল্যের স্থায়িত্ব (stability in the value of Money) সাধন ছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এই উন্নীত মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এ জন্য মুদ্রামূল্যের তথা দ্রব্যমূল্যের স্থিতি সাধন করা সরকারী অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

লোকের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আর্থিক আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া উন্নততর জীবনযাত্রার মান ব্যাহত করিবে। ইহা ছাড়াও লোকের সঞ্চয়ের নিরাপত্তার জন্যও মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয়। মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইলে লোকের সঞ্চয়ের মূল্যও হ্রাস পায়।

চতুর্থতঃ, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা (Reduction of Inequality of Income and Wealth) এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত সমবণ্টন করা অর্থনৈতিক নীতির আর একটি উদ্দেশ্য। সমাজ-ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক যে বিরাট ব্যবধান আছে তাহা দূরীভূত না হইলে জনসাধারণের অভাব মুক্তি হইতে পারে না। আর অভাব মুক্তি না হইলে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ হইতে পারে না। আয় বৈষম্যের ফলে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ ব্যাহত হয় ও সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লব সৃষ্টি করে। আয় বৈষম্যের কারণ হইল, ১। গুণ ও যোগ্যতার পার্থক্য, ২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব, ৩। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ও ৪। সামাজিক পরিবেশ ও অনায়াসলব্ধ আয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা আয়-বৈষম্য দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য আধুনিক অনেক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান হারে কর, উত্তরাধিকার কর, সম্পদ কর, ব্যয় কর স্থাপন, এবং ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ, সামাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া আয় ও ধন বৈষম্য হ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

পঞ্চমতঃ, মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে চায়—কেহই ক্রীতদাসের মত পরাধীন হইতে চায় না। এইজন্য শ্রমিকদের কাজের অবস্থা উন্নত করা (Improving working conditions of labour) প্রয়োজন। শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক ব্যবস্থা ব্যতীতও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা, স্বাধীনতা ও কাজের একঘেয়েমী দূর করিবার জন্য বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ও ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শ্রমের সময়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক, যুক্তি সংগত অবসর, চিত্ত বিনোদনের জন্য বিশুদ্ধ

আমোদ-প্রমোদ, অসুস্থ অবস্থায় বা বার্ধক্যে বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে বটে, তবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এককালীন এই সমস্ত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্র জনকল্যাণ উদ্দেশ্যে নীতি নির্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করা অনেক সময় দুরূহ হয়। যে উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে অর্থ-নৈতিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, অনেক সময় সেই উপায়গুলি পরস্পর-বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পূর্ণ কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে ঘাটতি ব্যয় (Deficit financing) করা অনেক সময় অপরিহার্য হইয়া উঠে, কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া লোকের আসল আয় (Real income) কমিয়া যায় ও প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যাহত হইতে পারে। এইজন্য নীতি নির্ধারণকালে সরকারকে বিভিন্ন উপায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিভিন্ন উপায়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা।

সামাজিক কাঠামো—The Social Framework.

কোন রাষ্ট্রীয় সরকারই সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থা উপেক্ষা করিয়া ইহার অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করিতে পারে না। প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারিত না হইলে সে নীতি শুধু আদর্শবাদী নীতি হয় এবং এরূপ নীতি কখনও অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না। সুতরাং অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে সামাজিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল।

একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দেশের ধনোৎপাদন ও ধন-বণ্টন-পদ্ধতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। উৎপাদন-পদ্ধতি আবার সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি, মূলধন-পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি যথাযথভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নত ধরণের হয়। কিন্তু দেশের

অর্থনৈতিক কাঠামো শুধু উৎপাদন-পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না—বণ্টন-ব্যবস্থার দ্বারাও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভাবিত হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তাধীন হয়. তাহা হইলে উৎপাদিত ধনের বেশীর ভাগ অল্পসংখ্যক লোকে ভোগ করে ও অধিকাংশ লোক দরিদ্র হয়। যে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সে সমস্ত দেশে এইরূপ অসম বণ্টন-ব্যবস্থা দেখা যায়; অসম বণ্টন-ব্যবস্থা হইলেও এরূপ দেশগুলি উন্নত দেশ (Developed Countries) বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার, অনেক দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার আয়ত্তে না রাখিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়। অনেক দেশ আবার এই উভয় পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এক মিশ্র পদ্ধতির ভিত্তিতে তাহাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো গঠন করিতেছে। ধনতান্ত্রিকই হউক আর সমাজতান্ত্রিকই হউক, উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হইল যান্ত্রিক কৃষি, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য।

ধনতান্ত্রিক কাঠামো—Capitalistic Economy

'ধনতন্ত্রবাদ' বলিতে এমন একটি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্যক্তিগত লাভের জন্য স্বাধীনভাবে উৎপাদন-কার্যে লিপ্ত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও ভোগের সামগ্রীগুলি যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নহে, উত্তরাধিকার-সূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে ভূমি ও শিল্পের মালিকগণ ধনবান হইতে অধিকতর ধনবান হন ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ধনতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোগ-নিয়ন্ত্রণের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারে। উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে নির্ধারিত হইয়া আপনা হইতেই স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিরাট বহরের উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করিবার জন্য ব্যবস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলেও অনেক সময় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ইহারা প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে শ্রমিক-সংঘ, ক্রেতা-সংঘ, উৎপাদক-সংঘ প্রভৃতি গঠন করে।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সুফল—এই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়। ক্রেতা স্বাধীনভাবে তাহার রুচিমত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবস্থাপকগণ বিশেষ সাবধানে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থায় শুধু যোগ্যতম পরিচালক টিকিয়া থাকে।

কুফল—কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ধনবৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি করে। সমান সুযোগ-সুবিধার অভাবে অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। অনেক সময় উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ক্রেতার ক্রয়-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকার-সমস্যা, ব্যবসায় চক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামো—Socialistic Economy

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান-গুলির উপর যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীন একটি

পরিকল্পনা সমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়-চক্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর কুফলগুলি দূর হইয়া অর্থনৈতিক জীবন সুগম হয়। রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সে দেশের জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তে পৃথিবীর বহু দেশই অল্পবিস্তর পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গলদ দূর করিতে পারিলেও এই ব্যবস্থায় কয়েকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা নষ্ট হয়। অনেক সময় সরকারও ভুল করিতে পারেন।

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো—Mixed Economy

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ত্রুটিগুলি বাদ দিয়া উভয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির ভিত্তিতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়। সুতরাং যে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো মিশ্র ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে উভয় ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-সম্মত অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন-পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়িতে পারে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন রাখা হয়। আবার, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর,সে-সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং জাতীয় জীবনে গুরুত্ব অনুসারে এই ভাগগুলির কোন্‌টি সরকারী পরিচালনাধীন হইবে এবং কোন্‌টি বে-সরকারী পরিচালনাধীন হইবে তাহা স্থির করা হয়। সাধারণতঃ কয়লা, বিদ্যুৎ, ইস্পাত প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি, যুদ্ধোপকরণ-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শিল্পগুলি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ-সম্পর্কিত শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। আবার, কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন উৎপাদন-ব্যবস্থা পাশাপাশি চলিতে পারে। বর্তমানে ভারত-সরকার এই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

উন্নত ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য—Features of Developed and Under-developed Economies

অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে দেখিতে গেলে দেশগুলিকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। কোন কোন দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়, আবার কোন কোন দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। উন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া দক্ষতার সহিত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। যান্ত্রিক কৃষি (কলের লাঙ্গলের সাহায্যে বহুপরিমাণে জমি একসঙ্গে চাষ, আধুনিক সেচব্যবস্থা, উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ, একই জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন, বীজবপন ও ফসল কাটিয়া মাড়াই করিবার জন্য যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ), বৃহদায়তনের শিল্প এবং ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের সাহায্যে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া লোকের জীবনধারণের মানও উন্নত হয়। অপরপক্ষে অনুন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাব দেখা যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা চিরাচরিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম হয়। ইহা ছাড়া, জাতিভেদ, যৌথপরিবার প্রথা, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী-ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা সামাজিক কারণেও বণ্টন-ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা যায়। ফলে, মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইয়া লোকের জীবনধারণের মান নীচু হয়।

অনুন্নত-দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল :

১। কৃষি-ব্যবস্থার ত্রুটি—Drawbacks of Agriculture

এই সমস্ত দেশে কৃষির প্রাধান্য থাকিলেও কৃষিকার্য চিরাচরিত প্রথায় পরিচালিত হয়। জলসেচ-ব্যবস্থার অভাব, চাষের জমির ক্ষুদ্রায়তন, একই জমি বিনাসারে পুনঃপুনঃ কর্ষণ ও কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষি হইতে উৎপাদন-পরিমাণ কম হয়।

২। শিল্পের অনগ্রসরতা—Industrial Backwardness

এই সমস্ত দেশ কৃষির ন্যায় শিল্পেও অনগ্রসর। মূলধন ও সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব হইল এই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া, উৎপাদনের

আধুনিক পদ্ধতিগুলি ও কারিগরি শিক্ষার অভাবহেতু উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সম্ভব হয় না। লোকের মাথাপিছু আয় কম বলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কম হয়। অনুন্নত দেশে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের নিকৃষ্টতার জন্য ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিদেশেও কোন চাহিদা হয় না।

৩। মূলধনের অভাব—Dearth of Capital

অনুন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম। এই অল্প আয় তাহারা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করে। উদ্বৃত্ত আয়ের অভাবে মূলধন গঠনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

৪। বেকার সমস্যা—Unemployment Problem

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সমস্ত দেশে স্থায়িরূপে বেকার-সমস্যা দেখা যায়। কৃষির অনগ্রসরতা ও শিল্প-ব্যবসায়ের অভাবহেতু জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে, বেকার সমস্যা ও অন্য নানাবিধ শ্রমিক-সম্পর্কিত সমস্যার উদ্ভব হয়।

৫। উৎকট ধনবৈষম্য—Worst Inequality of Wealth

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ আয়ের পার্থক্য। মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে জাতীয় আয়ের বেশীরভাগ কেন্দ্রীভূত হয়। আর অধিকাংশ লোকেরই অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় না। দরিদ্রশ্রেণী সর্বদিক দিয়াই শোষিত ও নির্যাতিত হয়।

৬। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী—Exports mainly agricultural, imports mainly industrial.

জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং দেশের অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য বিদেশ হইতে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করিতে হয়, অথচ অনুন্নত দেশ হইতে উন্নত দেশে রপ্তানী করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণ ও উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট পণ্যের অভাব হেতু অনুন্নত দেশ হইতে প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়—Requirements for Economic Development

অনুন্নত দেশগুলির দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্রনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণপূর্বক অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Economic Planning) গ্রহণ করা হইতেছে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্প একটি অপরের পরিপূরক। কৃষিজাত কাঁচামাল না হইলে শিল্পপ্রসার সম্ভব নয়। কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার প্রয়োজন। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সাহায্যে একদিকে যেরূপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়, অপরদিকে সেইরূপ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পের প্রসার সম্ভব হয়। অনুন্নত দেশের লোকের আয় স্বল্প এবং এইজন্য জীবনযাত্রার মান খুব নীচু। এইজন্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষি হইল আয়ের একটি প্রধান উপায়। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের চাষবাস প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্য একসঙ্গে বহু পরিমাণ জমির চাষ, কলের লাঙ্গলের প্রবর্তন, সেচব্যবস্থা, সারের ব্যবস্থা ও কৃষিজাত দ্রব্যের উত্তম বিক্রয়-ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কোন দেশই শুধু কৃষির উন্নতির দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারে না। কৃষির সঙ্গে শিল্পের প্রসারও প্রয়োজন। এইজন্য কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলির উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে চিনি, বস্ত্র, ও নানাজাতীয় ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের শিল্পগুলির প্রসার আবশ্যক। পল্লী-অঞ্চলের লোকের অবস্থার উন্নতির জন্য ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের উপর জোর দিতে হইবে। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ও বিদেশের সঙ্গে যাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধে চলিতে পারে, সেজন্য রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন ইত্যাদির উন্নতিও একান্ত আবশ্যক। দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীতও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের অনুন্নত অবস্থা দূর করিয়া উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রচুর

মূলধনের আবশ্যক। এজন্য সরকারী, বে-সরকারী এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। স্বল্প মেয়াদের জন্য সরকার ঘাটতি ব্যয় অর্থাৎ নোট প্রচলনের সাহায্যে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া ভোগ্যবস্তুর উপর কর ধার্য করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে ঋণগ্রহণ, করবৃদ্ধি ও নূতন নূতন করস্থাপন করিয়া উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহ করা যাইতে পারে।

উন্নয়নের জন্য বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ বিদেশী ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব করিয়াছে। কিন্তু বিদেশী ঋণগ্রহণ সম্পর্কে প্রধান কথা হইল যে, উন্নয়নের জন্য বিদেশী অর্থঋণ অপেক্ষা বিদেশী কারিগরি নৈপুণ্য ও শিল্প-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করা বেশী প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক নীতি ও সামাজিক কাঠামো

সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক যে সকল নীতি নির্ধারিত ও কার্যকরী করা হয়, সেই নীতিগুলিকে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক নীতি বলা হয়।

রাষ্ট্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। কল্যাণ সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় হইল অভাব হইতে মুক্তি। জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে হইবে: ১। পূর্ণ কর্মসংস্থান, ২। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, ৩। দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব সাধন, ৪। আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা ও ৫। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। অবাধ প্রতিযোগিতা, ২। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ৩। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ, ৪। উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অভাব, ৫। চাহিদা ও যোগান দ্বারা মূল্য নির্ণয়, ৬। ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপক শ্রেণীর আবির্ভাব, ৭। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ৮। আয়-বৈষম্য।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

১। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্র মালিকানা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ, ২। পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন, ৩। ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা।

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উৎপাদনের কতিপয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও অন্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিয়া মিশ্রতন্ত্র গঠন করা হয়।

উন্নতদেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

১। যান্ত্রিক কৃষি, ২। উন্নত ধরণের ও বৃহৎ বহরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। ফলে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য

১। কৃষির ক্রটি, ২। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনগ্রসরতা, ৩। মূলধনের অভাব, ৪। বেকার-সমস্যা ও ৫। উৎকট ধনবৈষম্য, ৬। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী।

প্রতিকার—১। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ২। কৃষি ও শিল্পের প্রসার, ৩। দেশের মধ্যে ও বিদেশ হইতে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা, ৪। বিদেশী ঋণ ও কারিগরি নৈপুণ্য এবং শিল্প অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise economy and a planned economy. (C. U. 1957)

2. What are the chief features of Mixed economy ? Illustrate your answer with Indian example.

3. Discuss the aims and utility of Economic Policy.

4. Discuss the value and limitations of Mico-economic analysis and Macro-economic analysis.

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় আয়

(Natioal Income)

আয়—Income

জাতীয় আয় আলোচনা করিবার পূর্বে আয় কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। কাজের প্রতিদানস্বরূপ প্রত্যেকে সাপ্তাহিক বা মাসিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাই হইল প্রত্যেকের আয়। অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ স্থির হয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা উপার্জন করে, তাহাই হইল তাহার ব্যক্তিগত আয়। একই পরিবারের তিন জনে যদি কাজ করে, তাহা হইলে এই তিন জনের আয় সমষ্টিকে পারিবারিক আয় (Family income) বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, এই আয়ের প্রয়োজন বা গুরুত্ব কি ? মানুষের স্বচ্ছলতা ও দৈন্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যার আয় বেশী তার অবস্থা ভাল, আর যার আয় কম তার অবস্থা খারাপ। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ ছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় প্রভৃতি নানা বাবদ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট পরিমাণ আয় না থাকিলে ব্যয় সংকুলান হয় না। কাজেই স্বল্প আয়ের লোকের সব অভাব মিটিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, আয়ের উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়—Money Income and Real Income

ব্যক্তি তাহার কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মজুরি পায় তাহাকে আর্থিক আয় বলা হয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া সে কাজের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পায় বা অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে তাহার উপর তাহার প্রকৃত আয় নির্ভর করে। সুতরাং কাজের অন্যান্য আনুসংগিক সুখ-

সুবিধা ও দ্রব্যমূল্যের দ্বারাই প্রকৃত আয় পরিমাপ করা যায়। কাজের আনুসংগিক সুবিধা হিসাবে বিনা ভাড়ায় আবাস-গৃহ, সুলভে খাদ্য-বস্ত্র পাওয়া প্রভৃতি লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করে।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে ইহা সত্য। কিন্তু আয় বাড়িলেই যে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহার উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

জাতীয় আয়—National Income

ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান যেরূপ তাহার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, একটি জাতির জীবনযাত্রার মান তদ্রূপ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক জাতীয় আয় কাহাকে বলে। একটি দেশে সমস্ত উৎস হইতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বৎসরে যে আয় হয়, তাহাকে সাধারণতঃ জাতীয় আয় বলা হয়। পিগু বলেন, জাতীয় আয় হইল একটি দেশের বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয়সমেত দেশের সমগ্র বৈষয়িক আয়ের সেই অংশ যে অংশের একটি অর্থমূল্য আছে। "National Dividend is that part of the objective income of the Community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money." পিগুর মত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যে-সমস্ত দ্রব্য ও কার্য অর্থের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য তাহাই হইল জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দ্রব্য বা কার্য অত্যধিক উপযোগী হইলেও যদি ইহার কোন অর্থমূল্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গৃহকর্ত্রী যদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবারের ব্যয়সংকোচ করেন তাহা হইলে পিগুর মতে গৃহকর্ত্রীর এই কার্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, কারণ গৃহকর্ত্রীর কার্যের কোন অর্থমূল্য প্রদান করা হয় না। কিন্তু বেতনভুক পাচক দ্বারা যদি ঐ রন্ধনকার্য সম্পাদিত হয় তাহা হইলে পাচকের এই কার্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে, কারণ পাচকের কার্যের অর্থমূল্য আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই কার্য এক সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে, অন্য সময়ে এই আয় হ্রাস করে। এতদ্ব্যতীত পিগুর

মত অনুসারে অবৈতনিক বিদ্যালয়, জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পার্ক, যাদুঘর পুস্তকালয় প্রভৃতি জনহিততর প্রতিষ্ঠানগুলিও জাতীয় আয় পরিমাপের বিষয়-বস্তু হইতে পারে না।

অধ্যাপক মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। একটি দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ কার্য সমেত বাৎসরিক যে বাস্তব ও অবাস্তব দ্রব্যসমষ্টি উৎপাদন করে, খরচ বাদ দিয়া সেই সমুদয় দ্রব্যসমষ্টিকে জাতীয় আয় বলা হয়। "The labour and capital of a country, acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind." মার্শালের মতে দেশের এই বাৎসরিক আয় হইতে আয় অর্জন করিবার যে খরচ তাহা বাদ দিলে নীট্ জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যায়। উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাৎসরিক যে আয় হয়, তাহা হইল মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের অপচয়-নিবারণ. কাঁচামাল প্রভৃতি চল্‌তি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট্ জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সঙ্গে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত নীট্ আয়ও যোগ দিয়া সমগ্র নীট্ জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং মার্শালের মতে একটি দেশে বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাই হইল বাৎসরিক আয়। অপর পক্ষে ফিসার বলেন যে, দেশে বাৎসরিক সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের যে অংশের ভোগব্যবহার করা হয় (consumed) তাহাই হইল নীট্ জাতীয় আয়। ফিসারের মত অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভোগব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এই কারণে মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে অর্থাৎ.উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা জাতীয় আয় নির্ধারণ করা অধিকতর সহজসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সুতরাং একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করে—এই উভয়ের

সমষ্টিকে সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা G. N. P.) বলা হয়। এই মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি-পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়ের আলোচনা তিনটি দিক হইতে করা যাইতে পারে।

১। **জাতীয় উৎপাদন সমষ্টি**—ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন প্রভৃতি উৎপাদনের চারিটি উপাদানের যুক্ত সাহায্যে এক বৎসরে দেশে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপাদিত হয় তাহাকে জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। মোট দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্যই হইল জাতীয় আয়।

২। **জাতীয় আয় সমষ্টি**—অপরপক্ষে জাতীয় উৎপাদনে অংশ-গ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানগুলির বাৎসরিক আয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলা যাইতে পারে। একটি বৎসরে জমির মালিক, শ্রমিক, মূলধনের মালিক ও সংগঠক উৎপাদন কার্যে সাহায্য করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহার সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়।

৩। **জাতীয় ব্যয় সমষ্টি**—জাতীয় ব্যয় হিসাব করিয়াও জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যায়। একটি নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের লোকে যে পরিমাণ আয় করে তাহার সমগ্র পরিমাণই ব্যয় করিতে পারে অথবা আয়ের একটা অংশ ব্যয় করিতে পারে এবং অপর অংশ সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করিতে পারে। সুতরাং একটি বৎসরে দেশের সকল লোকের ভোগ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়ের পরিমাণের সহিত সঞ্চয় বা বিনিয়োগ পরিমাণ যোগ করিলে জাতীয় ব্যয় পরিমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে ব্যয় পরিমাণের ভিত্তিতে আয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় হইল বণ্টনের একমাত্র উৎস। এই উৎস হইতে উৎপাদনের উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদত্ত হয়। দেশের বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে যে আয় হয়, তৎসমুদয়ই জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং এই জাতীয় আয়ই হইল দেশের একমাত্র ধনভাণ্ডার যাহা হইতে সকল প্রকার আর্থিক আদান-প্রদান হয়। জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। জাতীয় আয় একটি সঞ্চিত ধনভাণ্ডার নহে, ইহা একটি আয়ের

প্রবাহ মাত্র। বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, তাহা সঞ্চিত হইয়া বৎসরের শেষে যে বণ্টিত হয় তাহা নহে। পরন্তু উৎপাদন ও বণ্টন, আয় ও ব্যয় যুগপৎ চলিতে থাকে। একটি চৌবাচ্চায় যেরূপ একদিকে জলসঞ্চিত হইতে থাকে এবং অপরদিকে জল ব্যবহৃত হইতে থাকে, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ কল্পনা করা হয় যে, এই আয়ের সঞ্চয় ও ব্যয় যুগপৎ চলিতে থাকে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ-পদ্ধতি—Measurement of the National Income.

উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি—Census of Production Method.

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার জন্য তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টি গণনা করিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিবার কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। (১) উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণকালে একই দ্রব্যের মূল্য একাধিক-বার যাহাতে জাতীয় আয়ে গণনা করা না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। একটি ব্যবহারযোগ্য গৃহের মূল্য নির্ধারিত হইলে, সেই গৃহ-নির্মাণের জন্য যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়, পৃথকভাবে আর সেই সকল উপকরণের মূল্য গণনা করিতে হয় না অর্থাৎ জাতীয় আয় নির্ধারণ-কালে শুধুমাত্র ভোগ-ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যসমষ্টি গণনা করিতে হইবে। (২) জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় বা ঋণ-প্রত্যর্পণ যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। (৩) স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ খরচ বাদ দিতে হইবে।

আয় সুমারী পদ্ধতি—Census of Income Method.

জাতীয় আয় পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এইজন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে সমস্ত কর্মী উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের সমগ্র আয়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত আয়গুলি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ক) খাজনা ও নূতন আবিষ্কারের প্রাপ্যাংশ, (খ) পারিশ্রমিক ও ভাতা, (গ) সুদ, (ঘ) সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট্ আয়।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন আয় গণনাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জাতীয় আয় গণনাকালে শুধুমাত্র অর্থ প্রদান দ্বারা হস্তান্তরিত হইলেই সেই আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি বাড়ীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে না, কারণ এই বিক্রয় দ্বারা শুধু মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, নূতন কোন সম্পদ্ উৎপাদিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, অনায়াসলভ্য আয় যথা, ভিক্ষুকের আয়, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা প্রভৃতি যে আয় বিনা-উৎপাদনে অর্জিত হয়, তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। তৃতীয়তঃ, যৌথ কারবার প্রভৃতি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অ-প্রদত্ত (undistributed) মুনাফা ও উৎপাদকের নিজস্ব জমির খাজনা বা শ্রমের মজুরি জাতীয় আয় নির্ধারণকালে অবশ্য গণনা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, দুইটি বিভিন্ন সময়ের জনপ্রতি আয়ের তুলনামূলক গণনা করিতে হইলে, দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে গণনাকার্য পরিচালিত করা আবশ্যক।

ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি—Consumption and Savings Method.

ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যেও জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। একটি বৎসরে দেশে বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, সেই আয় আংশিকভাবে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, এবং আংশিকভাবে সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং সমগ্র জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ করা হয় ও অপরাংশ সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের ও সেবামূলক কার্য ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে—এই উভয়ের যোগফল হইল জাতীয় ব্যয় (National outlay)।

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতি—উৎপাদন, আয় ও ব্যয়—বিভিন্ন হইলেও তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে একই ফল পাওয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা যাহা উৎপাদন করে, সেই উৎপাদন পরিমাণ পুনরায় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয়

আয়ের সমান হইবেই। জাতীয় আয় আবার লোকে অংশতঃ ভোগের জন্য ব্যয় করে, অংশতঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সঞ্চয় ও ভোগ মিলিয়া জাতীয় ব্যয় হয়। এ দিক দিয়াও জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান।

জাতীয় আয়-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা—Utility of the study of National Income.

একটি দেশের লোকের বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে যে ধন উৎপাদিত হয়, তাহাই হইল সেই দেশের জাতীয় আয় এবং এই জাতীয় আয়ের যে অংশ লোকে খাজনা, মজুরি বা বেতন, সুদ ও লভ্যাংশরূপে পায় তাহাই হইল ব্যক্তিগত আয়। সুতরাং ব্যক্তিগত আয় হইল জাতীয় আয়ের একটি অংশ। জাতীয় আয়ের পরিবর্তনে ব্যক্তিগত আয়ের পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যক্তিগত আয়ের পরিবর্তনে ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানও পরিবর্তিত হয়। ধনবিজ্ঞানে যে সমুদয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পর্যালোচনা করা হয় তাহার প্রত্যেকটি সমস্যাই জাতীয় আয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট। জাতীয় আয়-বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন উৎস হইতে কি পরিমাণ আয় হইতেছে অর্থাৎ দেশের লোকে সঞ্চিত মূলধন হইতে কি পরিমাণ সুদ, পরিশ্রমের দ্বারা কি পরিমাণ পারিশ্রমিক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়-সম্পর্কিত তথ্যগুলি এরূপভাবে সন্নিবদ্ধ করা হয় যে, জাতীয় আয়-গঠনকারী বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক ও আংশিক রূপ ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়-বিশ্লেষণের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। আয়-ব্যয়, সঞ্চয়-বিনিয়োগ, উৎপাদন-বণ্টন প্রভৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহাও জাতীয় আয়-বিশ্লেষণের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। উৎপাদনের উপাদান-গুলির যথাযথ নিয়োগ দ্বারাই সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় এবং একমাত্র জাতীয় আয়-বিশ্লেষণের সাহায্যে উপাদানগুলির যথাযথ নিয়োগ হইতেছে কিনা তাহা জানা সম্ভব হয় ও যে ক্ষেত্রে উপাদানগুলির যথাযথ নিয়োগ না হয় সে ক্ষেত্রে উপাদানগুলির সর্বাধিক সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয়। এইজন্য অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে

যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন তাহা জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়। জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেই দেশের সরকার তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব (বাজেট) প্রস্তুত করে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার করিতে হইলেও জাতীয় আয়ের সাহায্যে তাহা সম্ভব হয়। দেশের মূলধন সঞ্চয় পরিমাণের সহিত মূলধন ব্যয় পরিমাণের সমতা আছে কিনা, উৎপাদিত ধনের বেশীর ভাগ ভোগব্যবহারে ব্যয়িত হইতেছে, না সঞ্চিত হইতেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে উৎপাদিত ধন বণ্টিত হইতেছে, দেশের দেনা-পাওনার সাম্যাবস্থা অনুকূল না প্রতিকূল—এই সকল বিষয় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এক কথায় জাতীয় আয়-বিশ্লেষণ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—Difficulties in the measurement of National Income.

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা করা সহজসাধ্য হইলেও সঠিকভাবে জাতীয় আয় নিরূপণ করা দুরূহ।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় আয় গণনা করা হয় সর্বত্র সব সময়ে সেই তথ্যাদি পাওয়া যায় না। অনুন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া এই জাতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এই সকল উৎপাদক সঠিকভাবে তাহাদের আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে না। অনেক সময় উৎপাদক স্বয়ং উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ নিজে ভোগ-ব্যবহার করে, অনেক সময় আবার সরাসরি দ্রব্য বিনিময় হয়। এই সব কারণেও উৎপাদন বা আয়ের নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় না বলিয়া জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার অসুবিধা ঘটে। মুদ্রা-স্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদনের উপাদানগুলির আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে জাতীয় আয়ে কোন পরিবর্তন নাও হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থমূল্যের সাহায্যে সঠিকভাবে জাতীয়

আয় নিরূপণের অনেক অসুবিধা আছে। গৃহকর্ত্রী রন্ধন কার্য করিলে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু বেতনভুক পাচকের কার্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের মূল্যবৃদ্ধি না পাইয়া যদি শুধু উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদনের দিক দিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় না।

পঞ্চমতঃ, জাতীয় আয় গণনার আর একটি অসুবিধা হইল একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার গণনা করিবার সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া যন্ত্রপাতি ও স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ কি পরিমাণ অর্থ মোট জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য।

ষষ্ঠতঃ, সরকার কর্তৃক ধার্য করগুলির কোন্‌টি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন্‌টি বাদ দিতে হইবে তাহাও এক কঠিন সমস্যা। যদি কোন লোকের সমগ্র আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে আদায়ীকৃত আয়কর জাতীয় আয়ে ধরা উচিত নয়। কারণ তাহা হইলে একই আয় দুইবার গণনা হইয়া জাতীয় আয় অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি করিবে। সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই অসুবিধা দেখা যাইতে পারে। নির্ভুলভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তন প্রভৃতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

Social Accounting—সামাজিক হিসাব-নিকাশ

সামাজিক হিসাবের সাহায্যেই জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মোট উৎপাদন, মোট আয় এবং মোট ব্যয় ও ভোগের সমন্বয়ে জাতীয় আয়ের একটি পূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করা হয়।

অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক হিসাব-নিকাশ করা কষ্টসাধ্য, কারণ জাতীয় আয় গণনা করিবার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা এসব দেশগুলিতে নাই বলিলেও চলে। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলিতে একমাত্র উৎপাদন সুমারীর সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়।

সামাজিক হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য সমাজের সকল ব্যক্তির আয়ের

একটি হিসাব-তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তাহাদের ব্যয় ও সঞ্চয়ের আর একটি হিসাব-তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অনুরূপভাবে বে-সরকারী উদ্যোগের আয়ের একটি হিসাব-তালিকা ও তৎসঙ্গে ইহাদের ব্যয় ও সঞ্চয়ের আর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তৃতীয়তঃ, সরকারী ক্ষেত্রের আয়ের একটি তালিকা ও তৎসঙ্গে ব্যয় ও সঞ্চয়ের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয় ও ব্যয়ের তালিকা মিলাইয়া দেখা হয় যে, এই দুইটি তালিকার মধ্যে সংগতি আছে কি না। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সংগতি থাকা উচিত কারণ আয় পরিমাণ ব্যয় ও সঞ্চয় পরিমাণের সমান হইতেই হইবে। যে ক্ষেত্রে এই আয় ও ব্যয়ের তালিকা সমান না হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে হিসাবে ভুল আছে। সুতরাং নূতন করিয়া হিসাব করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয়—একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া সেই দেশের শ্রম ও মূলধন প্রতি বৎসর গড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কার্য সমেত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যজাত ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করে। এই উৎপাদন পরিমাণের সেই সময়কার অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধন ও কাঁচামাল পুনঃস্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি—জাতীয় আয় তিন প্রকারে গণনা করা যায়। ১। উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি—সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিয়া, ২। আয় সুমারী পদ্ধতি—সমাজে সকল ব্যক্তির আয়, অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ দিয়া। ৩। ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি—নির্দিষ্ট বৎসরে মোট ব্যয়িত অর্থ পরিমাণ ও সঞ্চিত অর্থ পরিমাণ যোগ দিয়া জাতীয় ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়। মোট ব্যয় পরিমাণ মোট আয়ের সমান হয়।

জাতীয় আয়ের গুরুত্ব—

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব ও উপযোগিতা আছে।

১। জাতীয় আয়ের মাধ্যমে লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং জাতীয় আয় অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিমাপক।

২। জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের তুলনা করা যাইতে পারে।

৩। জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের গলদ জানিতে পারা যায় এবং এই গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা হয়।

৪। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে জাতীয় আয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অতি প্রয়োজনীয়। এই তথ্যগুলি ব্যতীত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—১। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব, ২। একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার গণনার সম্ভাবনা, ৩। মূল্যস্তরের পরিবর্তন ৪। অর্থমূল্য দ্বারা সেবামূলক কার্যের উপযোগিতা নির্ধারণ করিবার অসুবিধা।

প্রশ্নাবলী

1. How would you define and measure the national income of a country ? (C. U. 1956 ; B. Com 1959)

2. Discuss the importance and utility of National Income analysis.

3. Enumerate the difficulties in the measurement of National Income.

পঞ্চম অধ্যায়

ভোগ, চাহিদা ও ক্রেতার আচরণ

(Consumption, Demand and Consumer's Behaviour)

ভোগ ও উৎপাদন—Consumption and Production.

ভোগের ইচ্ছাই মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস। মানুষের যদি ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকিত তাহা হইলে উৎপাদনের কোন প্রয়োজন হইত না। ভোগের পরিমাণ ও ভোগের বৈচিত্র্য উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্যের বাজারে কোন চাহিদা নাই, যাহা লোকে কোন প্রকার মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে, সে দ্রব্য কখনও উৎপাদিত হইতে পারে না। সুতরাং সমস্ত উৎপাদন কার্যের মূলে রহিয়াছে এই ভোগের বা অভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্য।

উপরি-প্রদত্ত উক্তি মানুষের প্রাথমিক অভাব পূরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। প্রাথমিক অভাবগুলির পরিতৃপ্তি হইলেও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে না। এই অবস্থায় অভাব পূরণের জন্য মানুষ নূতন কর্ম প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয় না—অধিকন্তু মানুষের স্বভাবজাত সক্রিয়তার জন্য নূতন নূতন ভোগ্যবস্তু আবিষ্কৃত হয় এবং এই নূতন কর্ম-প্রচেষ্টার ফল নূতন অভাব সৃষ্টি করে। নূতন নূতন দ্রব্য সৃষ্টি হইলে সেগুলি ক্রমশঃ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হইয়া নূতন অভাব সৃষ্টি করে। নূতন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে, মানুষ এই যন্ত্রের অভাব-বোধ করিতে লাগিল। বর্তমানে টেলিফোন সভ্য জীবন যাপনের একটি অপরিহার্য অংগ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ভোগ ও উৎপাদনের সম্পর্ক বিপরীতমুখী হইয়াছে। বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থাই ক্রেতার রুচিবোধ সৃষ্টি করিয়া বা পরিবর্তিত করিয়া দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হইলেও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে বহুল পরিমাণে উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অভাব ও ইহার প্রকৃতি—Human Wants and their Characteristics.

মানুষের ভোগস্পৃহা তাহার অসংখ্য অভাব হইতে উদ্ভূত। শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান হইলেই মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। শরীর ধারণ করা ব্যতীতও মানুষের একটি অন্তর্জীবন আছে। মানুষ চায় তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—তাই এই উন্নতির সহায়ক সামগ্রী আহরণের জন্য সে সর্বদা কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। সামাজিক জীব হিসাবেও শিষ্টাচার বজায় রাখিবার জন্য মানুষের কতকগুলি প্রয়োজন মিটাইতে হয়। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানুষ কতকগুলি অভাবের দাস। এই অভাবগুলির প্রকৃতি জানিতে পারিলেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

১। মানুষের অভাবের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবের পরিসমাপ্তি নাই (unlimited in number)। যে মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ হইল, পর মুহূর্তেই পুনরায় নূতন অভাব দেখা যায়। অভাবগুলি যেন মানুষের মনে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। কোনটি সম্পর্কে মানুষ সচেতন আবার কোনটি সম্পর্কে সে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু প্রথম স্তরের অভাব তৃপ্ত হইলেই দ্বিতীয় স্তরের অভাব সম্পর্কে সে সচেতন হয়। এইরূপে মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই, কেননা অভাবগুলি সংখ্যাতীত, নানাজাতীয় ও ক্রমবর্ধমান।

২। মানুষের অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্রভাবে অভাবগুলির পরিতৃপ্তি করা সম্ভব না হইলেও কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত করা যায় (Each particular want is satiable)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয়ের প্রয়োজন। একজাতীয় পানীয়ের দ্বারা তাহার তৃষ্ণা দূর হইলে সে অন্যজাতীয় পানীয়ের অভাববোধ করে। এইরূপে পানীয়ের অভাবের কোন সীমা নাই। কিন্তু এককভাবে এই পানীয়ের অভাব এক গ্লাস জলদ্বারা মিটিতে পারে। মানুষের কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত করা যায়—অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের উপর অর্থতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সূত্রটি হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র (Law of Diminishing Utility)। এই সূত্র অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণীয় বলিয়া যে

দ্রব্য দ্বারা ঐ অভাবটি পূরণ হয়, তাহার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযোগিতাও হ্রাস পায়।

৩। মানুষের অভাবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবগুলি পরিপূরক (Complementery)। কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি একভাবে পূরণ করা যায় না। সেগুলি পূরণ করিতে গেলে একাধিক দ্রব্যের সহযোগ প্রয়োজন হয়। যেমন, মোটরগাড়ী চড়িতে হইলে শুধু গাড়ী হইলে চলে না, পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। লিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহা একমাত্র কলম দ্বারা সম্ভব হয় না। কলম, কালি ও কাগজের প্রয়োজন হয়। কার্যতঃ দেখা যায় যে, প্রায় সব অভাবই একাধিক দ্রব্যের সহযোগে পূরণ হয়। সম্পর্কিত মূল-তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যদি কোন যুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার পরিপূরক সামগ্রীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

৪। অভাবগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা প্রতিযোগিতামূলক (Competitive)। অভাব মোচনের উপাদানগুলির অপ্রাচুর্যই হইল ইহার কারণ। যেহেতু অপ্রচুর উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাব মিটান সম্ভবপর নয়, সেইহেতু মানুষের অভাবমোচনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বাছাই বা পছন্দ করিতে হয়। শ্রান্তিবিনোদনের জন্য সিনেমায় যাওয়া যাইতে পারে, কিংবা খেলার মাঠে যাওয়া যাইতে পারে, অথবা থিয়েটারে যাওয়া চলে। আমাদের সীমিত সময়, 'অর্থ ও উৎসাহের উপর বিভিন্ন অভাব যেন প্রতিযোগিরূপে তাহাদের দাবী জানাইতেছে। সুতরাং এই অভাবগুলির মধ্যে একটি নিয়মিত প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সমান-প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্রটি (Law of Equi-marginal Utility) বিকল্পে Principle of Substitution সূত্রটি অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। অভাবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন কোন অভাব পরিতৃপ্ত হইলেও সেই অভাবের পরিসমাপ্তি বা নিবৃত্তি ঘটে না। পুনঃ পুনঃ সেই অভাব বোধ হয়। একই অভাব বারবার পরিতৃপ্ত হওয়ার ফলে অভাবটি 'স্বভাবে' পরিণত হয় অর্থাৎ সেই দ্রব্যটির ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পর্যবসিত হয়। এইরূপে মানুষের জীবনযাত্রার মান গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্বন্ধে সে সর্বদা সচেতন এবং এই অভাবগুলি তৃপ্ত করিতে পারিলে তাহার কষ্টের লাঘব হয়। আবার এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্পর্কে মানুষ সচেতন নহে। এই অভাবগুলি তৃপ্ত না হইলেও তাহার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই অভাবগুলি তৃপ্ত হইলে সে লাভবান হয়। ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে কেহ যদি মোটর যানে গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিনা কষ্টে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Human Wants.

মানুষের অভাবপূরণের দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা, ১। অপরিহার্য দ্রব্য (Necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্য (Comforts) এবং বিলাসিতার দ্রব্য (Luxuries)। অপরিহার্য দ্রব্যগুলি হইল সেই দ্রব্যগুলি, যেগুলির অভাব অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। অপরিহার্য দ্রব্যগুলিকে পুনরায় তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য (Necessaries for life), যেগুলির অভাবে মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, কর্মক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Necessaries for efficiency)। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই দ্রব্যগুলি অপরিহার্য না হইলেও এইগুলির ভোগদ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইগুলি ভোগের জন্য যে ব্যয় হয়, সে ব্যয়ের অনুপাতে অধিকতর লাভবান্ হওয়া যায়। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ এই পর্যায়ভুক্ত। তৃতীয়তঃ, ব্যবহার-সিদ্ধ বা অভ্যাসগত কতকগুলি দ্রব্য (Conventional necessaries), যেগুলির ব্যবহার জীবন-ধারণের জন্যও প্রয়োজনীয় নয় অথবা কর্মদক্ষতা বজায় রাখিবার জন্যও আবশ্যক হয় না। এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার অনেক সময় সামাজিক শিষ্টাচার পালনের জন্য অথবা অভ্যাসের ফলে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায় এবং এইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য অনেকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ভোগ হ্রাস করিতে দ্বিধা করে না। ধূমপান, মদ্যপান বা মূল্যবান্ পরিধেয় ব্যবহার করা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আরামপ্রদ দ্রব্যগুলির ব্যবহার মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি করে।

গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া যে মানুষের শ্রান্তি-বিনোদন করিয়া তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু আরামপ্রদ দ্রব্য সম্পর্কে এই কথা বলা হয় যে, এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার হইতে যে উপযোগিতা পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান করিতে হয়।

নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহারকেই (Consumption of superfluous wants) সাধারণতঃ বিলাসিতা বলা হয়। অনেকে ইহাকে নিরর্থক খরচা বলিয়া অভিহিত করেন। মূল্যবান্ অলংকার পরিধান করা বিলাসিতার একটি উদাহরণ।

সাধারণতঃ 'বিলাসিতা' শব্দটি নীতিজ্ঞান-বিরোধী ভোগসমূহকে বুঝায়। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। বিলাসদ্রব্য ব্যবহারেরও সুফল আছে। মানুষের বিলাসদ্রব্য, যথা, অলংকার, মোটরগাড়ী প্রভৃতি দুর্দিনে সঞ্চিত অর্থের কাজ করে। বিলাসিতা অনেক সময় মানুষকে নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করিয়া সামাজিক অগ্রগতির সহায়তা করে। বিলাসিতার সপক্ষে আরও বলা হয় যে, ধনীর বিলাসদ্রব্য উৎপাদন দ্বারা দরিদ্র অন্নসংস্থান করিতে পারে। নীতিজ্ঞান-বিরোধী বিলাসিতা বর্জনীয় হইলেও বিলাসিতামাত্রই যে ক্ষতিকর ইহা বলা সমীচীন নহে।

অভাবের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অভাবপূরণ করিবার দ্রব্যগুলির শ্রেণীবিভাগকালে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ বিভাগ চূড়ান্ত নহে—ইহা আপেক্ষিক মাত্র। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন। একজন ছাত্রের পক্ষে একটি ফাউণ্টেন্ পেন অপরিহার্য দ্রব্য হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিলাসদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্যপান অহিতকর বিলাসিতা, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহাকে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল কথা হইল যে, অভাবের তীব্রতা অনুসারে দ্রব্যগুলিকে উপরি-উক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কিন্তু সর্বদেশে অথবা সর্বকালে সকল লোকে একই দ্রব্যের অভাব সমানভাবে অনুভব করে না।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র—Law of Diminishing Utility.

ধনবিজ্ঞানে 'উপযোগিতা' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্বেই

আলোচিত হইয়াছে। অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানুষের সমগ্র অভাব অপূরণীয় হইলেও বিশেষ কোন একটি অভাব সহজেই পূরণ করা যায়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক গ্লাস জলই যথেষ্ট, তারপর আর জলের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সম্ভব হইলে অন্যজাতীয় পানীয় গ্রহণ করা যায়। জলের তৃষ্ণা এক বা দুই গ্লাস জলে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। প্রথম গ্লাস জল বা অত্যধিক তৃষ্ণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গ্লাস জল হইতে যে উপযোগিতা পাওয়া যায়, তৃতীয় গ্লাস জলের উপযোগিতা তদপেক্ষা কম। চতুর্থ গ্লাস জলের হয়ত কোনই উপযোগিতা নাই। অতিরিক্ত শীতের সময় প্রথম পেয়ালা চায়ের উপযোগিতা অত্যধিক এবং এই এক পেয়ালা চায়ের জন্য কেহ হয়ত অত্যধিক মূল্য দিতেও প্রস্তুত। এক পেয়ালা চা দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্তি না পাইলে দ্বিতীয় পেয়ালার প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগিতা হয়ত প্রথম পেয়ালার উপযোগিতা অপেক্ষাও অধিক। এরূপ ব্যক্তির নিকট তৃতীয় ও চতুর্থ পেয়ালা চায়ের উপযোগিতা থাকিলেও সে উপযোগিতা প্রথম ও দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগিতা অপেক্ষা কম। পঞ্চম পেয়ালা চায়ের হয়ত তাহার পক্ষে আদৌ কোন উপযোগিতা নাই ও পঞ্চম পেয়ালা দিতে গেলে সে হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। এইরূপে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রা যদি পর পর ব্যবহার বা ভোগ করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরবর্তীমাত্রার উপযোগিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। মানুষের ভোগ করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। প্রত্যেক বিশেষ অভাব পূরণীয়। সুতরাং নির্দিষ্ট অভাবপূরণের সামগ্রীটির মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অক্ষমতা হেতু সেই সামগ্রীর উপযোগিতা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। মার্শাল বলেন: "The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has." কোন একটি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া যে উপযোগিতা বা সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, ঠিক সেই দ্রব্যটির অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার দ্বারা অতিরিক্ত উপযোগিতার পরিবর্তে অতিরিক্ত মাত্রাগুলির উপযোগিতা হ্রাস পায়। ইহাই হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র। সুতরাং দেখা যায় যে, অভাবপূরণের দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সেই দ্রব্যটির উপযোগিতা হ্রাস পায়। পর পৃষ্ঠার চিত্র দ্বারা এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ঐ চিত্রের কখ রেখা দ্বারা উপযোগিতার পরিমাপ করা হইতেছে ও কগ রেখাদ্বারা ভোগের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। যখন কচ পরিমাণ ভোগ করা হয়, তখন উপযোগিতার পরিমাণ হইল চচ´। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কছ হইলে উপযোগিতার পরিমাণ হইল ছছ´। ভোগের পরিমাণ কজ হইলে উপযোগিতা হইল জজ´। ভোগের পরিমাণ কঝ হইলে উপযোগিতার পরিমাণ হইল ঝঝ´। এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মাত্রা অর্থাৎ কচ পরিমাণ ভোগের পর দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ কছ পরিমাণ ভোগ করিলে
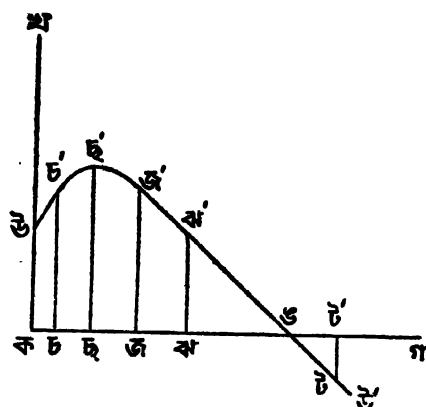
১নং চিত্র

উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ জ ও ঝ মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উপযোগিতার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত একই দ্রব্যভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, প্রথম দুই-এক মাত্রা বৃদ্ধিতে উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও পরবর্তী মাত্রাগুলির বৃদ্ধির ফলে উপযোগিতার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা হ্রাস পাইয়া চিত্রের ঙ বিন্দুতে ইহা একেবারেই শূন্য হইবে। ইহার পর মাত্রাবৃদ্ধি হইলে উপযোগিতার পরিবর্তে অনুপযোগিতার সৃষ্টি হইবে। যখন কট পরিমাণ ভোগ করা হইবে তখন এই অনুপযোগিতার পরিমাণ হইবে টট´। উউ´ এই বক্ররেখাটির দ্বারা উপযোগিতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে।

উপযোগিতা হ্রাসের কারণ—Causes of the Diminution of Utility.

এখন প্রশ্ন হইল যে, একই দ্রব্যভোগের মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা কেন হ্রাস পায়? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নির্দিষ্ট অভাবটি সহজেই পূরণ করা যায়। সুতরাং একটি দ্রব্য দ্বারা নির্দিষ্ট অভাবটি পরিতৃপ্ত হইলে সে দ্রব্যটির আর কোন উপযোগিতা থাকে না—সুতরাং একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ কেহই চায় না। উপযোগিতা-হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ হইল যে, মানুষের একটি নির্দিষ্ট অভাব একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা পূরণ হয় না। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে, 'দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটে না'—তাই দুধই চাই এবং দুধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেই দুধের উপযোগিতা হ্রাস পায়। ভাতের পরিবর্তে ফল খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ফল ভাতের যথার্থ পরিবর্তী সামগ্রী নহে। সুতরাং ভাতই চাই এবং ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপযোগিতারও হ্রাস হয় (Goods are imperfect substitutes)।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্রের ব্যতিক্রম—Limitations of the Law of Diminishing Utility.

অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়াছে যে, এই সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ মাত্র, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহাদের কার্যকারিতার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে উপযোগিতার পরিমাণ হ্রাস নাও পাইতে পারে। অপরাপর অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় এই সূত্রটির কার্যকারিতা কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে সূত্রটি আর কার্যকরী হয় না।

১। পর পর মাত্রাবৃদ্ধির ফলে একই দ্রব্যের উপযোগিতা হ্রাস পায় তখনই, যখন আমরা সেই দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ করিতে পারি। দ্রব্যটির প্রথম ব্যবহারের পরিমাণ যদি অভাবপূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটির পরবর্তী অতিরিক্ত মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং অভাবটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপযোগিতার এই বৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। চা পান করিবার যে ইচ্ছা তাহা পূর্ণ এক পেয়ালা চায়ে নিবৃত্ত হয়। এক পেয়ালা চা-ই হইল চা-পানের

উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার পরিবর্তে যদি প্রথমে সিকি পেয়ালা, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিকি পেয়ালা দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ণ এক পেয়ালা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সিকি পেয়ালার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

২। দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের সময়ের ব্যবধানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোকে দুপুরে ও রাত্রে ভাত খায়। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগিতা হ্রাস পায় না, কিন্তু বেলা ১২ টার সময় ভাত খাইয়া পুনরায় বেলা ১টার সময় ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগিতা হ্রাস পায়। সুতরাং এই সূত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে।

৩। লোকের আয়ের পরিমাণের বা রুচিবোধের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে এই সূত্রটি প্রযোজ্য। কিন্তু যদি আয় বৃদ্ধি পায় বা রুচি পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৪। এই সূত্রটির আরও একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্র অনুসারে কোনও দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিলেই উপযোগিতার পরিমাণ হ্রাস পায় বলা হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তির কোন দ্রব্য হইতে উপযোগিতা তাহার প্রতিবেশীর সেই দ্রব্যের অধিকার-ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তির যদি ডাকটিকিট সংগ্রহ-ব্যাপারে কোন নিকটস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর টিকিটগুলি যদি কোন কারণে নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির টিকিটের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কোন ব্যক্তি তাহার গৃহে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়াও টেলিফোন হইতে অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে, যদি টেলিফোনের ব্যবহার প্রসার লাভ করে।

৫। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য (Antique)-সংগ্রহ ব্যাপারে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নহে। যত বেশী দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, উপযোগিতা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। ডাকটিকিট বা পুরাতন মুদ্রা-সংগ্রহ ব্যাপারে সাধারণতঃ একজাতীয় টিকিট বা একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করা হয় না। বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়,

সুতরাং উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। একজাতীয় টিকিট বা একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিলে তাহার উপযোগিতার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

৬। অনেকে বলেন অর্থের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নহে। অর্থ-আহরণের আকাঙ্ক্ষার কোন নিবৃত্তি নাই এবং অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযোগিতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কার্যতঃ ইহা সত্য নহে। ধনীর নিকট এক আনার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট এক আনার তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য। অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পায়। এই সূত্রটির বিশদ আলোচনা করিয়া অধ্যাপক টাউসিগ্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই সূত্রটির ব্যতিক্রম এত কম যে ইহাকে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থনৈতিক সূত্র বলা যাইতে পারে।

প্রান্তিক উপযোগিতা ও সমগ্র উপযোগিতা—Marginal Utility and Total Utility.

একটি লোক যদি একসঙ্গে ৫টি আম খায় তাহা হইলে এই ৫টি আম হইতে সে যে তৃপ্তি বা উপযোগিতা পায়, তাহাকে সমগ্র উপযোগিতা বা Total Utility বলা হয়। প্রান্তিক উপযোগিতা বা Marginal Utility বলিতে সেই ব্যক্তি শেষ অর্থাৎ পঞ্চম আমটি খাইয়া যে উপযোগিতা পাইল, তাহাই বুঝায়। একটি লোক তাহার মজুত দ্রব্যের সামান্য বৃদ্ধিতে যে উপযোগিতা পায়, তাহাকে প্রান্তিক উপযোগিতা বলা হয়। প্রান্তিক উপযোগিতার সংজ্ঞা একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

ক্রেতা দ্রব্যক্রয়কালে মনে মনে হিসাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মাত্রা দ্রব্যের জন্য প্রদত্ত মূল্য ও প্রত্যেক মাত্রা হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা সমান কি না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করিবে। প্রদত্ত মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগিতা সমান হইলে তাহার পর ক্রেতা আর ক্রয় করিবে না। এই শেষ ক্রয়কে প্রান্তিক ক্রয় (Marginal purchase) বলা হয় এবং এই শেষ মাত্রা হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগিতা পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগিতা। নিম্নলিখিত উদাহরণটির দ্বারা প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণা স্পষ্টতর হইবে।

দ্রব্যের মাত্রা Units	সমগ্র উপযোগিতা Total utility	প্রান্তিক উপযোগিতা Marginal utility
১ম আম	১০	১০
২য় "	১৮	৮
৩য় "	২৪	৬
৪র্থ "	২৮	৪
৫ম "	৩০	২
৬ষ্ঠ "	৩০	০
৭ম "	২৭	-৩

উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তী আম হইতে ক্রেতা যে উপযোগিতা পায় তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ষষ্ঠ আমের ক্ষেত্রে উপযোগিতা শূন্য হয় এবং ইহার পর সপ্তম আম ক্রয় করিলে উপ-যোগিতার পরিবর্তে অনুপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পঞ্চম আম পর্যন্ত উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু তৎপরে এই উপযোগিতা-বৃদ্ধি কমিতে থাকে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগিতা বলিতে ক্রীতদ্রব্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষ মাত্রার উপযোগিতা বুঝায়। এই উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা কম। ক্রম-হ্রাসমান উপযোগিতা সূত্রটি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে একটা সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু ভোগের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, উপযোগিতার পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। ভোগ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগিতা হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রান্তিক (শেষ) মাত্রার উপযোগিতা হ্রাস পায়। এই জন্য বর্তমানে এই সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্র (Law of Diminishing Utility) আখ্যা না দিয়া **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা (Law of Diminishing Marginal Utility)** বলা অধিকতর সমীচিন।

উপরি-উক্ত উদাহরণ হইতে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইল যে, প্রান্তিক উপযোগিতা শূন্য না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা শূন্য হইলে মোট উপযোগিতা আর বৃদ্ধি পায় না এবং প্রান্তিক উপযোগিতা যতই শূন্যের কম হইতে থাকে সমগ্র উপযোগিত

ততই অধিক হারে কমিতে থাকে। সপ্তম আম ভোগের ক্ষেত্রে এই সমগ্র উপযোগিতা হ্রাসের সূচনা দেখা যায়।

প্রান্তিক উপযোগিতা ও মূল্য—Marginal Utility and Price.

পূর্ব আলোচনা হইতে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল্য দ্বারা প্রান্তিক উপযোগিতা স্থিরীকৃত হয়, অর্থমূল্য ও প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হওয়া চাই। যে স্থলে উপযোগিতা ও মূল্য সমান হয়, ক্রেতা সেখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি মূল্য প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ক্রয় করিবে না। একটি দ্রব্যের সকল মাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়া (being interchangeable) শেষ বা প্রান্তিক মাত্রার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, অপর সকল মাত্রার জন্যও সেই একই মূল্য প্রদত্ত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, প্রান্তিক (মাত্রার) উপযোগিতাই মূল্য নির্ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য সমগ্র উপযোগিতার উপর নির্ভর করে না, তাহা না হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগিতা মূল্য স্থির করে না—ইহা মূল্য-নির্ধারণের স্থান সূচিত করে মাত্র। চাহিদা ও যোগান হইল মূল্য-নির্ধারণের প্রকৃত কারণ। মূল্য পরিবর্তিত হইলে প্রান্তিক উপযোগিতারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগিতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

চাহিদা—Demand.

অর্থতত্ত্বে 'চাহিদা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি দ্রব্য পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে অর্থতত্ত্বে চাহিদা বলা হয় না। চাহিদা বলিতে কার্যকরী চাহিদা (Effective Demand) বুঝায়। শুধুমাত্র ভোগের আকাঙ্ক্ষাই চাহিদা নহে—এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার ইচ্ছা ও ইচ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত ক্রয়-ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক। যখন ঈপ্সিত দ্রব্যের জন্য মূল্য প্রদান করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক হওয়া যায়, তখনই সেই ইচ্ছাকে প্রকৃত চাহিদা বলা হয়। সুতরাং অর্থতত্ত্বে চাহিদা বলিলে বুঝা যায় যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়, তাহাই চাহিদা। মূল্য ছাড়া চাহিদা থাকিতে পারে না এবং এই চাহিদার পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের—যথা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক—পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হইবে।

চাহিদার তালিকা—Demand Schedule.

একটি লোক বিভিন্ন মূল্যে একটি দ্রব্য কি পরিমাণে ক্রয় করিবে তাহার তালিকা হইল ব্যক্তি-বিশেষের চাহিদার তালিকা। ধরা যাউক মূল্য যখন

মূল্য Price	চাহিদা Demand
৫ টাকা	৪,০০০ দ্রব্য
৪ "	৬,০০০ "
৩ "	৮,০০০ "
২ "	১০,০০০ "।

প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার তালিকা একত্রিত করিয়া সমগ্র বাজারের চাহিদার তালিকা পাওয়া যায়। কার্যতঃ কিন্তু এরূপ বাজার-তালিকা প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব। বাজারের চাহিদার তালিকা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক যে, বাজারে ৫ জন ক্রেতা আছে। তাহা হইলে বিভিন্ন মূল্যে তাহারা নিম্নলিখিতভাবে ক্রয় করিতে পারে :—

বাজার-চাহিদা তালিকা—Market Demand Schedule.

মূল্য	প্রত্যেক ক্রেতা কর্তৃক চাহিদার পরিমাণ					মোট চাহিদা
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
১০ টাকা	১	২	০	০	০	৩
৯ "	২	৩	১	০	০	৬
৮ "	৩	৪	২	১	০	১০
৭ "	৪	৫	৩	২	১	১৫

উপরি-উক্ত সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি সমগ্রভাবে বাজারের চাহিদার পরিমাপক। বাজার-চাহিদার তালিকা ব্যক্তিগত-চাহিদার তালিকা অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিশীল এবং এইজন্যই ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় ও শাসন-কর্তৃপক্ষ এই তালিকার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চাহিদার সূত্র—Law of Demand.

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট অভাব পূরণের সামগ্রীর আধিক্য হইলে সেই সামগ্রীর পরবর্তী মাত্রাগুলির উপযোগিতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। প্রথম পেয়ালা চা পানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পেয়ালার উপযোগিতা কম এবং এই উপযোগিতা-হ্রাসের নিমিত্তই পানকারী কম-উপযোগী মাত্রাগুলি অধিক-উপযোগী মাত্রার সমান মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। যেহেতু দ্রব্যটির মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা হ্রাস পাইতেছে, সেইহেতু কম মূল্য না হইলে ক্রেতা আর সেই দ্রব্যের অধিকমাত্রা ক্রয় করিবে না। চাহিদার সূত্র হইল—স্থিতাবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার বৃদ্ধি হয় ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার হ্রাস হয় (The amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price, other things remaining the same)। সুতরাং এই সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্রের উপ-সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। এই সূত্রটি মূল্য ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক হইল বিপরীতমুখী অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে ও মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মূল্য ও চাহিদার এই সম্পর্ক আনুপাতিক নাও হইতে পারে (though inverse but not necessarily proportionate) অর্থাৎ, মূল্য দ্বিগুণ হইলে চাহিদা যে অর্ধেক হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় এই সূত্রটিও অনুমানসিদ্ধ। কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সূত্রটির কার্যকারিতা নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ধরিয়া লইতে হইবে যে; ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবর্তিত আছে। রুচি পরিবর্তিত হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করে না। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকা চাই। আয়ের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে অনেক সময় ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বিশেষ করিয়া পরিবর্তী সামগ্রী বা পরিপূরক (Substitutes or Complementary goods) সামগ্রীর মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকা চাই। যদি কোকো বা কফির

মূল্য কমে অথবা দুধ বা চিনি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে চায়ের মূল্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম—Limitations to the Law of Demand.

অর্থনৈতিক অন্যান্য সূত্রের ন্যায় চাহিদার সূত্রেরও কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলি শুধুমাত্র 'লোক দেখান'র জন্য ব্যবহৃত হয়—তাহাদের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই। স্ত্রীলোকের অলংকার এই জাতীয় দ্রব্য। স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিত্তবান শ্রেণীর মহিলাগণ তাঁহাদের আভিজাত্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে অধিক স্বর্ণালংকার ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ফাট্‌কা বাজারে (Share Market) দেখা যায় যে, যখন কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশায় সকলে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয় অর্থাৎ শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও মূল্য হ্রাস পাইলে শেয়ারের চাহিদাও হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় চাল, ডাল, তৈল, লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে চাহিদা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যায় যে, চাহিদা প্রধানতঃ মূল্যের উপর নির্ভর করিলেও সম্পূর্ণভাবে ইহার উপর নির্ভর করে না।
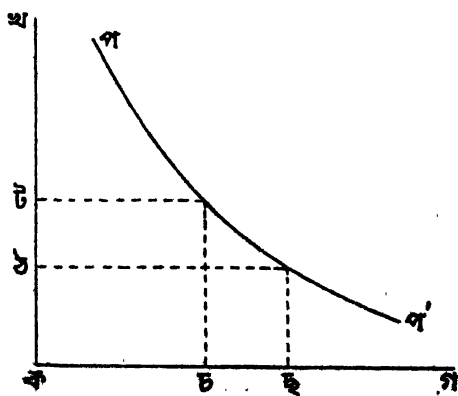
২নং চিত্র

উপরে প্রদর্শিত চিত্র দ্বারা চাহিদার সূত্রটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কখ রেখা দ্বারা দ্রব্যমূল্য সূচিত হইতেছে ও **কগ** রেখা দ্বারা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেখান হইতেছে। যখন দ্রব্যমূল্য **কট**, তখন চাহিদার পরিমাণ হইল **কচ**। ইহার পর দ্রব্যমূল্য যখন **কঠ**-এ হ্রাস পাইল, চাহিদা **কচ** হইতে **কছ**-এ বৃদ্ধি পাইল। **পপ'** এই বক্র রেখাটির দ্বারা মূল্যের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখান হইল।

মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তনের কারণ—Causes of the operation of the Law of Demand.

মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ; তাহার প্রথম কারণ হইল যে, মূল্য কমিলে যে-ক্রেতাগণ পূর্বমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিত তাহারা বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিয়া দ্রব্যের একাধিক ব্যবহার করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য হ্রাস পাইলে যাহারা পূর্বমূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অক্ষম ছিল, বর্তমান স্বল্প মূল্যে তাহারাও ক্রয় করিবে—কেননা বর্তমান মূল্য তাহাদের প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হইবে।

স্থিরমূল্যে চাহিদা পরিবর্তনের কারণ—Causes of changes in Demand when price is steady.

মূল্য পরিবর্তিত হইলে চাহিদার পরিবর্তনের কারণ উপরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য অপরিবর্তিত থাকিলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নানাকারণে চাহিদার এই মূল্য-নিরপেক্ষ পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

প্রথমতঃ, জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে চাহিদা অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা হ্রাস পাইলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, লোকের আর্থিক আয়ের (Money Income) পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আর্থিক আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পায়।

তৃতীয়তঃ, মানুষের রুচি, অভ্যাস ও জীবনধারণের পদ্ধতি পরিবর্তনের সংগে সংগে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে যাহা রুচিকর বা অভ্যাসগত

দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হইত, পরবর্তী কালে রুচি-পরিবর্তনের জন্ম সে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে। নূতন রুচি বা অভ্যাস গঠনের ফলে পুরাতন দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমানে যুবকগণের মধ্যে ধুতির ব্যবহার হ্রাস পাইয়া প্যাণ্টালুনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

চতুর্থতঃ, বেকারত্ব দূর হইয়া দেশে যদি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে লোকের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যাদির মোট চাহিদাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে কর্মসংস্থানের অভাব ঘটিলে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে আর্থিক আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ যখন আশান্বিত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেন, তখন মূলধনের বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে শিল্প-ব্যবসায়ে মন্দার সময় বিনিয়োগ-পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে মোট ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে চাহিদাও হ্রাস পায়।

ষষ্ঠতঃ, যদি কোন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী থাকে তাহা হইলে একটির মূল্য পরিবর্তিত হইলে অপরটির চাহিদারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of Demand.

চাহিদার সূত্র অনুসারে দেখা যায় যে, চাহিদা ও মূল্যের মধ্যে একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক রহিয়াছে। মূল্যের উত্থান-পতনে চাহিদারও উত্থান-পতন হয়। মূল্যের প্রভাবে চাহিদার এই পরিবর্তন অর্থাৎ সংকোচন ও প্রসারণকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে চাহিদা ও মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা বুঝায়। মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যে হারে (rate) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, সেই হারই চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতা সূচিত করে।

কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তন মূল্য-পরিবর্তনের সমানুপাতিক নাও হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে চাহিদার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে

যে, যদি বেতারযন্ত্রের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে বহুলোকে ইহার ব্যবহার করিবে, ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য লবণের দাম দ্বিগুণিত হইলেও ইহার চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বেতারযন্ত্রের চাহিদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু লবণের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তনশীল নহে। মূল্যের প্রভাব উভয় দ্রব্যের উপর সমান নহে।

এরূপ দ্রব্য খুব কমই আছে, মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যাহার চাহিদার একটুও পরিবর্তন হয় না। মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদার কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটে, তবে এই পরিবর্তনের মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, মূল্যের একটা নির্দিষ্ট পতনে চাহিদার অধিক বা কম বৃদ্ধি এবং মূল্যের একটা নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে চাহিদার অধিক বা কম হ্রাস—তদনুসারেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আধিক্য বা স্বল্পতা নির্ণীত হয়। ("The elasticity of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price, and diminishes much or little for a given rise in price.")

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভরশীল—Factors on which elasticity depends.

কোন জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে:

১। প্রথমতঃ বলা যায় যে, স্থিতিস্থাপকতা সামগ্রীটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সামগ্রীটি অপরিহার্য কিনা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জীবনধারণের নিমিত্ত অপরিহার্য সামগ্রীগুলির চাহিদা অপরিবর্তনশীল, কেননা মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করা যায় না—যথা, লবণ। অপর পক্ষে বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা পরিবর্তনশীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার না করিলেও চলে—যথা, গন্ধদ্রব্য।

২। যে-সমস্ত দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়, যেমন বিদ্যুৎ, সে-সমস্ত

দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেকটির ব্যবহারে মিতব্যয়িতা করিয়া ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়।

৩। অভ্যাসগত দ্রব্যগুলির চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় হয়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে লোকে অনেক সময় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যয়সংকোচ করিয়া অভ্যাসগত দ্রব্য ব্যবহার করে।

৪। যে-সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত পরিবর্তী সামগ্রী (Substitutes) পাওয়া যায় যে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা পরিবর্তনশীল হয়। বাস্ ও ট্রাম একটির ভাড়া বৃদ্ধি পাইলে লোকে অপরটি ব্যবহার করিবে।

৫। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেক পরিমাণে লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যাহাদের আয় বেশী, মূল্যপরিবর্তনে তাহাদের চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। স্বল্প-আয়ের লোকের চাহিদাই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে অধিকতর প্রভাবিত হয়।

৬। যে-সমস্ত দ্রব্যের উপর লোকের আয়ের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ ব্যয়িত হয়, মূল্যের পরিবর্তনে সে-সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না।

৭। যে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য পূর্ব হইতেই অত্যধিক রহিয়াছে, সে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কম হয় কিন্তু স্বল্পমূল্যের দ্রব্যের মূল্য যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলেও তাহার চাহিদার সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন ঘটে না।

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ—Measurement of Elasticity.

মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সকল দ্রব্যেরই চাহিদার অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা কি উপায়ে জানা যায় তাহাই হইল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দুইটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যটির মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে ও পরে দ্রব্যটির জন্য যে-পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া স্থিতিস্থাপকতাকে তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়।

১। মূল্যপরিবর্তন হইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে, তাহাকে unit elasticity বা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা বলা হয়।

২। স্থিতিস্থাপকতা স্থিতাবস্থার ঊর্ধ্বে যায় তখন, যখন মূল্যপতনের ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় (greater than unity).

৩। স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা নিম্নাভিমুখী হয় তখন, যখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মূল্যপতনের ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় (Less than unity).

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্থিতিস্থাপকতার উপরি-উক্ত তিনটি বিভিন্ন রূপ স্পষ্টতর হইবে—

মূল্য	চাহিদার পরিমাণ	সমগ্র ব্যয়
৬ টাকা	৯	৫৪ টাকা
৪॥০ ,,	১২	৫৪ ,,
৪ ,,	১৪	৫৬ ,,
৩ ,,	১৫	৪৫ ,,

(১) উপরি-উক্ত তালিকায় মূল্য যখন ৬ টাকা হইতে ৪॥০ টাকায় হ্রাস হইতেছে তখন চাহিদার পরিমাণ ৯ হইতে ১২ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহার দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা (unit elasticity) সূচিত হইতেছে। (২) মূল্য ৪॥০ হইতে যখন ৪ টাকায় হ্রাস পাইতেছে, তখন চাহিদার পরিমাণ ১২ হইতে ১৪ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ৫৪ হইতে ৫৬-এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি বুঝাইতেছে। (৩) মূল্য যখন ৪ টাকা হইতে ৩ টাকায় হ্রাস পাইল, তখন চাহিদার পরিমাণ ১৪ হইতে ১৫ বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ৫৬ হইতে ৪৫ হ্রাস পাইল। ইহা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিম্নাভিমুখী গতি বুঝাইতেছে।

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, মূল্য-পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদা-পরিবর্তনের হারের তুলনা করিতে হইবে। মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় আর সেই অনুপাতে চাহিদাও যদি এক-চতুর্থাংশ

হারে হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা (unit elasticity) বলা হয়। কিন্তু মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশেরও অধিক হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি বলা হয়; আর চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশের কম হ্রাস হয় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিম্নাভিমুখী গতি বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{মূল্য পরিবর্তনের হার}}$$
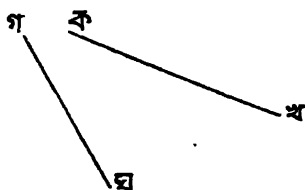
৩নং চিত্র

কখ রেখা পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিমাপক। গঘ রেখা অপরিবর্তনশীল চাহিদার পরিমাপক।

১। যখন মূল্য পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলনা করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থির করা হয় তখন তাহাকে মূল্য পরিবর্তন-জনিত স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity) বলা হয়। মূল্যের সামান্যতম পরিবর্তনেও চাহিদা-রেখার প্রতিবিন্দুতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হইবে তাহা নির্ণয় করা হয়।

২। আয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য যদি অপরিবর্তনীয় থাকে তাহা হইলে অনেক সময় কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার, আয় হ্রাস পাইলে কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা কম হয়, যেমন বিলাসদ্রব্য। আয় পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity) বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{আয় পরিবর্তনের হার}} \text{।}$$

৩। যুক্ত চাহিদা দ্রব্য ও পরিবর্তী সামগ্রীর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য এরূপ সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে যে, একটির মূল্য পরিবর্তিত হইলে অপরটির মূল্য পরিবর্তিত না হইয়াও দ্রব্যটির চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। একটি দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross elasticity) বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{ক-এর চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{খ-এর মূল্য পরিবর্তনের হার}} \text{।}$$

চাহিদার সূত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—The Law of Demand and Elasticity of Demand.

চাহিদার সূত্র মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সূচিত করে। এই সূত্র অনুসারে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকিলে, মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। কি পরিমাণ মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে কি পরিমাণ চাহিদার বৃদ্ধি হইবে এবং কি পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে কি পরিমাণ চাহিদার হ্রাস হইবে—ইহা সূত্রটির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক যে বিপরীতমুখী—চাহিদার সূত্র হইতে শুধু ইহাই জানা যায়। মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহা একমাত্র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিতে পারা যায়। মূল্যের উত্থান-পতনে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা সূচিত হয়। সুতরাং চাহিদার সূত্র চাহিদা ও মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক বুঝায়—সুতরাং এই সম্পর্ক হইল গুণবাচক (Qualitative)। অপরপক্ষে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মূল্যের সহিত চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সূচিত করে। সুতরাং এই সম্পর্ক পরিমাণ-বাচক (Quantitative)।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগিতা—Practical Utility of the Concept of Elasticity of Demand.

অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ব্যতীত এই সংজ্ঞাটির বাস্তব

উপযোগিতাও কম নহে। মূল্যপরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর কার্যকরী হয়, তাহা এই সংজ্ঞাটির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। করধার্য-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণেও এই সংজ্ঞাটি বিশেষ সহায়ক হয়। করধার্য-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণকালে এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়াও মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু চাহিদা যদি পরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস না করিলে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ-তত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। যদি কোন জাতীয় শ্রমের চাহিদা অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে, মজুরি বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ-নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি সহায়ক।

চাহিদা পরিবর্তনের কারণ—Causes of changes in Demand.

একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ নানা কারণে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধনবিজ্ঞানে চাহিদার অর্থ হইল কার্যকরী চাহিদা এবং মূল্য-নিরপেক্ষভাবে এই চাহিদার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যই প্রধানতঃ চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

১। দ্রব্যমূল্য—Price-level—যদি কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ উক্ত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং মূল্য হ্রাস পাইলে দ্রব্যটির চাহিদা সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়।

২। ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ—Individual taste and likes.

ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের উপর দ্রব্যের চাহিদা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। রুচিপরিবর্তনের সহিত চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন অনেক সময় মূল্য-নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে।

৩। বিকল্প ও অনুপূরক সামগ্রীর দাম—Prices of Competitive and Complementary goods.

বিকল্প অর্থাৎ পরিবর্তী সামগ্রীর মূল্যের সহিত একটি দ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিকল্প সামগ্রীর মূল্যপরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন

একাভিমুখী হয় অর্থাৎ একটির মূল্য হ্রাস পাইলে অপরটির মূল্যও হ্রাস পায় এবং চাহিদাও হ্রাস পায়। অনুপূরক সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্যপরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী হয়। মোটর গাড়ীর মূল্য হ্রাস পাইলে পেট্রলের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পেট্রলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

৪। ব্যক্তিগত আয়—Individual Income.

ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও আয় কমিলে চাহিদা সংকুচিত হয়।

ব্যক্তিগত চাহিদা কখন পরিবর্তিত হয় বলা যাইতে পারে—When is a person's Demand said to change ?

ব্যক্তিগত চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত চাহিদার হ্রাস ও বৃদ্ধি সমার্থক নহে। যখন মূল্যপরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তখন এই মূল্যপরিবর্তন-জনিত চাহিদা-পরিবর্তনকে চাহিদার সংকোচন বা প্রসারণ বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ একমাত্র মূল্যের উত্থান-পতন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ক্রেতা তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা মূল্যদ্বারা অধিকতররূপে প্রভাবিত হয়। অপর পক্ষে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলা হয় তখন, যখন ক্রেতা মূল্য-নিরপেক্ষভাবে প্রয়োজন অনুসারে তাহার চাহিদার পরিমাণ স্থির করে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা ক্রেতার ক্রয় পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজনের গুরুত্ব-নির্বিচারে একমাত্র মূল্য দ্বারাই চাহিদার পরিমাণ নির্ধারিত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল্য-নির্বিচারে ক্রেতার প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারেই চাহিদার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাছের সের প্রতি দাম ৩৲ টাকা হইতে ২৲ টাকায় হ্রাস পাইলে ক্রেতা যদি তাহার পূর্বক্রীত পরিমাণ চার সের ক্রয় না করিয়া পাঁচ সের ক্রয় করে, তাহা হইলে এই বর্ধিত চাহিদাকে চাহিদার প্রসারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু মাছের মূল্য যদি অপরিবর্তিত অর্থাৎ ৩৲ টাকাই থাকে এবং ক্রেতা যদি এই অপরিবর্তিত মূল্যেও অধিক পরিমাণ অর্থাৎ চার সেরের পরিবর্তে পাঁচ সের ক্রয় করে তাহা হইলে ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন (বৃদ্ধি) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও অর্থাৎ

মাছের দাম ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা অথবা ৫৲ টাকায় বৃদ্ধি পাইলেও ক্রেতা যদি পূর্বপরিমাণ অর্থাৎ চার সের ক্রয় করে তাহা হইলেও ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন (বৃদ্ধি) বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চাহিদা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চাহিদার জন্য ব্যয়পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু চাহিদার প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যয়পরিমাণের বৃদ্ধি নাও হইতে পারে। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, (১) চাহিদার প্রসারণ বলিলে বুঝা যায় হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় করা, অপর পক্ষে চাহিদা-বৃদ্ধির অর্থ হইল অপরিবর্তিত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় করা অথবা অধিক মূল্যে পূর্ব (সম) পরিমাণ ক্রয় করা। (২) চাহিদার সংকোচনের তাৎপর্য হইল অধিক মূল্যে স্বল্পপরিমাণ ক্রয় করা, চাহিদা-হ্রাসের অর্থ হইল পূর্ব (সম) মূল্যে কমপরিমাণ ক্রয় করা অথবা হ্রাস - প্রাপ্ত মূল্যে পূর্ব (সম) পরিমাণ ক্রয় করা।

ভোগোদ্বৃত্ত—Consumer's Surplus.

ধনবিজ্ঞানে অধ্যাপক মার্শালের অবদানগুলির মধ্যে ভোগোদ্বৃত্ত অন্যতম। যখন কোন ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তখন সে দ্রব্যটির জন্য একটি মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে ; কিন্তু যদি সে তাহার নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ঐ দ্রব্যটি স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, যাহা সে অন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যয় করিতে পারে। একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে, তাহাকেই ভোগোদ্বৃত্ত নামে অভিহিত করা হয়। মার্শাল বলেন, ক্রেতার ক্রয় করিবার আগ্রহ এত অধিক যে, একটি দ্রব্য ক্রয় না করিয়া চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি এরূপ ক্ষেত্রে সে তদপেক্ষা কম মূল্যে ঐ দ্রব্যটি পায়, তাহা হইলে ক্রেতার আগ্রহ দ্বারা নির্ধারিত মূল্য ও যে মূল্যে সে দ্রব্যটি পাইতেছে, এই উভয়ের পার্থক্য হইল ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপক। ("The excess of the price which he would be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus.")

ক্রেতা একটি দ্রব্য পাইবার জন্য যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য (Individual demand price) বলা হয়। ক্রীত দ্রব্যটি হইতে ক্রেতা যে সমগ্র উপযোগিতা (Total utility) পায়, ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য সেই সমগ্র উপযোগিতার পরিমাপক। কিন্তু ক্রেতা বাজার দরে (Market price) দ্রব্য ক্রয় করে। বাজার দর প্রান্তিক উপযোগিতার (Marginal utility) পরিমাপক। ক্রেতার ক্রীত দ্রব্যের পরিমাণের ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য হইতে যদি সে ঐ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে বাজার দর হিসাবে যে পরিমাণ মূল্য দিয়াছে তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য দ্বারা ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একজন ক্রেতা প্রথম পেয়ালা চায়ের জন্য আট আনা, দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের জন্য ছয় আনা, তৃতীয় পেয়ালার জন্য চার আনা ও চতুর্থ পেয়ালার জন্য দুই আনা দিতে প্রস্তুত। তাহা হইলে সে এই চার পেয়ালা চায়ের জন্য মোট এক টাকা চার আনা খরচ করিতে প্রস্তুত। এই চার পেয়ালা চা হইতে ক্রেতা এক টাকা চার আনা মূল্যের সমগ্র উপযোগিতা পাইতেছে। কিন্তু কার্যতঃ এই চার পেয়ালা চা সে প্রান্তিক উপযোগিতা দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে অর্থাৎ প্রতি পেয়ালাই দুই আনা মূল্যে পাইতেছে। সুতরাং সমগ্র উপযোগিতার পরিমাপক এক টাকা চার আনা হইতে প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত চার পেয়ালার বাজার মূল্যের যোগফল বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ভেগোদ্বৃত্তের পরিমাণ স্থির করা যায় :—

	প্রান্তিক উপযোগিতা	সমগ্র উপযোগিতা
প্রথম পেয়ালা চা	॥০	॥০
দ্বিতীয় " "	।৵০	॥০ + ।৵০
তৃতীয় " "	।০	॥০ + ।৵০ + ।০
চতুর্থ " "	৵০	॥০ + ।৵০ + ।০ + ৵০
		= ১।০ = সমগ্র উপযোগতা

উপরি-উক্ত উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, যখন ক্রেতা চার কাপ চা খাইতেছে তখন সে এই চার পেয়ালা চা হইতে ১।০ আনার মত সমগ্র উপ-

যোগিতা পাইতেছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একই বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য হইতে পারে না। সে প্রতি পেয়ালা চা দুই আনা দরে (প্রান্তিক উপযোগিতা) পাইতেছে। সুতরাং চার পেয়ালা চায়ে সে মোট আট আনা মূল্য দিতেছে। সুতরাং সমগ্র উপযোগিতা (১।৹) হইতে প্রান্তিক উপযোগিতা (৵৹) × যে কয় পেয়ালা খাইতেছে অর্থাৎ ৵৹ × ৪ = ॥৹ বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ১।৹ – ৵৹ × ৪ = ১।৹ – ॥৹ = ৸৹ ভোগোদ্বৃত্ত। সুতরাং ভোগোদ্বৃত্তকে তিন ভাবে প্রকাশ করা যায় :—

১। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় না করিয়া চলিয়া আসা অপেক্ষা যে অধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও কার্যতঃ যে মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে—এই উভয়ের পার্থক্য হইল ভোগোদ্বৃত্ত।

২। ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য ও বাজার মূল্যের পার্থক্য।

৩। সমগ্র উপযোগিতা ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটিলে বাজার দর হ্রাস পাইলে ভোগোদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় অথবা বাজার দর অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি ক্রেতার ক্রয় করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেও ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তিন পয়সা মূল্যের পোস্টকার্ড, স্বল্পমূল্যের সংবাদপত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ উপযোগিতা পাওয়া যায়, তাহা পাইবার জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে অনেক অধিক ব্যয় করিতে হইত। সভ্যসমাজে বাস করিবার ফলে এই ভোগোদ্বৃত্ত সম্ভব হইয়াছে।

এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ভোগোদ্বৃত্ত উৎপত্তির কারণ হইল আয়ের পার্থক্য (Inequality of income)। এই পার্থক্যের জন্য ক্রয়-ক্ষমতার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন একটি দ্রব্যের মূল্য আট আনা তখন মাত্র ১০ জন লোকে ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করে, মূল্য যখন ছয় আনা তখন ১৫ জনে ক্রয় করে ও মূল্য যখন চার আনা তখন ২০জনে ক্রয় করে এবং চাহিদা ও যোগানের সমতা হয়। মূল্য যখন চার আনা তখনই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রেতারা ভোগোদ্বৃত্ত পায়। যাহারা

চার আনা মূল্য হইলে ক্রয় করে, কিন্তু অধিক মূল্য হইলে ক্রয় করে ন তাহাদিগকে প্রান্তিক ক্রেতা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, বাজারে একই দ্রব্যের সকলগুলিরই একই মূল্য যে বাজারে বৈষম্যমূলক মূল্য প্রচলিত, সেখানে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ কর যায় না।
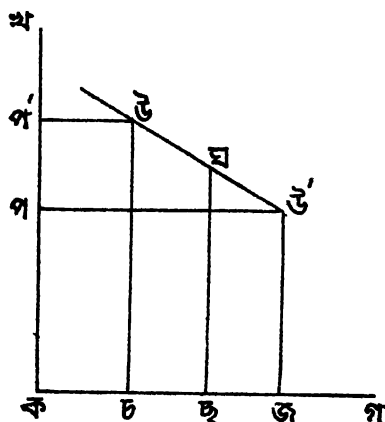
৪নং চিত্র

উপরি-প্রদত্ত চিত্র সাহায্যে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা হইয়াছে। **কখ** রেখা দ্বারা মূল্য বা উপযোগিতা এবং **কগ** রেখা দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ পরিমাপ করা হইয়াছে। যখন **কচ** পরিমাণ ক্রয় করা হয় তখন **চউ** পরিমাণ মূল্য দেওয়া হয় ও **কচউপ'** পরিমাণ উপযোগিতা পাওয়া যায়। এই পরিমাণ উপযোগিতা না পাইলে ক্রেতা **চউ** পরিমাণ মূল্য দিতে প্রস্তুত নহে। **চছ** পরিমাণের জন্য **ছঘ** পরিমাণ মূল্য দেওয়া হয় এবং **চছঘউ** পরিমাণ উপযোগিতা পাওয়া যায়। **ছজ** পরিমাণের জন্য **জউ'** মূল্য দেওয়া হয় এবং ক্রেতা **চজউ'ঘ** পরিমাণ সন্তুষ্টি আশা করে। এখন যদি ধরা যায় যে, ক্রেতা এই তিন মাত্রা দ্রব্য—**কচ, চছ** ও **ছজ** একই মূল্য অর্থাৎ **জউ'** মূল্যে পায়, তাহা হইলে তাহার এই তিন মাত্রা দ্রব্যের জন্য **কজ × জউ'** অর্থাৎ **কজউ'প** পরিমাণ ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং এই তিন মাত্রা দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার ভোগোদ্বৃত্ত হইবে **কজউ'উপ' − কজউ'প = পউ'উপ'**।

মার্শাল-প্রদত্ত ভোগোদ্বৃত্ত সংজ্ঞাটির বর্তমানে অধ্যাপক হিক্‌স কর্তৃক নূতন ভাবে ব্যাখ্যা হইয়াছে। হিক্‌স বলেন, মূল্যহ্রাসের ফলে ক্রেতার হস্তে পূর্বপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়াও যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সেই উদ্বৃত্ত অর্থকে ভোগোদ্বৃত্ত বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ধরা যাউক প্রতি পাউণ্ড চা যখন ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল তখন ক্রেতা ৪ পাউণ্ড ক্রয় করিত এবং ইহাতে তাহার মোট ব্যয় হইত ৪ × ৩ = ১২৲ টাকা। চায়ের মূল্য হ্রাস পাইয়া প্রতি পাউণ্ড ২৷৷৹ টাকা হইল। ক্রেতা বর্তমানে ৪ পাউণ্ড চা ক্রয় করিলে তাহার মোট ব্যয় হইবে ৪ × ২৷৷৹ = ১০৲। সুতরাং ক্রেতার হস্তে ১২ — ১০ = ২৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। এই ব্যয়হ্রাসের ফলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইল বলা যাইতে পারে।

ভোগোদ্বৃত্ত সংজ্ঞার সমালোচনা—Criticism of the Doctrine of Consumer's Surplus.

ভোগোদ্বৃত্ত সংজ্ঞাটির বহু সমালোচনা হইয়াছে ও অধ্যাপক মার্শাল এই সমালোচনাগুলির সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

১। নিকোল্‌সন বলেন যে, এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণরূপে কল্পনা-প্রসূত এবং নিরর্থক। ১০০ পাউণ্ড আয়ের উপযোগিতা বাৎসরিক ১,০০০ পাউণ্ড আয়ের সমান বলিবার কোন সার্থকতাই নাই। তদুত্তরে মার্শাল বলেন যে, আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ উক্তির কোন সার্থকতা না থাকিলেও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক মান তুলনা করিবার পক্ষে এই সংজ্ঞাটি বিশেষ সহায়ক। ইংলণ্ডে ৩০০ পাউণ্ড আয় করিয়া লোকে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতে পারে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ১,০০০ পাউণ্ড আয় করিয়াও লোকে সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতে পারে না।

২। জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য নহে। এই দ্রব্যগুলি মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দুঃখ দূর করে। এই দ্রব্যগুলি না হইলে কষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা অতিরিক্ত কোন সন্তুষ্টি বিধান করে না। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না।

৩। ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রেতার নিকট সর্বদ্রব্য ক্রয়কালে সমান থাকে। কিন্তু

কার্যতঃ তাহা হয় না। ক্রেতা যত অধিক দ্রব্য ক্রয় করে, প্রান্তিক উপযোগিতা ততই পরিবর্তিত হয়। ইহার উত্তরে মার্শাল বলেন যে, ক্রেতা কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের উপর তাহার আয়ের বেশীর ভাগ ব্যয় করে না, সুতরাং অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

৪। বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন রুচি ও আর্থিক সংগতির জন্য ভোগোদ্বৃত্তের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। মার্শাল বলেন যে, বহুসংখ্যক লোকের গড ভোগোদ্বৃত্ত নির্ণয়-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি ও আয়ের পার্থক্য উপেক্ষা করিলেও ভোগোদ্বৃত্ত সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব।

৫। পরিবর্তী সামগ্রী থাকার জন্য বহুক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের অন্তরায় ঘটে। মার্শাল বলেন যে, পরিবর্তী সামগ্রীগুলিকে যথাযথভাবে একটি সাধারণ চাহিদার তালিকাভুক্ত করিয়া এই অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে।

ভোগোদ্বৃত্ত সংজ্ঞার তত্ত্ববিষয়ক ও বাস্তব গুরুত্ব—Theoretical and Practical Importance of the Concept.

এই সংজ্ঞার তত্ত্ববিষয়ক প্রধান গুরুত্ব হইল যে, কোন দ্রব্য হইতে যে পরিমাণ উপযোগিতা বা সন্তুষ্টি পাওয়া যায় প্রদত্ত মূল্য দ্বারা তাহার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। একটি দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের পার্থক্য এই সংজ্ঞাটির দ্বারা সূচিত হয় লবণের ব্যবহারিক মূল্য উহার বিনিময় মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক এবং এই পার্থক্য এই সংজ্ঞাটির দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ দ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার মান নির্ণয় করিতে পারি। তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে মূল্য নির্ধারণ কালে এই সংজ্ঞাটি বিবেচনা করিতে হয়। সে যদি এত উচ্চ স্তরে মূল্য স্থির করে, যে মূল্যে ক্রেতার কোন ভোগোদ্বৃত্ত থাকে না, তাহা হইলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মুনাফা কম হয়। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ-নির্ধারণ ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটির গুরুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রত দেশগুলির অধিবাসিগণ যদি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা অধিকতর উপযোগিতা পান তাহা হইলে বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। পঞ্চমতঃ, করধার্য-ব্যাপারেও এই সংজ্ঞাটির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে কর ধার্য করিতে হয়। এরূপভাবে কর ধার্য করা উচিত

যাহাতে এই ভোগোদ্বৃত্তের কোন ক্ষতি না হয় অথচ সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়।

ভোগকারীর (ক্রেতার) একাধিপত্য—Consumer's Sovereignty.

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তখন ক্রেতা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহার পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভোগকারীর অবাধ ক্রয়-স্বাধীনতা দেখা যায়। সে তাহার পছন্দমত দ্রব্য যে-কোনও বিক্রেতার নিকট হইতে তাহার অভীপ্সিত মূল্যে ক্রয় করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার রুচি, পছন্দ ও চাহিদার উপর নির্ভর করিতে হয়। ক্রেতা যে জাতীয় দ্রব্য যেরূপ মূল্যে ক্রয় করিতে পারে বিক্রেতাকে ঠিক সেই জাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ করিতে হয়, নতুবা বিক্রেতার মুনাফা অর্জন সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতাই হইল ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ামক। তাহার চাহিদা অনুসারেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের দ্রব্যাদির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতার একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আধুনিককালে উৎপাদকগণ যে শুধুমাত্র ক্রেতার অভিরুচি অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। আধুনিক উৎপাদকগণ শুধুমাত্র ক্রেতার অভিরুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অনেক সময় তাহারা তাহাদের অনুমান-শক্তি প্রয়োগ করিয়া পূর্বাহ্লেই ক্রেতার পছন্দমত দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। ক্রেতা কোন্ দ্রব্য পছন্দ করিতে পারে, ক্রেতার অভিরুচি কোন্‌মুখী, সুচতুর ব্যবসায়িগণ তাহা অনুমান করিয়া বিজ্ঞাপন মারফৎ সেই সমস্ত দ্রব্যের উপযোগিতা সম্পর্কে ক্রেতাগণকে সচেতন করিয়া নূতন চাহিদার সৃষ্টি করে। এরূপ স্থলে নূতন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কেও উৎপাদককে ক্রেতার ক্রয়সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া মূল্য স্থির করিতে হয়। দ্রব্যের উপযোগিতা বা মূল্য ক্রেতার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে—এ সম্পর্কে উৎপাদকের অনুমান যদি সঠিক না হয় তাহা হইলে উৎ-পাদকের সাফল্য অসম্ভব। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভোগকারীর অভাব নিবৃত্তি করিবার ক্ষমতার উপরই সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ভর করে।

ভোগকারীর একাধিপত্যের সীমা—Limitations to Consumer's Sovereignty.

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভোগকারীর অবাধ স্বাধীনতা থাকিলেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাহার অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে :

প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভোগকারী এককভাবে উৎপাদক বা বিক্রেতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ক্রেতার এ চাহিদা বা অভিরুচি উৎপাদক সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে। এককভাবে ক্রেতা সম্পূর্ণ নিঃসহায়। সুতরাং ভোগকারীর একাধিপত্য তাহাদের সংঘবদ্ধ চাহিদার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় উৎপাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া নানা জাতীয় একচেটিয়া কারবার স্থাপন দ্বারা ক্রেতার ক্রয়স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

তৃতীয়তঃ, অনেক সময় উৎপাদকগণ নূতন বিক্রয়-কৌশল অবলম্বন ও চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন মারফৎ ক্রেতার রুচি ও পছন্দ পরিবর্তন করিয়া ক্রেতাকে তাহার পছন্দের বাহিরের দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করে। উৎপাদক শুধু ভোগকারীর রুচিমত দ্রব্য সরবরাহ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সে তাহার উদ্ভাবনী কৌশল দ্বারা ক্রেতার রুচি পরিবর্তন করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় রাষ্ট্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্রেতার অবাধ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, যে সমস্ত দ্রব্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী কলে প্রস্তুত হয় (Standardized goods), সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতার স্বাধীনতা উপেক্ষিত হয়। এরূপক্ষেত্রে সকল ক্রেতাই এক পর্যায়ভুক্ত হয় এবং ক্রেতার রুচি বা পছন্দ প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ষষ্ঠতঃ, ক্রেতার ক্রয়সামর্থ্যই হইল তাহার একাধিপত্যের প্রধান অন্তরায়। ক্রয়সামর্থ্যের (অর্থের) অভাবে অনেক সময় ক্রেতাকে তাহার অভিরুচি অনুযায়ী দ্রব্য ক্রয় না করিয়া নিকৃষ্ট স্তরের দ্রব্য ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পার্কার পেন ব্যবহারের ইচ্ছা অনেক সময় অর্থের অভাবে স্বল্পদামী কলম ব্যবহার করিয়া নিবৃত্ত রাখিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত ক্রেতার অভ্যাসগত রুচি, সামাজিক পরিবেশ, অজ্ঞতা প্রভৃতিও অনেক সময় তাহার ইচ্ছামত দ্রব্য ক্রয় করিবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

সমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র—Law of Equi-Marginal Utility or The Principle of Substitution.

যদি কোন দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহারযোগ্য হয় তাহা হইলে লোকে সেই দ্রব্যটি এই বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে এরূপভাবে ভাগ করিবে যে, ঐ দ্রব্যটির প্রত্যেক ব্যবহার হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যবহারের প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হইলে সেই দ্রব্যটির সমগ্র উপযোগিতা সর্বাধিক হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জল নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি কোন লোক স্নান করিবার জন্য অধিক জল খরচ করে, তাহা হইলে অন্য ব্যবহারের জন্য তাহার কম জল থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে জলের প্রত্যেক ব্যবহার হইতে প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হইবে না—সুতরাং জলের সমগ্র উপযোগিতাও হ্রাস পাইবে।

ব্যয় করিবার কালেও লোকে এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। উপার্জিত অর্থের প্রত্যেকটি এরূপভাবে বিভিন্ন দ্রব্য ও কাজের জন্য ব্যয় করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যয় হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয়। লোকে সাধারণতঃ খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করে, কিন্তু এই বিভিন্ন অভাব মিটাইবার জন্য সে অর্জিত অর্থ এরূপ-ভাবে ব্যয় করে যে, সকল অভাব যথাযথভাবে পূরণ হইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেকটি অভাব মিটাইবার জন্য যে অর্থ সে ব্যয় করে, সেই অর্থ হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পায়। যদি কোন লোক তাহার আয়ের অর্ধাংশ বাড়ী-ভাড়া দেয় অথবা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহার খাদ্য, পরিধেয়, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয় করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ থাকিবে না। ফলে এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করিবার অর্থের উপযোগিতা কম হইবে এবং অর্থ হইতে তাহার মোট উপযোগিতাও হ্রাস পাইবে।

এই সূত্রটি শুধু মানুষের বর্তমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ব্যয় সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মানুষ তাহার আয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ব্যয়ের মধ্যে এরূপভাবে ভাগ করিবে যে, বর্তমান ব্যয় ও ভবিষ্যৎ ব্যয় হইতে সমান উপযোগিতা পায়। যদি সে বর্তমানে অধিক ব্যয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের ব্যয়-সংকুলান হইবে না; ফলে অর্থের সমগ্র উপযোগিতা হ্রাস পাইবে। আবার,

যদি বর্তমানে স্বল্প খরচ করিয়া ভবিষ্যতের জন্যই অধিক সঞ্চয় করে তাহা হইলেও বর্তমানে অর্থ হইতে প্রান্তিক উপযোগিতা কম হইবে, ফলে অর্থের সমগ্র উপযোগিতা হ্রাস পাইবে। যদি কোন ব্যক্তি দেখিতে পায় যে, এক দিকের ব্যয় হইতে সে অধিক উপযোগিতা পাইতেছে না, কিন্তু অপরদিকে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া অধিক উপযোগিতা পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে সে প্রথম দিকের ব্যয় হ্রাস করিয়া দ্বিতীয় দিকের ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে স্বল্প উপযোগিতা ছাড়িয়া সে অধিক উপযোগিতা লাভের চেষ্টা দ্বারা তাহার সমগ্র উপযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইবে। একদিকের ব্যয় হ্রাস করার ফলে প্রান্তিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাইবে। শেষ পর্যন্ত যখন উভয় দিক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হইবে তখন আর দ্রব্য পরিবর্তন দ্বারা অধিকতর উপযোগিতা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সমান প্রান্তিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ সমগ্র বা মোট উপযোগিতা পাওয়া যায়। ইহাকেই ভোগকারীর সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ (Doctrine of Maximum Satisfaction) বলা হয়।

সূত্রটির গুরুত্ব—Importance of the Law.

শুধু ব্যয় করিবার কালে যে লোকে এই নীতিটি অনুসরণ করে তাহা নহে —উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থাও বহুলাংশে এই নীতিটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উৎপাদক উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলিকে এরূপভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে সে সর্বাধিক উৎপাদন লাভ করিতে পারে। যদি কোন জমিতে ধান ও পাট এই উভয়ই উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধান ও পাট ইহার মধ্যে যেটি উৎপাদন করিয়া কৃষক সর্বাধিক লাভবান হইবে, সেইটিই সেই জমিতে উৎপাদন করিবে।

বণ্টন-ব্যবস্থায়ও ব্যবস্থাপক এই নীতি অনুসারে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগিতা নির্ধারণ করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অংশ স্থির করে। সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় অপেক্ষা সরকারী ব্যয় অধিকতর সুফল প্রদান করে, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা ও সরকারী ব্যয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের

স্থান অধিকার করে। তাহা হইলেই সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়। মূল্য নির্ধারণ ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। যোগান হ্রাস পাওয়ার ফলে যখন কোন দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি পায় তখন ক্রেতাগণ এই নীতি অনুসরণ করিয়া অধিক মূল্যের দ্রব্য কম এবং স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বেশী ক্রয় করে।

সমালোচনা—Criticism.

দৈনন্দিন জীবনে সমান-প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্রটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ক্রেতা ক্রয়কালে যে এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দ্রব্য-ক্রয় করে তাহা সত্য নহে। অনেক সময় ক্রেতা প্রয়োজনের তাগিদে অথবা বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিকল্প সামগ্রীর উপযোগিতা বিচার না করিয়াই দ্রব্যটি ক্রয় করে। উৎপাদন-ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ভোগকারীর পক্ষে একদিকের ব্যয় কমাইয়া অন্যদিকে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া অধিক তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন লোক চা পান করিয়া যে তৃপ্তি পায়, একটি সেলাইয়ের কল হইতে তদপেক্ষা অধিক তৃপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও চা-এর উপর ব্যয়সংকোচ করিয়া সেলাই-এর কল ক্রয় করা সম্ভব হয় না। সেলাই-এর কল ক্রয় করিতে গেলে চা-পান ব্যতীত আরও অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ে তাহাকে বিরত থাকিতে হয়। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই দ্রব্যপরিবর্তন দ্বারা সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধনবিজ্ঞানে উপযোগিতার অর্থ হইল আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি—তৃপ্তি নহে। সুতরাং অধিক আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া অধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় দ্বারা সব সময়ে অধিক তৃপ্তি নাও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা হইলেও তৃপ্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ নাও হইতে পারে।

প্রান্তিক পছন্দের সূত্র—Theory of Marginal Preference.

অধুনা অধ্যাপক হিক্স্, য্যালান প্রমুখ অনেক লেখক মার্শাল-প্রদত্ত প্রান্তিক উপযোগিতা সংজ্ঞাটির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন ক্রেতাই অন্ত

দ্রব্যের উপযোগিতার সহিত তুলনা না করিয়া এককভাবে একটি দ্রব্যের উপযোগিতা নির্ধারণ করে না। ক্রেতার আচরণ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রেতা একজাতীয় দ্রব্যসমষ্টির পরিবর্তে অন্যজাতীয় দ্রব্য-সমষ্টি পছন্দ করিতে পারে। ক্রেতা তাহার রুচি ও জীবনধারণের মান অনুসারে তাহার উপার্জিত অর্থ বিভিন্ন অভাব মিটাইবার জন্য ব্যয় করে। অনেক সময় ক্রেতা একদিকে ব্যয় সংকোচ করিয়া অন্যদিকে ব্যয় বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ক্রেতা তাহার ধূমপানের জন্য ব্যয় সংকোচ করিয়া সেই সঞ্চিত অর্থ পুষ্টিকর খাদ্যে ব্যয় করিতে পারে। এইরূপে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে ক্রেতার আপেক্ষিক পছন্দ স্থির হইলে, সে সামগ্রীগুলির কোন নির্দিষ্ট একটির অন্য-নিরপেক্ষ উপযোগিতা পরিমাপ না করিয়া একটি অধিক ক্রয় করিবে ও অন্যটি কম ক্রয় করিবে। এইরূপে কোন ব্যক্তি যদি ১০৲ টাকা মূল্যের চা ও ঐ মূল্যের কফির মধ্যে তাহার পছন্দ প্রয়োগ করিয়া কফি অপেক্ষা চা অধিকতর পছন্দ করে, তাহা হইলে সে চায়ের পরিবর্তে কফি ব্যবহার করিয়া আর অধিক লাভবান হইবে না। এই বিন্দুতেই চা ও কফির প্রান্তিক পছন্দের সীমা নির্ধারিত হয়। প্রান্তিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে একই দ্রব্যের আধিক্যহেতু যেরূপ উপযোগিতা হ্রাস পায়, প্রান্তিক পছন্দের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ একটির পরিবর্তে অন্যটির পছন্দের ক্ষেত্রে একটির আধিক্য হইলে সেইটির প্রতি আসক্তি হ্রাস পাইবে।

নিরপেক্ষ রেখা—Indifference curves.

মার্শাল-কর্তৃক প্রদত্ত 'উপযোগিতা'র ধারণা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করে তখন সে অন্য দ্রব্যের উপযোগিতা-নিরপেক্ষভাবে শুধু একটি মাত্র দ্রব্যের উপযোগিতা বিবেচনা করে অর্থাৎ চা ক্রয় করিবার সময় সে কোকো, কফি বা অন্য জাতীয় পানীয়ের উপযোগিতার বিষয় চিন্তা না করিয়া চা ক্রয় করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়কালে তাহার পছন্দ প্রয়োগ করিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রার যুক্তক্রয় দ্বারা সমান উপযোগিতা লাভ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় কোন একটি বিশেষ যুক্ত-ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ পছন্দ থাকে না অর্থাৎ যুক্তক্রয় কালে সে সম্পূর্ণ উদাসীন (Indifferent) থাকে।

ধরা যাউক, একজন ক্রেতা কোকো অপেক্ষা চা অধিকতর পছন্দ করে কিন্তু চা-এর মূল্য অপেক্ষা কোকোর মূল্য যদি কম হয় তাহা হইলে সে কিছু পরিমাণ কোকো ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু চা-এর মূল্য যদি অত্যধিক হ্রাস পায় তাহা হইলে সে আর কোকো আদৌ ব্যবহার করিবে না। অপর পক্ষে চা-এর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে সে অত্যধিক মূল্যের জন্য চা খাওয়া বন্ধ করিতে পারে। মূল্যের এই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিবর্তন সীমারেখার মধ্যে ক্রেতা চা ও কোকো এই উভয় দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উভয় দ্রব্যই এরূপ পরিমাণে ক্রয় করিবে যাহাতে সে উভয় দ্রব্যের সামান্যতম মূল্য-পরিবর্তনের সুবিধা পায়। সুতরাং চা ও কোকোর বিভিন্ন মাত্রার যুক্তক্রয় দ্বারা সে সমান উপযোগিতা পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ক্রেতার নিকট চা ও কোকোর নিম্নলিখিত যুক্তক্রয় সমান উপযোগিতা-সম্পন্ন :

১।	৮ পেয়ালা চা	৪ পেয়ালা কোকো
২।	৭ " "	৫ " "
৩।	৬ " "	৬ " "
৪।	৫ " "	৭ " "

৩নং চিত্র
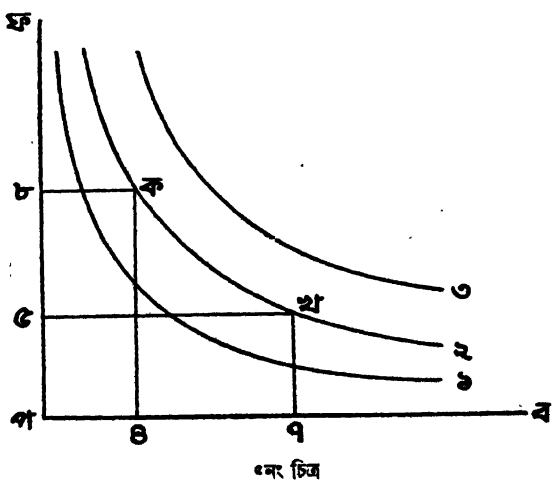
উপরি-প্রদত্ত চিত্রের পফ রেখা দ্বারা চা-এর পরিমাণ ও পব রেখার দ্বারা কোকোর পরিমাণ দেখান হইয়াছে। যে-কোন ক্রেতার পছন্দ ১, ২, ৩ রেখার

দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই রেখাগুলির মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দুটি এই দুইটি দ্রব্যের যুক্তপছন্দের নির্দেশক। ২নং রেখার উপর **ক** ও **খ** বিন্দু অবস্থিত। **ক** বিন্দুতে ৮ পেয়ালা চা ও ৪ পেয়ালা কোকোর যুক্তচাহিদা দেখান হইয়াছে এবং **খ** বিন্দুতে ৫ পেয়ালা চা ও ৭ পেয়ালা কোকোর যুক্তচাহিদা দেখান হইয়াছে। এই দুইটি যুক্তচাহিদা একজন ক্রেতা সমানভাবে পছন্দ করে, কারণ ইহাদের উভয়ের সমগ্র উপযোগিতা তাহার নিকট সমান।

এইরূপ বহু পছন্দরেখা অংকন করা যাইতে পারে যাহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা বেশী বা কম হইতে পারে। চিত্রে ১নং যে পছন্দরেখা দেখান হইয়াছে তাহাতে ২নং রেখার তুলনায় দুইটি দ্রব্য কম পরিমাণে যুক্তচাহিদা প্রকাশ করে এবং ৩নং রেখায় দুইটি দ্রব্যের যে পরিমাণ দেখান হইয়াছে তাহা ২নং রেখায় প্রকাশিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু প্রত্যেক ক্রেতা অধিক পরিমাণ উপযোগিতা লাভের আশায় পছন্দ রেখার সর্বোচ্চ সীমায় ক্রয়ের চেষ্টা করিবে। কারণ সর্বোচ্চ পছন্দরেখায় সে দুইটি দ্রব্যেরই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য পাইতে পারে। কিন্তু সব সময়ে ইহা সম্ভব নহে। কারণ তাহার ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

সে তাহার নির্দিষ্ট ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে দুইটি দ্রব্যের সেই পরিমাণ ক্রয় করিবে যাহাতে সে সর্বাধিক পরিমাণ উপযোগিতা পাইতে পারে। ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা ও দ্রব্যমূল্য যদি অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থাকে ক্রেতার ক্রয়ের স্থিতাবস্থা (consumer's equilibrium) বলা হয়।

নিরপেক্ষ রেখার উপযোগিতা—Utility of Indifference curve.

মার্শালের মতে অর্থের দ্বারা উপযোগিতার পরিমাণ পরিমাপযোগ্য। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ক্রেতা একটি দ্রব্য ভোগ করিয়া কি পরিমাণ উপযোগিতা পাইতেছে তাহা সঠিকভাবে বলিতে না পারিলেও একাধিক দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রার যুক্তব্যবহারের কোন্‌টি অধিকতর উপযোগিতা-সম্পন্ন তাহা বুঝিতে পারে। নিরপেক্ষ রেখার প্রধান সুবিধা হইল যে, ইহা উপযোগিতার পরিমাণ পরিমাপ করিবার চেষ্টা করে না। একটি দ্রব্যের উপযোগিতার পরিমাণ অন্য দ্রব্যের উপযোগিতা-নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ

করিবার প্রয়াস না পাইয়া এই সংজ্ঞাটি একাধিক দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত-ব্যবহারের কোন্‌টি অধিকতর উপযোগিতা-সম্পন্ন তাহা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং উপযোগিতা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেও ইহা উপযোগিতা পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করে না। কারণ উপযোগিতা অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নহে।

শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই নির্বাচন-সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে। মানবজীবনের অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা হইল এই দ্রব্যের নির্বাচন। নিরপেক্ষ রেখা এই সমস্যা-সমাধানের প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে নির্দেশ করে।

সংক্ষিপ্তসার

ভোগ—

অভাব পূরণ করাই হইল ভোগ। উৎপাদন দ্বারা যে নূতন উপযোগিতা সৃষ্ট হয়, ভোগ দ্বারা সেই উপযোগিতা নষ্ট হয়। ভোগ-ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু মানুষের প্রাথমিক অভাবগুলি দূর হইলেই মানুষের নূতন নূতন কর্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ উৎপাদন মানুষের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন করিয়া নূতন অভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং ভোগ উৎপাদনব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য—

১। অভাব অসংখ্য ২। কিন্তু, প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণ করা যায়, ৩। একই অভাব নানাভাবে পূরণ করা যায়, অর্থাৎ অভাবগুলির মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে, ৪। অনেক অভাব একমাত্র একাধিক দ্রব্যের সহযোগিতায় দূর করা যায়।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ—

অপরিহার্যতার দিক দিয়া অভাবকে ১। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, ২। আরামপ্রদ দ্রব্য ও ৩। বিলাসিতার দ্রব্য—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি অপরিহার্য, কেননা এই অভাবগুলি পূরণ না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আরামপ্রদ দ্রব্য লোকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিলেও

উপযোগিতা অপেক্ষা এইগুলির খরচ অনেক বেশী। বিলাসদ্রব্যের কোন উপযোগিতা নাই বলিলেও চলে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, (ক) বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, (খ) কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও (গ) অভ্যাসগত বা ব্যবহারসিদ্ধ দ্রব্য, যেমন অলংকার বা মূল্যবান পরিচ্ছদ। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের দিক দিয়াই এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা—

যেহেতু মানুষের নির্দিষ্ট কোন অভাব সহজে পূরণ করা যায়, সেইহেতু কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রা ভোগ করিলে সেই দ্রব্যের উপযোগিতা হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু এই উপযোগিতা-হ্রাসের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। অনেক সময় দ্বিতীয় পেয়ালা চা হইতে প্রথম পেয়ালা চা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগিতা পাওয়া যায়। তবে একই দ্রব্যের আধিক্য হইলে উপযোগিতা যে একসময় হইতে হ্রাস পাইবে ইহা ধ্রুবসত্য। তবে দ্রব্যটি একই জাতীয় হওয়া চাই এবং লোকের রুচি, অভ্যাস ও আয় অপরিবর্তনীয় থাকা চাই।

চাহিদার সূত্র—

চাহিদার সূত্র প্রান্তিক উপযোগিতা-সূত্রের একটি উপসিদ্ধান্ত মাত্র। একই দ্রব্যের আধিক্য হইলে উপযোগিতা হ্রাস পায়—সুতরাং লোকে সেই দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কম মূল্য দিতে চায়। ইহা হইতে বলা যায় যে, মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই সূত্রের কার্যকারিতা শর্তাধীন। যদি লোকের রুচি, অভ্যাস, আয় প্রভৃতির কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলেই চাহিদার সূত্রটি প্রযোজ্য।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—

মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য ঈষৎ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিলে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, আবার কোন দ্রব্যের মূল্যের অধিক হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেও চাহিদার অনুমানক্ষম কোন পরিবর্তন হয় না। প্রথমোক্ত চাহিদাকে পরিবর্তনশীল চাহিদা বলা হয় ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চাহিদাকে অপরিবর্তনীয় চাহিদা বলা হয়। কিন্তু কার্যতঃ কোন চাহিদাকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনশীল বা সম্পূর্ণরূপে

অপরিবর্তনীয় বলা চলে না। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভ্যাসগত দ্রব্য ও অতি স্বল্পমূল্যের দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয়, এবং বিলাসদ্রব্য, একাধিকভাবে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য ও পরিবর্তী দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তনশীল হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূল্য-নির্ধারণকালে ও সরকার করধার্য-নির্ধারণে এই সংজ্ঞাটির সাহায্য লইয়া থাকে।

চাহিদা পরিবর্তনের কারণ:

নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে:

১। মূল্যবৃদ্ধি পাইলে চাহিদা সাধারণতঃ হ্রাস পায়, মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

২। অনেক সময় মূল্য-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

৩। বিকল্প সামগ্রীর মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

৪। ব্যক্তিগত আয় হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে।

ব্যক্তিগত চাহিদার কখন পরিবর্তন হয়:

১। অপরিবর্তিত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় করা অথবা অধিক মূল্যে পূর্ব পরিমাণ ক্রয় করা হইলে চাহিদার বৃদ্ধি বলা হয়।

২। পক্ষান্তরে অপরিবর্তিত মূল্যে কম পরিমাণ ক্রয় করা অথবা হ্রাস-প্রাপ্ত মূল্যে পূর্ব পরিমাণ ক্রয় করা হইলে চাহিদার হ্রাস বলা হয়।

ভোগোদ্বৃত্ত—

সমগ্র উপযোগিতা দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য এবং প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত বাজার মূল্যের পার্থক্যকেই মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত আখ্যা দিয়াছেন। ক্রীত দ্রব্য হইতে মূল্যাতিরিক্ত যে সন্তোষ পাওয়া যায়, তাহাই ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত। সুতরাং ক্রেতার ব্যক্তিগত মূল্য যদি বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী হইবে। এই ভোগোদ্বৃত্ত একটা মানসিক ধারণা, সুতরাং ইহার সুস্পষ্ট পরিমাপ সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগোদ্বৃত্ত সমান হইতে পারে না। তবে এই সংজ্ঞাটির দ্বারা বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে।

সমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র—

বিভিন্নভাবে উপযোগী দ্রব্য ব্যবহারকালে লোকে দ্রব্যটি এরূপভাবে ব্যবহার করে যে, প্রত্যেকটি ব্যবহার হইতে সে সমান উপযোগিতা লাভ করিতে পারে। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে উপযোগিতা সমান হইলে সেই দ্রব্যটির সমগ্র উপযোগিতা সর্বাধিক হয়। এই নীতি ভোগের ক্ষেত্র ব্যতীতও বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে, উৎপাদন ও বণ্টন-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্নাবলী

1. What is elasticity of demand? How would you measure the elasticity of demand for a commodity? (C. U. 1955)

2. Explain what Marshall means by *Consumer's Surplus*. Show how it is related to individual demand price and to market price.

3. Show that (*a*) the law of demand states a (qualitative) relation between the prices prevailing in market and the amount demanded at each price; and

(*b*) the elasticity of demand expresses a (quantitative) relation between the *change* in price and the corresponding *change* in the amount of demand. (C. U. 1952)

4. How should a man expend his income over the different items of his various needs, present as well as prospective? Give reasons for your answer. (C. U. 1949)

5. Examine the Principle of substitution and the law of Equi-marginal Returns. What are the limitations of the latter? (C. U. B. Com. 1957)

6. Explain the concept of Consumer's Surplus and indicate its importance in theory and practice? (C. U. 1958)

7. Explain the factors on which the elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure the elasticity of demand at a given price? (C. U. 1960)

8. Explain carefully the basis of the Law of Demand. Do you know of any exceptions to the Law? (C. U. B. Com. 1961)

9. How would you measure the elasticity of demand for a commodity! What are the factors which determine the elasticity of demand? (C. U. 1962)

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপাদন—ভূমি

(Production—Land)

ভূমি ও ইহার বৈশিষ্ট্য—Land and its peculiarities.

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভূমি বলিতে যাবতীয় প্রকৃতি-দত্ত পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান এবং উপাদানগুলির প্রত্যেকটির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল যে—

১। ইহার কোন উৎপাদন-খরচ নাই (No cost of production)। ইহা প্রকৃতির দান হিসাবেই পাওয়া যায়। অন্যান্য উপাদানগুলি মানুষের শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু ভূমি উৎপাদন করিতে মানুষের কোনরূপ শ্রম প্রয়োগ করিতে হয় না। কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও ইহাকে মানুষের ব্যবহার-যোগ্য করিবার জন্য শ্রমের প্রয়োজন। কৃষিকার্যের জন্য অথবা বাসস্থান নির্মাণ বা অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, ভূমির সংস্কার করা অপরিহার্য। অরণ্যভূমিকে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে গেলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয় এবং কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ-ব্যবস্থা, কৃত্রিম সার প্রয়োগ করা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূমির অবস্থান, জলবায়ু ও আদিম উর্বরতা-শক্তির জন্য কোন ব্যয় না হইলেও ভূমিকে ব্যবহারযোগ্য ও ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন-খরচ অবশ্যম্ভাবী। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভূমিরও একটা উৎপাদন-খরচ আছে।

২। ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার যোগান সীমাবদ্ধ (Fixity of Supply)। মূলধনের পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা অন্ততঃ দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। মানুষের চেষ্টায় একদিকে যেরূপ ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা চলে না, নৈসর্গিক কারণে সেইরূপ ভূমির আয়তনের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ভূমির যোগানের এই নির্দিষ্টতার জন্য ভূমির মালিকানায় একচেটিয়া ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জমির মালিকগণ অতিরিক্ত আয় পাইতে পারেন।

৩। ভূমির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গতিশীলতার অভাব (Lack of mobility)। শ্রমিক বা মূলধনের মতন সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে ভূমি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। এইজন্য জমির খাজনার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

৪। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও অবস্থানের পরিবেশের এত পার্থক্য (Heterogeneity) দেখা যায় যে, একখণ্ড জমি অন্যখণ্ড জমির পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য হয় না। একজন শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য একজন শ্রমিক নিযুক্ত করা চলে, একমাত্রা মূলধনের পরিবর্তে অপর একমাত্রা মূলধন বিনিয়োগ করিলেও উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত না হইতে পারে, কিন্তু একখণ্ড জমির পরিবর্তে অন্যখণ্ড জমি সর্বক্ষেত্রে সমান ফলপ্রসূ হয় না, সুতরাং একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হইতে পারে না (not interchangeable)।

৫। ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন আরম্ভ হয়। একই জমিতে যদি ক্রমবর্ধমান হারে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ সমানুপাতিক হারে জমির উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি পায় না।

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে—Factors determining the productivity of Land.

১। নৈসর্গিক কারণ—Natural factor.

নৈসর্গিক কারণেই সাধারণতঃ বিভিন্ন জমির মধ্যে উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, নদী, হ্রদ বা পর্বতের নৈকট্য উৎপাদিকা-শক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। নৈসর্গিক কারণে গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল উর্বর আর রাজপুতানা অঞ্চল অনুর্বর।

২। মানবীয় কারণ—Human factor.

মানুষের চেষ্টা-যত্নেও জমির উৎপাদিকা-শক্তি পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষ নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমি

হইতে জল নিষ্কাশন করিয়া ও স্থানভেদে নানাভাবে সেচব্যবস্থা দ্বারা জলাভূমি বা মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে।

৩। ভৌগোলিক কারণ—Geographical factor.

জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনেকাংশে জমির অবস্থান স্থলের উপর নির্ভর করে। খারাপ জমি সহরাঞ্চলের নৈকট্য হেতু দূরস্থ উৎকৃষ্ট জমি অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির এই উৎকৃষ্টতা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়া বর্তমান যুগে বহু অব্যবহার্য জমিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ব্যাপক ও গভীর চাষ—Extensive and Intensive Cultivation.

যখন অধিক জমি স্বল্প মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিয়া চাষ করা হয়, তখন তাহাকে ব্যাপক চাষ বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে চাষের কাজ যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। নূতন জায়গায় যেখানে চাষের জমি সহজপ্রাপ্য সেখানে অধিক ফসলের আশায় চাষী অধিক জমি চাষ করে, কিন্তু যে পরিমাণে জমি বৃদ্ধি করে সে পরিমাণে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে না।

আবার যেখানে চাষের জমি অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য সেখানে চাষী অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে। অধিক ফসল পাইবার উদ্দেশ্যে চাষী ভাল বীজ যথাযথভাবে বপন করে, জমিতে যথেষ্ট সার দেয় ও প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করে। সুতরাং ব্যাপক চাষ ও গভীর চাষের পার্থক্য হইল যে, প্রথম পদ্ধতিতে অধিক জমি ব্যবহার করা হয়; দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে অধিক মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করা হয়।

ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-সূত্র—Law of Diminishing Returns,

ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটি ধনবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এই সূত্রটি দুই দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য উৎপাদন-ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমবর্ধমান হারে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ জমির উৎপাদন-

হার হ্রাস পায় অর্থাৎ যে হারে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। মূলধন ও শ্রমবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে। মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে এই সূত্রটির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। "An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture." কৃষিক্ষেত্রে একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলে স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইত। নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রের কার্যকারিতা দেখা যাইতে পারে।

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধনের মাত্রা	সমগ্র উৎপন্ন	অতিরিক্ত উৎপন্ন
এক বিঘা	৫	১০ মণ	—
"	৫+৫=১০	২৫ মণ	১৫ মণ
"	৫+৫+৫=১৫	৩৭ মণ	১২ "
"	৫+৫+৫+৫=২০	৪৭ মণ	১০ "

উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, প্রথমতঃ এক বিঘা জমিতে যদি ৫ মাত্রা মূলধন ও শ্রম প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার যদি মূলধন ও শ্রমের মাত্রা দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে প্রথম মাত্রা অপেক্ষাও অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাত্রা বিনিয়োগের ফলে ১০ মণ, দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের ফলে সমগ্র উৎপন্নের পরিমাণ ১০ মণ হইতে ২৫ মণে বর্ধিত হইল, অর্থাৎ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের ফলে ১৫ মণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তৃতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদনের হার হ্রাস পাইয়াছে অর্থাৎ ১৫ মণ বৃদ্ধি না পাইয়া ১২ মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চতুর্থ মাত্রা মূলধন ও শ্রম প্রয়োগের ফলে ১০ মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার মূলধন ও শ্রমবৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক হয় না, অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে।

নিম্ন-প্রদত্ত নক্সার দ্বারা ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রটি সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। **কগ** রেখা দ্বারা প্রযুক্ত মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ সূচিত হইয়াছে এবং **কখ**
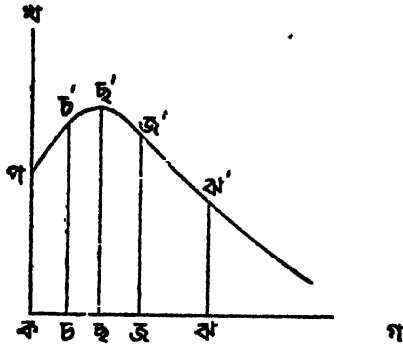
৬নং চিত্র

রেখা অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ সূচিত করে। জমি যথোপযুক্তভাবে চাষ না-হওয়ার কারণে অধিক মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া অনুপাতের অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। মূলধন ও শ্রমের অনুপাতে ফসলবৃদ্ধি **পছ'** বক্ররেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। যখন **কচ** পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ হয়, তখন **চচ'** পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। যখন **কছ** পরিমাণ প্রয়োগ করা হয়, তখন **ছছ'** পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর যদি **কজ** ও তৎপরে **কঝ** পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। উপরি-উক্ত নক্সায় দেখান হইয়াছে যে, প্রথম দুই মাত্রা মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ পর্যন্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় মাত্রা হইতে হ্রাস পাইতেছে। তাই বক্র রেখাটি **প** হইতে **ছ'** পর্যন্ত ঊর্ধ্বাভিমুখী কিন্তু **ছ** হইতে **ঝ'** পর্যন্ত ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী।

এই সূত্রটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, এই সূত্র অনুসারে ক্রমবর্ধমান হারে মূলধন ও শ্রম প্রযুক্ত হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে (Total return increases but increases at a diminishing rate)। উৎপাদন-বৃদ্ধির

অনুপাত হ্রাস পাইবার ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। প্রথমবার পাঁচ টাকা মূল্যের মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া যদি দশ মণ পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতি মণের উৎপাদন-খরচা হয় আট আনা। দ্বিতীয় ৫৲ টাকা খরচ করিয়া যদি অতিরিক্ত পাঁচ মণ পাওয়া যায় ও তৃতীয় পাঁচ টাকা খরচ করিয়া যদি অতিরিক্ত তিন মণ পাওয়া যায়; তাহা হইলে দেখা যায় যে, অধিক উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রথম দশ মণের উৎপাদন খরচা হইল মণ প্রতি $\frac{৫}{১০}=\frac{১}{২}$, অর্থাৎ আট আনা, দ্বিতীয় বারে মণ প্রতি খরচ হইল ১৲ টাকা ও তৃতীয় বারে খরচ হইল ১৷৷৵১০ আনা।

দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্র অনুসারে ফসল বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয় না, অর্থাৎ জমির উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে, কিন্তু কোন্ সময় হইতে বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে অর্থাৎ প্রথমবার মূলধন ও শ্রম বৃদ্ধি করিবার পর অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বৃদ্ধি করিবার পর তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন জমিতে অতি শীঘ্র আর কোন জমিতে বিলম্বে এই সূত্রটি কার্যকরী হয়। তবে ইহার কার্যকারিতা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, এই সূত্র জমির উৎপন্নের পরিমাণ-সম্পর্কিত, উৎপন্নের মূল্য-সম্পর্কিত নহে। ফসল-বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ফসলের অর্থমূল্য যে হ্রাস পাইবে—এ সূত্রটির দ্বারা তাহা সূচিত হয় না।

এই সম্পর্কে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ এই উভয় ক্ষেত্রেই এই সূত্রটি কার্যকরী। যখন কোন চাষী তাহার স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ ব্যয় করে বা অধিক পরিমাণ জমিতে সম-পরিমাণ ব্যয় করে—এই উভয় পদ্ধতিরই ফল হইল ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন।

কেয়ার্ণক্রস্ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে যদি কোন একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে উপর্যুপরি শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির অনুপাতে হ্রাস পায় ("Successive applications of labour and capital to a given area of land must ultimately, other things remaining the same, yield a less than proportionate increase in produce.")

ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রের ব্যতিক্রম—Limitations of the Law.

১। এই সূত্রটির কার্যকারিতা কতকগুলি অনুমান-সিদ্ধ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, জমিতে প্রযুক্ত পূর্ববর্তী শ্রম ও মূলধনের মাত্রা যথোপযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেই এই সূত্রটি কার্যকরী হয়। পূর্ববর্তী শ্রম ও মূলধনের মাত্রা যদি প্রয়োজনীয় মাত্রা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে শ্রম ও মূলধনের বর্ধিত মাত্রা প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২। যদি চাষবাসের প্রণালী অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন সুনিশ্চিত। কিন্তু চাষের কার্যে যদি উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সাধারণ লাঙ্গলের পরিবর্তে যদি কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, সেচ-ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে অবশ্য শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে।

৩। এই সূত্রটি কার্যকরী হয় যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, মূলধন ও শ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেও জমির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় থাকে। মূলধন ও শ্রম-বৃদ্ধির সহিত যদি জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই সূত্রটি কার্যকরী হয় না।

কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ—Application of the law to spheres other than agriculture.

খনি—Mines.

খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে এই সূত্রটির কার্যকারিতা পরিদৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণ খনিজ পদার্থ পাইবার আশায় ক্রমশঃই খনির তলদেশে কার্য করিবার প্রয়োজন হয়। যতই নিম্নাভিমুখী হইতে হয় ততই উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়। খনির তলদেশ হইতে খনিজ পদার্থ আহরণ করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হয় ও তজ্জন্য উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়। খনিজ পদার্থ প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহার পরিমাণের একটা সীমা আছে। সুতরাং অধিক খরচ করিলেও কালক্রমে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় ও শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ

শূন্য হয়। কিন্তু কৃষিকার্যে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও একেবারে শূন্য হয় না।

মৎস্যস্থলী—Fishery.

মৎস্য ধরিবার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া নদী হইতে মৎস্য ধরিবার ক্ষেত্রে এই সূত্রটির কার্যকারিতা দেখা যায়। জমির উৎপাদিকা-শক্তির ন্যায় নদীতে মৎস্যের সংখ্যারও একটা সীমা আছে। নদীতে যদি ক্রমবর্ধমান হারে মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া লোকে অভিযান করে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃত মৎস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সমস্ত দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যেখানে পাঁচশত মৎস্য পাওয়া যাইত, সেখানে পঞ্চাশটির অধিক মৎস্য পাওয়াও দুষ্কর হয়। ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমুদ্রের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নহে। মার্শাল বলেন যে, সমুদ্রের বিস্তৃতি এত বিরাট যে গভীরভাবে বা ব্যাপকভাবে এখানে মৎস্য ধরা সম্ভব নহে এবং গভীর ও ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারাও এই প্রায়-অফুরন্ত মৎস্য-ভাণ্ডারের কোনরূপ হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না।

সহরাঞ্চলে গৃহ-নির্মাণক্ষেত্র—Building sites in urban areas.

সহরাঞ্চলে গৃহ-নির্মাণক্ষেত্রেও এই সূত্রটি প্রযোজ্য। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আকাশস্পর্শী বিরাট আয়তনের গৃহ নির্মিত হইলেও এ কথা সত্য যে, গৃহটি যতই সুউচ্চ হইতে থাকে, নির্মাণ-খরচ ততই বৃদ্ধি পায়। মালমসল্লা উত্তোলন করিবার খরচ ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং উপরতলাগুলিতে যাইবার জন্য বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্র স্থাপিত করিতে হয়। অপরদিকে আলো-হাওয়ার অভাবহেতু নিম্নতলাগুলির উপযোগিতা হ্রাস পায়।

শিল্পের ক্ষেত্র—Industries.

শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সূত্রটি প্রযোজ্য। যখন কোন শিল্পে স্থায়ী মূলধন অর্থাৎ বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বৃদ্ধি না করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় তখন ক্রম-হ্রাসমান নীতি কার্যকরী হয়। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা স্বল্প-মেয়াদী কালে প্রযোজ্য।

ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদনের কারণ—Why does the Law of Diminishing Returns operate ?

এখন প্রশ্ন হইল যে, উৎপাদনক্ষেত্রে কেন এই সূত্রটি কার্যকরী হয় ? মার্শালের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উৎপাদনের যে ক্ষেত্রে প্রকৃতি-দেবী অংশ গ্রহণ করেন সেখানে উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রম-হ্রাসমান নীতির অনুসরণ করে, আর উৎপাদনের যে ক্ষেত্রে মানুষ অংশ গ্রহণ করে, সেখানকার উৎপাদন ক্রম-বর্ধমান নীতির অনুগামী হয়। কৃষিকার্যে প্রকৃতির প্রভাব অনতিক্রমণীয়। মানুষ তাহার বুদ্ধি, উৎসাহ ও কর্মপটুতার দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতি পরাজয় বরণ করিতে চায় না। মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের কৃষি প্রবর্তন করিয়া ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-প্রবণতা স্থগিত রাখিতে পারে, কিন্তু একেবারে দূর করিতে পারে না। তাহার কারণ হইল, জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও জমির উৎপাদিকা-শক্তিরও একটা সীমা আছে। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া একই জমিতে অধিক পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিলে, শেষ পর্যন্ত ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী এবং এই ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদনের জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

———

সপ্তম অধ্যায়

উৎপাদন—শ্রম

(Production—Labour)

শ্রমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য—Importance and Characteristics of Labour.

ধনবিজ্ঞানে 'শ্রম' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উৎপাদনের যতগুলি উপাদান আছে তন্মধ্যে শ্রমই হইল অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। মানুষের বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি প্রযুক্ত না হইলে অন্যান্য উপাদানগুলি ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ যে বহুল পরিমাণে শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহা অনস্বীকার্য। শ্রমই নৈসর্গিক শক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু শ্রম শুধু উৎপাদনের উপাদান নহে, শ্রম উৎপাদনের উদ্দেশ্যও বটে। উৎপাদনের লক্ষ্যই হইল মানুষের অভাবের নিবৃত্তি। শ্রমই হইল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার প্রধান উপাদান। সুতরাং সমাজকল্যাণ শ্রমিক-কল্যাণের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটা দেশে উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা সেই দেশের শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভর করে সেই দেশের জনসংখ্যার উপর। দেশের জনসংখ্যা নির্ভর করে চারিটি অবস্থার উপর, যথা—জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশে গমন ও বিদেশ হইতে আগমন। এইগুলির মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহার তুলনা করিয়া বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়।

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১। শ্রমের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য (Labour is inseparable from labourer)। শ্রমকে শ্রমিক হইতে পৃথক করা যায় না। শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে, কিন্তু নিজেকে বিক্রয় করে না।

২। শ্রমিককে স্বয়ং তাহার শ্রম বিক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে হয়। (The labourer must personally deliver his goods.) সুতরাং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিককে কাজ করিতে হয় তাহা উন্নত না হইলে শ্রমের মানও উন্নত হয় না। এই কারণেই শ্রমের গতিশীলতার অর্থ হইল শ্রমিকের গতিশীলতা অর্থাৎ শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা।

৩। উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমই হইল সর্বাধিক পচনশীল উপাদান। ভূমি ও মূলধন নিয়োগে বিলম্ব ঘটিলে ইহারা একেবারেই বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একদিন শ্রম না করিলে সে শ্রম আর অন্য কোন দিন প্রয়োগ করা যায় না। যেদিন কর্মবিরতি হয়, সেদিন আর প্রত্যাবর্তন করে না—সুতরাং কর্মবিরতির দিনের মজুরি আর পাওয়া যায় না। এই কারণে শ্রমিক মালিকের সহিত প্রতিযোগিতায় মজুরির পরিমাণ বিশেষ বিচার না করিয়াই তাহার শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

৪। শ্রমিকের মালিকের সহিত দর কষাকষি করিবার সামর্থ্যও অপেক্ষাকৃত কম (The labourer has relatively less bargaining capacity.) ইহার একটি কারণ হইল শ্রমের দ্রুত পচনশীলতা, দ্বিতীয় কারণ হইল শ্রমিকের মজুদ তহবিলের অভাব (No reserve fund)। বেকার অবস্থায় বেশীদিন থাকিলে অনশনের ভয় আছে। সুতরাং শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা না থাকার ফলে মালিকের শর্তে শ্রমিককে তাহার শ্রম বিক্রয় করিতে হয় অর্থাৎ মালিক যে পরিমাণ মজুরি দিতে রাজী থাকে শ্রমিককে সেই মজুরিতেই কাজ করিতে হয়।

৫। শ্রমের সরবরাহেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যোগান বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য কমিলে যোগান হ্রাস পায়। কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ মজুরি বাড়িলে শ্রমের যোগানও যে বৃদ্ধি পাইবে ইহা সব সময়ে সত্য নহে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক অল্প পরিশ্রম করিয়া অধিক আয় করিতে পারে বলিয়া অধিক সময় পরিশ্রম নাও করিতে পারে। ফলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। অপর পক্ষে শ্রমের মূল্য কমিলে শ্রমিক অধিক সময় কাজ করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। ফলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রমের যোগান জনসংখ্যা এবং শ্রমিকের দক্ষতার

উপর নির্ভর করে। এই দুইটির কোনটিকেই স্বল্প মেয়াদে বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একমাত্র দীর্ঘ মেয়াদে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব।

ম্যালথাস্-প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব—Malthusian Theory of Population.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথাস্ নামক জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচার করেন। জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদের সারাংশ হইল যে, মানবজাতির প্রজনন-শক্তি অত্যধিক, তাই জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাবৃদ্ধির এই দ্রুততায় গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য ম্যালথাস্ বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (Geometrical progression) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmetical progression)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ হারে, আর খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি পায় ২, ৪, ৬, ৮, ১০ হারে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধিকে প্রতিযোগিতায় খাদ্যদ্রব্যের বৃদ্ধির অনেক পশ্চাতে থাকিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অত্যধিক ক্ষিপ্রতার ফলে প্রত্যেক দেশ একটি সময়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন খাদ্যসংকট দেখা দেয়। দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তদ্দারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ চলিতে পারে না। এই অবস্থাকে ম্যালথাস্ অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় খাদ্যাভাব ঘটে, ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা যায়। খাদ্যসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এক দেশ আর অপর দেশকে আক্রমণ করে ও যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। ইঞ্জিনে অত্যধিক বাষ্প উৎপাদিত হইলে নিরাপত্তামূলক ঢাকনি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উত্তোলিত হইয়া যেরূপে অতিরিক্ত বাষ্প মুক্ত হয়, একটি দেশের ভরণপোষণের সাধ্যাতীত জনসংখ্যা হইলেও তদ্রূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির দ্বারা জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়া উপযুক্ত সংখ্যায় প্রত্যাবর্তন করে। এইরূপে অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পাইলেও জনসংখ্যার সহিত খাদ্য-সরবরাহের সমতা স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কারণ মানুষের প্রজনন-ইচ্ছার বিরতি নাই। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা বংশ বৃদ্ধি করে এবং পুনরায়

অতি-প্রাকৃত কারণে সংখ্যা হ্রাস পায় এবং পুনঃপুনঃ হ্রাস-বৃদ্ধি চলিতে থাকে।

এই সংকটজনক ও অনিশ্চিত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ম্যালথাস্ মানবজাতির উদ্দেশ্যে এক উপদেশ-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় প্রজনন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে তাহা হইলে প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে এ ভার গ্রহণ করেন। তাই ম্যালথাস্ কৌমার্য অবলম্বন, অধিক বয়সে বিবাহ অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সমালোচনা—Criticism.

ম্যালথাস্-প্রদত্ত জনসংখ্যা সম্পর্কিত মতবাদ বর্তমানে অসার ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা-গুলি প্রযোজ্য।

১। প্রথমতঃ বলা হয় যে, ম্যালথাস্ তাঁহার সমসাময়িক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার মতবাদ গঠন করেন। তাঁহার জীবিত অবস্থায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কোন একটি মাত্র দেশের অবস্থা দেখিয়া সর্বদেশে প্রযোজ্য একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই।

২। তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, তিনি ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না বা ইংলণ্ডে 'শিল্পবিপ্লব' সংঘটিত হইয়া উৎপাদন-ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহাও তাঁহার ধারণার অতীত ছিল।

৩। ম্যালথাস্ তাঁহার মতবাদে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও খাদ্য-বৃদ্ধির যে গাণিতিক তুলনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রমাত্মক। জনসংখ্যা বা খাদ্যদ্রব্য কোন গাণিতিক নিয়ম অনুসারে বর্ধিত হয় না।

৪। ম্যালথাসের মতবাদ সম্পর্কে আরও একটি সমালোচনা করা যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার ধারণা নির্ভুল ছিল না। মানুষের প্রজনন-ইচ্ছা অত্যধিক হইলেও সভ্যতা বৃদ্ধির সংগে সংগে এই ইচ্ছা প্রশমিত হয়। এতদ্ব্যতীত আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে জীবনধারণের মান উন্নত হইলে এই

উন্নতমান বজায় রাখিবার জন্য সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির সংখ্যা হ্রাস পায়। সুতরাং ম্যালথাসের মতবাদ শিক্ষিত জনসমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

৫। উনবিংশ শতাব্দী হইতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত ম্যালথাসের স্বদেশ ইংলণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে তাঁহার মতবাদের অসারতা সপ্রমাণিত হয়। এই সময় তাঁহার স্বদেশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয় ও খাদ্য-উৎপাদন হ্রাস পায়। তৎসত্ত্বেও শিল্পজাতদ্রব্য বিনিময় দ্বারা ইংলণ্ড বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিয়া তাহার জীবনধারণের উন্নতমান অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, জনসংখ্যা দেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে না। এইজন্য সেলিগ্‌ম্যান্ বলিয়াছেন যে, প্রকৃত সমস্যা শুধু দেশের জনসংখ্যাধিক্যে আরোপ করা চলে না—এই সমস্যা উৎপাদনের উৎকর্ষ ও বণ্টন-ব্যবস্থার সুবিচারের উপর নির্ভর করে।

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ ক্ষুধা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মানুষ হস্তপদাদিসংযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষি ও শিল্পে শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়। শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে বৃহত্তর জনসংখ্যা উন্নতমানের জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই আতংকিত হইবার কোন সংগত কারণ নাই।

সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব—The Optimum Theory of Population.

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি নূতন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এ মতবাদটি সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা নামে পরিচিত। ডাঃ ক্যানান্ এই মতবাদটি প্রচার করেন এবং কার্ সণ্ডারস্ ইহার নামকরণ করেন। ম্যালথাসের মতবাদের সহিত এই মতবাদের প্রধান পার্থক্য হইল যে, এই মতবাদ দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া দেশের সমগ্র উৎপাদন-দক্ষতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই মত অনুসারে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার যে সম্পর্ক তদপেক্ষা দেশের

মোট উৎপাদিত ধনের পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার অধিক সম্পর্ক বর্তমান। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক দেশই তাহার বর্তমান উৎপাদন-দক্ষতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ভরণপোষণ করিতে পারে। উৎপাদন-দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকিলে সেই দেশের সেই জনসংখ্যাকে সর্বাধিক কাম্য সংখ্যা বলা যাইতে পারে, যে সংখ্যা হইলে জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। বর্তমান উৎপাদন-দক্ষতার কোন পরিবর্তন না হইয়া যদি শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায় এবং বলা যায় যে, সে দেশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চাপবৃদ্ধির প্রতিকার হইল সংখ্যা হ্রাস করা। অপর পক্ষে উৎপাদন-দক্ষতার কোন পরিবর্তন না হইয়া শুধু যদি জনসংখ্যা হ্রাস পায়, সে ক্ষেত্রেও জন প্রতি আয় হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থা সে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যার স্বল্পতা বা অভাব সূচিত করে এবং ইহার প্রতিকার হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। সুতরাং একটি দেশে দুই প্রকারের সংখ্যা-সমস্যা দেখা দিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বাধিক-কাম্য সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে—ইহা উৎপাদন-দক্ষতার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং উৎপাদন-দক্ষতার পরিবর্তনের সহিত এই কাম্য সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংখ্যা উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে না—ইহা সর্ববিধ উৎপাদন-ব্যবস্থার (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি) উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, এই কাম্য সংখ্যা শুধুমাত্র দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নহে—ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের সহিতও এই সংখ্যার সম্পর্ক আছে। চীন দেশে গৃহযুদ্ধের ফলে ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্যসম্পর্ক ব্যাহত হইলে ভারতের জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া জন প্রতি আয় হ্রাস পাইতে পারে।

একটি দেশে সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা হইলে, সে দেশে জীবনধারণের মান উন্নততর হয় এবং সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রচলিত অবস্থায় সে দেশের জীবনযাত্রার মান সর্বাধিক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান শুধু সর্বাধিক উন্নত বলিয়া তৃপ্ত হইলে চলিবে না—সমস্যা হইল কি প্রকারে জীবন-যাত্রার এই উন্নতমান রক্ষা করা যায়। জীবনযাত্রার এই উন্নত মান রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল যে, পুত্রকন্যাগণ যতদিন পর্যন্ত পিতার মত

কর্মদক্ষ না হন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা যেন বিবাহ করিয়া সন্তান-সন্ততির পিতা না হন।

ম্যালথাস্-প্রদত্ত সংখ্যা-তত্ত্ব ও সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের পার্থক্য—Distinction between Malthusian Theory and the Optimum Theory of Population.

জনসংখ্যা-সম্পর্কিত উপরি-উক্ত তুইটি মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে উহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

১। দেশাভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণের উপরই ম্যালথাস্ সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব অনুসারে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যার বৃদ্ধির কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নাই। এই মত অনুসারে বলা হয় যে, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই দ্রব্যগুলির বিনিময় দ্বারা অন্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানী দ্বারা দেশের লোকের জীবিকার সংস্থান করা যাইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনে প্রয়োজন অপেক্ষা কম খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হইলেও সে দেশ শিল্পজাত দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ভিন্ন দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

২। ম্যালথাসের মতে দেশের জনসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত কিনা তাহা বিচার করিবার একমাত্র মাপকাঠি হইল খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত হইলে সে দেশে জনসংখ্যার আধিক্য হইয়াছে বলা যায় না, আবার জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা ঘটিলে সে দেশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। পক্ষান্তরে, কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের ভিত্তি হইল মাথাপিছু আয়। এই মাথাপিছু আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার আধিক্য বা অনাধিক্য বিচার করা হয়।

৩। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই আতংকের কারণ ঘটে। কিন্তু কাম্য-সংখ্যাতত্ত্ব জনসংখ্যার বৃদ্ধিমাত্রকেই আতংকের কারণ বলিয়া গণ্য করে না। এই মত অনুসারে বলা যায় যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্বারা যদি দেশের

অর্থনৈতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়া উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্বারা দেশ অধিকতর লাভবান হয়।

৪। ম্যালথাসের মতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকালমৃত্যু প্রভৃতি হইল দেশে সংখ্যাধিক্যের লক্ষণ। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, দেশে যে জনসংখ্যা আছে তাহা কমাইলে মাথাপিছু আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেশে সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। সুতরাং ম্যালথাস্-প্রদত্ত লক্ষণগুলির দ্বারা সংখ্যাধিক্যের পরিমাপ সম্ভব নহে।

৫। ম্যালথাস্ শুধু খাদ্যদ্রব্য-উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যার তুলনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, দেশের জনসংখ্যা পর্যাপ্তাতিরিক্ত কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সমগ্র সম্পদের সহিত (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যজাত, খনিজ প্রভৃতি) জনসংখ্যার তুলনা না করিলে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ইংলণ্ডে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন না হইলেও দেশের অন্যবিধ সম্পদ জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রচুর নহে বলিয়া সে দেশে জীবনযাত্রার মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

৬। ম্যালথাস্ তাঁহার সংখ্যাতত্ত্ব প্রচার দ্বারা মানবজাতির মনে যে ত্রাস ও নিরাশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের সমর্থকগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার দ্বারা মানবজাতির মন হইতে ম্যালথুসীয় নৈরাশ্যবাদ দূরীভূত করিয়া এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কাম্য সংখ্যাতত্ত্বের মূল কথা হইল যে, মানুষ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শিল্প-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। সুতরাং দারিদ্র্য দূর করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন মানুষের সাধ্যাতীত নহে।

নীট প্রজনন হার—Net Reproduction Rate.

জন্ম ও মৃত্যুহারের পার্থক্যের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার নির্ধারণ করা হয় তাহা সব সময়ে সংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক পরিমাপক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ১৯৪০ সালে ফরাসীদেশ ও ইংলণ্ডের জন্মহার ও মৃত্যু-হারের পার্থক্য ছিল যথাক্রমে হাজারকরা ২ ও ৫ অর্থাৎ উভয় দেশেই মৃত্যুহার

অপেক্ষা জন্মহার বেশী ছিল। ইহা দ্বারা উভয় দেশেই সংখ্যা বৃদ্ধি সূচিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ এই উভয় দেশেই জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছিল। সুতরাং জন্মহার ও মৃত্যুহার তুলনা করিয়া জনসংখ্যা নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি নির্ভুল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই কারণে কুৎজিনস্‌কি একটি অভিনব প্রণালীতে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কুৎজিনস্‌কি বলেন, সমাজে একমাত্র স্ত্রীলোকগণই সন্তান উৎপাদনক্ষম। সুতরাং জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, প্রজননক্ষম স্ত্রীলোকের অনুপাত বর্তমানে কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা স্থির করা। জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে ১০০০টি স্ত্রী-শিশু লইয়া হিসাব আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত সন্তানের জন্ম দেয়। এখন লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই ১০০০টি স্ত্রী-শিশুর মধ্যে কতজন এই প্রজননের বয়স অর্থাৎ ১৫-৪৫ অতিক্রম করে এবং ইহারা কতজন স্ত্রী-সন্তানের জন্ম দেন। যদি ১০০০ জনই ১৫-৪৫ বৎসর অতিক্রম করিবার মধ্যে নূতন ১০০০টি স্ত্রী-শিশুর মাতা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জনসংখ্যা অপরিবর্তিত আছে। যদি এই ১০০০ জন ৭০০ স্ত্রী শিশুর জন্ম দেয় তাহা হইলে জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে বলিতে হইবে অর্থাৎ নীট প্রজনন হার হইবে ·৭। অপরপক্ষে যদি এই ১০০০ জন মাতা ১০০০ জনেরও অধিক, যথা, ১৫০০ জন ভবিষ্যৎ মাতার জন্মদান করিয়াছেন তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে অর্থাৎ নীট প্রজননের হার হইবে ১·৫।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকগণ যে হারে সন্তানবতী হইতে পারেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যতঃ সে হারে সন্তান প্রসব করেন না। সুতরাং সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা ও সন্তানবতী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সাধারণতঃ সে হারে বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং নীট প্রজনন হার অনুসারে ম্যালথাসের মতবাদ সমর্থিত হয় না।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা—Efficiency of Labour.

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমকেই

সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। ভূমি, মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলিকে শ্রমসাহায্যে উৎপাদনে কার্যকরী করা হয়। শ্রম-নিরপেক্ষভাবে ইহাদের নিজস্ব কোন উৎপাদন-শক্তি নাই। সুতরাং শ্রমিকের দক্ষতার উপরই যে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য শুধু শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য হইলেই যথেষ্ট নহে, প্রত্যেক শ্রমিককে দক্ষ করিয়া তুলিতে পারিলে উৎপাদন-কার্যে উৎকর্ষ লাভ করা সহজসাধ্য হয়।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা আংশিকভাবে শ্রমিকের নিজের উপর নির্ভর করে এবং আংশিকভাবে ইহা ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে।

১। দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জলবায়ু প্রভৃতি দ্বারা বহুল পরিমাণে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা প্রভাবিত হয়। শীতপ্রধান দেশের লোক সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমক্ষম হয়, অপর পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী দীর্ঘ সময়-ব্যাপী পরিশ্রম করিতে পারে না। কর্মদক্ষতার জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া সহায়ক।

২। জাতিগত বৈশিষ্ট্যও শ্রমিকের দক্ষতার পরিচায়ক। পাঞ্জাবী বা পাঠান দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ এবং অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য হইল তাহারা আরামপ্রিয় এবং কায়িক পরিশ্রমবিমুখ।

৩। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, শীতাতপ নিবারণের জন্য যথাযোগ্য পরিধেয় ও আলো-হাওয়াযুক্ত আবাসস্থল দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

৪। দক্ষতা বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিমত্তা-বৃদ্ধির জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষা দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক বিকাশ লাভ করে ও তাহার বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি করে।

৫। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীতও শ্রমিকের পক্ষে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত কোন শ্রমিকই দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না।

৬। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকের দক্ষতা তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। দেহ ও মনের দিক দিয়া সমর্থ ও কারিগরি

শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সুদক্ষ শ্রমিক বলিয়া পরিগণিত হয় না, যদি তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের অভাব হয়। কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা হইল শ্রমিকের প্রধান গুণ।

৭। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ও একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন এই তিনটি বিষয় শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইজন্য সরকারী কার্যে যোগদান করিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হয়। একই কাজ পুনঃপুনঃ করিলে লোকের কাজের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে। এই একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য আমোদ-প্রমোদ, অবকাশ ও ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৮। শ্রমিকদের কত সময় কাজ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত থাকা আবশ্যক। অত্যধিক পরিশ্রম কর্মদক্ষতার হানি করে। এইজন্য সভ্য দেশে আইন করিয়া কোন শ্রমিককেই সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অধিক কার্যে নিযুক্ত রাখা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

৯। উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও সময়মত পারিশ্রমিক প্রদান শ্রমিককে কর্মপটু করে। নিয়মিতরূপে উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইলে প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাহার কর্তব্য পালন করিতে উৎসুক হয়।

১০। শ্রমিক যে পরিবেশে কাজ করে, সে পরিবেশও স্বাস্থ্যকর ও সুরুচিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকের কর্মস্থল আলো-হাওয়াযুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব হইল মালিকের কিন্তু এই পরিবেশ রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইল শ্রমিকের। এতদ্ব্যতীত মালিক ভাল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী যোগান দ্বারা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার কাজ করিবার ইচ্ছা (will to work) ও কাজ করিবার সামর্থ্যের (power to work) উপর নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমিকের মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিলেই তাহাকে পূর্ণ কর্মদক্ষ শ্রমিকরূপে পাওয়া যায়।

শ্রমিকের গতিশীলতা—Mobility of Labour.

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা তাহার গতিশীলতা বা স্থানান্তর গমন-যোগ্যতার উপর

অনেকাংশে নির্ভর করে। সকল স্থানে যেরূপ বিভিন্ন যোগ্যতার শ্রমিক পাওয়া যায় না, তদ্রূপ বিভিন্ন বৃত্তিতেও বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হয়। সুতরাং একস্থান হইতে অন্যস্থানে বা একবৃত্তি হইতে অন্যবৃত্তিতে শ্রমিকের গতিশীলতা না থাকিলে উৎপাদন-কার্য ব্যাহত হইতে পারে। শ্রমিকের এই গতিশীলতার প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ভৌগোলিক গতিশীলতা—**Geographical mobility.** এই জাতীয় গতিশীলতার অর্থ হইল যে, শ্রমিকের এক দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমন বা দেশান্তরে গমন। বিহার হইতে বাংলা দেশে আগমন কিম্বা দক্ষিণ-আফ্রিকা বা সিংহলে গমনকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলা হয়।

২। বৃত্তিমূলক গতিশীলতা—**Horizontal mobility.** এক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অনুরূপ অন্য বৃত্তি অবলম্বন করাকে বৃত্তিমূলক গতিশীলতা বলা যাইতে পারে। কর্মকার যখন স্বর্ণকারের বৃত্তি অবলম্বন করে তখন তাহাকে বৃত্তিমূলক গতিশীলতা বলা যাইতে পারে।

৩। স্তরগত গতিশীলতা—**Vertical mobility.** যখন কোন শ্রমিক কোন বৃত্তির নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তখন এই গতিশীলতাকে স্তরগত গতিশীলতা বলা যায়। যখন কোন কেরাণী তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপটুতার জন্য ব্যবস্থাপকের পদে উন্নীত হয় তখন তাহা স্তরগত গতিশীলতা আখ্যা পায়।

৪। শিল্পগত গতিশীলতা—**Mobility between industries.** এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর গতিশীলতা দেখা যায়। ইহা সাধারণ গতিশীলতা এবং এই গতিশীলতা শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পরিমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কাপড়ের কলে নিযুক্ত একজন কেরাণী যখন রেলের কেরাণী হয় তখন তাহাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলা চলে।

শ্রমিকের গতিশীলতার অনেক সুবিধা আছে। যদি কোন কারণে কোন শিল্পে বা ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় তাহা হইলে এই গতিশীলতার জন্য শ্রমিক অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। স্তরগত গতিশীলতা শ্রমিকের মনে উচ্চাভিলাষ সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বৃত্তির নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে সাহায্য করে এবং এই গতিশীলতাই শ্রমিককে অধিকতর কর্মপটু করে। অধুনা যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধনের ফলে ও বিভিন্ন

স্থানের শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ পাইবার সুবিধার জন্য শ্রমিকের ভৌগোলিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের শ্রমিক আজ কর্মান্বেষণে দূর দেশে গমন করিতেছে।

গতিশীলতার প্রধান অন্তরায় হইল গৃহ-কাতর প্রকৃতি। শ্রমিকেরা স্বজন ও স্বদেশ ছাড়িয়া অপরিচিত পরিবেশে যাইতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ, জাতি-ভেদ প্রথাও গতিশীলতার পরিপন্থী। এইজন্য শ্রমিকেরা সাধারণতঃ তাহাদের জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে। তৃতীয়তঃ, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত নানাবিধ আচার ও প্রথা এই গতিশীলতাকে ব্যাহত করে। এই কারণেই গ্রামাঞ্চল হইতে লোকে সহরাঞ্চলে আসিতে দ্বিধা বোধ করে। পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষার অভাব মানুষকে সংকীর্ণমনা করিয়া তুলে। শ্রমিকের যদি সাধারণ জ্ঞান, কিছু কারিগরি শিক্ষা ও কর্মপটুতা না থাকে, তাহা হইলে স্থানান্তরে গমন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন—মূলধন

(Production—Capital)

সংজ্ঞা-নির্দেশ—Definition.

ধনের বা সম্পদের যে অংশ উৎপাদন-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ সেই অংশকে মূলধন বলা হয়। মূলধন বলিলে প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্য ব্যতীত সেই সমস্ত উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী বুঝায়, যেগুলি মানুষ পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। জনৈক ধনবিজ্ঞানী এইজন্য মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' (Produced means of production) আখ্যা দিয়াছেন। এই অর্থে মূলধন বলিতে গৃহ, কারখানা, কল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বুঝায়।

উপরি-উক্ত ভাবে মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশে অনেকে আপত্তি করেন। আপত্তির কারণ হইল যে, উপরি-উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে ধন ও মূলধনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হইল যে, ধন উৎপাদিত হইলেই ভোগ করা হয় এবং যে ধন ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না তাহাই মূলধন। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই পার্থক্য ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। চিকিৎসক তাঁহার মোটর-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া রোগী দেখিলে চিকিৎসকের মোটরগাড়ীকে মূলধন বলা হয়, কেননা মোটরগাড়ী তাঁহাকে অধিক উপার্জনে সাহায্য করে। অপরপক্ষে চিকিৎসক যদি পরমুহূর্তে অবসর-বিনোদনের জন্য মোটরে ভ্রমণ করেন তাহা হইলে তাঁহার গাড়ী ধন বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়। আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও মূলধনের এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যবসায়ীর দিক দিয়া দেখিতে গেলে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা তাহার পক্ষে যেরূপ মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থও সেইরূপ মূলধন।

মূলধন সংজ্ঞার এই ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে মার্শাল মূলধনকে আয়ের উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আয় যদি মূলধনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য

বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই আয় কি শুধু আর্থিক আয়, না দ্রব্যজাত বা কর্মজাত আয় অর্থাৎ যাহা হইতে একটা আর্থিক আয়ের পরিবর্তে উপযোগিতা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে আবাসগৃহে আমরা বাস করি তাহা হইতে কোন আর্থিক আয় পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু বাসগৃহের অভাব পূরণ করিয়া সেই আবাসগৃহ উপযোগিতা সৃষ্টি করে। সুতরাং অর্থরূপে না হইলেও উপযোগিতারূপে আবাসগৃহকে আয়প্রদ বলা যায়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল ধনই আয়প্রদ এবং সেই অর্থে সকল ধনই মূলধন। একমাত্র পার্থক্য হইল যে, কোনটি আর্থিক আয় সৃষ্টি করে, কোনটি আবার প্রত্যক্ষ উপযোগিতা সৃষ্টি করে।

কেয়ার্ণক্রস্-প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition by Cairncross.

ধন-সংজ্ঞার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কেয়ার্ণক্রস্ ধন-সংজ্ঞাকে তিন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা, সামগ্রী, অর্থ ও ধনের স্বত্ব। সামগ্রী বলিতে কেয়ার্ণক্রস্ **বস্তুগত মূলধনের** (**Concrete Capital**) কথা বলিয়াছেন। বাস্তব মূলধন আবার উৎপাদকের ব্যবহার্য মূলধন ও ভোগকারীর ব্যবহার্য মূলধন হইতে পারে। উৎপাদকের বাস্তব মূলধন হইল বাড়ী, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি যাহা হইতে উৎপাদক অর্থ উপার্জন করিতে পারে। আবাস-গৃহ, আসবাবপত্র প্রভৃতি ভোগকারীর বাস্তব মূলধনের পর্যায়ভুক্ত। এইগুলি হইতে ভোগকারী আর্থিক আয় পায় না—কিন্তু উপযোগিতা পায়।

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব মূলধনের পরিমাণকে **অর্থমূল্য দ্বারা প্রকাশ** করা হয়। যদি কোন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার মূলধন কত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বলিবে তাহার মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। অর্থ দ্বারাই বিত্তের পরিমাপ এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অর্থকেই মূলধনের পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থকেই মূলধন বলা যায় না। কারণ, অর্থ দ্বারা উৎপাদনের উপাদান বা ভোগ্য সামগ্রী আহরণ করা যায় মাত্র—অর্থ প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎপাদনকার্যে সাহায্য করিতে পারে না বা ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কেয়ার্ণক্রসের মতে **ধনের স্বত্বকেও** (**Title to wealth**)

মূলধন বলা যাইতে পারে। ধনের এই স্বত্বগুলি, যথা, ন্যাশনাল্ সেভিংস সার্টিফিকেট, শেয়ার প্রভৃতির স্বত্বাধিকারীকে একটি আয় প্রদান করে।

মূলধনের প্রকৃতি—Nature of Capital.

১। মূলধন সম্পূর্ণরূপে মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উপাদানও নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দানও নহে। মানুষ প্রকৃতির দানের উপর শ্রম বিনিয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে, কিন্তু এই মূলধন আপাতঃ কোন অভাবপূরণ না করিয়া অভাবপূরণের সামগ্রী-উৎপাদনের সহায়তা করে এবং শেষ পর্যন্ত মূলধন-সাহায্যে উৎপাদিত সামগ্রী দ্বারা আমাদের অভাব পূরণ হয়। সুতরাং বর্তমানে যাহাকে মূলধন বলা হইতেছে, তাহা প্রকৃতির দান ও মানুষের অতীতের পরিশ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। মূলধনের একটা চাহিদা আছে এবং এই চাহিদার কারণ হইল মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা (Productivity)। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বিনা-মূলধনে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক, এবং সেইজন্য মূলধনের একটা চাহিদা আছে।

৩। মূলধন সঞ্চয়ের ফল (Capital is the result of saving)। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত সম্পদের উপর শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে। এই মূলধন প্রত্যক্ষভাবে ভোগ ব্যবহারে নিযুক্ত না হইয়া অতিরিক্ত উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে বা নিযুক্ত হইবার অপেক্ষায় থাকে। যে ধন সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাহা মূলধন নহে। যে ধন বর্তমানে ভোগ-ব্যবহার না করিয়া উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত হয় তাহাই হইল মূলধন। এইজন্য মূলধনকে সঞ্চয়ের ফল বলা হয়। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনকে ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন বলা যাইতে পারে।

৪। চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সরবরাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার (Prospective) উপর তদ্রূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। লোকে মূলধন হইতে একটা আয় পাইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে এবং সঞ্চয় না হইলে চাহিদা মিটিতে পারে না।

ভূমি ও মূলধনের পার্থক্য—Distinction between Land and Capital.

ধনবিজ্ঞানে ভূমি ও মূলধন উৎপাদনের দুইটি পৃথক উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ১। ভূমি প্রকৃতির দান, মনুষ্যসৃষ্ট নহে, কিন্তু মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট। প্রকৃতিদত্ত দ্রব্য হইতে মূলধনের সৃষ্টি হইলেও মানুষের শ্রম ব্যতীত মূলধন সৃষ্টি হইতে পারে না। ২। ভূমির আয়তন সীমাবদ্ধ—এই আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়, কিন্তু মূলধনের সরবরাহ অন্ততপক্ষে দীর্ঘমেয়াদী সময়ে বৃদ্ধি করা যায়। ৩। মূলধন পুনঃপুনঃ ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত বিনাশ পায়, কিন্তু ভূমির কোন বিনাশ নাই। ৪। মূলধন স্থানান্তরযোগ্য। মার্কিনদেশ হইতে মেশিন ও অর্থ ভারতে আমদানী করা যাইতে পারে কিন্তু ভারতের ভূমি মার্কিন দেশে স্থানান্তরিত করা যায় না। ৫। মূলধন হইতে যে আয় হয় অর্থাৎ সুদ একবিধ (uniform), কিন্তু ভূমি হইতে যে আয় হয় অর্থাৎ খাজনা তাহা সমান হয় না।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভূমি ও মূলধনের প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ে তুলনীয়। মানুষ মূলধনের মত নূতন ভূমি সৃষ্টি করিতে না পারিলেও তাহার পরিশ্রম দ্বারা ভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে। মূলধনের ন্যায় ভূমিও ক্ষয়িষ্ণু। ভূমির উপযোগিতা ভূমির আয়তন অপেক্ষা ইহার উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ফসল উৎপাদনের ফলে ভূমির উৎপাদন-শক্তি যে হ্রাস পায় ইহা অনস্বীকার্য।

অর্থকে কি মূলধন বলা যাইতে পারে ?—Is money Capital ?

অর্থ ও মূলধন কোনক্রমেই একার্থবোধক নহে। দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এ কথা সত্য নহে। ভারতে বর্তমানে অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেও মূলধনের তীব্র অভাব দেখা যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ধনের যে অংশ হইতে একটি আয় পাওয়া যায় তাহাকে মূলধন বলা যায়। যদি কোন ব্যক্তি তাহার সঞ্চিত অর্থ স্বল্প মেয়াদে বা দীর্ঘ মেয়াদে কোথাও বিনিয়োগ করে এবং এই বিনিয়োগ

হইতে একটা আয় পায়, তাহা হইলে সেই আয়প্রদ অর্থকে মূলধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থের একবার কোথায়ও বিনিয়োগ হইলে সেই অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ সে অর্থ দ্বারা কোন নগদ কারবার করা চলে না—সুতরাং তাহাকে আর অর্থ বলা যায় না। অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র। অর্থ দ্বারা উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্য-বস্তুর উপর অধিকার জন্মে এবং উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্যবস্তুর মূল্য• অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ব্যবসায়ীর ভাষায় অর্থ মূলধনের একার্থবোধক হইলেও, অর্থ মূলধন নহে।

কতিপয় উদাহরণ দ্বারা মূলধনের সংজ্ঞাকে আরও সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill of a business) মূলধন কি না? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যেহেতু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুনাম অতিরিক্ত আয় করিতে সাহায্য করে, সেই হেতু ব্যবসায়ের সুনাম ব্যবসায়ীর পক্ষে মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু সুনাম মূলধন হইলেও অবাস্তব মূলধন (Non-material)। একই কারণে বিশেষ অধিকারপত্রও (Patent Right) মূলধন পর্যায়ভুক্ত। এই অধিকার অর্জন করিতে হয় এবং ইহা আয়প্রদ। কিন্তু চল্‌তি অর্থকে (Money in circulation) মূলধন বলা যায় না, কারণ এই অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের মূলধন নহে। ইহা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। গায়কের দক্ষতা (Skill of a musician) গায়কের অন্তর্নিহিত গুণ (Internal quality)। ইহা অবাস্তব। গায়কের আয় করিতে সাহায্য করিলেও এই দক্ষতা মূলধন নহে। মার্শাল ইহাকে ব্যক্তিগত মূলধন (Personal capital) আখ্যা দিয়াছেন। ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ (Accumulated savings in the bank) ব্যক্তির দিক দিয়া মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যদি ঐ সঞ্চিত অর্থ হইতে একটা আয় অর্থাৎ সুদ পাওয়া যায়। সমাজের দিক দিয়াও ঐ অর্থকে মূলধন বলা যাইতে পারে যদি ব্যাংক ঐ অর্থ অধিকতর উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করে। সরকার যুদ্ধের খরচ (War loan) সংকুলান করিবার জন্য যে ঋণ-পত্র দ্বারা ধার করে, ব্যক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই ঋণ-পত্রকে মূলধন বলা যায়, কেন না ইহা হইতে ব্যক্তি সুদ পায়। কিন্তু সমাজের দিক দেখিতে গেলে ইহা মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

মূলধন ও সম্পদ—Capital and Wealth.

যখন মানুষের দ্বারা উৎপাদিত কোন দ্রব্য ভোগকার্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে সম্পদ বলা হয়, পক্ষান্তরে এই উৎপাদিত দ্রব্যটি যদি উৎপাদনের উপাদান হিসাবে পুনরায় উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে তাহাকে মূলধন বলা হয়। দ্রব্যটি উৎপাদিত হইলে যদি বর্তমান অভাবপূরণের জন্য তাহা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে দ্রব্যটি সম্পদ-পর্যায়ভুক্ত হয়, অপর পক্ষে উৎপাদিত দ্রব্যটিকে যদি আপাতঃ অভাব মোচনের জন্য নিয়োজিত না করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে নিয়োজিত করা হয় তাহা হইলে ঐ একই দ্রব্য মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উৎপন্ন ধান্য যদি চাউলে পরিবর্তিত করিয়া বর্তমানে খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই ধান্যকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু ঐ ধান্য যদি খাদ্যহিসাবে ব্যবহার না করিয়া অধিকতর উৎপাদন-উদ্দেশ্যে 'বীজ ধান' হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ইহা মূলধন বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং সম্পদ ও মূলধনের পার্থক্য কোনও দ্রব্যের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মূলধনকেই সম্পদ বলা চলে, কিন্তু উৎপাদিত সকল সম্পদ মূলধন নাও হইতে পারে। মার্শাল বলেন :—("We should speak of wealth when considering things as results of production, subjects of consumption and yielding pleasure of possession ; we should speak of capital when considering things as agents of production.")

মূলধন ও আয়—Capital and Income.

মূলধন হইল আয়প্রদ অর্থাৎ আয়ের উৎস। মূলধনের অধিকারী তাহার সঞ্চিত ও একত্রীভূত মূলধন হইতে নিয়মিত যে প্রতিদান পায়, তাহাকে আয় বলা হয়। সেভিংস ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হইল মূলধন, কিন্তু সঞ্চিত অর্থ হইতে বাৎসরিক যে সুদ পাওয়া যায় তাহা হইল আয়। উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে সঞ্চিত ও একত্রীভূত করিয়া রাখা হয় তাহা হইল মূলধন এবং এই মূলধন হইতে যে প্রতিদান সৃষ্টি হয় তাহা হইল আয়। সুতরাং মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়কে একটা স্রোতধারা (a flow of services

over a period of time) বলা যাইতে পারে; আর মূলধনকে একটি আয়প্রদ সঞ্চিত তহবিল (a stored-up facilities) বলা যাইতে পারে। মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয় সঞ্চিত হইয়া পুনরায় মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে। কেয়ার্ণক্রস্ বলেন মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয় ছাড়াও শ্রমও কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আয় হইতে পারে। ["It includes also the value of services (like the waiter's......) which are rendered by persons."]

মূলধনের শ্রেণী-বিভাগ—Classification of capital.

স্থায়ী মূলধন ও চল্‌তি মূলধন—Fixed capital and Circulating capital.

মেশিন, রেলওয়ে ইঞ্জিন, গৃহ প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। ইহারা একবারমাত্র ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। কিন্তু চল্‌তি মূলধন দ্বারা একবারের অধিক উৎপাদন করা যায় না। ইহারা একবার ব্যবহৃত হইলেই পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। তুলা মেশিনে সুতার আকারে পরিবর্তিত হয় এবং একই তুলা উৎপাদন-কার্যে একাধিক বার ব্যবহার করা যায় না। উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় কাঁচামাল এই পর্যায়ভুক্ত। বোল্‌ডিংএর মতে স্থায়ী মূলধন ও চল্‌তি মূলধনের পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে। কারণ, সময়ের ব্যবধানে যাহা স্থায়ী মূলধন তাহা চল্‌তি মূলধনে পরিণত হইতে পারে এবং চল্‌তি স্থায়িরূপে গণ্য হইতে পারে। এক শত মাইল ভ্রমণকালে মোটরে ব্যবহৃত পেট্রোল চল্‌তি মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয় ও গাড়ীর চাকার রবার স্থায়ী মূলধন বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু অতি দীর্ঘ ভ্রমণের সময় পেট্রোল ও চাকার রবার উভয়কেই চল্‌তি মূলধন বলা যায়—কেন না উভয়েই একবার ব্যবহারে শেষ হয়। অপর পক্ষে যাহা বিক্রেতার নিকট চল্‌তি মূলধন তাহা ক্রেতার নিকট স্থায়ী মূলধন হইতে পারে। সিংগার কোম্পানীর পক্ষে একটি সেলাইয়ের কল চল্‌তি মূলধন—ইহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লাভ করে, কিন্তু ক্রেতার নিকট ইহা স্থায়ী মূলধন—ক্রেতা ইহা বার বার ব্যবহার করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইল অর্থকে যদি মূলধন বলা যায় তাহা হইলে অর্থ কোন্ পর্যায়ে পড়ে—ইহা স্থায়ী মূলধন না চল্‌তি মূলধন। দুই দিক দিয়া এ প্রশ্নের সমাধান

করা যায়। অর্থ যদি মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে চল্‌তি মূলধন বলা সমীচীন। একটি মুদ্রা দ্বারা একাধিক ক্রয়কার্য বা আদান-প্রদান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। মুদ্রাটি একবার ব্যবহৃত হইলে তাহা কোন উৎপাদন বা ভোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয়-বার আর সেই মুদ্রাটি ব্যবহার করা যায় না। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে এক মাত্রা অর্থ এক মাত্রা কাঁচামালের সমান—সুতরাং চল্‌তি মূলধন। কিন্তু সমষ্টি বা সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঐ এক মাত্রা অর্থ অবিকৃত থাকে —ইহার অর্থরূপের কোন পরিবর্তন হয় না—শুধু হস্তান্তরিত হয় মাত্র এবং ঐ এক মাত্রা অর্থ মেশিনের ন্যায় বার বার আদান-প্রদানকার্যে সাহায্য করে—সুতরাং ইহাকে স্থায়ী মূলধন বলা যায়।

নিমজ্জ ও ভাসমান মূলধন—Sunk and Floating capital.

যে মূলধন একটি নির্দিষ্ট বা বিশেষ উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যাহা অন্য কোন বিকল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়, তাহাকে নিমজ্জ মূলধন বলা হয়। যে মূলধন একটি কাপড়ের কলে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা আর লৌহশিল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়।

যখন একই মূলধন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়, তখন তাহাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়। একই পরিমাণ অর্থ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহার করা যায়। কাঁচামালগুলিও এই পর্যায়ভুক্ত, কেন না তাহারা বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে।

মূলধনের কার্যকারিতা—Functions of capital.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মূলধন উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এই মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রথমতঃ, মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মূলধন কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, যাহারা উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত থাকে, মূলধন সেই সমস্ত কর্মীকে ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করিয়া পরোক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। চতুর্থতঃ, উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন প্রয়োগের ফলে শ্রমবিভাগ সম্ভব হইয়াছে। উৎপাদনে শ্রমবিভাগ নীতি প্রযুক্ত

হওয়ার ফলে শ্রমিক তাহার গুণ ও যোগ্যতানুসারে কাজ করিতে পারে। সুতরাং শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হওয়ার ফলে একদিকে শ্রমিকের শ্রমভার লাঘব হইয়াছে, অপরদিকে শ্রমবিভাগ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই ব্যবস্থায় জাতীয় আয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের সকল শ্রেণীই লাভবান হয়।

বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী পদ্ধতি। কাঁচামাল সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-ব্যাপার কতকগুলি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়। সুতরাং ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। এই জন্য ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের কার্য সময়সাপেক্ষ হইলেও প্রতিটি স্তরের উৎপাদন-কার্য দ্রুত হয়। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন-খরচা হ্রাস হয়। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন সময়সাপেক্ষ, কারণ ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতির শেষ স্তর। দ্রব্য উৎপাদিত হইলে তাহার বিক্রয়লব্ধ মূল্য হইতে বিভিন্ন সহযোগী উপাদানের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকদের সঞ্চিত অর্থ না থাকার কারণ তাহারা এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে পারে না। তাই মালিকগণ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার পূর্বে শ্রমিকগণকে তাহাদের দৈনিক মজুরি প্রদান করেন। ইহার ফলে উৎপাদন ও ভোগ যুগপৎ চলিতে থাকে।

মূলধন বৃদ্ধির কারণ—Conditions for Capital-formation.

দেশের মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর। একটা অবস্থা হইল মানসিক (subjective) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি (will to save), অপরটি হইল বাহ্যিক (objective) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতা (power to save)।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা—Will to Save.

মানুষের দূরদৃষ্টি, স্বজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এবং সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সঞ্চয় করে। সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষা,

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর জীবনধারণের জন্যও লোকে সঞ্চয় করে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই দূরদৃষ্টি ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে বলা যায় যে, সঞ্চয়ের এই প্রবৃত্তি মানুষের একটা জন্মগত সংস্কার। অসভ্য মানুষও কোন একটা কিছু পাইলেই তাহার কিয়দংশ আগামী কালের জন্য রাখিয়া দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাও মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি করে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা—Power to Save.

মূলধনের বৃদ্ধি শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—সংগে সংগে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাকা চাই। এজন্য ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে কোন্ উদ্বৃত্ত আয় নাই, সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, তাহার প্রধান কারণ হইল অধিকাংশ লোকেরই সঞ্চয় করিবার মত কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তার অবস্থার সৃষ্টি না হইলে লোকে সঞ্চয় করিতে সাহসী হয় না। দস্যু-তস্কর বা অত্যাচারী সরকারের প্রাবল্য থাকিলে লোকে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে না। সঞ্চয়ের নিমিত্ত দেশে সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য দেশে বহু ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, অংশীদারী কারবার প্রভৃতি থাকা চাই। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। সুদের হারের উপরও সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। সুদের হার যদি অধিক হয় তাহা হইলে লোকে অধিক লাভের আশায় সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হইবে ও সুদের হার হ্রাস পাইলে কম সঞ্চয় করিবে। কিন্তু সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ক কেইনস্ প্রভৃতি আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, সঞ্চিত অর্থ যদি যথাযথভাবে লাভজনক কার্যে বিনিয়োগ না হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র সঞ্চয় দ্বারা সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বলা যায় যে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সর্বক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। কারণ অল্প মূলধন বিনিযোগ করিয়া উচ্চ হারে সুদের জন্য অধিক মূলধন পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একটি দেশে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিও সঞ্চয়ের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ ও আচারনিষ্ঠ। তাহাদের নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এত অধিক

ব্যয় করিতে হয় যে, সাধারণ লোকের সামান্য আয় হইতে সঞ্চয়যোগ্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না।

মূলধন সংগঠন—Capital Formation.

উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হিসাবে মূলধনের গুরুত্ব সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে মূলধনের প্রাচুর্য দেখা যায়। বহু পূর্ব হইতেই এই সমস্ত দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার ফলে ইহারা অনুন্নত দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই সমস্ত দেশ হইতেও ছলে-বলে-কৌশলে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং এই দেশগুলির জাতীয় আয়-পরিমাণ, জনপ্রতি আয়, সঞ্চয় পরিমাণ অধিক, ফলে মূলধন পরিমাণও অধিক।

মূলধন সংগঠন সাধারণতঃ তিনস্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ, ব্যয় সংকোচ সাহায্যে সঞ্চয় সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থকে যথাযথভাবে আয়ের উৎসরূপে বিনিয়োগ করা এবং তৃতীয়তঃ এই নিযুক্ত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি) রূপান্তরিত করা।

সঞ্চয়ের এই তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মূলধন গঠনের প্রাথমিক স্তর হইল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্য ভোগ নিবৃত্তির প্রয়োজন। এজন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা চাই। অনুন্নত দেশগুলিতে লোকের মাথাপিছু আয় এত কম যে তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর হইল সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগ। এজন্যও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্ত আবশ্যক অনুন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। ব্যাংক, বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবই হইল বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া অনুন্নত দেশের লোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে সাধারণতঃ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় না। তৃতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মূলধন দ্রব্য ও উৎপাদনের সহায়ক ভারী ও মূল শিল্প-গুলির প্রসার প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাবের ফলে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না।

নবম অধ্যায়

উৎপাদন—ব্যবস্থাপনা

(Production—Organisation)

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব—Importance of Organisation

অধুনা নানা কারণে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গুরুত্ব-বৃদ্ধির কারণ হইল যে, চাহিদার প্রসার ও বৈচিত্র্যের জন্য বড় বহরে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। অধিক পরিমাণে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যে বিনিয়োগ করিবার দক্ষতার উপর উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে। এই জন্যই বর্তমানে উৎপাদন-কার্যে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। ভূমি, মূলধন ও শ্রমের মধ্যে এরূপভাবে সংযোগ সাধন করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ সর্বাধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় চাহিদার অবর্তমানে ভবিষ্যতে চাহিদার সৃষ্টি হইতে পারে এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদন-কার্য শুরু হয়। কোন কারণে যদি চাহিদা হ্রাস পায় বা আদৌ নূতন চাহিদার সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে এই ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করিবার ভার পড়ে ব্যবস্থাপকের উপর। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঝুঁকি অবশ্যম্ভাবী। আকস্মিক কারণে বা অদৃষ্টপূর্ব কারণে অথবা চাহিদার পরিবর্তনে বা উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনে এই ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কয়েক জাতীয় ঝুঁকি বীমা করিতে পারা গেলেও এমন অনেক ঝুঁকি আছে যাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার নাই। আধুনিক যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার এই অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি শ্রমিক, জমির মালিক বা মূলধন-সরবরাহকারী গ্রহণ করে না। এই ঝুঁকি বহন করিতে হয় ব্যবস্থাপকের। এইজন্যই উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সমধিক।

ব্যবস্থাপকের কার্য—Functions of the Entrepreneur

ব্যবস্থাপকের কার্য দুইভাগে ভাগ করা যায়—যথা, ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে সংমিশ্রণ করা (Co-ordination) এবং ঝুঁকি বহন করা (Risk-taking)।

উৎপাদন-কার্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাপক কর্তৃক পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপক স্বয়ং তাঁহার ব্যবসায়-স্থান পছন্দ করিয়া উৎপাদনের সহায়ক গৃহাদি নির্মাণ করেন। তিনিই মূলধন সংগ্রহ করিয়া যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী ক্রয় করেন। তিনিই শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং শ্রমিকদের কাজ ভাগ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রমবিভাগ নীতির উপর উৎপাদনের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। উৎপাদন-কার্য সমাপ্ত হইলে উৎপাদিত দ্রব্য কোন্ বাজারে বিক্রয় করিলে সর্বাধিক লাভ হইবে তাহা তিনি স্থির করেন। উপযুক্ত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিতে হয়। দ্রব্যজাত বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহাকেই অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে বণ্টন করিতে হয়। জমি বা বাড়ীর খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি লাভ-লোকসান-নির্বিচারে প্রদান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল তাঁহার মুনাফা। তাঁহার মুনাফার পরিমাণ অধিক হইতে পারে, স্বল্প হইতে পারে অথবা একেবারেই কিছু না হইতে পারে।

ব্যবস্থাপকের মুনাফার অনিশ্চয়তার কারণ হইল যে, একাকী তাঁহাকেই সমস্ত ঝুঁকি বহন করিতে হয়। যদি তাঁহার পূর্ব অনুমান বা সিদ্ধান্ত ভুল হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি বহন করিতে হয়। লোকের রুচি সচরাচর পরিবর্তিত হইতেছে। প্রতিযোগিতার তীব্রতাও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যবস্থাপক যদি সমস্ত দিক বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য ব্যবস্থাপকের দূরদৃষ্টি, অনুপ্রেরণা ও মানব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মধ্যে একজন জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই কারণ তাঁহাকেই তাঁহার অধস্তন কর্মী নিয়োগ করিতে হয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তাহাদের কার্যে আসক্তি জন্মে। ব্যবস্থাপক শুধু ঝুঁকি বহন করিলেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাকে বুদ্ধিমত্তা,

সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা ঝুঁকি অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের সংখ্যা অতি স্বল্প। যে গুণগুলির সমাবেশে এইরূপ ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় তাহা একান্ত দুর্লভ। এইজন্য বলা হয় যে, উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা যায় না, তাঁহারা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠেন।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংগঠন—Froms of Business organisation.

উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,

এক-মালিকানা কারবার—The Single Entrepreneurship System.

এক-মালিকানা কারবারে কারবারের একজনমাত্র স্বত্বাধিকারী থাকে। এই স্বত্বাধিকারী নিজেই মূলধন যোগান দেয় ও প্রয়োজন-ক্ষেত্রে ধারও করিতে পারে। সে ঘর ভাড়া করিতে পারে ও প্রয়োজন হইলে একজন সহকারী নিযুক্ত করে। ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারও তাহার নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এক কথায় প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সংগঠনকার্য সে নিজেই পরিচালনা করে এবং ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান নিজেই বহন করে। এই ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক স্বয়ং শ্রমিক, মূলধনের মালিক ও ঝুঁকি-বহনকারীর স্থান অধিকার করে। কৃষিকার্যে ও খুচ্‌রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই জাতীয় কারবার পরিদৃষ্ট হয়।

এক-মালিকানা কারবারের সুবিধা—Advantages of Single Entrepreneurship System.

১। মূলধনের মালিকানা ও সংগঠনের কার্য একই হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে এই ব্যবস্থায় উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী জানে যে, ব্যবসায়ে লাভ হইলে তাহা তাহারই প্রাপ্য হইবে। সুতরাং সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিতে সচেষ্ট থাকে।

২। মালিক স্বয়ং প্রত্যেক ক্রেতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার রুচির পরিচর্যা করিতে পারে। বিক্রেতা ক্রেতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তাহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিলে ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

৩। নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপকের চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহার ফলে উৎপাদনে অপচয় হ্রাস পাইয়া মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থায় পুংখানুপুংখ হিসাব রাখিবারও প্রয়োজন হয় না।

৪। এই ধরণের ব্যবসায়ের আর একটি সুবিধা হইল যে, ইহা অতি সহজেই আরম্ভ করা যায় এবং অতি সহজেই গুটান যায়—কারণ একজন মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। এই জাতীয় কারবারের প্রধান অসুবিধা হইল মূলধনের স্বল্পতা। মূলধনের অভাবে কারবার প্রসার লাভ করিতে পারে না।

২। দ্বিতীয়তঃ, যতই কর্মদক্ষ হউক-না-কেন, একব্যক্তির পক্ষে উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থায় নানাবিধ অপচয় ঘটিতে পারে।

৩। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেশের সমগ্র চাহিদা সংকুলান করা অসম্ভব। বড় বহরের উৎপাদন ব্যতীত কোন দেশই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

এক-মালিকানা কারবারের ক্রটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অংশীদারী কারবারের সৃষ্টি হয়।

অংশীদারী কারবার—Partnership.

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া যখন কোন কারবার প্রতিষ্ঠা করে এবং সকলেই মূলধন জোগায় ও লাভ-লোকসান বহন করে, তখন তাহাকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। 'অংশীদারী কারবার' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারগণ সমান পরিমাণ মূলধন জোগান দেন এবং সমান পরিমাণ লাভ-লোকসান বহন করেন, আবার কোথাও বা অসমান-ভাবে মূলধন জোগান হয় এবং লাভ-লোকসানও অসমানভাবে বণ্টিত হয়। কোথাও বা আবার অংশীদার মূলধন জোগান না দিয়া শুধুমাত্র তাহার কর্ম-দক্ষতার জন্য অংশীদাররূপে পরিগণিত হয়। নাতিবৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই ধরণের ব্যবস্থাপনা দেখিতে পাওয়া যায়। আটা-ময়দার কলে, আসবাব-

পত্র-উৎপাদন ক্ষেত্রে, ব্যাংক ব্যবসায় প্রভৃতিতে এই ধরণের অংশীদারী কারবার প্রচলিত।

অংশীদারী কারবারের সুবিধা—Advantages of Partnership.

১। এই ব্যবস্থায় এক-মালিকানা কারবার অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলিয়া শিল্পের প্রসার সম্ভব হয়।

২। মূলধন ব্যতীত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ইহার অধিকতর সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিক মালিক থাকার ফলে ব্যবস্থাপনা-কার্যে শ্রমবিভাগ নীতি প্রযুক্ত হয় এবং ইহার ফলে পরিচালনা-কার্যের প্রত্যেকটি অংশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

৩। মালিকানা স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা একই হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে মালিকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য অধিকতর যত্ন ও দায়িত্বের সহিত তাহাদের কর্তব্য পালন করে।

৪। অংশীদারী কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অংশীদারগণের অসীম দায়িত্ব (Unlimited liability)। অসীম দায়িত্বের জন্যই প্রত্যেক অংশীদারই কোনরূপ ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তাপূর্ণ উদ্যম হইতে বিরত থাকে।

৫। অংশীদারী কারবারে আর একটি সুবিধা হইল ইহার সহজ পরিবর্তনশীলতা। প্রয়োজনক্ষেত্রে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া পূর্বতন ব্যবস্থাকে বর্তমান সময়োপযোগী করা যায়।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। অংশীদারী কারবারের কোন স্থায়িত্ব নাই। একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অথবা সে যদি উন্মাদ বা দেউলিয়া হয় তাহা হইলে এই কারবার আইনতঃ ভাঙিয়া যায়।

২। ইহার আর একটি গুরুতর অসুবিধা হইল অসীম দায়িত্ব—এইজন্য কোন অংশীদারই স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে কাজ করিতে পারে না। কারবারের সমগ্র ঋণ একজন অংশীদারের নিকট হইতেই আদায় করা যাইতে পারে।

৩। অংশীদারী কারবারেরও মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নহে, যাহা দ্বারা বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করা

যাইতে পারে। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, রেলওয়ে, জাহাজ ও এরোপ্লেন নির্মাণ প্রভৃতি এই জাতীয় অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না।

৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ শেষ পর্যন্ত ইহার বিনাশের কারণ হয়। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাবই হইল ইহার স্থায়িত্বের অভাবের প্রধান কারণ।

অংশীদারী কারবারের আর একটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সসীম অংশীদারী কারবার (Limited Partnership) বলা হয়। সসীম অংশীদারী কারবারে কয়েকজন অংশীদার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আইনানুমোদিতভাবে তাহাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই অংশীদারগণ কারবার-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

যৌথ কারবার—Joint-Stock Company or Corporation.

কমপক্ষে সাতজন সদস্য লইয়া যৌথ কারবার গঠিত হয়। কিন্তু সদস্য-সংখ্যার কোন সর্বাধিক সংখ্যা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই। যাহারা এই জাতীয় কারবার স্থাপনের জন্য প্রথম অগ্রণী হন তাঁহাদিগকে উদ্যোক্তা (Promoters) বলা হয়। কারবার স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাগণকে প্রথমতঃ যৌথ কারবারের সরকারী অধিকর্তার (Registrar) নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হয়। এই আবেদনপত্র কারবার-সম্পর্কে সমুদয় তথ্য-(কারবারের নাম, কর্মস্থল, মূলধনের পরিমাণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি) সম্বলিত হওয়া চাই। সরকারী অধিকর্তার অনুমোদন পাইলে কারবারটি আইন দ্বারা অনুমোদিত কারবার বলিয়া পরিগণিত হয় এবং উদ্যোক্তাগণ মূলধন-সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

যৌথ কারবারের মূলধন ও শেয়ার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। যৌথ কারবারের মূলধনকে সাধারণতঃ চারিভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

মূলধনের প্রকারভেদ—Forms of Capital.

(ক) অনুমোদিত মূলধন—Authorised or Registered Capital.

যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে কারবারটি সরকারের সম্মতি লাভ করে, তাহাকে অনুমোদিত মূলধন বলা হয়। এই পরিমাণ মূলধন কারবারটি প্রথম

অবস্থায় সংগ্রহ নাও করিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ কোনমতেই চলে না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কারবারের চল্‌তি মূলধন অনুমোদিত মূলধন অপেক্ষা অনেক কম।

(খ) প্রচারিত মূলধন—Issued Capital.

কারবারটি যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে সরকারের সমর্থন লাভ করে তদপেক্ষা কম পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য বাজারে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণ মূল্যের মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয় হয়, তাহাকে প্রচারিত মূলধন বলা হয়।

(গ) বিক্রীত মূলধন—Subscribed Capital.

প্রচারিত মূলধনের যে পরিমাণ অংশ জনসাধারণ ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহাকে বিক্রীত মূলধন বলা হয়।

(ঘ) আদায়ীকৃত মূলধন—Paid up Capital.

ক্রয় করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ মূলধনের যে পরিমাণ কার্যতঃ অংশীদারগণ প্রদান করেন, তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন একটি বস্ত্রশিল্প যদি যৌথ কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহা হইলে ধরা যাউক যে সেই শিল্পটি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকাকে অনুমোদিত মূলধন বলা হয়। কারবারটি একই সময়ে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রথম পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বাহির করিলে, এই ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনকে প্রচারিত মূলধন বলা হয়। এই প্রচারিত ২৫ লক্ষের মধ্যে জনসাধারণ যদি ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দেয় অর্থাৎ কার্যতঃ ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় হয় তাহা হইলে এই ১৫ লক্ষ টাকাকে বিক্রীত মূলধন বলা হয়। বিক্রীত মূলধনের সমগ্র অর্থমূল্য একসঙ্গে প্রদত্ত হয় না, সাধারণতঃ শেয়ারের যে অর্থমূল্য তাহার অর্ধেক প্রদত্ত হয়। অবশিষ্টাংশ প্রয়োজনমত ক্রেতার নিকট হইতে লওয়া হয়। যদি কোন লোক ১০০৲ টাকা মূল্যের একটি শেয়ার ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাকে প্রথমতঃ ৫০৲ টাকা দিতে হয়। সুতরাং ক্রীত শেয়ারের যে পরিমাণ অংশ প্রদত্ত হয় তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলা হয়। ১৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ শেয়ার যদি বিক্রীত হয় ও শেয়ার প্রতি যদি অর্ধেক

মূল্য অগ্রিম দেওয়া হয় তাহা হইল ৭½ লক্ষ টাকা কারবারের আদায়ীকৃত মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয়।

শেয়ারের প্রকারভেদ—Forms of Shares.

যৌথ কারবারের উদ্দেশ্য হইল যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহদায়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করা। এইজন্য ইহারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করে।

(ক) ঋণপত্র—Bond or Debenture

যাহারা কোন প্রকার ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক নহে তাহাদিগের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় শেয়ার বিক্রয় করা হয়। ইহারা কোনরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে যাইতে চায় না। নির্ধারিত হারে ইহারা ধারের সুদ পায়। কারবারের লাভ-লোকসানে ইহাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং ইহাদিগকে কারবারের মালিক বলা চলে না—ইহারা শুধু ঋণদাতা।

(খ) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার—Preference Share.

অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হইল যে, যাহারা ইহা ক্রয় করে তাহাদিগকে লাভের অগ্রাধিকার দিতে হয়। অবশ্য যদি কারবারে কোন লাভ না হয় তাহা হইলে ইহাদিগকে কিছু দিতে হয় না। কিন্তু ইহাদের সহিত শর্ত হয় যে, কারবারে লাভ হইলেই সাধারণ শেয়ারের অধিকারীদের মধ্যে লাভ বণ্টনের পূর্বে ইহাদিগকে একটা নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ দিতে হইবে। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার তিন প্রকারের হইতে পারে। (অ) ক্রমবর্ধনশীল শেয়ার (Cumulative Shares), যাহা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। (আ) অপরিবর্তনীয় শেয়ার (Non-cumulative), যাহা লাভের পরিমাণ অনুসারে প্রতিবৎসর দেওয়া হয়। (ই) অতিরিক্ত লভ্যাংশ-গ্রহণকারী শেয়ার (Participating), যাহা নির্ধারিত লভ্যাংশ ব্যতীত অতিরিক্ত লভ্যাংশের একটা ভাগ পায়।

(গ) সাধারণ শেয়ার—Ordinary Share.

সাধারণ শেয়ারের ক্রেতাগণ কারবারের সমগ্র ঝুঁকি বহন করে। ব্যয়-সংকুলান করিয়া এবং অন্যান্য শেয়ারের মালিকগণের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার

পর ইহাদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টিত হয়। কারবার যখন গুটান হয় তখনও অন্যান্য শেয়ারের মালিকগণের পাওনা সাধারণ শেয়ারের মালিকগণের পাওনার পূর্বে দিতে হয়। সাধারণ শেয়ারের অধিকারিগণই হইল যৌথ কারবারের প্রকৃত মালিক।

যৌথ কারবারের পরিচালনা-ব্যবস্থা—Management of Joint-Stock Company.

সাধারণ শেয়ারের মালিকগণ যদিও যৌথ কারবারের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী তথাপি পরিচালনা-কার্যে তাহারা কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। স্বত্বাধিকারিগণ একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) নির্বাচন করে এবং এই পরিচালকমণ্ডলী কারবার পরিচালনা-কার্যের তত্ত্বাবধান করে। কারবারটির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা-কার্য বেতনভুক পরিচালকের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় মালিকানাস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা এই দুইটি পৃথক হস্তে ন্যস্ত হয়। কিন্তু এক-মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে যাহারা মালিক তাহাদের হস্তেই পরিচালনা-কার্য ন্যস্ত থাকে। পরিচালনা-ব্যবস্থা বাহ্যতঃ গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইলেও কার্যতঃ তাহা নহে। কারণ সাধারণ সদস্যগণ পারস্পরিক পরিচয়ের অভাবে সংঘবদ্ধভাবে কারবার-পরিচালনা ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাধারণ সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কারবার-পরিচালনায় নেতৃত্ব করে।

যৌথ কারবারের সুবিধা—Advantages of Joint-Stock Company.

১। পূর্বে মূলধনের অভাবে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বর্তমানে যৌথ কারবারের ভিত্তিতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া অতিকায় উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। এই উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়।

২। যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে স্বল্পপরিমাণ উদ্বৃত্তেরও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পপরিমাণ উদ্বৃত্তও লোকে বর্তমানে যৌথ

কারবারে বিনিয়োগ করিয়া একটা অতিরিক্ত আয় পাইতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে এই কারবার জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহ দেয়।

৩। মূলধন বিনিয়োগ-ব্যবস্থা এই কারবারে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে যে, ঝুঁকি না লইয়াও লোকে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে। সাধারণ শেয়ার ক্রয় না করিয়া ঋণপত্র বা অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার ক্রয় করিলে আদৌ কোন অনিশ্চয়তা থাকে না বা ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৪। শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য এবং যে-কোন সময়ে সংভার বিনিময়-কেন্দ্রের (Stock-Exchange) মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য বলিয়া এগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

৫। শেয়ারের মালিকগণের দায়িত্ব সসীম (Limited liability) হওয়ার জন্য তাহাদের ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ব্যক্তিগত ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস হওয়ার ফলে যৌথ কারবারের পক্ষে উৎপাদন-ক্ষেত্রে নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে। নূতন পদ্ধতি বিফল হইলেও কোন ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র লোকসানের ভার বহন করিতে হয় না।

৬। যৌথ কারবার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অংশীদারী কারবারের ন্যায় একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে সহসা ইহার অস্তিত্বের কোন অবসান ঘটে না।

৭। মূলধনের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা-কার্য পৃথক হস্তে ন্যস্ত হওয়ার ফলে পরিচালনা-কার্য উপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পিত হয়। এইজন্য যৌথ কারবার দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য যৌথ কারবারের একটি প্রধান সুবিধা বলিয়া পরিগণিত হইলেও এই পার্থক্যকে একটি প্রধান অসুবিধার কারণ বলা যাইতে পারে। ব্যবস্থাপকগণের স্বার্থহানি হইবার আশংকা না থাকার জন্য তাহারা অনেক সময় অহেতুক ঝুঁকি গ্রহণ করে। অপর লোকের মূলধনের নিরাপত্তার প্রতি অবহিত না হইয়া তাহারা নানাপ্রকার ঝুঁকিদার দুর্ম কল্পনায় মূলধন বিনিয়োগ করে।

২। এই ব্যবস্থায় সাধারণ অংশীদারগণের দায়িত্ব সসীম ও শেয়ারগুলি

হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সাধারণ অংশীদারগণ কারবার-পরিচালনাকার্যে একপ্রকার উদাসীন থাকে। ফলে পরিচালকগণের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং তাহারা তাহাদের খুশীমত কাজ করে।

৩। এই ব্যবস্থায় দক্ষ পরিচালকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। নির্বাচনের প্রথায় নিযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই দক্ষতা অপেক্ষা ভোটের জোরে নির্বাচিত হইয়া থাকে। ব্যবসায়-পরিচালনার মত উপযুক্ত দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা তাহাদের থাকে না। সুতরাং ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা সুদূর-পরাহত হয়।

৪। অনেক সময় যোগ্য কর্মচারীর অভাবে যৌথ কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। নিয়োগ-ব্যাপারে পরিচালকমণ্ডলী যোগ্যতা অপেক্ষা আত্মীয়তা-বন্ধন ও আশ্রিত-বাৎসল্যের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়া থাকে। ফলে দুর্নীতি, অযোগ্যতা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়।

৫। যৌথ কারবারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত সংস্পর্শ না থাকার ফলে উভয়ের মধ্যে সচরাচর বিরোধ ঘটে। বিরোধের ফলে উৎপাদন-কার্য ব্যাহত হয়।

যৌথ কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিলে ইহার অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী বলিয়া মনে হয়। অসুবিধাগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। যৌথ কারবারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার সাহায্যে অল্পখরচায় বৃহৎ বহরে উৎপাদন সম্ভব হয়।

সমবায় প্রথা—Co-operation.

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলির প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে সদস্যগণ তাহাদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের কোন ভেদ নাই। সমবায় প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমবায়ের সদস্যগণই কারবারের কর্মী এবং মালিক এবং লাভ-লোকসান সমভাবেই তাহারা বহন করে। এই ব্যবস্থায় কোন দালাল (Middleman) থাকে না। সদস্যগণ নিজেরাই ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচালনার কার্য সম্পাদন করে। জনপ্রতি এক ভোট নীতিতে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্যগণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া স্বাধীন-

ভাবে সাম্যের ভিত্তিতে (Equality) কাজ করে। সদস্যগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীতও তাহাদের নৈতিক উন্নতি বিধান করাও সমবায় প্রথার আর একটি উদ্দেশ্য।

সমবায় সমিতিগুলি নানা উদ্দেশ্যে গঠিত হইতে পারে। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ঋণদান-ক্ষেত্রেও এই সমিতিগুলি (Co-operative Credit Society) বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

সমবায় প্রথার সুবিধা—Benefits of Co-operation.

১। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক কর্মীই হইল স্বাধীন ও ব্যবসায়ের মালিক। এই মালিকানা-বোধ তাহাকে আত্মসচেতন করিয়া অধিকতর নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবার শিক্ষা দেয়।

২। এই ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধানের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রত্যেকের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত জড়িত। কর্তব্যে অবহেলা বা অমনোযোগ হইলে নিজের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা।

৩। সমবায় প্রথার প্রধান সুবিধা হইল যে, ইহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রমিকেরাই মালিক, সুতরাং ধর্মঘট ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা উৎপাদন-কার্য ব্যাহত হয় না।

৪। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটে। শ্রমিকগণ মজুরি ছাড়াও মুনাফার একটা অংশ পায়।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। সমবায় পদ্ধতি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া অধিক মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ আকারে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

২। সাধারণ শ্রমিকগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও কর্মদক্ষতার অভাব দেখা যায়। এইজন্য অনেক সময় সমবায় প্রথা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

৩। সহযোগিতার মনোভাবই হইল সমবায় প্রথার প্রধান ভিত্তি। এই মনোভাবের অবর্তমানে পরিচালনা-কার্যে বিশৃংখলা উপস্থিত হয়।

৪। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সমবায় প্রথার নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং এই অবস্থায় কোন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যোগদান করে না। তাহারা অন্যত্র অধিক আয় করিতে পারে। সুতরাং সমবায় প্রথায় সুদক্ষ পরিচালকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

সরকারী ও আধা-সরকারী পরিচালনা—Government and Semi-Government Undertakings.

বর্তমান যুগে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকার কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রায় সকল দেশেই রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি সরকারী পরিচালনাধীন। জল ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ, যানবাহন প্রভৃতি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়।

সরকার উপরি-উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইলেও এইগুলির বাস্তব পরিচালনাভার সরকারী প্রভাবমুক্ত একটি সংসদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা-কার্য জনমত অনুসারেই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমি—ভূমি বলিতে নৈসর্গিক সমস্ত পদার্থ ও শক্তি বুঝায়। ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল (ক) ইহার কোন উৎপাদন-খরচা নাই, (খ) ইহার আয়তন সীমাবদ্ধ—সুতরাং ভূমির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় না। (গ) ইহার গতিশীলতার অভাব। (ঘ) বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য। (ঙ) ভূমিতে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন আরম্ভ হয়।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের অর্থ হইল যে, ভূমির পরিমাণ সমান রাখিয়া যদি অন্য দুইটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে শ্রম ও মূলধন যে পরিমাণে ভূমিতে প্রযুক্ত হয় তদপেক্ষা কমহারে ভূমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধি শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয় না। ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটে বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলেই এই সূত্রটি কার্যকরী হয়। ভূমি ব্যতীত খনিকার্যে, মৎস্য ধরিবার ক্ষেত্র প্রভৃতিতে এই সূত্রের

প্রয়োগ দেখা যায়। ভূমির আয়তনের ও উৎপাদিকা-শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই সূত্রের প্রভাব দেখা যায়।

শ্রম—শ্রম উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। উপযোগিতা-সম্পন্ন অর্থাৎ বিনিময়যোগ্য যে-কোন কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। শ্রমের পরিমাণ শ্রমিকের সংখ্যা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে দুইটি প্রচলিত মতবাদ আছে। প্রথমটি হইল ম্যাল্‌থাস্-প্রদত্ত মতবাদ। এই মতবাদে বলা হয় যে, সাধারণতঃ জনসংখ্যা খাদ্যবস্তু-বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় ও জনসংখ্যা যদি খাদ্যসরবরাহের অনুপাতে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। ম্যাল্‌থাসের মতে জনসংখ্যা দেশের খাদ্যপরিমাণের সীমা কখনই লংঘন করিতে পারে না, সেইজন্য তিনি স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ ম্যাল্‌থাসের মতবাদ খণ্ডন করিয়া বলেন যে, জনসংখ্যার যে সমস্যা তাহা শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, ইহা দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও বণ্টন-ব্যবস্থার ন্যায়বিচারের উপর সমধিক নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহারা সর্বাধিক-কাম্য সংখ্যাতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে দেশের উৎপাদন-দক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে জনসংখ্যা হইলে লোকপ্রতি আয় সর্বাধিক হয়, সেই জনসংখ্যাকে তাঁহারা সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা বলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা একটি নির্ধারিত বা স্থিতিশীল সংখ্যা নহে, উৎপাদন-দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে এই সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

শ্রমিকের দক্ষতা তাহার নিজের ও ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও তাহার কর্তব্যজ্ঞান তাহার দক্ষতা-বৃদ্ধির সহায়ক। এই দক্ষতা-বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। উপযুক্ত বেতন, নির্ধারিত কাজ, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধির সহায়ক। ব্যবস্থাপক তাহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্য দ্বারা বহুল পরিমাণে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

মূলধন—ধনের যে অংশ অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে অর্থাৎ যে-কোন আকারে একটি অতিরিক্ত আয় অর্জন করিতে পারে, তাহাকে মূলধন বলা হয়। মূলধন হইল আয়ের উৎস। মূলধন ভূমির ন্যায় প্রাকৃতিক উপাদান নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যসৃষ্ট নহে। মানুষ প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর শ্রম বিনিয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে।

উৎপাদনের একটি উপাদান হইলেও ভূমির সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ভূমির পরিমাণ সীমিত, মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তনীয়। ভূমি প্রকৃতির দান, মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট। মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু ভূমির বিনাশ নাই।

গৃহ, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, কারণ ইহারা দীর্ঘকালব্যাপী উৎপাদনে সাহায্য করে কিন্তু কাঁচামাল প্রভৃতি একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য নহে বলিয়া ইহাদিগকে চলতি মূলধন বলা হয়।

(১) মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। (২) মূলধন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। (৩) মূলধন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করে।

মূলধনের উপর উৎপাদন নির্ভর করে। সুতরাং মূলধন-বৃদ্ধি আবশ্যক। মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। সঞ্চয়ের ইচ্ছা লোকের দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সঞ্চয়-ক্ষমতা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথা, উদ্বৃত্ত আয়, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, সঞ্চয় করিবার সুযোগ, সুদের হার প্রভৃতি।

ব্যবস্থাপনা—অধুনা উৎপাদন-ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা-কার্য সর্বাধিক গুরুত্ব-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনের জন্যই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এবং যিনি এই উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগ সাধন করেন তাঁহাকে ব্যবস্থাপক বলা হয়। ব্যবস্থাপক উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্রয়-বিক্রয়, শ্রমিক-নিয়োগ, মূলধন সংগ্রহ করা, উৎপাদিত

আয় বণ্টন করা ব্যতীতও ব্যবস্থাপককে ঝুঁকি বহন করিতে হয়। উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তাঁহার লভ্যাংশ তাঁহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংগঠন—ব্যবস্থাপনা একজন মালিকের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সাধারণতঃ জমির মালিক, শ্রমিক ও মূলধনের অধিকারী হইয়া থাকেন এবং উৎপাদনের সমগ্র লাভ-ক্ষতি তাঁহাকে বহন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অংশীদারী কারবারে একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের মূলধন দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন। প্রত্যেকেই ব্যবস্থাপনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করেন ও ব্যবসায়ের ঝুঁকি সকলেই বহন করেন। যৌথ কারবারে বহু ব্যক্তি একত্রিত হইয়া মূলধন সরবরাহ করে। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে তাহারা ব্যবসায়ের সমান ঝুঁকি বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের পরিচালনা-ভার সাধারণ অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সংসদের উপর ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় অংশীদারগণের ঝুঁকি কম, কিন্তু পরিচালনা-ব্যবস্থায় অংশীদারগণের কোন কর্তৃত্ব না থাকায় অংশীদারগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত, সমবায় পদ্ধতিতে গঠিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সরকার পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থা দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Enunciate the law of Diminishing Returns both with special reference to agriculture and as a general law applicable to all industries. (Madras & P. U. 1937)

2. "Labour and Capital cannot be withdrawn from a part of the land and concentrated on the rest without causing a reduction of social income." (C. U. 1944)

3. "The problem of population is not one of mere size in relation to food supply but of efficient production and equitable distribution." Discuss.

4. Define over-population and under-population in the light of Optimum Theory. (Dacca, 1943)

5. What do you mean by efficiency of labour ? Examine the chief factors which determine the efficiency of a worker in modern industry. (Pat. 1945 ; C. U. 1929)

6. What is Capital ? Is money Capital ? Justify your answer by appropriate reasoning. (C. U. 1955)

7. Distinguish between the different senses in which the word *Capital* is used in popular and economic language. (C. U. 1944)

8. Define capital and discuss its main functions. (C. U. ; B. Com. 1930)

9. Enumerate the factors that are essential to Capital formation in a Country. Are those factors present in India ?

10. What are the functions of an entrepreneur ? Estimate his importance in the modern economic organisation. (C. U. 1952)

11. Examine the reasons for the predominance of joint-stock companies over other forms of business organisation. (C. U. ; B. Com. 1952)

12. 'Reflection on the characteristics of land gave us one of the most famous Economic Laws—the law of Diminishing Returns', Explain. Is the operation of the law restricted to land alone ? (C. U. ; B. Com. 1958)

13. "The Laws of increasing and decreasing returns are often cited as if they were in some way parallel to one another. But they are quite distinct". Explain this statement. (C. U. 1960)

14. What are the different kinds of shares issued by joint-stock companies ? In what respects is a joint-stock company superior to a partnership ? (C. U. 1962)

দশম অধ্যায়

উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা

(Organisation of Production)

বিশেষত্বশীলতা—Specialisation.

বর্তমান যুগে অভাব-বৃদ্ধির ফলে কোন মানুষই আর সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নহে। তাহার অসংখ্য অভাব আর তাহার নিজ কর্ম-প্রচেষ্টা দ্বারা মিটিতে পারে না। অভাব তৃপ্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক মানুষেরই কর্ম-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেইজন্য প্রত্যেক লোকই তাহার রুচি ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কার্যে মনঃসংযোগ করে। এইরূপে সমাজের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে এবং বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান দ্বারা তাহাদের বৈচিত্র্যময় অভাব পূরণ করে। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, শিল্পী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, কর্মকার লৌহদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক শিক্ষকতা করেন এবং প্রত্যেকেই অর্থের মাধ্যমে বিনিময় দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা কাজ সংগ্রহ করিয়া অভাব মোচন করে। এইরূপে যখন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নির্দিষ্ট একটি উৎপাদনে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখে, তখন এই নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকেই বিশেষত্বশীলতা বলা হয়। বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই বিশেষত্বশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা স্তরে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি অংশ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়।

কোন ব্যক্তিই যেরূপ সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দেশই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। যে যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে একটি দেশের নৈসর্গিক ও অর্জিত সুবিধা আছে, সেই দেশ শুধু সেই দ্রব্যগুলিই উৎপাদন করে এবং অন্য দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অপর দেশ হইতে আমদানী করে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের মধ্যেও

বিশেষত্বশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে বিশেষত্বশীলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) বলা হয় এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক বিভাগের মধ্যে যে বিশেষত্বশীলতা দেখা যায় তাহাকে শিল্পের স্থানীয়করণ (Localisation of Industries) বলা হয়।

শ্রমবিভাগ—Division of Labour.

উপরি-উক্ত ব্যক্তিগত বিশেষত্বশীলতার ফল হইল শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের মূলনীতি হইল কর্মবিভাগ। সমাজের উপযোগী বিভিন্ন কার্য যখন সেই কার্যে অভিজ্ঞ লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রমবিভাগ বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক লোক একটি নির্দিষ্ট কার্যে লিপ্ত থাকে।

আদিম যুগে মানবসমাজে কোন কর্মবিভাগ ছিল না। প্রত্যেক লোকেই স্বকীয় পরিশ্রম দ্বারা তাহার সমগ্র অভাব পরিতৃপ্ত করিত। নারী ও পুরুষের মধ্যে কর্মবিভাগ দ্বারাই মানবসমাজে শ্রমবিভাগের প্রথম সূত্রপাত হয়। নারী তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত করিত, পুরুষ হয়ত তাহার সামর্থ্য ও বুদ্ধির আধিক্যহেতু অপেক্ষাকৃত কঠোর কার্যে নিযুক্ত থাকিত। মানব সমাজের প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত শ্রমবিভাগ নীতি বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শ্রমবিভাগের চারিটি প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত শ্রমবিভাগ (Division into trades and professions)। বৃত্তিগত শ্রমবিভাগের ফলে সমাজে নানা শ্রেণী বা জাতির উদ্ভব হয়। এই বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। আমাদের দেশে এই বৃত্তিগত বা গুণগত শ্রমবিভাগের ফলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারিটি জাতির উদ্ভব হয়। (২) সামাজিক অগ্রগতির ফলে ইহার পরবর্তী যুগে এই শ্রমবিভাগ নীতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিশেষত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন কার্যগুলি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ (Division into process which is complete)। শূদ্রের কার্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কার্য হইতে প্রথম পর্যায়ে পৃথক হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে শূদ্রের নির্ধারিত কার্য বিভক্ত হইয়া চর্মকার, মৎস্যজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন উপশ্রেণীতে ভাগ হইল। কিন্তু মৎস্যজীবী বা

চর্মকারের কার্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। (৩) বর্তমান যুগে যান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্রে মানুষের এই আদিম কর্মবিভাগ নীতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে কোন উৎপাদন-কার্যই আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যই শত শত ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা প্রত্যেকটি পদ্ধতির কার্য সম্পাদিত হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েই সামান্য একটি আলপিন-প্রস্তুত কার্য শতাধিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি হইতে এই শেষোক্ত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল যে, এ পদ্ধতিগুলির কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে (Division into process which is incomplete)। জুতা তৈয়ারী করিবার কারখানায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র জুতা-প্রস্তুত কার্যটি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কাঁচা চামড়া পাকা চামড়ায় পরিণত করাই হইল জুতা তৈয়ারী করিবার প্রথম পদ্ধতি। তারপর অসংখ্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ জুতাটি ব্যবহারযোগ্য হয় অর্থাৎ জুতা তৈয়ারীর এই অসংখ্য ক্ষুদ্র পদ্ধতিগুলির সংহতিতেই সম্পূর্ণ জুতার উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটি পদ্ধতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদ্ধতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এককভাবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই অসম্পূর্ণ ও উপযোগিতাবিহীন। সকল পদ্ধতিগুলির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ দ্রব্যটি উৎপাদিত হয়। (৪) এতদ্ব্যতীত ভৌগোলিক ভিত্তিতেও শ্রমবিভাগ (Geographical or Territorial Division of Labour) নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

বিশেষত্বশীলতা ও সহযোগিতাই হইল শ্রমবিভাগের ভিত্তি—Division of Labour is nothing but Specialisation and Co-operation.

শ্রমবিভাগ নীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বিভাগ উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যে পদ্ধতি অনুসারে প্রথমতঃ কোন একটি বিশেষ উৎপাদন-কার্য কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় এবং এই প্রত্যেক অংশের কার্য ভিন্ন শ্রেণীর কর্মী দ্বারা সম্পাদিত হয়। জুতার কারখানায় যাহারা কাঁচা চামড়া পাকা করে (tan) তাহারা শুধু ঐ কার্যটি করে, অন্য কিছু করে না। একই জাতীয় কার্য পুনঃপুনঃ সম্পাদন করিয়া এই

শ্রমিকগণ ঐ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিয়া বিশেষজ্ঞ হয়। কিন্তু চামড়া শুধু পাকা হইলেই ব্যবহারযোগ্য হয় না। এই নির্দিষ্ট কার্যটি যখন জুতা-প্রস্তুত কার্যটির অন্যান্য নির্ধারিত পদ্ধতির মধ্য দিয়া শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয়, তখনই জুতা ব্যবহারযোগ্য হয়। যদি ধরা যায় যে, সম্পূর্ণ একজোড়া জুতা দশটি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে প্রথম হইতে দশম পদ্ধতি পর্যন্ত প্রত্যেক পদ্ধতিটি জুতা তৈয়ারীর অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও এককভাবে একটি পদ্ধতির কোন উপযোগিতা নাই। একমাত্র দশটি পদ্ধতির সহযোগিতায়ই জুতা প্রস্তুত হয়। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যক্তির (শ্রমিকের) দিক দিয়া দেখিতে গেলে শ্রমবিভাগের একমাত্র তাৎপর্য হইল বিশেষত্বশীলতা, কেননা শ্রমিক সমগ্র কার্যের একটিমাত্র ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদন করে ও এই কার্যে বিশেষজ্ঞ হয়। অপর পক্ষে সমষ্টির (ভোগকারীর) দিক দিয়া দেখিতে গেলে শ্রমবিভাগের তাৎপর্য হইল সহযোগিতা। যে জুতা আমি ব্যবহার করি তাহা দশজন বিভিন্ন কর্মীর সহযোগিতার ফল।

আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এই কর্মবিভাগ নীতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, চাহিদার অত্যধিক বৃদ্ধি ও যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্যই শ্রমবিভাগ অধুনা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্রম-বিভাগের স্বাভাবিক পরিণতি হইল বিশেষত্বশীলতা, যাহার জন্য কোন ব্যক্তি বা কারখানা কোন একটা দ্রব্য সমগ্রভাবে উৎপাদন করিতে পারে না। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে এই বিশেষত্বশীলতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কোন একটি যন্ত্র কোন একটি দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যতীত অন্য কিছু প্রস্তুত করিতে পারে না। সেইজন্য বিশেষত্বশীলতার সহিত সহযোগিতাযুক্ত না হইলে উৎপাদন-কার্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বিশেষত্বশীলতা স্বয়ংসম্পূর্ণতা (self-sufficiency) বিনষ্ট করে। এইজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন। ব্যক্তির পক্ষেও যেরূপ এই সহযোগিতামূলক বিনিময়ের প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সেইরূপ সহযোগিতামূলক বিনিময় অপরিহার্য, কারণ ব্যক্তির ন্যায় কোন একটি দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা—Advantages of Division of Labour.

১। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পুনঃ পুনঃ একই কার্য

করিতে করিতে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও কার্যটি সে নির্ভুলভাবে করিতে পারে।

২। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা ও শিক্ষা অনুসারে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কাজ দেওয়া হয়। ফলে, প্রত্যেক কর্মীর নিকট হইতে সর্বাধিক কাজ পাওয়া যায় এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৩। শ্রমবিভাগ দ্বারা সময়ের অপচয় রহিত হয়। যখন কোন শ্রমিককে একাধিক কার্য সম্পাদন করিতে হয় তখন তাহাকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হয়। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ বদল করিতে হয়। এইজন্য সময়ের অপচয় ঘটে। কিন্তু শ্রমবিভাগ ব্যবস্থায় এইরূপ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না—শ্রমিক তাহার নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করে।

আর এক দিক দিয়াও সময়ের মিতব্যয়িতা হয়। একটি সম্পূর্ণ কাজের একটি অংশ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে যে সময় দরকার, তাহা সম্পূর্ণ পদ্ধতি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় অপেক্ষা অনেক কম। সম্পূর্ণ জুতা-প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে যে সময় লাগে, শুধু কাঁচা চামড়া পাকা করিবার প্রণালী শিখিতে তদপেক্ষা কম সময় লাগে।

৪। বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন কাজ করে, সেজন্য পৃথক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে বলিয়া প্রত্যেকের জন্য এক প্রস্থ যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত এই এক প্রস্থ যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ব্যবহার হয়। যন্ত্রপাতি বিনা ব্যবহারে কখনও ঠিক থাকে না। সুতরাং যন্ত্রপাতির দিক দিয়াও অনেক মিতব্যয়িতা হয়।

৫। এই ব্যবস্থায় একটি জটিল উৎপাদন-কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিভক্ত হওয়ার ফলে কার্যটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ফলে শ্রমিকের শ্রমভারের লাঘব হয়।

৬। এই অবস্থার দ্বারা শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপেক্ষাকৃত সরল অংশে বিভক্ত কাজগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। এইজন্য শ্রমিকগণ এক স্তর হইতে সহজেই অন্য স্তরে যাইতে পারে।

৭। উৎপাদন-কার্য যখন ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, তখন শ্রমিকেরা বার বার উক্ত কার্য করিতে করিতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়। তাহারা তাহাদের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় অনেক নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়।

শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অল্প সময়ে তাহারা অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম হয়। ফলে উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। উৎপাদন-খরচা হ্রাস পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য-হ্রাসের ফলে চাহিদার বৃদ্ধি হয়। সমাজের পক্ষে ইহাই হইল শ্রমবিভাগের বাস্তব উপযোগিতা।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা—Disadvantages of Division of Labour.

শ্রমবিভাগ বহু দিক হইতে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

১। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের সাধারণ কর্মপটুতা ও দায়িত্ব-জ্ঞান হ্রাস পায়। একটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিলেও তাহার সাধারণ কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ণ কাজটির উৎকর্ষ সম্পর্কে তাহার দায়িত্ববোধেরও অভাব জন্মে।

২। এক ধরণের বিশেষ কাজ করিতে করিতে তাহার চিত্তের প্রসার হ্রাস পায়। যে শ্রমিক নিত্যই কলে সুতা যোগান দেয়, তাহার অন্য কোন বিষয়ে আর তাদৃশ আসক্তি থাকে না।

৩। একই ধরণের কাজ প্রতিনিয়ত করিলে কাজটির আর নূতনত্ব থাকে না। শ্রমিক তাহার কাজে আর কোন উৎসাহ পায় না। এই বিরক্তিকর একঘেয়েমি শুধু যে তাহার চিত্তপ্রসারের পরিপন্থী তাহা নহে, একঘেয়েমি শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক একটি যন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

৪। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। যদি কোন কারণে শিল্পবিশেষে মন্দা দেখা দেয়, তাহা হইলে এই অত্যধিক বিশেষত্ব-শীলতার জন্য শ্রমিকেরা অন্য কোন কার্য দ্বারা জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়।

শ্রমবিভাগের সীমা—Limits to Division of Labour.

শ্রমবিভাগের সুবিধা আলোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, উৎপাদন-কার্যে যত বেশী পরিমাণে শ্রমবিভাগ নীতি অনুসৃত হইবে তত বেশী সুবিধা বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নহে। উৎপাদনকার্যে শ্রমবিভাগ নীতি প্রয়োগেরও একটা সীমা আছে।

প্রথমতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের চহিদার ক্ষেত্র (Extent of the market) যদি প্রশস্ত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া বড় বহরে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বিক্রয় করিবার বাজার যদি সংকীর্ণ হয়, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অধিক উৎপাদন লাভের পরিবর্তে লোকসান আনয়ন করে।

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে শ্রমিকের কোন অভাব নাই—প্রয়োজনমত শ্রমিক পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে শ্রমবিভাগ সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত উৎপাদন-কার্য ক্রমাগত চলিতে থাকে (Continuous) শুধুমাত্র সেই সকল উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ কার্যকরী হইতে পারে। যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা বৎসরে তিন মাস কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা লাভজনক হয় না।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ বা শিল্পের স্থানীয়করণ—Localisation of Industries.

যখন একই দ্রব্য অথবা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন অথবা বিক্রয় করে এইরূপ কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়, তখন শিল্পগুলির এই একত্র সমাবেশকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলা চলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাটকলগুলি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শিল্পের এই স্থানীয়করণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ স্ট্রীটে পুস্তক-প্রকাশকের ভিড়, রাধাবাজারে ঘড়ির দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে শিল্পের এই স্থানীয়করণ-প্রবণতার পরিচয় দেয়। আবার

সমগ্র দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত ; পাটকলগুলি বাংলা অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ—Causes of Localisation of Industries.

নানাকারণে এক একটি শিল্প একই অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি হইল প্রধান—

১। নৈসর্গিক কারণ—Natural or Physical Causes.

(ক) যে অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনার অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে এক একটি বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়,

(খ) যে অঞ্চলে কাঁচামাল, খনিজ পদার্থ, বনজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্য সহজে পাওয়া যায়,

(গ) যেখানে কয়লা প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্য এবং সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়।

২। অর্থনৈতিক কারণ—Economic Causes.

বর্তমান যুগে অন্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পগুলির একত্র সমাবেশ হয়। অর্থনৈতিক কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

(ক) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যায়,

(খ) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন পাওয়া যায়,

(গ) যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কাঁচামাল ক্রয় করিবার সুবিধা ও উৎপন্নজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা আছে।

উপরি-উক্ত কারণে পাটকলগুলি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

৩। রাজনৈতিক কারণ—Political Causes.

পূর্বে অনেক সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজা-বাদশাহ্‌দের আনুকূল্যে স্থাপিত হইত। বর্তমান যুগেও বহু জাতীয় সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

৪। প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণা—Momentum of earlier start.

যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হইয়া বিখ্যাত হয় অর্থাৎ সুনাম অর্জন করে, তখন পূর্ববর্তী শিল্পের সুনামের অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ জাতীয় আরও অনেক শিল্প উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা—Advantages of Localisation of Industries.

১। কোন একটি স্থানে শিল্পের সমাবেশ হইলে তত্রত্য শিল্পগুলি সহজেই সুনাম অর্জন করিয়া জনপ্রিয় হয়।

২। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের সন্তান-সন্ততিগণ সহজেই উক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে। এইরূপে বংশপরম্পরাক্রমে শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

৩। একত্র সমাবেশ দ্বারা শিল্পগুলি অনেক সুবিধা পায়। সহযোগিতা-মূলক ভাবে তাহারা উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং উৎপন্নজাত দ্রব্যগুলি সহযোগিতামূলক ভাবে বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হয়।

৪। যখন কোন অঞ্চলে শিল্প সমাবেশ হয় তখন ঐ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিবার উদ্দেশ্যে বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অনুপূরক অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Supplementary industries) কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। একই অঞ্চলে নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

৬। শিল্প সমাবেশের আরও একটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পগুলি একই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের মূলধন ও শ্রমিকের সন্ধান করিতে হয় না। যেখানে শিল্প সমাবেশ হয়, মূলধন ও শ্রমিক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের অসুবিধা—Disadvantages of Localisation of Industries.

শিল্প স্থানীয়করণের অনেক সুবিধা থাকিলেও ইহার কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা আছে।

১। অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে। একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইলে সমগ্র দেশকে একটি দ্রব্যের জন্য দেশের একটি অঞ্চলের উৎপাদনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়।

২। শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহার ফলে বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিতে পারে। যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পে মন্দা উপস্থিত হয় তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে বেকার সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য প্রধান শিল্পের অনুপূরক শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা যায়।

৩। শিল্পের অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে এক অঞ্চলে এক শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদার সৃষ্টি হয়। যেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু পুরুষ শ্রমিক কাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের সেখানে বিশেষ কর্মসংস্থান হয় না, ফলে, স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের অন্য স্থানে যাইতে হয়। ইহার জন্য অনেক সময় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, স্ত্রী-শ্রমিক ও অল্পবয়স্ক পুরুষ-শ্রমিকগণ অনুপূরক শিল্পগুলিতে নিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং শিল্প স্থানীয়করণের ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

৪। অতিরিক্ত স্থানীয়করণের ফলে একই অঞ্চলে অধিক লোকের সমাবেশ হয়। ইহার ফলে বাসগৃহের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।

৫। শিল্প স্থানীয়করণের তাৎপর্য হইল যে, দেশের একটি অঞ্চল একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে রত থাকে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগাযোগ-ব্যবস্থার গোলযোগ ঘটিলে বা যুদ্ধকালে এই পরনির্ভরশীলতার জন্য সেই অঞ্চলকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই জন্যই কোন একটি বিশেষ শিল্পের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল না হইয়া নানা জাতীয় শিল্প গঠন (Diversification of Industries) করা উচিত।

৬। শিল্পগুলি একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে বর্তমান যুগে ইহা শত্রু-পক্ষের প্রধান আক্রমণস্থলরূপে পরিগণিত হয়। আকাশ হইতে বোমা

বর্ষণ করিয়া শিল্পাঞ্চলগুলি ধ্বংস করা বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের একটা প্রধ বৈশিষ্ট্য ছিল।

শিল্প স্থানীয়করণের যে সমস্ত অসুবিধার কথা উপরে আলোচিত হই তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল শিল্পগুলিকে একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূ না করিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা। এই ব্যবস্থায় স্থানীয়করণে কতকগুলি সুবিধা অন্তর্হিত হইলেও অধিকাংশ অসুবিধাগুলি, যথ পরনির্ভরশীলতা, যুদ্ধকালে বিপদাশংকা, বেকার সমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবে সৃষ্টি প্রভৃতি দূরীভূত হইতে পারে।

যন্ত্র—ইহার সুবিধা ও অসুবিধা—Machinery—its advantage and disadvantages.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব হয় তাহার ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিয়া বর্তমান বিং শতাব্দীতে যন্ত্রব্যবহার এরূপ ব্যাপক হইয়াছে যে, বর্তমান যুগকে যান্ত্রিক যু বলা হয়। ক্ষুদ্রবৃহৎ সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্র এখন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে যন্ত্রের এই বহুল ব্যবহারের কারণ হইল ইহার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা।

সুবিধা :—

১। যন্ত্র মানুষের শ্রমভার বহুলপরিমাণে লাঘব করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইজিপ্টের বিস্ময়কর পিরামিডগুলি, ভারতের তাজমহল প্রভৃতি নির্মাণ করিতে কত শত শ্রমিকের জীবনপাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগে উক্তজাতীয় নির্মাণকার্য সম্ভব না হইলেও বলা যায় যে, যে-কার্য সম্পাদনের জন্য সহস্র সহস্র লোকের জীবনপাত করিতে হইত বর্তমান যুগে তাহা অতি সহজেই যন্ত্রসাহায্যে সম্ভব হয়। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, যন্ত্র মানুষের মুক্তির সন্ধান দিয়াছে।

২। যন্ত্র মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে। যন্ত্র-সাহায্যে মানুষ দ্রুততরভাবে সূক্ষ্ম কার্য সম্পাদন করিতে পারে। ইহাতে সময়েরও মিতব্যয়িতা হয়।

৩। যন্ত্রসাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তে আনয়ন করিয়া তাহার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে।

৪। যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় যন্ত্র-সাহায্যে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। যন্ত্রসাহায্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও উৎকৃষ্টতর দ্রব্য অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব।

৫। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। যে-সমস্ত শিল্পগুলি প্রধানতঃ যন্ত্রসাহায্যে পরিচালিত হয়, সে-সমস্ত শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নীতি কার্যকরী হয়। উৎপাদনের বহর যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রতি মাত্রা সামগ্রীর উৎপাদন খরচা সাধারণতঃ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

অসুবিধা :—

১। যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত মান অনুযায়ী একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ইহা ক্রেতার রুচির পরিচর্যা করিতে পারে না।

২। যান্ত্রিক উৎপাদনের আর একটি অসুবিধা হইল ইহার একঘেয়েমি। প্রতিদিন একই কাজ করিতে করিতে শ্রমিকের সেই কাজের উপর বিতৃষ্ণা হয়। নূতনত্বের অভাবে নির্ধারিত কার্যে তাহার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের অভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু উপরি-উক্ত অসুবিধা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহা প্রণিধানযোগ্য। একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেখানে সহস্র সহস্র লোক বৈচিত্র্যময় পরিবেশে নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিতেছে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই শ্রমিকের চিত্তবিনোদনে সহায়তা করে। অন্ততঃপক্ষে একথা বলা চলে যে, যে-কৃষক সমস্ত দিন একাকী ভূমিকর্ষণ কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহার মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ অপেক্ষা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিকেরই অবসাদ ও ক্লান্তি অধিক নহে।

৩। যান্ত্রিক উৎপাদনের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, এই ব্যবস্থায় বহু লোক স্বল্পপরিসর স্থানে একত্রিত হয়। যন্ত্র পরিচালনার ফলে আবহাওয়া দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকগণও তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নানাবিধ অবাঞ্ছিত আমোদ-প্রমোদে রত হয়। ফলে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটে।

কিন্তু উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির অধিকাংশই ব্যবস্থাপক উপযুক্ত ব্যবস্থা

অবলম্বন করিয়া দূর করিতে পারেন। শ্রমিকগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সভ্য দেশগুলিতে নানাপ্রকার আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রমিকের উপর যন্ত্রের প্রভাব—Influence of Machinery on Labour.

শ্রম ও মূলধন উভয়েই উৎপাদনের দুইটি বিভিন্ন উপাদান। মূলধনের একটি রূপ হইল যন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, শ্রম ও মূলধন অর্থাৎ যন্ত্র পরস্পর-বিরোধী। নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে শ্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পায়, কারণ যে কার্য সম্পাদন করিবার জন্য একশত শ্রমিকের প্রয়োজন যন্ত্রের সাহায্যে সে কার্যটি পাঁচজন শ্রমিকের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহৃত হইলেই শ্রমিকের উপযোগিতা হ্রাস পায়। ফলে বেকার সমস্যা উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রমিকেরা সাধারণতঃ যন্ত্র ব্যবহারের বিরোধী।

উপরি-উক্ত মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের শ্রমভারের লাঘব হয়। যন্ত্র শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যন্ত্রসাহায্যে স্বল্প খরচায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং সেজন্য শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

যন্ত্র ব্যবহার শুরু হইলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পায় সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যন্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হইলে যন্ত্র পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যন্ত্রের ব্যবহার যতই প্রসারলাভ করে যন্ত্র উৎপাদন করিবার (Machine-making) শিল্পগুলির সংখ্যাও তত বেশী হয়। এই নূতন শিল্পগুলিতে শ্রমিকগণ শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত হয়। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্প প্রসারলাভ করিলে নূতন শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শিল্পের প্রসার না হইলেও মূল্যহ্রাসের ফলে লোকের উদ্বৃত্ত অধিক হয়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ লোকে অন্যভাবে ব্যয় করে। নূতন দ্রব্য বা নূতন কাজের উপর ব্যয় করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং এই নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ কর্মসংস্থান করিতে পারে।

সুতরাং যন্ত্র ব্যবহারের প্রথম অবস্থায় যে বেকার সমস্যা দেখা যায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী নহে। যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শ্রমিকগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। যন্ত্র ব্যবহারের যে কুফল তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রের মালিকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই কুফলগুলি দূর করা সাধ্যাতীত নহে।

সংক্ষিপ্তসার

শ্রমবিভাগ—শ্রমবিভাগ বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি কার্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ যখন পৃথক্ পৃথক্ লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রমবিভাগ বলা হয়। এক জোড়া জুতা একজন চর্মকার প্রথম হইতে শেষ অবধি প্রস্তুত করিতে পারে অথবা এই প্রস্তুতকার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ পৃথক্ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। বর্তমান যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তির দিক দিয়া এই শ্রমবিভাগ বিশেষত্বশীলতা সূচিত করে, সমাজের দিক দিয়া শ্রমবিভাগ সহযোগিতা সূচিত করে।

শ্রমবিভাগের দ্বারা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সময়ের অপব্যয় রহিত হয়, যন্ত্রপাতিরও কোন অপচয় হয় না। শ্রমবিভাগের ফলে জটিল কার্য সরল হয় ও শ্রমিকগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগ উৎপাদন-খরচা হ্রাস করিয়া দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখী করে। ইহাতে লোকে সস্তায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য পাইতে পারে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা হইল যে, ইহাতে শ্রমিকের সাধারণ কর্মপটুতা হ্রাস পায় ও কাজে নূতনত্ব থাকে না। একই কাজ করিতে করিতে শ্রমিকের চিত্তের বহুমুখীতা নষ্ট হয়।

উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতার উপরই শ্রমবিভাগের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে।

শিল্পের স্থানীয়করণ—যখন এক জাতীয় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান একই দ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয় উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলা হয়। আবহাওয়ার আনুকূল্য, খনিজ পদার্থ বা কাঁচা-

মাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে সেই স্থানে নৈসর্গিক কারণে শিল্প সমাবেশ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক, মূলধন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক কারণেও শিল্পগুলি একস্থানে সমবেত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, পূর্বে রাজা ও বাদশাহদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কারণেও শিল্প সমাবেশ হইত। অনেক সময় আবার প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণায় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল, শিল্পগুলি সহজে সুনাম অর্জন করিতে পারে এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে অনেক সুবিধা পায়। প্রধান শিল্পের বহু অনুপূরক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ে ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করে। ইহাতে শ্রমিকের কর্মসংস্থাপন হয়। ইহার অসুবিধা হইল যে, একটি বা কতিপয় দ্রব্য উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন কারণে মন্দা উপস্থিত হইলে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

যন্ত্র এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধা—বর্তমান যুগে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন পরিচালিত হয়। যন্ত্র মানুষের শ্রমভার লাঘব করিয়া বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে। যন্ত্র উৎপাদন-খরচা হ্রাস করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ যন্ত্র সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। যন্ত্রের অসুবিধা হইল যে, ইহাতে একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, কিন্তু বৈচিত্র্যময় উৎপাদন সম্ভব নহে। যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় মানুষের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয় ও মানুষ যন্ত্রের ক্রীতদাস হইয়া সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আপাততঃ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া বেকার সমস্যা উপস্থিত হইলেও শেষ পর্যন্ত যন্ত্র উৎপাদন-খরচা হ্রাস করে। ফলে মূল্য হ্রাস হয় ও শ্রমিকেরা এই মূল্যহ্রাসের ফলে নানাভাবে লাভবান হয়। নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র উৎপাদনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া শ্রমিকের বেকার সমস্যা দূর হয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Division of Labour is limited by the extent of the market." Discuss.

(C. U. 1945)

2. Discuss the merits and demerits of division of labour and of the modern industrial organisation based upon it.

(C. U. 1953)

3. Show how the modern industrial organisation is based upon specialisation and co-operation. (C. U. 1951)

4. "Specialisation introduces two inevitable risks into production." What are the risks ? What are the methods that have been developed to deal with these risks ?

(C. U. ; B.Com. 1950)

5. What are the factors leading to localisation of industry ? Mention the consequence of such localisation.

6. Examine the economic effects of the introduction of machinery on labour. Does machinery create unemployment ? Give reasons.

একাদশ অধ্যায়

উৎপাদনের আয়তন

(Scale of Production)

বর্তমান যুগে কোন দ্রব্যই স্বল্পপরিমাণে উৎপাদিত হয় না। একসংগে একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহু দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বহুসংখ্যক শ্রমিক ও বহু-পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বৃহদায়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। একসংগে বহুলপরিমাণে উৎপাদন করিবার কয়েকটি সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থায় উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। বহুলপরিমাণে উৎপাদন-ব্যবস্থার যে সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ব্যয়সংকোচ (Internal economies) এবং বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ (External economies).

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ব্যয়সংকোচ—Internal Economies.

এই সুবিধাগুলি সাধারণতঃ কোন শিল্পবিশেষের আভ্যন্তরীণ সু-ব্যবস্থাপনার ফলেই উদ্ভূত হয়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। ব্যবস্থাপক উৎপাদনের উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে উৎপাদন-কার্যে বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন। ফলে ব্যয়সংকোচ হয়। একজাতীয় শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এই সুবিধা সমান নহে—কারণ, ইহা ব্যবস্থাপকের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সমান নহে, সুতরাং এই ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধাগুলিরও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত কারণগুলির সমন্বয়ে ঘটিতে পারে।

(ক) যান্ত্রিক সুবিধা—**Technical economies.**

বড় ও অতি-আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া অনেক ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়। উৎপাদন-কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রত্যেক অংশটি প্রস্তুত করা যায়।

(খ) বাণিজ্যিক সুবিধা—Commercial economies.

কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়-ব্যাপারে ইহাদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দর কষাকষি করিতে পারে এবং ক্রয়-ব্যাপারে অনেক সময় সুবিধাজনক দরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

(গ) পরিচালনা-ব্যবস্থা-সম্পর্কিত সুবিধা—Managerial economies.

শিল্প-ব্যবস্থপনা-সম্পর্কেও ইহাদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থাপনা-কার্য কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগীয় ধরাবাঁধা কাজগুলি অধস্তন কর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া ব্যবস্থাপক স্বয়ং সমগ্রভাবে শিল্পটির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন।

(ঘ) আর্থিক সুবিধা—Financial economies.

বড় বড় কারবারগুলি ঋণ পরিশোধে সমর্থ—এই খ্যাতি থাকার জন্য সহজে ও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পাইতে পারে।

(ঙ) ঝুঁকিবহন-সম্পর্কিত সুবিধা—Economies arising out of risk-bearing capacity.

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ঝুঁকিবহন করিবার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাহারা নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে এবং একটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অন্যটির দ্বারা ক্ষতিপূরণ করে। তাহারা উৎপাদন-পদ্ধতি, বিক্রয়স্থল প্রভৃতি পরিবর্তন করিয়া ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। উপরি-উক্ত সুবিধা-গুলির কোনটিই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে।

বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ—External economies.

এই সুবিধাগুলি কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান-বিশেষের একচেটিয়া নহে। বস্তুতঃ, এই সুবিধাগুলির দ্বারা একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই লাভবান হইতে পারে, কারণ এই সুবিধাগুলি আভ্যন্তরীণ সু-ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধা

শিল্পপ্রতিষ্ঠান-বিশেষের প্রসারের (expansion) উপর নির্ভরশীল, অপরপক্ষে বাহ্যিক সুবিধাগুলি নির্ভর করে সমগ্রভাবে শিল্পটির প্রসারের উপর। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে অনেক অনুপূরক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রধান শিল্পটির কাঁচামাল সরবরাহ করিবার জন্য নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হইতে পারে। মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে। স্থানীয়করণের ফলে শিল্পগুলি শ্রমিক ও সরকারের সহিত যুক্তভাবে তাহাদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ধরণের সুবিধা সমগ্র শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে। যদি বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসার হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে বস্ত্রবয়ন-যন্ত্র উৎপাদিত হয়। ফলে যন্ত্র-উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায় এবং বয়ন শিল্পগুলি একযোগে কমমূল্যে বয়নযন্ত্র ক্রয় করিয়া ব্যয়-সংকোচ করিতে পারে। ইহা হইতে আর একটি অনুমান স্বাভাবিক যে, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপরি-উক্ত যে দুই জাতীয় সুবিধার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নাই। যাহা বয়নশিল্পে বাহ্যিক সুবিধা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা বয়নযন্ত্র-উৎপাদন শিল্পের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধার ফল মাত্র। অপর পক্ষে, বাহ্যিক সুবিধার অধিকারী কিছু সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি সংঘবদ্ধ হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সমুদয় সুবিধা পাইতে পারে।

বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ নিম্নলিখিত কারণে ঘটিয়া থাকে :

(ক) শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা—Economies of Localisation of Industries. শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সাধারণতঃ এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। যেখানে প্রধান শিল্পের সমাবেশ হয়, সেইস্থলে মূলধন, দক্ষ শ্রমিক ও অনুপূরক শিল্পগুলি আকৃষ্ট হয়।

(খ) তথ্যবিষয়ক সুবিধা—Economies of Information.

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবার উদ্দেশ্যে একযোগে গবেষণা ও কার্য পরিচালনা করে। গবেষণার ফল পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইরূপে শিল্পবিষয়ক উন্নততর তথ্যসমূহ সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই সমানভাবে কার্যকরী করিতে পারে।

(গ) বিশেষত্বশীলতার সুবিধা—Economies of Specialisation.

বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমগ্র উৎপাদন-কার্যটিকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা সম্ভব। বিভিন্ন বিভাগগুলি উৎপাদন-কার্যের বিভিন্ন অংশগুলিকে বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে। বয়নশিল্পে কোন প্রতিষ্ঠান ধুতি প্রস্তুত করিতে পারে, আবার কোন প্রতিষ্ঠান শাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে।

কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন কিসের উপর নির্ভর করে— Factors determining the size of a Firm.

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এবং এই উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করে। শিল্পের প্রসার যদি মুনাফা-অর্জনের সহায়ক না হয়, তাহা হইলে আয়তনবৃদ্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়তনবৃদ্ধি কতিপয় নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারের পরিধির উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্বল্প হয় এবং মূল্য যদি সচরাচর পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে উৎপাদন লাভজনক হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র থাকাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা উৎপাদককে অত্যুৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। দ্রব্যটির চাহিদা যদি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় এবং মূল্য যদি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়, তাহা হইলে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন লাভজনক হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন প্রসার লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজ সহজ এবং অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা পরিচালনা-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয় এবং শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক পরিচালকের প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, মূলধন পরিমাণের উপরও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন বহুল-পরিমাণে নির্ভর করে। যদি যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রয়

দ্বারা অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে শিল্পের আয়তন-বৃদ্ধি সম্ভব। মূলধনের অভাব ঘটিলে আয়তনের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চতুর্থতঃ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলে তাহার ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতনে ইহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না, কিন্তু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির পরিমাণ যত অধিক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা তত কম। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের এই সময়োচিত নমনীয়তার অভাবের জন্য অনেক সময় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র থাকাই ভাল।

পঞ্চমতঃ, যে সমস্ত উৎপাদনক্ষেত্রে বৃহৎ ও জটিল ধরণের যন্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন সাধারণতঃ বড় হয়। অপরপক্ষে ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে যেখানে উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ হয় এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়াই স্বাভাবিক।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারের সীমা—Limits to the expansion of a Business unit.

শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। আয়তনবৃদ্ধির ফলে নানাবিধ ব্যয়সংকোচ হয় ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য গঠনের প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়তন ক্ষুদ্র ও উৎপাদন-পরিমাণ স্বল্প হইলেও সময় ও সুযোগ পাইলেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি আয়তন-বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই আয়তন-বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। আয়তন-বৃদ্ধি নানা দিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন-বৃদ্ধির নিম্নলিখিত অন্তরায়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

১। বাজার-জনিত অন্তরায়—Marketing obstacles.

শ্রমবিভাগ নীতি আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, শ্রমবিভাগের প্রসার বাজারের আয়তন অর্থাৎ চাহিদার প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজারের বিস্তৃতি যদি স্বল্প হয় অর্থাৎ চাহিদা যদি স্থানীয় হয়, তাহা হইলে বৃহৎ বহরে উৎপাদন লাভজনক হয় না। ক্রেতাগণ যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত-

ভাবে বাস করে, তাহা হইলে বিক্রয়-খরচ বৃদ্ধি পায়। আবার কাঁচামালগুলি যদি নানা জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন-কেন্দ্রে একত্রিত করিতে হয়, তাহা হইলেও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৃহৎ বহরে একটি উৎপাদন-কেন্দ্র পরিচালিত না করিয়া বাজারের বা কাঁচামালের সন্নিকটে ছোট বহরে উৎপাদন লাভজনক হয়। অনেক সময় আবার একই জাতীয় শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার ফলে ক্রেতাগণ তাহাদের রুচি ও আয় অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সমজাতীয় দ্রব্যের একটির পরিবর্তে অপরটি ক্রয় করে। সুতরাং গুণগত বৈষম্যের জন্য প্রত্যেকটির চাহিদা সংকুচিত হয়। বাজারে যদি গুণের ঈষৎ তারতম্য-সমন্বিত পাঁচরকমের ও পাঁচটি বিভিন্ন মূল্যের মাখন প্রচলিত থাকে তাহা হইলে ক্রেতাগণ তাহাদের নিজস্ব রুচি ও আয় অনুযায়ী এক এক ধরণের মাখন ক্রয় করে। এইরূপে পাঁচটি মাখনের পাঁচটি নিজস্ব বাজার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে কোনটির উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। প্রত্যেকটির উৎপাদন ইহার নিজস্ব বাজারের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

বাজার-জনিত অন্তরায় অনেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা-উপশাখা স্থাপন করিয়া দূর করা সম্ভব হইলেও পরিচালনা-কার্যে অসুবিধা ঘটিতে পারে। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন ক্রেতাগণের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যটিই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলিয়া উৎপাদন-পরিমাণ-বৃদ্ধি-জনিত ব্যয়সংকোচ লাভ করা যায় না।

২। মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা-জনিত অন্তরায়—Financial obstacles.

অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি হইতে পারে না। চড়া সুদের হারের ক্ষেত্রে অথবা মূলধন যোগান দিবার প্রতিষ্ঠানের অবর্তমানে শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। নগদ অর্থ সংগৃহীত হইলেও অনেক সময় উৎপাদনের সহায়ক মূলধন দ্রব্য অর্থাৎ গৃহাদি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্যতা শিল্পসম্প্রসারণে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৩। পরিচালনা-সংক্রান্ত অন্তরায়—Managerial obstacles.

শিল্পপ্রতিষ্ঠান যতই প্রসার লাভ করিতে থাকে, ইহার পরিচালনা-ব্যবস্থা ততই ব্যাপক ও জটিল হয়। কৃষিকার্য ও খুচরা বিক্রয়-ক্ষেত্রে মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের অভাব ঘটিলে উৎপাদনকার্য ব্যাহত হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের সাফল্য মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভর করে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্ষুদ্র হয়; নতুবা পরিচালনা-সংক্রান্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার, যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিয়ম-মাফিক ভাবে যে সমস্ত স্থলে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, সেখানকার পরিচালনা-কার্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে চলিতে পারে। এজন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন স্ফীত হওয়া সম্ভব। বর্তমানে শিল্প-ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনা (Scientific Management) সম্ভব হইলেও সকল শিল্পে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। সুতরাং বৃহৎ বহরে উৎপাদন-ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র বহরের উৎপাদন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্পব্যবস্থাপনার কার্যে ব্যবস্থাপকের পরিচালনা-শক্তিরও একটি সীমা আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন বিভাগের সমাবেশে অতি বৃহৎ হয়, তাহা হইলে পরিচালকের পক্ষে কার্যকরীভাবে সমস্ত বিভাগের যথাযথ তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত বিভাগগুলির কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সাধ্যাতীত হয়। পরিচালকের তত্ত্বাবধান শিথিল হইলে শিল্পে দক্ষতার অভাব দেখা দেয়। ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়। সুতরাং শিল্পের প্রসার পরিচালনা-ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

কৃষি ও বৃহদায়তন উৎপাদন—Agriculture and Large-scale production.

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনক্ষেত্রে ও পরিবহন-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব। কৃষির ক্ষেত্রে এই উৎপাদনপদ্ধতি প্রযোজ্য নহে বলিয়া এতদিন লোকের ধারণা ছিল। কৃষিকার্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি বৃহৎ বহরে উৎপাদনের অন্তরায় ঘটায়। প্রথমতঃ, কৃষিকার্যে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিশেষত্বশীলতার বিশেষ কোন স্থান নাই। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন-কার্য স্বল্প-পরিমাণ স্থানে কেন্দ্রীভূত করা যায় এবং সেইজন্য পরিচালক সুষ্ঠুভাবে সমগ্র

উৎপাদন-কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। কিন্তু কৃষিকার্য দীর্ঘপরিসর স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিক্ষেত্র যদি শত শত মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত হয়, তাহা হইলে উপযুক্তভাবে তাহার পরিচালনা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, কৃষিকার্য শিল্পের ন্যায় কোনরূপ নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী নহে।

কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ উৎপাদনপদ্ধতি প্রযোজ্য নহে একথা স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হইবে যে, সোভিয়েত দেশে ইহা সম্ভব হইয়াছে। সেদেশের যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলির যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ হয় এবং এই পদ্ধতির ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—Small-scale production.

বর্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ বলিয়া অভিহিত হয়। এই যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন শিল্পের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বৃহদায়তন শিল্পগুলি বহু দিক দিয়া এত সুবিধার অধিকারী যে, এই অতিকায় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান জীবিত থাকিতে পারে না। বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাবের ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখনও পর্যন্ত কোন রকমে টিকিয়া আছে। তাহারা মৃতকল্প অবস্থায় থাকিলেও একেবারে মরিয়া যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইল যে, কি কারণে তাহারা এই তীব্র অসম প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও বাঁচিয়া আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর হইল যে, প্রথমতঃ, বৃহদায়তন শিল্প সর্বক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করিতে পারে না এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উৎপাদন-ব্যাপারে অধিকতর সুবিধার অধিকারী।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার জন্য কৃষিকার্যে বৃহৎ আকারে উৎপাদন সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত হস্তদ্বারা সম্পাদিত শিল্পের ক্ষেত্রেও বৃহৎ বহরে উৎপাদন অসম্ভব।

২। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রধান সুবিধা হইল শিল্পের মালিক স্বীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করে। মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত কাজ করে, অপরের স্বার্থের জন্য তদ্রূপ করে না।

৩। শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে অধিকতর মনোযোগ ও তৎপরতার

সহিত পরিচালনা-কার্য সম্পাদিত হয়। মালিকের সদা-জাগ্রত দৃষ্টি সর্বত্র নিবদ্ধ থাকে। উৎপাদনের ত্রুটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪। ক্ষুদ্র শিল্পে মালিককে ব্যক্তিগতভাবে তাহার অধস্তন কর্মিবৃন্দের সংস্পর্শে আসিতে হয়। এই ব্যক্তিগত পরিচয় ও প্রভাব কর্মিবৃন্দকে কার্যে অনুপ্রেরণা দান করে।

৫। ক্ষুদ্র শিল্পে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কম এবং মালিক স্বয়ং বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে অতি সহজে সংযোগ সাধন করিতে পারে। এজন্য তাহার বিশেষজ্ঞের সহিত বিস্তৃত আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

৬। বৃহদায়তনের শিল্পগুলি শুধু নির্ধারিত মান অনুযায়ী অর্থাৎ এক রকমের দ্রব্য উৎপাদন করে। ইহারা ক্রেতার রুচির পরিচর্যা করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি এদিক দিয়া অধিকতর সুবিধার অধিকারী। তাহারা হস্তদ্বারা সুরুচিকর দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লোকের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ করিতে পারে।

৭। বর্তমান যুগে শিল্পের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধাগুলি অপেক্ষা বাহ্যিক সুবিধাগুলি বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পবিষয়ক জ্ঞানের সহজ ও বহুল প্রচারের ফলে ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলিও নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া তাহার বহু অসুবিধা দূর করিতে সামর্থ হইয়াছে। সুতরাং বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহার পক্ষে টিকিয়া থাকা একেবারে অসম্ভব মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই।

পরিবর্তনশীল অনুপাতের সূত্র—Law of Variable Proportion.

ভূমি সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অধিক পরিমাণে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্রটি সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। শিল্পের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মূলধন ও শ্রম বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সূত্র (Law of Increasing Returns) বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগের সমানুপাতে উৎপাদন

বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্র বা Law of Constant Returns বলা হয়।

অধুনা ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটি যে শুধুমাত্র কৃষিকার্যে প্রযোজ্য তাহা নহে—এই সূত্রের প্রয়োগ উৎপাদন-কার্যের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁহারা বলেন যে, উৎপাদন-কার্যে যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য সহযোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের একটি অবস্থায় অন্য উপাদানগুলির বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। কৃষির ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-সম্পর্কিত উৎপাদনক্ষেত্রেও এই সূত্রটি কার্যকরী হইতে পারে। যদি কোন কারণবশতঃ উৎপাদনের একটি উপাদানের সরবরাহ সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য সহ-যোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন সমানুপাতিক হয় না অর্থাৎ উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। শিল্পের পরিচালক উপাদানসমূহের যথাযথ-ভাবে সংযোগসাধন করিলেও এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। যদি কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের সমগ্র উপাদানগুলির পরিমাণ সমানু-পাতিক হারে বৃদ্ধি করে ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে তাহাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি একটি মাত্র উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করে ও অন্যগুলির মাত্রা ঠিক রাখে তাহা হইলে সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। যদি ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় অথবা মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। উৎপাদনের এই বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের পরিবর্তনশীল অনুপাত বলিয়া পরিচিত।

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের পরিমাণ—

বহুসংখ্যক শ্রমিক ও বহুপরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বর্তমান যুগে

যন্ত্রের সাহায্যে একসংগে বহুপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, ইহাতে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ও বাহ্যিক সুবিধা পাওয়া যায়। যান্ত্রিক সুবিধা, বাণিজ্যিক সুবিধা, আর্থিক সুবিধা হইল আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। শিল্প স্থানীয়করণজনিত সুবিধা, বিশেষত্বশীলতার সুবিধা প্রভৃতি বাহ্যিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। এই সুবিধাগুলির জন্য উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিলে ব্যয়সংকোচ হয়। কিন্তু এই প্রসারেরও একটা সীমা আছে।

১। প্রসারের খরচা একটি নির্দিষ্ট স্থলে এত অধিক হয় যে, অধিক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিয়াও সমানুপাতিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

২। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি—চাহিদা স্বল্প হইলে অধিক উৎপাদন লাভজনক হইতে পারে না।

৩। পরিচালকের পরিচালন-ক্ষমতার উপর শিল্পের প্রসার নির্ভর করে।

৪। স্থানের অভাবে ও মূলধনের অভাবে শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় না।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন কিসের উপর নির্ভর করে—

কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃহৎ হইবে বা ক্ষুদ্র হইবে তাহা কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথা,

১। বাজারের বিস্তৃতি ও দ্রব্যমূল্য—

দ্রব্যটির চাহিদা যদি ব্যাপক হয় ও মূল্য যদি অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে শিল্পটির আয়তন বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিপরীত ক্ষেত্রে আয়তন ক্ষুদ্র থাকে।

২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজ যদি সহজ হয় এবং অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আয়তন ক্ষুদ্র হয়, পক্ষান্তরে জটিল ও নানাধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার অপরিহার্য হইলে আয়তন বৃদ্ধি পায়।

৩। মূলধনের সহজ প্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতার উপরেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে।

৪। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতনজনিত ঝুঁকিবহন ক্ষমতার অভাব ক্ষেত্রে শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হয়—ঝুঁকিবহনে সক্ষম হইলে আয়তন বৃহৎ হয়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারের সীমা—

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন-বৃদ্ধির নানা অন্তরায় দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,

১। বাজার-জনিত অন্তরায়, ২। মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা-জনিত অন্তরায় ও ৩। পরিচালন-সংক্রান্ত অন্তরায়। এই অন্তরায়গুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাপকের পরিচালন-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই শিল্পের আয়তন-বৃদ্ধির বাধা সৃষ্টি করে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—

বৃহদায়তন শিল্পের যে সুবিধা আছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সে সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন-খরচা অধিক হয়, ফলে বৃহদায়তন শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা পরাজিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখনও পর্যন্ত টিকিয়া আছে তাহার কারণ হইল—

১। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ক্রেতার বিভিন্ন রুচি ও চাহিদার পরিচর্যা করিতে পারে।

২। শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচালকের তত্ত্বাবধান দৃঢ়তর হয় ও অপচয় নিবারিত হয়।

৩। পরিচালকের ব্যক্তিগত প্রভাবে শ্রমিকগণ কাজে অধিকতর উৎসাহিত হয়।

৪। বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থার সুবিধাগুলির অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পূর্বে তাহাদের যে অসুবিধা ছিল তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে।

পরিবর্তনশীল অনুপাতের সূত্র—

বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অনুপাত অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, কোথায়ও বা সমানুপাতিক হয় আবার কোথাও বা ক্রমহ্রাসমান হয়। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বতন ধনবিজ্ঞানিগণ ক্রমহ্রাসমান, সমানুপাতিক, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন—এই তিনটি সূত্রের

অবতারণা করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সূত্রই প্রযোজ্য এবং সেই সূত্রটি হইল পরিবর্তনশীল অনুপাতের সূত্র। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যখন উৎপাদনের উপাদানগুলির একটির পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্যগুলির অনুপাত বৃদ্ধি করা হয়, তখন উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। যদি উৎপাদনের উপাদানগুলির প্রত্যেকটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া অপর দুইটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, সেইজন্য কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Why does Small-scale production still persist in many industries? (C. U. 1940)

2. Distinguish between internal and external economies with suitable examples. Do these economies continue indefinitely? Give reasons for your answer. (C. U. 1959)

3. Explain carefully the factors which tend to set a limit to the growth of a firm. (C. U. 1960; B.Com. 1961)

4. What are the conditions under which Small-scale production units are preferable to Large-scale units? (C. U. B.Com. 1951)

5. Explain and illustrate what is meant by 'External' and 'Internal' economies. Discuss in this connection the limits of Large-scale production. (C. U. B.Com., 1957)

6. Discuss the factors that determine the size of business units. (C. U. 1955)

7. Discuss carefully the economies that are likely to result from the expansion of the size of a firm. (C. U. B.Com., 1960)

8. Indicate the chief types of internal and external economies with suitable examples. (C. U. 1962)

একাদশ অধ্যায়

শিল্পসংহতি

(Industrial Combinations)

নানাকারণে শিল্পগুলি প্রসারলাভ করিতে পারে। নির্দিষ্ট কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাহার নিজস্ব আয়তন বৃদ্ধি করিয়া বা অন্য শিল্পের সহিত যুক্ত হইয়া প্রসারলাভ করে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিলে শুধু যে তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সংগে সংগে ইহার উৎপাদন-কার্যেরও পরিবর্তন ঘটে। কোন শিল্প প্রসারলাভ করিলে তাহাতে নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি সংযুক্ত হয় এবং নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। শিল্প-সংহতির দ্বারা শিল্পের যেরূপ প্রসার ঘটে, সংহতির অভাবে শিল্পের তদ্রূপ সংকোচন হয়, ফলে কিছু উৎপাদন-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পায়।

শিল্পসংহতির উদ্দেশ্য—Motives leading to the combination of firms.

বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নানাপ্রকার সুবিধা-লাভের জন্য অতিকায় বহরে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করা। এইজন্য শিল্পগুলি নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া এবং মূলধন ও অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধি দ্বারা প্রসার লাভ করে। আবার অনেক সময় একাধিক সমজাতীয় শিল্পের সংযুক্তির ফলে একটি বৃহদায়তন শিল্পের সৃষ্টি হয়। শিল্পের প্রসার-লাভের নানা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে :

১। ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্য—Economies Motive.

উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ও বাহ্যিক কতকগুলি ব্যয়সংকোচ হয়। ইহার ফলে প্রতিমাত্রা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। এই ব্যয়সংকোচের অভিপ্রায়ে অনেক সময় শিল্পের

প্রসার লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল শিল্পের পক্ষে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়সংকোচ করা সম্ভব হয় না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিচালনা-জনিত, বাজার-জনিত বা অর্থসম্পর্কিত অন্তরায় দ্বারা শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়।

২। একচেটিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্য—Monopoly Motive.

বাজারে একচেটিয়া অথবা আধা-একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় শিল্পের কলেবর বৃদ্ধি পায়। একাধিক শিল্পের সংযুক্তির দ্বারাই শিল্পের এই জাতীয় প্রসারলাভ ঘটিয়া থাকে। শিল্পসংযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হইল বাজারে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা অর্জন করা। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্য ও একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্য পরস্পরের পরিপূরক কারণ ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে প্রসার লাভ করিতে করিতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া অবস্থায় পরিণত হইতে পারে; পক্ষান্তরে একচেটিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পাইলেও এই প্রসারলাভের ফলে নানাবিধ ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়। মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা নিছক অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য যখন শিল্পসংযুক্তি ঘটে, তখন এই শিল্পসংযুক্তি দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কতকগুলি সমাজসেবা-মূলক শিল্পের ক্ষেত্রে, যথা, রেল, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতি, একচেটিয়া স্থাপন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।

৩। ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য—Power Motive.

উপরি-উক্ত দুইটি উদ্দেশ্য ব্যতীতও ক্ষমতালাভের ইচ্ছাও অনেক সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারের অন্যতম কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ মুনাফা অর্জন ছাড়াও সমাজে পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করিয়া থাকে। বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া মানুষ যে আত্মতৃপ্তি ও গৌরবের অধিকারী হয়, তাহার আকর্ষণ অত্যধিক মুনাফা লাভের আকর্ষণ অপেক্ষা ন্যূন নহে। স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিবার অধিকার, সহস্র সহস্র শ্রমিক ও কর্মীর উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এবং বংশানুক্রমে এই ক্ষমতার অধিকারী থাকা মানুষকে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি

করিতে প্রলুব্ধ করে। রকফেলার, কারনেগী, ফোর্ড এবং ভারতের টাটা, জাপানের মিট্‌শুইয়ী ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

৪। **অর্থলাভের উদ্দেশ্য—Financial Motive.**

যখন একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি ঘটে তখন এই শিল্পসংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ কমিশন হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ পাইয়া থাকেন। শিল্পসংযুক্তির ফলে সম্মিলিত শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয় এবং শিল্পসংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ভিত্তিতে শেয়ার ও অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা-অর্জনের সুযোগ পায়। এই অতিরিক্ত অর্থলাভের উদ্দেশ্যেও সংযুক্তির দ্বারা শিল্পের প্রসার ঘটিয়া থাকে।

৫। **বিবিধ উদ্দেশ্য—Other Motives.**

উপরি-উক্ত চারিটি উদ্দেশ্য ব্যতীতও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণেও শিল্পের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। দেশের প্রচলিত আইন যদি পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আইন-পরিবর্তনের ফলে তাহাদের নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া নূতন ধরণের দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হয়। নূতন আইন-প্রবর্তনের ফলে নূতন শাখা স্থাপন করিতেও হইতে পারে। নূতন আইনে যদি অ-বন্টিত মুনাফার উপর কর ধার্য না হয়, তাহা হইলে অনেক সময় এই অ-বন্টিত মুনাফা মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিয়া শিল্পের প্রসারলাভ ঘটিতে পারে। কিন্তু অ-বন্টিত মুনাফার উপর কর ধার্য হইলে শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শিল্পসংহতির পদ্ধতি—Process of Integration.

অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া অর্থাৎ একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা সাধারণতঃ শিল্পসংহতি ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ, যদি কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একই দ্রব্য উৎপাদনকারী অথবা বিক্রয়কারী অন্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে **সমান্তরাল সংহতি** (**Horizontal Combination**) বলা হয়।

কয়েকটি ব্যাংক একত্রিত হইয়া যদি একই ব্যাংকে পরিণত হয় তাহা হইলে ব্যাংকগুলির এই সংহতিকে সমান্তরাল সংহতি বলা যায়। সমান্তরাল সংহতি প্রসারলাভ করিয়া কালক্রমে আন্তর্জাতিক প্রসারসম্পন্ন হইতে পারে।

সমান্তরাল সংহতির একাধিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা নিবারণ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা এই জাতীয় সংহতির প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত শিল্প-সংহতির দ্বারা নানাভাবে ব্যয়সংকোচ করাও ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যখন কোন শিল্পের পৃথক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বা পদ্ধতিগুলি যুক্ত হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাহাকে **উর্ধ্বাধো সংহতি (Vertical Combination)** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একখানি পুস্তক অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে রচিত হয়। যথা, পুস্তক মুদ্রণকার্য, পুস্তক বাঁধান ও পুস্তক প্রকাশ করা। প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পুস্তক-প্রণয়নের এই তিনটি কার্য তিনটি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু যদি কোন পুস্তক-প্রকাশক তাহার নিজস্ব মুদ্রণ বিভাগ ও বাঁধাই বিভাগ স্থাপনা করিয়া একসংগে পুস্তক-প্রণয়নের তিনটি কার্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে পুস্তক-প্রণয়ণের এই তিনটি কার্যের সংহতি উর্ধ্বাধো সংহতি বলিয়া পরিচিত হয়। এই সংহতি আবার উর্ধ্ব হইতে নিম্নাভিমুখী হইতে পারে অথবা নিম্ন হইতে উর্ধ্বাভিমুখী হইতে পারে। উপরি-উক্ত উদাহরণ হইতেই উর্ধ্বাধো সংহতি গঠনের এই দুইটি ভিন্ন প্রবণতা সূচিত হয়। ছাপাখানার সহিত যদি পুস্তক বাঁধান ও পুস্তক-প্রকাশনা বিভাগ যুক্ত হয়, তাহা হইলে এই সংহতিকে নিম্ন হইতে উর্ধ্বাভিমুখী বলা যাইতে পারে, অপরপক্ষে পুস্তক-প্রকাশনা বিভাগের সহিত যদি বাঁধান ও মুদ্রণ বিভাগ দুইটি যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে উর্ধ্ব হইতে নিম্নাভিমুখী বলা হয়। কয়লার খনির কার্য, লৌহখনির কার্য, অপরিষ্কৃত লৌহ প্রস্তুতকরণ ও ইস্পাত প্রস্তুত-কার্য যুক্ত হইয়া যখন একই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তাহাও উর্ধ্বাধো সংহতি বলিয়া অভিহিত হয়।

অধুনা এই উর্ধ্বাধো সংহতি আবার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। অনেক সময় অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে অথবা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় দ্রব্য বা কাজ দ্বারা

ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে চেষ্টা করা হয়। এরোপ্লেন কোম্পানীগুলি এই উদ্দেশ্যে যাত্রীদের সুবিধার জন্য পরিবহন-ব্যবস্থা, ভ্রমণ-ব্যবস্থা ও হোটেল প্রভৃতি রাখে। ইহাকে **পার্শ্বাভিমুখান্ সংহতি (Lateral Integration)** বলা হয়।

অনেক সময় আবার উর্ধ্বাধো সংহতিগুলি বিভিন্ন স্থানে শাখা-প্রশাখা স্থাপন করিয়া স্থানীয় বাজার অধিকার করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে পরিবহন-খরচা হ্রাস পায় ও বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুনাফা বৃদ্ধি করে। ইহাকে **স্থানিক সংহতি (Territorial Integration)** বলা হয়।

সমান্তরাল সংহতির সুবিধা ও অসুবিধা—Advantages and Disadvantages of Horizontal Combination.

সমান্তরাল সংহতির প্রধান সুবিধা হইল যে, শিল্পসংহতির ফলে তাহাদের মধ্যে আর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং প্রতিযোগিতার তীব্রতার জন্য বাধ্য হইয়া আর মূল্য হ্রাস করিতে হয় না। সমান্তরাল সংহতির পরিণতি হইল একচেটিয়া ব্যবসায়। সুতরাং এই ব্যবস্থার দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে উৎপাদন-খরচাও হ্রাস পায়।

কিন্তু এই জাতীয় সংহতির প্রধান অসুবিধা হইল যে, সংহতির ফলে অত্যুৎপাদন (over-production) ঘটিয়া শিল্পে সংকট দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংহতির ফলে নানারূপে ব্যয়সংকোচ হইলেও উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার অসুবিধা হইতে পারে। ফলে উৎপাদন-কার্য ব্যাহত হইয়া শিল্পে সংকট উপস্থিত হয়। শিল্পের অত্যধিক সংহতির ফলে অতিকায় শিল্পের আবির্ভাব হইলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

উর্ধ্বাধো সংহতির সুবিধা ও অসুবিধা—Advantages and Disadvantages of Vertical Combination.

উর্ধ্বাধো সংহতির একটা প্রধান সুবিধা হইল একই শিল্প-ব্যবস্থাপনায় নানা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়া ব্যয়সংকোচ করা যায়। ব্যয়সংকোচের ফলে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যাপারে কোন শিল্পের যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ সংহতির দ্বারা সে সম্ভাবনা দূরীভূত

হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অপরিহার্য সহায়ক সামগ্রী হইল কয়লা। কয়লার খনি ক্রয় করিয়া মূলশিল্পের সহিত সংযুক্ত করিলে শুধু যে ব্যয়সংকোচ হয় তাহা নহে, এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটির প্রাপ্তি সম্পর্কেও আর কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। অনেক সময় বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মূলশিল্পটি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা-প্রসারের ব্যবস্থা করে।

উর্ধ্বাধো সংহতি নিয়ন্ত্রিত না হইলে কালক্রমে ইহা একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ইহারা মূল্য বৃদ্ধি করে, ফলে জনসাধারণের স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকে। এই সংহতির ফলে ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির পক্ষে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হয়।

শিল্পসংহতির বিভিন্ন রূপ—Various Forms of Industrial Combinations.

শিল্পসংহতির বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংহতির আপেক্ষিক দুর্বলতা বা দৃঢ়তার ভিত্তিতে ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। এইরূপ শিল্পসংহতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা। সংহতির দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অথবা মূল্য স্থির করিয়া ক্রেতাকে ক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকোচন করিয়া উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য এইরূপ শিল্প-সংহতির আবির্ভাব হয়।

১। যখন কোন শিল্পে বা ব্যবসায়ে সংকট উপস্থিত হয় তখন শিল্পপতিগণ বা ব্যবসায়িগণ সংকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। যদি অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে শিল্পে মন্দা দেখা দেয় তাহা হইলে তাহারা মিলিতভাবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ভারতের পাটশিল্প সমিতি এই জাতীয় সংহতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২। অনেক সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মূল্যনির্ধারণ ব্যাপারে ও ক্রেতাকে অন্যবিধ সুবিধাদান ব্যাপারে সমতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়। যদি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মূল্যের তারতম্য হয় তাহা হইলে তাহাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্রেতার সুবিধা হয়। এই

উদ্দেশ্যে শুধু মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যতীতও ক্রেতাকে অন্য নানাবিধ যে সুবিধা দেওয়া হয় যথা, ধারে বিক্রয় করা বা বাট্টা দেওয়া, সে সম্পর্কেও তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে।

৩। বহুস্থলে আবার প্রতিযোগিতার তীব্রতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িগণ বিক্রয়স্থল নির্ধারিত করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন বাজারে বিক্রয় করে, সুতরাং একের সহিত অপরের প্রতিযোগিতা হইতে পারে না।

৪। উৎপাদক সংঘ—Cartel.

যখন একজাতীয় অথচ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়স্থল নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে উৎপাদক সমিতি বলা হয়। শিল্প বা ব্যবসায়ের এইরূপ সংহতির বৈশিষ্ট্য হইল যে, উৎপাদক সমিতিতে যোগদানকারী প্রত্যেকটি মূল প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন সত্তা অব্যাহত থাকে। তাহাদের আভ্যন্তরীণ-ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা এইরূপ সংহতির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না। পারস্পরিক সুবিধার জন্যই তাহারা সংঘবদ্ধ হয় এবং সদস্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি বিক্রয় সংঘের (Sales bureau or Syndicate) নিকট তাহাদের নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন হস্তান্তরিত করে। এই বিক্রয়সংঘ মূল্য স্থির করে, উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে এবং সমগ্র ক্রয়ের আবেদন গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বাজারে মাল সরবরাহ করে। ভারতে শর্করা শিল্প সমিতি ও সিমেন্ট শিল্প সমিতি এই জাতীয় সংহতির উদাহরণ ছিল। জার্মানীতে সর্বপ্রথম এই জাতীয় সংহতির আবির্ভাব হয়।

৫। যৌথ ব্যবসায়—Trust.

যৌথ ব্যবসায় সমান্তরাল পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণতঃ গঠিত হয়। যখন একই জাতীয় দুই বা ততোধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় সংঘবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে তখন শিল্পের এই সংঘবদ্ধতাকে যৌথ ব্যবসায় বলা যাইতে পারে। যৌথ ব্যবসায়ে পূর্বে অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়া একই ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। ইহাই হইল উৎপাদক সমিতি ও যৌথ ব্যবসায়ের প্রধান পার্থক্য।

৬। একত্রীকরণ সমিতি—Holding Company.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সারম্যান্ আইনের দ্বারা যখন যৌথ ব্যবসায় গঠন করা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়, তখন এই আইনকে ব্যর্থ করিয়া নূতন এক ধরণের শিল্পসংহতি গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সমিতির অধীনে যৌথ ব্যবসায় গঠন করিয়া যোগদানকারী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলি একটি একত্রীকরণ সমিতির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সমিতিই সমগ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নীতি নির্ধারণ করে।

যৌথ ব্যবসায় ও উৎপাদক সংঘের আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা—Relative merits and demerits of Trusts and Cartels.

১। উৎপাদক সমিতি অপেক্ষা যৌথ ব্যবসায় অধিকতর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। যৌথ ব্যবসায় একই পরিচালনাধীন একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া শিল্পপরিচালনাক্ষেত্রে একই নীতি অনুসৃত হয়। উৎপাদক সমিতি হইল কতকগুলি স্বতন্ত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমাবেশ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ ইচ্ছামত সমিতি পরিত্যাগ করিতে পারে।

২। উভয় প্রকারের সংহতির উদ্দেশ্য হইল মূল্যবৃদ্ধি করিয়া অধিকতর মুনাফা অর্জন করা। এ বিষয়ে উৎপাদক সমিতি অপেক্ষা যৌথ ব্যবসায়ের সুবিধা অনেক বেশী। যৌথ ব্যবসায়ে মূল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়া একই পরিচালনার অধীন হয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার অভাব দেখা যায় তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানকে হয় দক্ষ করিয়া গঠন করা হয়, নতুবা একেবারে উৎসাদিত করা হয়। এইরূপে যৌথ ব্যবসায়ে একই ব্যবস্থাপনার ফলে শিল্পের সর্বাংগীণ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু উৎপাদক সমিতির ক্ষেত্রে সদস্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পৃথক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ-হ্রাস ও বিক্রয়-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিয়া ব্যয়সংকোচ করা ব্যতীত অন্য কোনভাবে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

৩। উৎপাদক সমিতি অপেক্ষা যৌথ ব্যবসায় স্থাপন করা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। উৎপাদক সমিতি হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বেচ্ছাকৃত সংহতি। এই সংহতির জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহা সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানই বহন করে।

কিন্তু যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিযোগিতা নিরোধ করিয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও পুরাতন পদ্ধতিতে চালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক মূল্যে ক্রয় করে।

৪। উৎপাদক সংঘে একই শিল্পের সকলে না হইলেও প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি যোগদান করে। ফলে উৎপাদক সমিতির বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। সেইজন্য ইহা অধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যৌথ ব্যবসায় দেশের একজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সকলকে লইয়া গঠিত হইতে পারে না। ইহার কিছুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে ও সেইজন্য ইহার পক্ষে অত্যধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয় না।

৫। উৎপাদক সংঘ হইল কতকগুলি স্বতন্ত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমাবেশ। ইহাদের নিজস্ব উৎপাদন-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা থাকে। কিন্তু যৌথ ব্যবসায় একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত একটিমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং উৎপাদক সমিতি ভাঙ্গিয়া গেলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন উৎপাদন-শক্তি ব্যাহত হয় না এবং সেইজন্য বাজার মূল্যের উপর ইহার কোন সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। অপর পক্ষে যৌথ ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া গেলে উৎপাদন-ব্যবস্থা এরূপভাবে বিপর্যস্ত হয় যে, বাজার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া ক্রেতার স্বার্থ ব্যাহত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

শিল্পসংহতি—শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব আয়তন বৃদ্ধি করিয়া বা অন্য সমজাতীয় শিল্পের সহিত যুক্ত হইয়া প্রসারলাভ করিতে পারে। দুই প্রকারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসারলাভ ঘটে। ১। সমান্তরাল সংহতি ও ২। ঊর্ধ্বাধো সংহতি। যখন একই জাতীয় অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এক ব্যবস্থাপনার অধীন হয়, তখন তাহাকে সমান্তরাল সংহতি বলা হয়। একই শিল্পের বিভিন্ন স্তরগুলি পৃথক্ ব্যবস্থাপনা হইতে যখন একই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাহাকে ঊর্ধ্বাধো সংহতি বলা হয়। ৪।৫টি পাটকল মিলিত হইয়া যদি একই মালিকের অধীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমান্তরাল সংহতি বলা হয়। আবার জুতা তৈরী করিবার বিভিন্ন স্তরগুলি যথা, কাঁচা চামড়া পাকা করা, চামড়া কাটা, সেলাই করা, বার্নিশ করা যাবতীয় কার্য যদি একই পরিচালনাধীন হয়, তাহা

হইলে উহা উর্ধ্বাধো সংহতি বলিয়া পরিচিত হয়। এইরূপ সংহতির উদ্দেশ্য হইল—১। প্রতিযোগিতা দূর করা, ২। উৎপাদন-খরচা হ্রাস করা ও ৩। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

শিল্পসংহতি নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে—

১। বিক্রয় সমিতি, ২। উৎপাদক সংঘ ও ৩। যৌথ ব্যবসায়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যখন প্রধানতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাদিগকে বিক্রয় সমিতি বলা হয়। ইহারা শুধু উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে, কিন্তু অন্য বিষয়ে স্বাধীন থাকে। উৎপাদক সমিতি আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। মূল্যনির্ধারণ, উৎপাদন-পরিমাণ স্থিরীকরণ ও বিক্রয়স্থল-নির্ধারণ এই সমিতির প্রধান কার্য। এইজন্য উৎপাদক সমিতির একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে। যৌথ ব্যবসায়ে বিভিন্ন শিল্পগুলি সমান্তরাল পদ্ধতিতে একত্রিত হইয়া একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাহাদের পৃথক্ কোন সত্তা থাকে না।

1. What are Trusts and Cartels? Examine their merits and demerits. (C. U. 1945)

2. Illustrate what you mean by vertical and horizontal combination. Discuss their advantages and disadvantages. (C. U. B. Com. 1952)

3. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti-social? (C. U. 1956)

4. Account for the fact that in certain industries efficiency and economy can be secured only by monopolistic control. How is the interest of consumers safeguarded in such cases? (C. U. B. Com. 1949)

5. Distinguish between the chief types of industrial combinatous, and indicate the factors which favour their growth. (C. U. 1961)

দ্বাদশ অধ্যায়

সরবরাহ ও উৎপাদন-খরচা

(Supply and Cost of Production)

ধনবিজ্ঞানে চাহিদা বলিলে যেমন একটা নির্ধারিত মূল্যে একটা নির্দিষ্ট-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় বুঝায়, সরবরাহ বলিলেও তদ্রূপ নির্ধারিত মূল্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের সরবরাহ বুঝায়। মূল্য-নিরপেক্ষভাবে যেরূপ চাহিদার পরিমাপ করা যায় না, তদ্রূপ সরবরাহের পরিমাপও করা যায় না। সুতরাং সরবরাহের পরিমাণ দ্রব্যটির চল্‌তি মূল্যের উপর সাধারণতঃ নির্ভর করে। উৎপাদন-খরচা সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদন-খরচা যদি এত বেশী হয় যে, ঐ খরচা দ্বারা মূল্য স্থির করা সম্ভব নয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে খরচার অনুরূপ মূল্যে বিক্রয় সম্ভব হয়, ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্যই উৎপাদিত হয়। ইহার আর একটি ফল হইল যে, যে-সমস্ত উৎপাদন-শিল্পের উৎপাদন-খরচা চল্‌তি মূল্য অপেক্ষা অধিক, তাহারা উৎপাদনে বিরত থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এইরূপে মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সমান হয়।

সরবরাহের সূত্র—Law of Supply.

মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, মূল্য হ্রাস পাইলে সরবরাহ সাধারণতঃ হ্রাস পায়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রেতার লাভের সম্ভাবনা অধিক হয়, সুতরাং বিক্রেতা অধিক পরিমাণ সরবরাহ করে। চাহিদার নিয়ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দাম বাড়িলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। অপর পক্ষে দাম ও যোগানের পরিবর্তনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। চাহিদার তালিকার ন্যায় যোগানেরও তালিকা প্রস্তুত করা যায়। মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে বিক্রেতাগণ যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহার তালিকাকেই যোগানের তালিকা বলা যায়। যোগান সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

সের প্রতি ঘিয়ের দাম		ঘিয়ের যোগান পরিমাণ
১০ টাকা	—	২০ মণ
৯ ,,		১৮ ,,
৮ ,,		১৬ ,,
৭ ,,		১৩ ,,

[তালিকাটি প্রমাণ করে যে, দাম বেশী হইলে বিক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। যে নির্দিষ্ট দামে তাহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাকে যোগান-দাম বলা হয়।]

অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় সরবরাহের সূত্রটি অনুমানসিদ্ধমাত্র। নিম্নলিখিত কারণে এই সূত্রটির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের সরবরাহ হ্রাস পায়; ইহার কারণ হইল যে, মজুরি-বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক কম কাজ করে এবং শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের শ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। একজনের আয়ে পরিবার প্রতিপালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখনও যাহারা পরবর্তী কালে একটা নির্দিষ্ট আয়ের জন্য সঞ্চয় করে তাহারা সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস করে। কারণ সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অল্প সঞ্চয়ে অধিক আয় হয়।

সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of Supply.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ন্যায় সরবরাহেরও স্থিতিস্থাপকতা আছে। মূল্য পরিবর্তনের হারও যোগান পরিমাণ পরিবর্তনের হারের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বুঝিবার জন্য যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়। মূল্য পরিবর্তনের ফলে যে হারে যোগান পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহাকেই সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যখন মূল্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহে মূল্য-পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা অধিক পরিবর্তন ঘটে, তখন তাহাকে স্থিতিস্থাপক সরবরাহ বলা হয়। অপর পক্ষে যখন মূল্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহে তদপেক্ষা কম পরিবর্তন ঘটে, তখন তাহাকে অস্থিতিস্থাপক সরবরাহ বলা হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য শতকরা একভাগ বৃদ্ধির ফলে যোগান যদি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যটির যোগান স্থিতিস্থাপক

(Elastic)। অপর পক্ষে মূল্যের শতকরা একভাগ বৃদ্ধির ফলে যোগান পরিমাণ যদি শতকরা একভাগের কম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে যোগানকে অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) বলা হয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিতরূপে নির্ধারিত করা যায় :

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{মূল্যের শতকরা পরিবর্তন}}$$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ন্যায় সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতাও অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রধানতঃ, ইহা নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদানগুলির সহজপ্রাপ্যতার উপর। যদি উৎপাদনের উপাদানগুলি সহজে পাওয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদক এইগুলির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু এই উপাদানগুলি যদি দুর্লভ হয় তাহা হইলে সরবরাহ অপরিবর্তনীয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, একাধিক বিক্রয়স্থল থাকিলে যদি এক বাজারে মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে সেই বাজার হইতে সরবরাহ হ্রাস করিয়া উচ্চমূল্যের বাজারে সরবরাহ স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে এক বাজারে সরবরাহ পরিবর্তনশীল হয়।

সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ—Causes of changes in Supply.

নানা কারণে যোগানের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

প্রথমতঃ, যাহারা দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহারা যদি উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ নিজেদের ভোগের জন্য ব্যবহার করে বা ঐ সমস্ত দ্রব্যের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করে তাহা হইলে বাজারে যোগান পরিমাণ হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বাজারের যোগান পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাবে যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। সময় মত উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলে ধান, পাট প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যোগান বাড়ে, আর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের হানি হয়। ফলে যোগান কমে।

চতুর্থতঃ, সরকার কোন দ্রব্যের উপর যদি কর ধার্য করে তাহা হইলে সেই দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে দ্রব্যটির মূল্য বাড়িয়া যায়।

মূল্য বাড়িয়া গেলে চাহিদা কমিবে, ফলে বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ যোগান দিবে।

উৎপাদন-খরচা—Cost of Production.

ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন-খরচা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। আর্থিক উৎপাদন-খরচা—Money Cost of Production.

একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহাকে দ্রব্যটির আর্থিক উৎপাদন-খরচা বলা হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য যে-পরিমাণ ব্যয় হয়, খাজনা, সুদ ও মজুরি এই আর্থিক উৎপাদন-খরচার অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত উৎপাদনের উপাদানগুলির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের ব্যয় (Depreciation charges) ও উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফাও উৎপাদন-খরচার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলির জন্য দেয় মূল্য, উৎপাদন-ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতির দ্বারা আর্থিক উৎপাদন-খরচা নির্ধারিত হয়।

২। আসল উৎপাদন-খরচা—Real Cost of Production.

একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে আর্থিক খরচা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, যথা, মূলধন সঞ্চয় করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ঝুঁকি বহন করিতে হয়, নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম ও ত্যাগ-স্বীকারের সমষ্টিই হইল বাস্তব উৎপাদন-খরচা। ইহা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নহে। মার্শালের ভাষায় বলা যায় যে, উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে নানাবিধ শ্রম প্রযুক্ত হয় এবং উৎপাদন কার্যে প্রযুক্ত মূলধন সঞ্চয় করিতে যে সংযম বা প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-স্বীকারের সমষ্টিকেই আসল উৎপাদন-খরচা বলা যাইতে পারে।

৩। মোট খরচা, প্রান্তিক খরচা ও গড় খরচা—**Total cost, Marginal cost, and Average cost.**

একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাকে মোট খরচা বলা হয়। যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তদপেক্ষা একমাত্রা পরিমাণ অধিক উৎপাদন করিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়,

তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা বলা হয়। মোট উৎপাদন-খরচা উৎপাদনের মাত্রা দ্বারা ভাগ করিলে গড় উৎপাদন-খরচা পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন একটি দ্রব্যের ১০ মাত্রা উৎপাদন করিতে ৫০৲ টাকা খরচ হয়। কিন্তু যদি একাদশ মাত্রা উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে খরচ হয় ৫৭৲ টাকা। সুতরাং এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, একাদশ মাত্রা উৎপাদন করিতে মোট খরচা হইল ৫৭৲ টাকা এবং একাদশ মাত্রার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হইল ৫৭ − ৫০ = ৭ টাকা, আর গড় খরচা হইল ৫৭ ÷ ১১ = প্রায় ৫ টাকা ২৮ নয়া পয়সা।

গড় ব্যয় আবার গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় লইয়া গঠিত। সেই ব্যয়গুলিকে গড় স্থির ব্যয় বলা হয় যে ব্যয়গুলি কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে উৎপাদন স্থগিত থাকিলেও চালাইয়া যাইতে হয়, যেমন, বাড়ী-ভাড়া, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন। মোট ব্যয়ের সেই অংশকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলা হয়, যে ব্যয় উৎপাদন একটু বাড়াইলে বা কমাইলে পরিবর্তন হয়, যেমন মজুরি, কাঁচামালের খরচ ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উৎপাদনের প্রথম দিকে গড় স্থির ও পরিবর্তনীয় উভয় ব্যয়ই কমিতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরে গড় স্থির ব্যয় কমিলেও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে থাকে। কারণ প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটা নির্ধারিত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদনের যখন চেষ্টা করা হয়, তখন পরিচালনা-সংক্রান্ত ও স্থানাভাব-সংক্রান্ত ত্রুটির দরুণ উৎপাদনের হার হ্রাস পাইতে থাকে অর্থাৎ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনের প্রথম দিকে গড় স্থির ব্যয় যে হারে কমে, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় সে হারে বৃদ্ধি পায় না। ফলে এই উভয় ব্যয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় গড় ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু উৎপাদন অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে গড় মোট ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় স্থির ব্যয় যোগ করিয়া গড় ব্যয় পাওয়া যায়। গড় ব্যয়ের এই দুইটি অংশের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতের উপরই গড় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। উৎপাদনের প্রথম দিকে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উভয় ব্যয়ই হ্রাস পাইয়া গড় ব্যয় কমে। উৎপাদন পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইলে

(স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা অতিক্রম না হইলে) গড় স্থির ব্যয় কমে, কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে থাকে। উৎপাদন পরিমাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা অতিক্রম করিলে স্থির ও পরিবর্তনীয় উভয় ব্যয়ই বাড়ে। ফলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই কারণে গড় ব্যয়ের আকৃতি ইংরেজী অক্ষর ইউ (U) এর মত হয়। গড় ব্যয়ের রেখা প্রথমে নিম্নাভিমুখী হইয়া পরে উর্ধ্বাভিমুখী হয়। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ব্যয়ের পরিবর্তন দেখান হইল।
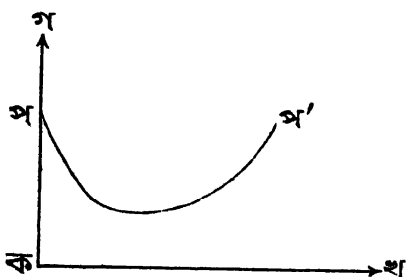
চিত্রে পপ´ রেখাটি মোট গড়পরতা খরচার রেখা। ইহা দেখিতে ইংরাজী 'U' অক্ষরটির মত বলিয়া অনেকে মোট গড়পরতা খরচার রেখাকে U-আকৃতি-বিশিষ্ট ('U-shaped') আখ্যা দিয়া থাকেন। ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে,—(১) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট গড়পরতা খরচা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। সেইজন্যই প-বিন্দু হইতে যে রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে তাহা নিম্নাভিমুখী। ইহার কারণ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা এবং এই সুবিধাগুলির জন্যে যত বেশী উৎপাদন হয় গড় খরচা ততই কমিতে থাকে ("production of more goods at less costs") (২) পরে এই নিম্নাভিমুখী রেখা উর্ধ্বাভিমুখী হইতে থাকে, অর্থাৎ উৎপাদন পরে যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মোট গড় খরচাও ততই পূর্বের ন্যায় হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধার সীমা (limits to large scale production) আছে এবং যখনই ঐ সীমা অতিক্রান্ত হয় তখনই বৃহদায়তনে উৎপাদন করিলে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা

(diseconomies) ভোগ করিতে হয় এবং এইজন্যই গড় খরচাও বাড়িতে থাকে।

সামগ্রিক গড়পরতা খরচা রেখা স্বল্প সময়ে এবং দীর্ঘ সময়ে সাধারণত একই আকৃতিবিশিষ্ট হয় তবে স্বল্প-মেয়াদ অপেক্ষা দীর্ঘ-মেয়াদে এই রেখা অধিকতর চ্যাপ্টা (flatter) হয়।

৪.। মোট খরচা, স্থায়ী খরচা ও চল্‌তি খরচা—Total cost, Supplementary or Fixed cost and Prime or Variable cost.

মোট উৎপাদন-খরচা সাধারণতঃ দুই প্রকারের খরচার সমষ্টি। একটিকে চল্‌তি খরচা ও অপরটিকে স্থায়ী খরচা বলা যাইতে পারে। চল্‌তি খরচাগুলি সাধারণতঃ উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, অপর পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে স্থায়ী খরচাগুলির সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন হয় না। এইজন্য প্রথমোক্ত খরচাগুলিকে পরিবর্তনশীল খরচা (variable costs) বলা হয়। স্থায়ী খরচাগুলি—উৎপাদন বেশী হউক বা কম হউক, অথবা উৎপাদন-কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকুক, তাহা সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে। কারখানা-গৃহের খাজনা, যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে প্রযুক্ত মূলধনের সুদ, স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের বেতন, ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিবার ব্যয় প্রভৃতি স্থায়ী খরচার অন্তর্ভুক্ত। যতদিন পর্যন্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি টিকিয়া থাকে, উৎপাদনকার্য স্থগিত থাকিলেও স্থায়ী খরচা বহন করিতে হয়।

অপর পক্ষে দিনমজুরের মজুরি, কাঁচামালের মূল্য এবং বিশেষ উৎপাদনের জন্য প্রযুক্ত বিদ্যুৎ প্রভৃতির জন্য ব্যয় চল্‌তি খরচার অন্তর্ভুক্ত। যখন কারখানায় কাজ চলে তখন চল্‌তি খরচা হয়। কাজ বন্ধ থাকিলে চল্‌তি খরচা বন্ধ হয়।

মোট খরচার এই বিশ্লেষণের স্বল্প-মেয়াদে মূল্য নির্ণয়-তত্ত্বে বিশেষ তাৎপর্য আছে। কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদে এই বিশ্লেষণের বিশেষ কোন কার্যকারিতা নাই। দীর্ঘ-মেয়াদে উভয়বিধ খরচাই পরিবর্তনশীল খরচা বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রমিকের মজুরি সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল খরচার অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু চুক্তি করিয়া যদি দীর্ঘকালের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মজুরি স্থায়ী ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে অতি দীর্ঘকালীন মেয়াদে স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ক্রয়মূল্যও চল্‌তি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে

পারে। সুতরাং মূল্যের উপর এই উভয় খরচার প্রভাব উৎপাদনকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।

গড় খরচা ও প্রান্তিক খরচার মধ্যে সম্পর্ক—Relationship between Average cost and Marginal cost.

উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে গড় ব্যয়ের উভয় অংশই অর্থাৎ গড় স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয় কমিতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম স্তরে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিলেও কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার সীমা যখন অতিক্রান্ত হয়, তখন এই গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সম্পর্কযুক্ত। প্রান্তিক খরচ যখন কম হয়, অর্থাৎ একটি অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ব্যয় কম হয়, তখন গড় ব্যয়ও কম হয়। প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয় হইতে কম হয়, তখন এই উভয় ব্যয়ই কম হয়। অপর পক্ষে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক ব্যয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। আবার গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিলে প্রান্তিক ব্যয়ও অপরিবর্তিত থাকে।

৫। সুযোগ-খরচা—Opportunity Cost.

উৎপাদনের উপাদানগুলির অপ্রাচুর্যের জন্য মানুষ তাহার ইচ্ছামত সমস্ত সামগ্রী এক সংগে উৎপাদন করিতে পারে না। কোন একটি বিশেষ উপাদান কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে প্রযুক্ত হইলে সেই উপাদান সাহায্যে অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন করা যায়, সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিতে হয়। সুতরাং একটি দ্রব্য উৎপাদন করিবার হেতুতে অন্যান্য যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারিল না, সেই সমস্ত দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার হইতে সমাজ বঞ্চিত হইল। সমাজের দিক দিয়া ইহাই হইল সুযোগ-খরচা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাজার

(The Firm and the Market)

উৎপাদন ও যোগান অর্থাৎ বিক্রয় এই দুইটিই হইল কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য। যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই দুইটি কার্যে লিপ্ত থাকে তাহাকে সাধারণতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Firm) বলা হয়। এক একটি ব্যবসায় বা শিল্প এইরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। এক একটি শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এক জাতীয় (Homogeneous) দ্রব্য বা বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য (Heterogeneous) উৎপাদন করিতে পারে। ক্রেতার যেমন সব সময় উদ্দেশ্য হইল যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া সর্বাধিক তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ করিবে, কোন বিক্রেতা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও সেইরূপ সর্বাধিক পরিমাণ লাভ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট লাভ পরিমাণ নির্ভর করে ইহার মোট আয় (Total Revenue) ও মোট ব্যয়ের (Total cost) পার্থক্যের উপর। মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিতে মোট লাভের পরিমাণ জানা যায়।

প্রতিষ্ঠান বিশেষের ভারসাম্য—Equilibrium of a Firm.

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল বিক্রয় দ্বারা সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা এবং যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে উৎপাদকের সর্বাধিক লাভ হয়, সে সেই পরিমাণই উৎপাদন করিবে এবং এই সর্বাধিক লাভ-জনক উৎপাদনই প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য আনয়ন করে। উৎপাদনের যে পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ আয় সমান হয়, সেই পর্যায়ে মুনাফা সর্বাধিক হয়। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের অর্থ হইল এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বলিতে বুঝায় এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠানের যে অতিরিক্ত আয় হয়। যত সময় পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ

আয় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে থাকে ততসময় পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে। অপরপক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় যদি প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আর উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধি পায় না—পরন্তু মুনাফা পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে।

এই কারণে একটি প্রতিষ্ঠান ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে যতক্ষণ ইহার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ইহার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই ভারসাম্য অবস্থা স্থিতিশীল নাও হইতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যে স্তরে ভারসাম্য আসে, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অন্য স্তরে স্থির হয়। আবার স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজারে এই ভারসাম্যের পরিবর্তন হইতে পারে।

বাজার—Market.

ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য যাহার ক্রয়-বিক্রয়-ব্যাপারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য সমতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক অর্থে বাজার বলিলে বুঝা যায় (১) দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও একদল বিক্রেতা, (২) ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ দ্রব্য-ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় রত এবং (৩) এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে একটি নির্দিষ্টকালে সকল ক্রেতাই একই দ্রব্যের জন্য একই মূল্য প্রদান করিবে এবং সকল বিক্রেতাকেই সেই দ্রব্যের জন্য সমান দাম ধার্য করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কোন ক্রেতারই একজন বিক্রেতার দ্রব্য ক্রয় না করিয়া অন্য বিক্রেতার দ্রব্য পছন্দ করিবার কারণ থাকে না, বা একজন বিক্রেতার একজন খরিদ্দারকে পছন্দ না করিয়া অন্য আর একজন খরিদ্দারকে অধিকতর পছন্দ করিবার কারণ থাকে না। ইহার ফলে সমগ্র বাজারে একই দ্রব্যের একই মূল্য বর্তমান থাকে। বাজারটি যদি দীর্ঘ-প্রসারিত হয় তাহা হইলে হয়ত বাজারের বিভিন্ন কেন্দ্রে

মূল্যের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যের এই পার্থক্যের কারণ হইল দ্রব্য-স্থানান্তরকরণের অতিরিক্ত-খরচা কিন্তু মূল্য কোন ক্ষেত্রেই স্থানান্তর-করণ-খরচা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না।

বাজারের শ্রেণী বিভাগ—Classification of Markets.

প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রের ব্যাপকতার উপর বাজারের প্রসার নির্ভর করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতা যদি স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার (Local market) বলা হয়। সাধারণতঃ যে-সমস্ত দ্রব্য পচনশীল, যথা, তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি, সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা যখন বহুদূর বিস্তারিত হয় অর্থাৎ একটা দেশের সমস্ত অংশের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চলিতে থাকে, তখন তাহাকে জাতীয় বাজার (National market) বলা হয়। সাধারণতঃ যে-সমস্ত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বা সহজে স্থানান্তরযোগ্য, যথা চাউল, ডাউল প্রভৃতি, সে-সমস্ত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক দ্রব্য আছে, যথা, পাট, গম, স্বর্ণ, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি, যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে এবং এই দ্রব্যগুলির বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার (International market) বলা হয়। যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির সংগে সংগে বহু দ্রব্যের সংকীর্ণ বাজার আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অর্থে বাজারকে আর একভাবে ভাগ করা হয়। সময়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা হয় স্বল্প-মেয়াদী বাজার (Short period market) ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার (Long period market)। মাছের বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী বাজার বলা হয়, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বল্পস্থায়ী হয়। এই বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে এবং এইজন্য মূল্যনির্ণয়ে চাহিদার প্রভাব অধিকতর হয়। আর বাজার যদি দীর্ঘ-মেয়াদী হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত সরবরাহ করিবার সময় থাকে এবং অতিরিক্ত সরবরাহের উৎপাদন-খরচা মূল্যের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার

করে। সময়ের ভিত্তিতে মার্শাল বাজারকে চারভাগে ভাগ করেন, যথা—(ক) অতি স্বল্প-মেয়াদী বাজার অর্থাৎ সপ্তাহকাল বা সর্বাধিক পনের দিন, (খ) স্বল্প-মেয়াদী বাজার অর্থাৎ পনের দিন বা একমাস, (গ) দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থাৎ ছয়মাস বা এক বৎসর পর্যন্ত, ও (ঘ) অতি দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

বাজারকে আবার চল্‌তি বাজার (Ready market) ও ভবিষ্যৎ বাজার (Future market) বলা হয়। চল্‌তি বাজারে ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য সংগে সংগে পায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাজারে ক্রেতাকে দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রয়ের চুক্তি বর্তমানে সম্পাদিত হইলেও ক্রেতাকে দ্রব্য পাইতে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়।

বাজারের বিস্তৃতি কিসের উপর নির্ভর করে—Conditions for a wide market.

বাজারের বিস্তৃতি সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে। সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সমান প্রতিযোগিতা হয় না। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা তথা বাজারের বিস্তৃতি নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে।

১। চাহিদার ব্যাপকতা—Wide demand.

দ্রব্যটির চাহিদা যতই ব্যাপক হয়, ইহার ক্রয়-বিক্রয়ে ততই প্রতিযোগিতা চলে। পাট, তুলা, স্বর্ণ প্রভৃতির চাহিদা হইল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এবং সেইজন্য এই দ্রব্যের অতি বিস্তীর্ণ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজার দেখা যায়।

২। দ্রব্যটি নমুনাযোগ্য কিনা—Suitability for sampling.

দ্রব্যটি যদি এরূপ হয় যে, তাহার নমুনা দেখিয়া দূরবর্তী ক্রেতাগণও দ্রব্যটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারে, তাহা হইলে দ্রব্যটি দূরবর্তী স্থানের ক্রেতারাও ক্রয় করিতে পারে। ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশের চায়ের নমুনা দেখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ক্রেতাগণ চা ক্রয় করে।

৩। ক্রমানুসারে পর্যায়যোগ্য কিনা—Suitability for grading.

দ্রব্যটি যদি গুণানুসারে পৃথকযোগ্য হয়, তাহা হইলে একই দ্রব্যের বিভিন্ন রকমারি পৃথগ্‌ভাবে ক্রেতার নিকট উপস্থিত করা সম্ভব হয়। ভারতে

উৎপন্ন কয়লা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি ভাগে বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং দূরবর্তী স্থানের ক্রেতাগণও কয়লার নমুনা না দেখিয়া কয়লার গুণানুসারে ভারতীয় কয়লা ক্রয় করিতে পারে।

৪। স্থানান্তরযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব—Portability and Durability.

দ্রব্যটির স্থায়িত্ব ও স্থানান্তরযোগ্যতা ইহার চাহিদার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দ্রব্যটি যদি ভঙ্গুর বা পচনশীল না হয় এবং নমুনা হিসাবে স্থানান্তরযোগ্য হয়, তাহা হইলে এ-সমস্ত দ্রব্যের বাজার বহুদূর বিস্তৃত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সবগুলিই বর্তমান। ইহারা স্থায়ী এবং ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অধিকতর মূল্য বহন করে। সুতরাং এই মূল্যবান্ ধাতুর বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। অপর পক্ষে ইটের আয়তনের তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম। সেইজন্য ইট স্থানান্তরযোগ্য নহে এবং ইহার বাজারও সাধারণতঃ স্থানীয় বাজার হয়।

মূল্য—Value.

দ্রব্যমূল্য সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারিত হয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের চাহিদার তীব্রতা বা উৎপাদকের খাম-খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। মূল্যনির্ধারণ-নীতির মূলকথা সর্বত্র সমান হইলেও দেশ-কাল-ভেদে এই মূল্যনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়। ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দ্বারাই মূল্য নির্ধারিত হয়, সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য মূল্যনির্ধারণ-নীতি সর্বত্র সমান হইতে পারে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে নীতিতে মূল্য নির্ধারিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে-নীতি প্রযোজ্য নহে।

মূল্যতত্ত্ব আলোচনা কালে বিশেষ অর্থে কতিপয় শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মূল্যতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে সেই শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা—Perfect Competition.

ধনবিজ্ঞানে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থ হইল যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার

ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন অন্তরায় নাই। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দ্বারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি সূচিত হয়।

১। একই দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার অবস্থিতি।

২। ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য আনীত দ্রব্যটি সমজাতীয় হওয়া চাই (Homogeneous) এবং দ্রব্যটির এই সমজাতীয়তার জন্যই ক্রেতা নিঃসন্দেহে যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে।

৩। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজারে চলতি মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। বিক্রেতা কি মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতেছে, ক্রেতা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এইজন্য ক্রেতা সর্বদাই সবনিম্ন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে সচেষ্ট থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মূল্য (Discriminating, price) থাকিতে পারে না।

৪। এরূপ অবস্থায় যে-কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজারে নিজ ইচ্ছামত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে। ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সীমা আইনের দ্বারা বা অন্য কোনপ্রকারে নির্ধারিত হয় না।

উপরে পূর্ণ প্রতিযোগিতার যে বর্ণনা দেওয়া হইল বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ নিখুঁত প্রতিযোগিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ধান, গম, পাট প্রভৃতি কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায়।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা—Imperfect Competition.

উপরি-উক্ত পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থাগুলির অভাব হইলেই সেই অবস্থাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা হয়।

১। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সংখ্যা এত কম হয় যে, একজন ক্রেতা বা একজন বিক্রেতা তাহার ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ইহার ফলে অন্য ক্রেতা বা বিক্রেতার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন বিক্রেতা তাহার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত-পরিমাণ উৎপাদন সে কেবলমাত্র মূল্য হ্রাস করিয়া বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। একজন বিক্রেতা যদি মূল্য

হ্রাস করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্য বিক্রেতার মূল্যের উপর দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতাগণ যদি তাহাদের অজ্ঞতাবশতঃ বিক্রেতাগণ কর্তৃক দাবীকৃত বৈষম্যমূলক মূল্য সম্পর্কে অবহিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা সর্বনিম্ন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ পায় না। অনেক সময় পরিবহন-ব্যবস্থার অত্যধিক খরচার জন্যও ক্রেতাগণ সর্বনিম্ন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলেও ক্রেতাগণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থাকেও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা হয়।

৩। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় দ্রব্যগুলি একজাতীয় হইলেও সমজাতীয় হয় না। একই দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রকারভেদ বিভিন্ন বিক্রেতা কর্তৃক বাজারে সরবরাহ হইতে পারে। একজাতীয় হইলেও বাজারে বিভিন্ন প্রকারের ঘি পাওয়া যায়। ক্রেতাগণ তাহাদের রুচি ও পছন্দমত বিভিন্ন ঘি ক্রয় করে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ঘি-এর প্রত্যেকটির একদল সমর্থক থাকে, যাহারা অন্য প্রকার ঘি ক্রয় না করিয়া ঐ ঘি ক্রয় করে। এইরূপে প্রত্যেক প্রকার ঘি-এরই একটি একচেটিয়া বাজার সৃষ্ট হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া বিক্রেতা ক্রেতাগণের নিকট হইতে উচ্চমূল্যও আদায় করিতে পারে। বাজারে যদি একই দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকার ভেদ থাকে, তাকে তাহা হইলে দ্রব্য-প্রভেদের (Product differentiation) উদ্ভব হয় এবং ফলে বহু বিক্রেতার উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায়।

একচেটিয়া কারবার—Monopoly.

একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ অভাব। যখন বাজারের সমগ্র সরবরাহ একজন বিক্রেতা বা একটি বিক্রেতা-সংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাহাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। সর্বাধিক পরিমাণ লাভ করাই হইল একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে সে উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এরূপভাবে মূল্য ধার্য করে যাহাতে তাহার সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা হয়। আমাদের দেশে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দ্বি-বিক্রেতায়ত্ত কারবার—Duopoly.

যখন বাজারের সমগ্র সরবরাহ দুইটি মাত্র বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান বা সংঘ দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাহাকে দ্বি-বিক্রেতায়ত্ত কারবার বলা হয়। কলিকাতা শহরে পরিবহন-ব্যবস্থা পূর্বে ট্রাম কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল। বর্তমানে বাস প্রবর্তিত হওয়ার ফলে শহরের সমগ্র পরিবহন-ব্যবস্থা ট্রাম কোম্পানী ও রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার—Oligopoly.

নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার সৃষ্টি হয় তখন, যখন সমগ্র সরবরাহ দুইটির অধিক বিক্রেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অথচ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের ন্যায় অসংখ্য বিক্রেতার উপস্থিতি থাকে না। সমগ্র পৃথিবীর পেট্রোল-সরবরাহ ৪।৫টি বিক্রেতা-সংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সুতরাং পেট্রোল বিক্রয় নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে। যখন নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবারের সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাহাকে খাঁটি নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার (pure oligopoly) বলা হয়, কিন্তু যখন বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাহাকে পৃথকীকৃত নাতি-অধিক বিক্রেতায়ত্ত কারবার (Differentiated oligopoly) বলা হয়।

একচেটিয়া ক্রয়—Monopsony.

বহু ক্রেতার চাহিদা যদি একজন বিক্রেতা বা একটি বিক্রয়-সংঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে একচেটিয়া বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী বলা হয়। অপর পক্ষে বহু বিক্রেতার সরবরাহ যদি একজন ক্রেতার খরিদের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে এইরূপ ক্রয়-ব্যবস্থাকে একচেটিয়া ক্রয় (Monopsony) বলা হয়। খাঁটি একচেটিয়া বিক্রেতা যেরূপ বিরল, একচেটিয়া ক্রেতাও তদ্রূপ বিরল। অনেক সময় দেশের সরকার কোন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে একচেটিয়া ক্রেতায় পরিণত হইতে পারে। যদি কোন অঞ্চলে একটি মাত্র কাপড়ের কল থাকে, তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী স্থানের কার্পাস উৎপাদনকারিগণ সেই কলে কার্পাস বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দূরবর্তীস্থানে অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও পরিবহন-খরচার জন্য তাহা সম্ভব হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায়

মূল্যতত্ত্ব

(Theory of Value)

মূল্যতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে 'মূল্য' শব্দটির অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন। 'মূল্য' শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use) ও বিনিময়মূল্য (Value-in-exchange)। ব্যবহারিক মূল্যের অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগিতা। যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর মূল্যবান্ অথবা স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান্, তখন 'মূল্য' শব্দটি উপযোগিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কেবলমাত্র বিনিময়মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ হইলেও অর্থনৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর মূল্যবান্। মূল্যের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা হইল বিনিময়মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা হইল সেই দ্রব্যের মূল্য। সুতরাং মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা (Purchasing power) বুঝায়। যদি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে দুইটি গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমতা হইল দুইটি গরু। একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু—এই বিনিময়ের হারকে 'মূল্য' (Value) বলা হয়। সুতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত (Ratio of exchange) বুঝায়।

অর্থমূল্য বা দাম—Price.

দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাণ করা হয়, তখন তাহাকে 'অর্থমূল্য' বা 'দাম' বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্য সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিনিময়মূল্য হইল ধনবিজ্ঞানের একটি বস্তু-নিরপেক্ষ (Abstract) ধারণা, অপর পক্ষে অর্থমূল্য হইল একটি বাস্তব (Concrete) ব্যাপার। বিনিময়মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত সূচিত করে, সুতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়মূল্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে না.

কারণ একটির বিনিময়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে অপরটির অনুপাত অবশ্যম্ভাবী-রূপে হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে সমস্ত দ্রব্যের অর্থমূল্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। দাম প্রত্যেকটি দ্রব্যের স্বতন্ত্র অর্থমূল্য সূচিত করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত দ্রব্যেরই অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায় ও অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইলে সমস্ত দ্রব্যের অর্থমূল্যও হ্রাস পায়।

মূল্যনির্ধারণ—Determination of value.

কোন দ্রব্যের বিনিময়মূল্য দ্রব্যটির উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু একমাত্র উপযোগিতাই বিনিময়মূল্যের কারণ হইতে পারে না। দ্রব্যটির সরবরাহ যদি অফুরন্ত হয়, তাহা হইলে উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যটির কোন বিনিময়মূল্য থাকিতে পারে না। কারণ দ্রব্যটির সরবরাহ যদি অফুরন্ত হয় তাহা হইলে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র অনুসারে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপ-যোগিতা শূন্যে পর্যবসিত হয়। এইজন্যই স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর উপযোগী হইলেও লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণের বিনিময়মূল্য অধিক, কারণ স্বর্ণ লৌহ অপেক্ষা অধিকতর দুষ্প্রাপ্য এবং সেইজন্য লৌহের প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা স্বর্ণের প্রান্তিক উপযোগিতা অধিক।

ধনবিজ্ঞানী জেভন্স ও তাঁহার অনুগামিগণের মতে দ্রব্যমূল্য দ্রব্যটির উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্রব্যটি উৎপাদন করিবার খরচা থাকিলেও দ্রব্যটির যদি কোন উপযোগিতা না থাকে তাহা হইলে তাহার কোন বিনিময়-মূল্য হইতে পারে না। সুতরাং দ্রব্যমূল্য একান্তভাবে উপযোগিতার উপর নির্ভর করে।

অপর পক্ষে রিকার্ডো, মিল্ প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, দ্রব্যমূল্য উৎ-পাদন-খরচার উপর নির্ভর করে। তাঁহারা বলেন যে, দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকা চাই—ইহা সত্য, কিন্তু দ্রব্যের বিনিময়মূল্য উপযোগিতার উপর নির্ভর করে না।

অধ্যাপক মার্শাল উপরি-উক্ত দুইটি বিপরীত মতবাদের সমন্বয়সাধন করিয়া বলেন যে, দ্রব্যমূল্য শুধুমাত্র উপযোগিতা বা উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয় না—এই উভয়ের প্রভাবেই দ্রব্যমূল্য স্থিরীকৃত হয়। ক্রেতা অর্থাৎ চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ক্রেতার চাহিদা উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিক্রেতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সরবরাহ উৎপাদন-

খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং দ্রব্যের বিনিময়মূল্য ক্রেতার চাহিদা (দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা) ও বিক্রেতার সরবরাহ (দ্রব্যটির প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা)—এই উভয়ের প্রভাবে স্থিরীকৃত হয়। এখন প্রশ্ন হইল কোন্ বিন্দুতে দ্রব্যমূল্য স্থিরীকৃত হইবে? সাধারণভাবে বলা যায়, যে-বিন্দুতে ক্রেতার চাহিদা বিক্রেতার সরবরাহের সমান হয়, সেই বিন্দুতে মূল্য নির্ধারিত হয় অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতাবস্থায় মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত মন্তব্যের আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট কালে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উপস্থিত হয়। প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি চাহিদা মূল্য থাকে অর্থাৎ যে-মূল্যে ক্রেতাগণ দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু এই ক্রয়মূল্য পরিবর্তনশীল, দ্রব্যটির সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। অপর পক্ষে, দ্রব্যটির একটি বিক্রয়মূল্য থাকে অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রেতাগণ দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে পারে। ক্রয়মূল্যের ন্যায় বিক্রয়মূল্যও দ্রব্যটির সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পরিবর্তিত হয়।

সাধারণতঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতাগণ ক্রয় হ্রাস করিয়া থাকে ও বিক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। অপর পক্ষে, মূল্য হ্রাস পাইলে ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে চাউলের ক্রয়-বিক্রয় নিম্নলিখিতভাবে ঘটে।

চাহিদার পরিমাণ	মণ প্রতি মূল্য	সরবরাহের পরিমাণ
৫০০ মণ	১০৲ টাকা	১,০০০
৬০০ ”	৯৲ ”	৮০০
৭০০ ”	৮৲ ”	৭০০
৯০০ ”	৭৲ ”	৫০০
১,২০০ ”	৬৲ ”	৪০০

উপরে চাহিদা ও সরবরাহের যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহাতে দেখা যায় যে, মণ প্রতি চাউলের মূল্য যখন ৮৲ টাকা তখন বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের সমতা হয় অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলে বিক্রেতা যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর ক্রেতা যে পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা সমান হয়। মূল্য ৮৲ টাকার বেশী বা কম হইলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমতা প্রাপ্ত হয় না।

বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্টকালে যে মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় হয়, তাহাকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়। উপরি-প্রদত্ত উদাহরণ অনুসারে ৮৲ টাকা মূল্যই হইল সেই নির্দিষ্টকালের মূল্য, যে মূল্যে ঐ সময়ের জন্য চাহিদা ও সরবরাহের সমতা ঘটিয়াছে।

মূল্যতত্ত্বে বলা হয় যে, দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত মন্তব্য দ্বারা মূল্যতত্ত্বের সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। উপরি-উক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য হইল যে, চাহিদা ও সরবরাহ অন্য-নিরপেক্ষভাবে মূল্য স্থির করে এবং মূল্যদ্বারা চাহিদা ও সরবরাহ প্রভাবিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হইল যে, চাহিদা ও সরবরাহ মূল্য-নিরপেক্ষ নহে। চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণ মূল্যদ্বারা নির্ধারিত হয়—কারণ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায় ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, এবং মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও সরবরাহ হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে অপর দুইটির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

৭নং চিত্র
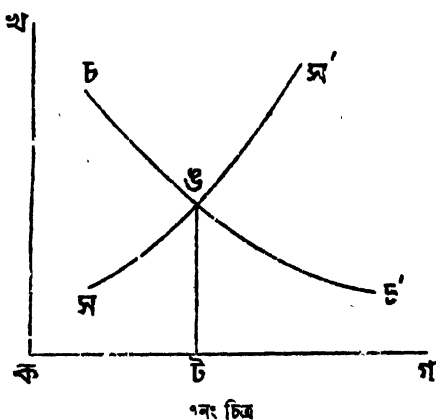
উপরে যে রেখাচিত্র প্রদত্ত হইল তাহার কখ রেখাদ্বারা দ্রব্যমূল্য দেখান হইয়াছে ও কগ রেখাদ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। চচ´ হইল চাহিদার রেখা এবং সস' হইল সরবরাহের রেখা। চচ´ ও সস´ রেখা দুইটি ঙ বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, মূল্য যখন ঙট, বিক্রেতাগণ তাহারা কট পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণও ঐ মূল্যে ঐ পরিমাণ

দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যখন ৬৳ তখন সরবরাহ ও চাহিদা সমান হয় এবং যে মূল্যে চাহিদা ও সরবরাহের সমতা হয় তাহাকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়।

মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাব—Influence of Demand and Supply in the determination of value.

চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হইলেও মূল্যের উপর চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাব সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। মূল্যনির্ধারণ-ব্যাপারে চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাব নির্ণয় করিবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল একটি নির্দিষ্ট-কালের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে মূল্যনির্ধারণ-সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সময়ের ভিত্তিতে তিনি মূল্যনির্ধারণ সমস্যাকে চারভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। যথা, ১। অতি স্বল্পকাল (Very short period), ২। স্বল্পকাল (Short period), ৩। দীর্ঘকাল (Long period) ও ৪। অতি দীর্ঘকাল (Very long period or Secular period)। অতি স্বল্পকালে নির্ধারিত মূল্যকে বাজার মূল্য বলা হয় এবং দীর্ঘ কালে প্রচলিত মূল্যকে স্বাভাবিক মূল্য বলা হয়।

বাজার দর—Market Value.

নির্দিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে বাজারে স্বল্পকালের জন্য একটি দ্রব্যের যে মূল্য চল্‌তি থাকে তাহাকে 'বাজার দর' বলা হয়। পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মূল্যের দৈনিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৎস্য, দুগ্ধ ও তরিতরকারী অধিক সময় অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভবপর নয় বলিয়া এই জাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত পরিমাণে সীমাবদ্ধ। এই জাতীয় পচনশীল দ্রব্যের যে পরিমাণ দৈনিক বাজারে আনীত হয়, সেইদিনই সেই পরিমাণ বিক্রয় না হইলে বিক্রেতার লোকসান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বাজার দর যাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাকে বিক্রয় করিতেই হইবে। বাজারে আনীত দ্রব্যটির পরিমাণ যদি অপরিবর্তনীয় হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্যটির মূল্য, উৎপাদন-খরচা যাহাই হউক না কেন, চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যদি কোন কারণে একদিন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাছের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ, সেইদিনের মত মাছের সরবরাহ আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। অপর পক্ষে

মাছের চাহিদা হ্রাস পাইলে সেইদিন মাছের দাম কমিবে, কারণ, সেইদিন কমমূল্যে মাছ বিক্রয় না করিয়া বিক্রেতাগণ ভবিষ্যতে অধিক মূল্যের আশায় মাছ মজুত রাখিতে পারে না। মাছ ধরিবার খরচা যাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাগণকে বাজারে চল্‌তি দামে সমগ্র পরিমাণ মাছ বিক্রয় করিতেই হইবে। সে দিনকার মত চাহিদা ও সরবরাহের একটা স্থিতাবস্থায় সমগ্র সরবরাহ বিক্রীত হইবে। সুতরাং অতি স্বল্প-মেয়াদী বাজারে (Very short period) সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদাই মূল্যনির্ধারণে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সরবরাহের যে একেবারেই কোন প্রভাব নাই এ কথা বলিলে ভুল হইবে। বাজারে আনীত সরবরাহের পরিমাণ মূল্যনির্ধারণে কিছু প্রভাব বিস্তার করে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৎস্য ও দুগ্ধের ন্যায় সকল দ্রব্যই অত্যধিক পচনশীল নহে। নিত্যব্যবহার্য এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা দু'চার দিন বা দু'এক সপ্তাহ বা দু'এক মাস মজুত রাখা যায়। এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতাগণ বাজার মূল্যের পরিবর্তনের সহিত সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তিত করিতে পারে। বাজারে যদি ঘি-এর দাম বিক্রেতার ঈপ্সিত মূল্য অপেক্ষা হ্রাস পায়, তাহা হইলে বিক্রেতা ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ঘি-এর একটি অংশ বিক্রয় না করিয়া মজুত রাখিতে পারে। অপর পক্ষে, চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে বাজার মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বিক্রেতা মজুত মাল সরবরাহ করিয়া বর্ধিত চাহিদা পূরণ করে, ফলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়। যদি বিক্রেতাগণ মনে করে যে, ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে তাহারা বর্তমান বাজার দরে বিক্রয় স্থগিত রাখে, ফলে বাজার দর বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে তাহারা বর্তমানে বাজার দরে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ফলে বাজার দর হ্রাস পায়। সুতরাং বাজার দর যে সম্পূর্ণরূপে সরবরাহের প্রভাবমুক্ত এ-কথা বলা চলে না। অনেক সময় আবার বাজার দর বিক্রেতা-সংঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একদল বিক্রেতা সংঘবদ্ধভাবে বাজারের সমস্ত অথবা অধিকাংশ সরবরাহ ক্রয় করিয়া অধিক লাভের আশায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ভিন্ন জায়গা হইতে নূতন সরবরাহ হইলে বিক্রেতা-সংঘের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, বাজার দর বাজারে অবস্থিত মজুত মালের পরিপ্রেক্ষিতে

প্রধানতঃ চাহিদার দ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও ভবিষ্যৎ সরবরাহের সম্ভাবনার প্রভাবমুক্ত নহে। অনেক সময় আবার বাজার দরের উপর বিক্রেতা-সংঘের প্রভাব দেখা যায়। ("Market values are governed by the relation of demand to stocks actually in the market, with more or less reference to future supplies ; and not without some influence of trade combinations.")

স্বাভাবিক দর—Normal Value.

স্বাভাবিক দর বলিলে একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্টকালের জন্য যে মূল্য স্থিরীকৃত হয় তাহা বুঝায়। এই নির্দিষ্টকাল স্বল্প-মেয়াদী অর্থাৎ কয়েক মাসব্যাপী অথবা দীর্ঘ-মেয়াদী বা কয়েক বৎসরব্যাপী হইতে পারে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকিলে এই নির্দিষ্টকালে চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে যে মূল্য নির্ধারিত হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা হয়। চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থার দ্বারাই স্বাভাবিক দর স্থিরীকৃত হয়। যে কারণগুলির জন্য স্বাভাবিক দর প্রবর্তিত হয়, সে কারণগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দর উভয়েই চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতাবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হইলেও বাজার দর চাহিদা ও সরবরাহের যে স্থিতাবস্থায় নির্ধারিত হয়, সে স্থিতাবস্থা আদৌ স্থায়ী নহে। এই স্থিতাবস্থা সাময়িক কালের জন্য ঘটে এবং প্রায় প্রতিদিনই সাময়িক কারণে পরিবর্তিত হয়। মৎস্যের বাজারে এই স্থিতাবস্থার দৈনিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক দর চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় এবং বাজার দর চাহিদা ও সরবরাহের সাময়িক স্থিতাবস্থা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং বাজার দর হইল বাস্তব মূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্টকালে চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় হওয়া উচিত। কিন্তু বাজার দর সাধারণতঃ এই অভিপ্রেত মূল্যের কিছু উচ্চে বা নিম্নে স্থিরীকৃত হয়, কদাচিৎ এই অভিপ্রেত মূল্যের সমান হয়। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনের সহিত বাজার দর কখনও স্বাভাবিক দরের উপরে যায় আবার কখনও বা নিম্নে যায়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

স্বাভাবিক দর কয়েক দিনের বাজার দরেয় গড়-দর বুঝায় না। স্থায়ী কারণে চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় যে মূল্য স্থিরীকৃত হয়, তাহাই স্বাভাবিক দর।

স্বল্প-মেয়াদী স্বাভাবিক দর—Short period Normal Price.

অতি স্বল্প-মেয়াদী বাজারের ক্ষেত্রে সরবরাহ অপরিবর্তনীয় থাকে অর্থাৎ সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, সুতরাং ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু স্বল্প-মেয়াদী বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সময়ে সরবরাহের পরিমাণ একেবারে অপরিবর্তনীয় নহে অর্থাৎ ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব অথচ চাহিদা অনুসারে ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদা-মূল্য বিক্রেতার গড়-খরচা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে বিক্রেতাকে কাঁচামাল ও নূতন শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইবে এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদনের জন্য তাহার একটি অতিরিক্ত উৎপাদন-খরচা হইবে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেহেতু এই চাহিদার বৃদ্ধি সাময়িক, সেইহেতু বিক্রেতা তাহার চল্‌তি মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দ্রব্যটির সরবরাহের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইবে। সে কোন মতে তাহার স্থায়ী মূলধন অর্থাৎ কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বৃদ্ধি করিবে না। অপর পক্ষে চাহিদা যদি এই স্বল্প মেয়াদে হ্রাস পায় অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদা-মূল্য যদি বিক্রেতার গড়-খরচা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা তাহার চল্‌তি মূলধনের (কাঁচামাল, সাধারণ শ্রমিক) পরিমাণ হ্রাস করিয়া সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করিবে। সুতরাং স্বল্প মেয়াদে বিক্রয়-মূল্য বিক্রেতার গড়-খরচার সমান না হইলেও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সমান হয় অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা দ্বারা বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ-মেয়াদী স্বাভাবিক দর—Long period Normal Price.

দীর্ঘ-মেয়াদী বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এরূপ ক্ষেত্রে সরবরাহ ও চাহিদার সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধন করা সম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা-মূল্য যদি বিক্রেতার গড়-খরচা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে বিক্রেতাগণ তাহাদে চল্‌তি ও স্থায়ী উভয়বিধ মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চাহিদার বৃদ্ধি পূরণ করিবার

চেষ্টা করিবে। মূল্যবৃদ্ধি পাইলে লাভের আশায় নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানও গঠিত হইয়া দ্রব্যটির সরবরাহ বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে সরবরাহের পরিমাণ সেই পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, যে পর্যন্ত বিক্রেতার গড়-খরচা চাহিদা মূল্যের সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বিক্রেতার গড়-খরচা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

তাহা হইলে দেখা যায় যে, (১) অতি স্বল্প-মেয়াদে দ্রব্যমূল্য, ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, এই সময়ে মূল্য উৎপাদন-খরচার সমান নাও হইতে পারে। (২) স্বল্প-মেয়াদে মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার (চল্‌তি খরচার) দ্বারা নির্ধারিত হয়। (৩) দীর্ঘ-মেয়াদে মূল্য গড় উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থপরিমাণ মোট খরচার সমান হইতে হইবে।

উপরি-উক্ত মূল্যনির্ধারণ-নীতিগুলি শুধুমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রযোজ্য। প্রতিযোগিতা যদি অসম্পূর্ণ হয় অথবা একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ-নীতি পৃথগ্‌ভাবে প্রযোজ্য।

প্রান্তিক উপযোগিতা, প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও মূল্য—Marginal Utility, Marginal Cost and Price.

মূল্যতত্ত্বের প্রথম কথা হইল যে, চাহিদার দিক দিয়া প্রান্তিক উপযোগিতা ও সরবরাহের দিক দিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা—এই উভয়ের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, প্রান্তিক উপযোগিতা ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার কোন্ বিন্দুতে মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে-বিন্দুতে ক্রেতার চাহিদা-মূল্য ও বিক্রেতার বিক্রয়-মূল্য সমান হয়, সেই বিন্দুতেই মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ইহাকেই স্থিতাবস্থা মূল্য (Equilibrium price) বলা হয়। ক্রেতা একটি দ্রব্যের অধিক মাত্রা ক্রয় করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন দ্রব্যটির শেষ মাত্রা ক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে তাহা তাহার প্রদত্ত-মূল্যের সমান হয়। ইহার পর সে যদি দ্রব্যটির আর এক মাত্রা অধিক ক্রয় করে, তাহা হইলে সে উক্ত অতিরিক্ত মাত্রা হইতে মূল্যাতিরিক্ত সন্তোষ পায় না, সুতরাং সে আর সে মাত্রা ক্রয় করিবে না। সুতরাং যে মাত্রা ক্রয় করা পর্যন্ত সে মূল্যাতিরিক্ত সন্তোষ পায়, সেই মাত্রাকে প্রান্তিক মাত্রা বা প্রান্তিক ক্রয় বলা হয়।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক মাত্রা হইতে যে সন্তোষ বা উপযোগিতা পাওয়া যায়, সেই উপযোগিতার দ্বারাই যে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা নহে। প্রান্তিক উপযোগিতা প্রত্যক্ষভাবে শুধু ক্রেতার ক্রয়-ঔৎসুক্য সূচিত করিয়া পরোক্ষভাবে ক্রয়মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ কথা সত্য যে, ক্রেতার চাহিদা-মূল্যের পরিমাপক হইল প্রান্তিক উপযোগিতা— মূল্যের উপর মোট উপযোগিতার কোন প্রভাব নাই।

অপর পক্ষে বিক্রেতার বিক্রয়-মূল্য তাহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সরবরাহের যে অংশ পর্যন্ত বিক্রয় করিলে উৎপাদকের উৎপাদন-খরচা চল্‌তি মূল্যের সমান হয়, সেই পর্যন্ত উৎপাদক বিক্রয় করিবে এবং তদতিরিক্ত বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ উৎপাদন করিবে না। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহার খরচা সংকুলান হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয় এবং এই প্রান্তিক উৎপাদন করিবার খরচাকে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা বলা হয়।

দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয় সেই বিন্দুতে, যে বিন্দুতে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সমান হয়। ২১১ পৃষ্ঠার উদাহরণে দেখা যায় যে, মূল্য যখন ৮৲ টাকা তখন ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ ও বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ সমান হয়। ৮৲ টাকা মূল্য হইল ক্রেতার ক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলেই ৭০০টি দ্রব্য ক্রীত হইবে এবং অপরপক্ষে ৮৲ টাকা হইল বিক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলেই ৭০০টি দ্রব্য বিক্রীত হইবে। ক্রেতার (চাহিদার) দিক দিয়া ৮৲ টাকা ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা সূচিত করে এবং বিক্রেতার (সরবরাহের) দিক দিয়া ৮৲ টাকা বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন খরচা সূচিত করে। সুতরাং ৮৲ টাকা ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ প্রান্ত এবং এই প্রান্তে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মূল্যের এই স্থিতাবস্থা প্রান্তিক উপযোগিতা ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার প্রান্ত ব্যতীত অন্য কোথায়ও হইতে পারে না। সেইজন্য বলা হয় যে, প্রান্ত হইল সেই বিন্দু, যে বিন্দুতে চাহিদা-মূল্য ও সরবরাহ-মূল্য সমান হইয়া স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রান্তেই মূল্য নির্ধারিত হয়—কিন্তু এই প্রান্ত-দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় না, কারণ, এই প্রান্তের অবস্থিতি পরিবর্তনশীল। চাহিদা

ও সরবরাহের পরিবর্তনে এই প্রান্তের অবস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এইজন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, ("Marginal uses do not govern value, but are governed together with value by the conditions of demand and supply.")

মূল্যনির্ধারণ তত্ত্বের সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের গুরুত্ব—Importance of the element of time in the Theory of value.

মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগান—এই দুইটির কোন্‌টির প্রভাব অধিক সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল। ধনবিজ্ঞানী জেভন্‌সের মতে মূল্যনির্ধারণে চাহিদাই হইল একমাত্র শক্তি, অপরপক্ষে রিকার্ডো যোগানের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মার্শালই সর্বপ্রথম এই দুইটি মতের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিয়া বলেন যে, চাহিদা ও যোগান এই উভয়ের প্রভাবেই মূল্য নির্ধারিত হয়। মূল্যনির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া মার্শাল বলেন যে, চাহিদা বা যোগান এককভাবে মূল্য নির্ধারণ করে না। মূল্য উভয়ের প্রভাবেই নির্ধারিত হয়। তবে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগান—এই দুইটির আপেক্ষিক প্রভাব কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বেশী বা কম তাহা একমাত্র সময়ের ভিত্তিতে স্থির করা সম্ভব। স্বল্প-মেয়াদী বাজারে মূল্য-নিরূপণে চাহিদার প্রভাব বেশী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজারে যোগানের প্রভাব বেশী। মূল্যনিরূপণে চাহিদা ও যোগান কাহার প্রভাব কখন অধিক, তাহা একমাত্র সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এইজন্য মার্শাল চাহিদা পরিবর্তিত হইলে যোগান পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময়কে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি কালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে সময়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—১। অতি স্বল্পকাল (Very short period), ২। স্বল্পকাল (Short period) ও ৩। দীর্ঘকাল (Long period)

আসল কথা হইল যে, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় এবং নির্ধারিত মূল্যে চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর চাহিদা বা যোগানের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা

হইলে মূল্যের ও পরিবর্তন ঘটে। একটির পরিবর্তন ঘটিলে অন্যটির উপর তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। চাহিদার যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে যোগানও পরিবর্তিত হয় এবং নূতনভাবে চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের এই নূতন স্থিতাবস্থায় আসিতে মূল্যেরও বহু পরিবর্তন ঘটে। কারণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই সংগে সংগে যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় এবং যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদানগুলি সংগ্রহ না করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই কারণে উৎপাদন-বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ। এইজন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সংগে সংগে দাম বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বল্পকালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার প্রভাব অধিক। দীর্ঘ সময় পাইলে চাহিদা অনুযায়ী যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, কিন্তু স্বল্প সময় হইলে চাহিদা অনুযায়ী যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

মূল্যের উপর উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাতের প্রভাব—Influence of the Laws of Returns on value.

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না এবং এই কারণে উৎপাদন-খরচা কোথায়ও বৃদ্ধি পায়, কোথায়ও সমানুপাতিক হয়, আর কোথায়ও বা উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্য প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদন-খরচা শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্র বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-খরচা বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন-খরচা উৎপাদন-পরিমাণের সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন-মাত্রার জন্য খরচা হ্রাস-বৃদ্ধি না পাইয়া সমান থাকে। ইহাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্র (Law of Constant Returns) বলা হয়। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্পে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে শিল্পে সু-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হইয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ও বাহ্যিক কতকগুলি ব্যয়-সংকোচ (Internal and external economies)

হয়। এই ব্যয়-সংকোচ জন্য শিল্প-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতিতে নির্ধারিত হইবে।

১। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Increasing Cost.

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র প্রযোজ্য, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন করিবার খরচা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত খরচ করিতে হয় অর্থাৎ প্রান্তিক খরচা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু এই বর্ধিত সরবরাহের জন্য বর্ধিত হারে খরচ হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা (অর্থাৎ শেষ মাত্রা উৎপাদনের জন্য যে খরচ হয়) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২। সমানুপাতিক উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Constant Costs.

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন সমানুপাতিক উৎপাদন-খরচা অনুসারে হয় অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ-নিরপেক্ষভাবে প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের খরচা সমানুপাতিক হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাস-বৃদ্ধি না পাইয়া সমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও গড় উৎপাদন-খরচা সমান হয়। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কিন্তু মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

৩। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Increasing Returns or Diminishing Costs.

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়,

উৎপাদন-খরচাও ততই হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন করিবার খরচ কম হয়। সুতরাং কোন সু-পরিচালিত শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-খরচা সর্বাধিক কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতির দ্বারা নির্ধারিত হইবে, ইহাই হইল সমস্যা। দ্রব্যমূল্য যদি এই সু-পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-খরচার (যাহা সর্বনিম্ন খরচা) দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত কমদক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলি প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না। সুতরাং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনজাত দ্রব্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে সু-পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন উৎপাদন-খরচার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, সর্বাপেক্ষা কমদক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারাও মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না, কারণ এরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হয়ত আদৌ কোন মুনাফা অর্জন করিতে সক্ষম না হইতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন হইল যে, যে-সকল দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচা নীতি প্রযোজ্য, যে-সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মেয়াদী স্বাভাবিক দর কি নীতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (Representative Firm) কল্পনার সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান—Representative Firm.

যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নীতি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচা নীতি প্রযোজ্য, সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্যনির্ধারণ-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক মার্শাল ধনবিজ্ঞানে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাটির সৃষ্টি করেন। প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল কোন শিল্পের এমন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যে-প্রতিষ্ঠান শিল্পক্ষেত্রে নবাগত নহে বা পূর্ব-অবস্থিত বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানও নহে। মার্শালের কল্পনা অনুসারে প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহা সর্বাধিক দক্ষতা বা সর্বাপেক্ষা কম দক্ষতার সহিত পরিচালিত না হইয়া স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান শিল্পক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত ও বাহ্যিক সুবিধাগুলি স্বাভাবিক পরিমাণে পাইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠান মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী হয় ও ব্যবসায়ে মাঝারি রকমের সাফল্য অর্জন করে। ক্রম-

হ্রাসমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য সর্বাধিক দক্ষ অথবা সর্বাপেক্ষা কম দক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত না হইয়া উপরি-উক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমালোচনা—Criticism.

বৃহৎ উৎপাদনক্ষেত্রে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিলে সেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদনক্ষেত্রে এত অধিক সুবিধার অধিকারী হয় যে, ইহার উৎপাদন-খরচা হ্রাস পাইয়া প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সর্বনিম্ন হয় এবং সেইজন্য এই সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয় না, সুতরাং মূল্যনির্ধারণ ব্যাপারে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার কোন প্রভাব থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে কি প্রতিযোগিতা সম্ভব? কোন শিল্পের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানটি এই সুবিধার অধিকারী হইবে অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-খরচা হ্রাস পাইয়া সর্বাপেক্ষা কম হইবে, সেই প্রতিষ্ঠানটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিক্রয়ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পাইবে। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যে বিলোপ পাইবে। এইরূপে দীর্ঘ মেয়াদে সেই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া কারবার বা দ্বি-বিক্রেতায়ত্ত কারবার বা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্শাল-প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত মার্শাল-প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা এত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট শিল্পের কোন্ প্রতিষ্ঠানটি সেই শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় তাহা বলা সুকঠিন।

কাম্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান—Optimum Firm.

বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ শিল্পক্ষেত্রে একটি নূতন সংজ্ঞার অবতারণা করিয়াছেন। এই সংজ্ঞাটিকে কাম্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বলা হয়। ইহাকে কাম্য-প্রতিষ্ঠান বলা হয় এই কারণে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে

ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি এরূপ প্রসারলাভ করে যে, প্রসারের ফলে শিল্প-ব্যবস্থাপকের সর্বাধিক মুনাফা হয়। আয়তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, কাম্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান এরূপ আয়তনবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যে, আয়তনের কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে শিল্পসংগঠনে দক্ষতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পাইয়া মুনাফার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবস্থাপনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, কাম্য প্রতিষ্ঠান হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহা উৎপাদনের উপাদানগুলির সর্বোৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ-পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই কারণে মাত্রাপ্রতি গড় উৎপাদন-খরচা সর্বাপেক্ষা কম হয়।

কাম্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংজ্ঞাটি সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যার অনুরূপ। সর্বাধিক-কাম্য জনসংখ্যা যেরূপ একটি নির্ধারিত জনসংখ্যা নহে—উৎপাদন-দক্ষতার পরিবর্তনের সহিত এই সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কাম্য প্রতিষ্ঠান সংজ্ঞাটিও তদ্রূপ একটি আপেক্ষিক ধারণামাত্র। অবস্থাভেদে এই কাম্য প্রতিষ্ঠান সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উৎপাদনের উপাদান-গুলির উৎকর্ষের পরিবর্তন ঘটিলে অথবা উৎপাদন-পদ্ধতির বা বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে কাম্য প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কাম্য প্রতিষ্ঠানের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতির জটিলতার জন্য ক্ষুদ্রায়তনই হইল কাম্য প্রতিষ্ঠান, কারণ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, ফলে সর্বাধিক মুনাফা সম্ভব হয়। আবার, কোথায়ও শিল্পের আয়তন বড় হইলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায়। সর্বাধিক কাম্য আয়তন লাভ করিবার জন্যই নানা-প্রকারের শিল্পসংহতি দেখা যায়। অপর পক্ষে এই সর্বাধিক কাম্য আয়তনের সীমা অতিক্রম করিলে শিল্পে মন্দা শুরু হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সম্পর্কযুক্ত মূল্য

(Interrelated Prices)

একটি দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্রব্যমূল্য-নিরপেক্ষভাবে কি নীতিতে নির্ধারিত হয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই বা ততোধিক দ্রব্যমূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই দ্রব্যগুলির একটির চাহিদা বা সরবরাহের পরিবর্তন ঘটিলে অপরগুলিরও চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। সম্পর্কযুক্ত মূল্যের চারিটি প্রকারভেদ দেখা যায়।

১। সংযুক্ত চাহিদা—Joint Demand.

যখন কোন একটি বিশেষ অভাব পূরণের জন্য বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দুই বা ততোধিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন হয়, তখন এই দুই বা ততোধিক দ্রব্যের চাহিদাকে সংযুক্ত চাহিদা বলা হয় এবং সংযুক্ত চাহিদার প্রত্যেকটি সামগ্রীকে অনুপূরক সামগ্রী (Complementary goods) বলা হয়। চা পান করিবার ইচ্ছা শুধু চায়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না—ইহার জন্য চা, চিনি ও দুধের প্রয়োজন হয়। সুতরাং চা-এর চাহিদা হইল সংযুক্ত চাহিদা এবং চা-পাতা, চিনি ও দুধ প্রত্যেকটি হইল অনুপূরক সামগ্রী। সংযুক্ত চাহিদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল উৎপাদনের উপাদান-গুলি। কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি ব্যতীত উৎপাদন-কার্য চলিতে পারে না। গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে নানাজাতীয় শ্রমিক ও নানাজাতীয় মাল-মশলার প্রয়োজন হয়। যে দ্রব্যটির জন্য প্রধানতঃ চাহিদার উৎপত্তি হয়, সেই দ্রব্যটির চাহিদাকে প্রত্যক্ষ (Direct Demand) বলা হয় এবং যে অনুপূরক সামগ্রীগুলির সমাবেশে চাহিদার নিবৃত্তি হয়, সেই অনুপূরক সামগ্রীগুলির চাহিদাকে উদ্ভূত বা পরোক্ষ চাহিদা (Derived Demand) বলা হয়। চা-এর চাহিদা হইল প্রত্যক্ষ চাহিদা আর এজন্য চা-পাতা, চিনি ও দুধের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা।

এখন প্রশ্ন হইল যে, সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অনুপূরক সামগ্রীর মূল্য কি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক সামগ্রীগুলির স্বতন্ত্র মূল্য প্রত্যেকটি সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগিতা ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা হইল যে, প্রত্যেকটি অনুপূরক সামগ্রীর পৃথক্ প্রান্তিক উপযোগিতা জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইজন্য অনুপূরক সামগ্রীগুলির একটির অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া অপরগুলির অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগিতা নির্ধারণ করা যায়। চা-এর ক্ষেত্রে চা-পাতা ও চিনির অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া দুধের অনুপাত হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া দুধের প্রান্তিক উপযোগিতা নির্ধারণ করা সম্ভব। এইরূপে প্রত্যেকটির অনুপাত পরিবর্তন ও অন্যগুলির অনুপাত ঠিক রাখিয়া প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগিতা নির্ধারণ করা সম্ভব। যে বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগিতা ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সমান হয়, সেই বিন্দুতেই সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়।

অনুপূরক সামগ্রীগুলির মূল্যসম্পর্ক—Relation between prices of complementary goods.

টেনিস্ খেলিবার জন্য বল ও র‍্যাকেটের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহা সংযুক্ত চাহিদার একটি উদাহরণ। বল ও র‍্যাকেট্ অনুপূরক সামগ্রী। যদি কোন কারণে র‍্যাকেটের দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সাধারণতঃ চাহিদার সূত্র অনুসারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে র‍্যাকেটের চাহিদা হ্রাস পায়। র‍্যাকেটের চাহিদা হ্রাস পাইলে স্বভাবতঃই বলের চাহিদা হ্রাস পাইবে, কেন না, বল সাধারণতঃ র‍্যাকেট্ ব্যতীত ব্যবহার করা চলে না। বলের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে বলের মূল্যও হ্রাস পাইবে।

অপর পক্ষে, র‍্যাকেটের মূল্য হ্রাস পাইলে র‍্যাকেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে বলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে, কারণ বল ছাড়া র‍্যাকেট ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে বলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক সামগ্রীগুলির মূল্য সম্পর্ক বিপরীতমুখী অর্থাৎ একটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অপরটির মূল্য হ্রাস পায়, আবার একটির মূল্য হ্রাস পাইলে অপরটির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে কোন অনুপূরক উপাদান কি উচ্চতর মূল্য পাইতে পারে ?—Can a factor which is jointly demanded charge a higher price ?

এই প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক মার্শাল চুণ-বালি কাজের মিস্ত্রীর উদাহরণ দ্বারা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গৃহ-নির্মাণ কার্যে নানাজাতীয় শ্রমিকের যথা, গৃহনির্মাণের মিস্ত্রী, চুণ-বালির মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, সাধারণ সাহায্যকারী শ্রমিক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। ইহারা প্রত্যেকেই গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপূরক শ্রমিক। মার্শালের মতে চুণ-বালির মিস্ত্রীর পারিশ্রমিক নিম্নলিখিত কারণে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(ক) অনুপূরক উপাদানের মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হয়, যদি ঐ অনুপূরক উপাদানটি উৎপাদনে একান্ত অপরিহার্য হয় এবং উহার কোন সন্তোষজনক পরিবর্তী সামগ্রী না থাকে। গৃহনির্মাণক্ষেত্রে চুণ-বালির মিস্ত্রীর কার্য অপরিহার্য এবং এই মিস্ত্রীর কোন পরিবর্তী শ্রমিক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহারা উচ্চতর মজুরি আদায় করিতে পারে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মূল দ্রব্যটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে যে দ্রব্যটির চাহিদার জন্য অনুপূরক উপাদানটির চাহিদা হয়, সেই মূল দ্রব্যটির চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় হয় তাহা হইলে অনুপূরক উপাদানটির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। গৃহনির্মাণ-কার্য যদি স্থগিত না থাকে অর্থাৎ গৃহের চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইলে চুণ-বালির মিস্ত্রীর কার্য অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহারা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিতে পারে।

(গ) তৃতীয়তঃ, অনুপূরক উপাদানটির খরচা যুক্ত-চাহিদা দ্রব্যটির মোট উৎপাদন-খরচার অকিঞ্চিৎকর অংশ হওয়া চাই। গৃহনির্মাণ-কার্যে চুণ-বালির মিস্ত্রীর মজুরি-খরচা গৃহনির্মাণ খরচার ক্ষুদ্র অংশ হইলে চুণ-বালির মিস্ত্রীর মজুরি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(ঘ) চতুর্থতঃ, প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুপূরক উপাদানগুলিকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য দেওয়া সম্ভব হইলে একটি অনুপূরক উপাদানকে অধিক মূল্য দেওয়া সম্ভব হয়। চুণ-বালির মিস্ত্রীরা মজুরিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি ধর্মঘট করে তাহা হইলে গৃহনির্মাণ স্থগিত থাকে। ফলে অন্য জাতীয় শ্রমিকেরা বেকার হয়। তখন এই বেকার শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়।

অন্ত জাতীয় শ্রমিকগণকে কম মজুরি লইতে বাধ্য করিয়া যে উদ্বৃত্ত হয়, সেই উদ্বৃত্ত দ্বারা চুণ-বালির মিস্ত্রীর মজুরি বৃদ্ধি করা হয়।

২। যুক্ত-সরবরাহ—Joint-supply or Joint-products.

যখন একই উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও একই সাধারণ উৎপাদন-খরচায় দুই বা ততোধিক দ্রব্য এরূপভাবে উৎপাদিত হয় যে, একটির উৎপাদন অন্যটির উৎপাদনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে, তখন এই দুই বা ততোধিক দ্রব্যকে যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্য বলা হয় এবং এই দ্রব্যগুলির সরবরাহকে যুক্ত-সরবরাহ বলা হয়। গ্যাস ও কোক, ধান্য ও খড়, মাংস ও উল, তুলার আঁশ ও তুলার বীজ প্রভৃতি হইল এই যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধান্য উৎপাদন করিতে গেলে একই খরচায় ও একই উৎপাদন-পদ্ধতিতে খড় পাওয়া যায়। খড় উৎপাদনের পৃথক্ কোন খরচা নাই এবং ধান উৎপাদন না করিয়া শুধু খড় উৎপাদন সম্ভব নয়। যুক্ত-সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দ্রব্যটির জন্য উৎপাদন-কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হয়, সেই দ্রব্যটিকে প্রধান দ্রব্য (Principal or Main product) বলা হয় ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলিকে উপজাত দ্রব্য (By-product) বলা হয়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাবের ফলে নানাপ্রকারে উপজাত দ্রব্যগুলিকে উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে এই উপজাত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার হইত না, কিন্তু বর্তমানে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই এই উপজাত দ্রব্যগুলিকে নূতন উপযোগিতা-সম্পন্ন দ্রব্য-উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বর্তমানে উৎপাদন-খরচা বলিলে কোন একটি দ্রব্যবিশেষের একক উৎপাদন-খরচা বুঝায় না, একসঙ্গে বহু দ্রব্যের যুক্ত উৎপাদন-খরচা বুঝায়।

মূল্যনির্ণয়—Determination of the value of joint-products.

(ক) এখন প্রশ্ন হইল যে, এই যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্য কি নীতি অনুসারে নির্ধারিত হয়? (১) সরবরাহের দিক দিয়া যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্য মোট উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং (২) চাহিদার দিকে দ্রব্যগুলির মূল্য প্রত্যেকটির পৃথক্ প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সরবরাহের দিকে এই দ্রব্যগুলির পৃথক্ উৎপাদন-খরচা জানা সাধারণতঃ সম্ভব

নয়, কারণ দ্রব্যগুলি একই অবিচ্ছেদ্য পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয় বলিয়া তাহাদের উৎপাদন-খরচা পরস্পরের সহিত এরূপ অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত যে, কোনটির কোন স্বতন্ত্র উৎপাদন-খরচা নাই বলিলেও চলে। সুতরাং মূল্যনির্ধারণ কালে বিক্রেতা এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মূল্য সেই দ্রব্যটির চাহিদার তীব্রতা দ্বারা এরূপভাবে স্থির করিবে যে, প্রত্যেকটির চাহিদা-মূল্য একত্রিত করিয়া তাহার দ্রব্যগুলির মোট উৎপাদন-খরচা সংকুলান হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি ছাগল হইতে যুগপৎ মাংস ও চামড়া পাওয়া যায়। মাংস ও চামড়ার পৃথক কোন উৎপাদন-খরচা স্থির করা সম্ভব নয়। কারণ এই দুইটি দ্রব্যই একই সাধারণ খরচায় একই পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। উৎপাদক ছাগলটি পালন করিতে মোট কত খরচ হইয়াছে শুধুমাত্র তাহা জানে। যদি ছাগলটি পালন করিতে তাহার মোট ২০৲ টাকা খরচ হয়, তাহা হইলে সে মাংস ও চামডার চাহিদার তীব্রতা অনুসারে মাংস ও চামড়ার মূল্য এরূপভাবে স্থির করিবে যে, এই উভয়ের মূল্য হইতে তাহার মোট খরচা অর্থাৎ ২০৲ টাকা সংকুলান হয়। যদি মাংসের চাহিদা চামড়ার চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সে মাংসের মূল্য ১৫৲ টাকা ও চামড়ার মূল্য ৫৲ টাকা ধার্য করিয়া তাহার মোট উৎপাদন-খরচা সংকুলান করিবে। আবার চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সে চামড়ার জন্য হয়ত ৮৲ টাকা ও মাংসের জন্য ১২৲ টাকা মূল্য ধার্য করিবে।

(খ) যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্য উপরি-উক্ত নীতি অনুসারে নির্ধারিত হয়। ধান ও খড়ের আপেক্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদক হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই দ্রব্যগুলির উৎপাদনের পরিমাণ একটি নৈসর্গিক ব্যাপার। কিন্তু এমন অনেক যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলির উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেকটির উৎপাদনের অনুপাত ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করিতে পারে। মেষপালন ক্ষেত্রে বর্তমানে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়াছে। দুইদল মেষকে পৃথগ্‌ভাবে পালন করিয়া একদল মেষ হইতে অধিক পরিমাণ মাংস ও অন্যদল হইতে অধিক পরিমাণ উল সংগ্রহ করা হয়। এইরূপে অতিরিক্ত মাংস ও অতিরিক্ত উল পাইবার জন্য যে পৃথক্ খরচা হয় তাহা

বর্তমানে জানা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যের পৃথক্ প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা জানা সম্ভব বলিয়া প্রত্যেকটির মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারণ সম্ভব হয়। যদি মূল্য এই প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সমান না হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত মাংস বা অতিরিক্ত উল উৎপাদিত হইবে না।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটিকে বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য একটি পৃথক্ খরচা বা চল্‌তি খরচা (Prime cost) বহন করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র (চল্‌তি) খরচা ঐ দ্রব্যের মূল্যনির্ধারণের সর্বনিম্ন সীমা বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেকটির মূল্য প্রত্যেকটির পৃথক্ উৎপাদন-খরচা ও স্থায়ী বা যুক্ত-খরচার (Supplementary or joint cost) একটা অংশদ্বারা নির্ধারিত হয়। যুক্ত খরচার কি পরিমাণ প্রত্যেকটির মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা সেই দ্রব্যটির চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্যসম্পর্ক—Relation between prices of joint-products or joint-cost goods.

যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটির মূল্য পরিবর্তিত হইলে অন্যগুলির উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন কারণে যদি মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাংসের সরবরাহও বৃদ্ধি পাইবে। মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলে চামড়ারও সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে, কারণ মাংস ও চামড়া যুক্তপদ্ধতিতে একই খরচায় উৎপাদিত হয়। চামড়ার চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে চামড়ার সরবরাহ-বৃদ্ধির ফলে চামড়ার মূল্য হ্রাস পাইবে।

অপর পক্ষে, যদি কোন কারণে মাংসের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে মাংসের সরবরাহও হ্রাস পাইবে। মাংসের সরবরাহ হ্রাস পাইলে আপনা হইতেই চামড়ার সরবরাহ হ্রাস পাইবে। কিন্তু চামড়ার চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং যুক্ত-সরবরাহের ক্ষেত্রেও যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যগুলির মূল্য বিপরীত-

মুখী অর্থাৎ একটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অপরটির মূল্য সাধারণতঃ হ্রাস পায় এবং একটির মূল্য হ্রাস পাইলে অপরটির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একটি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে অপরটি মূল্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, সেই প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ অপর দ্রব্যটির চাহিদার প্রকৃতি ও দ্রব্যটির অন্য কোন পরিবর্তী সামগ্রী আছে কিনা তাহার উপর নির্ভর করে। কোক্ কয়লার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে যদি গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গ্যাসের চাহিদা যদি পরিবর্তনশীল হয় এবং গ্যাসের পরিবর্তী সামগ্রী হিসাবে যদি সস্তায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গ্যাসের পরিবর্তে লোকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবে। ফলে গ্যাসের চাহিদা হ্রাস পাইবে ও মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

রেল পরিবহনের মাশুল নির্ধারণ—Fixing of Railway Rates.

রেল পরিবহন-কার্যের মাশুল নির্ধারণ সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। একটির প্রবর্তক হইলেন অধ্যাপক টাউসিগ, অপরটির উদ্ভাবক হইলেন অধ্যাপক পিগু। টাউসিগের মতে রেল পরিবহন-ব্যবস্থা হইল যুক্ত-সরবরাহের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁহার মতবাদ সমর্থনের জন্য বলেন যে, রেল পরিবহনের যে বিরাট খরচা তাহার অধিকাংশই স্থায়ী খরচার (Supplementary costs or overhead charges) অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, যাত্রীবহন ও মালবহনের জন্য যে স্বতন্ত্র খরচা হয়, তাহার পৃথকীকরণ সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, একই উপাদানের সাহায্যে ও একই যুক্ত-খরচার সাহায্যে বিভিন্ন বাজারের চাহিদা পূরণ করা হয়। সুতরাং রেল পরিবহন দ্বারা যে বিভিন্ন যাত্রী ও বিভিন্ন দ্রব্যকে স্থানান্তর করা হয়, তাহার পৃথক্ খরচা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। টাউসিগ্ অবশ্য স্বীকার করেন যে, বিভিন্ন ধরণের পরিবহনের জন্য কিছু পৃথক্ খরচা আছে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীবহন ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীবহন বা স্বর্ণ ও কয়লা পরিবহন-খরচার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

মতান্তরে পিগু বলেন যে, রেল পরিবহন-কার্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও যুক্ত-সরবরাহ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার মতে যুক্ত-

সরবরাহের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তখন, যখন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য মূলধন ও শ্রম প্রয়োগের ফলে অপর দ্রব্যগুলি অপরিহার্যরূপে উৎপাদিত হয়। ধান্য-উৎপাদন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের অবশ্যম্ভাবী ফল ধান্য ও খড়। কিন্তু রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায়। যাত্রী-সাধারণের সুবিধার জন্য মূলধন বিনিয়োগ করা হইলে, সেই মূলধন প্রয়োগের ফলে মালবহন-ব্যবস্থার সুবিধার সৃষ্টি নাও হইতে পারে। রেল পরিবহনে স্থায়ী খরচা মোট খরচার একটি বিরাট অংশ বলিয়াই শুধু রেল পরিবহন-ব্যবস্থাকে যুক্ত-সরবরাহ নীতির অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নহে। পিগু বলেন যে, একটিমাত্র বিশেষক্ষেত্রে রেল পরিবহন-ব্যবস্থায় যুক্ত-সরবরাহের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রেলের প্রারম্ভ প্রান্ত হইতে যখন শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গাড়ী যায় এবং এই শেষ প্রান্ত হইতে গাড়ী যখন প্রথম প্রান্তে প্রত্যাবর্তন করে, তখনই এই যুক্ত-সরবরাহ নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, প্রথম প্রান্ত হইতে শেষ প্রান্ত অভিমুখে গাড়ী যাত্রা করিলে পুনরায় ঐ গাড়ীকে প্রথম প্রান্তে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন অপরিহার্য। সুতরাং শেষ প্রান্তের দিকে যাত্রার খরচার সহিত প্রত্যাবর্তনের খরচা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নতুবা পরিবহন-ব্যবস্থার অচল অবস্থার উদ্ভব হইবে। এই একটি মাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত রেল পরিবহনের অন্য কোন ক্ষেত্রে যুক্ত-সরবরাহের কোন বৈশিষ্ট্য নাই—সুতরাং রেলের মাশুল যুক্ত-সরবরাহ নীতি দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না।

রেলের মাশুল নির্ধারণে দুইটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হইতে পারে। রেলের মাশুল পরিবহন-খরচ অনুযায়ী (cost of service principle) কিংবা পরিবহন-মূল্য অনুযায়ী (value of service principle) হইতে পারে। রেলের বিভিন্ন ধরণের পরিবহন-কার্যের খরচ পৃথগ্‌ভাবে স্থির করা দুঃসাধ্য। সুতরাং প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে যদি রেলের মাশুল নির্ধারিত হয় তাহা হইলে পরিবহনযোগ্য সকল দ্রব্যের মাশুলই সমান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রেলের মাশুল যদি সমান হয় তাহা হইলে লৌহ, কয়লা প্রভৃতি ভারী অথচ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান্ দ্রব্যের প্রেরকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর পক্ষে স্বর্ণ প্রভৃতি হাল্‌কা অথচ মূল্যবান দ্রব্যের প্রেরকগণ লাভবান হয়। রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য গাড়ীর গতিবেগের পার্থক্যের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে মাইলপ্রতি মাশুলের পার্থক্য করিতে পারেন।

রেলের মাশুল সাধারণতঃ পরিবহন-মূল্য অনুযায়ী হয়। এই নীতি অনুসারে পরিবহনযোগ্য দ্রব্যগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয় এবং এই বিভিন্ন পর্যায়ের দ্রব্যগুলির মাশুল দিবার সামর্থ্যের দ্বারা তাহাদের মাশুল নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও স্বল্প আয়তনে অধিক মূল্য বহন করে এবং এইজন্য স্বর্ণের উপর উচ্চ মাশুল ধার্য করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে কয়লা, কাষ্ঠ প্রভৃতি নিম্ন পর্যায়ের ভারী দ্রব্য এবং ইহারা কম মূল্যবান। কম মূল্যবান বলিয়া ইহাদের উচ্চহারে মাশুল দিবার সামর্থ্য নাই, সেইজন্য এই নিম্ন পর্যায়ের দ্রব্যগুলির মাশুল অপেক্ষাকৃত কম। এই বিভিন্ন দ্রব্যগুলির মাশুল এরূপভাবে নির্ধারিত হয় যে, রেল কর্তৃপক্ষ সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। সুতরাং এই শেষোক্ত নীতি অনুসারে রেলের মাশুলের হার বিভিন্ন হয়।

৩। প্রতিযোগী বা বিকল্প সরবরাহ—Composite or Rival Supply.

যখন কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব বিভিন্ন দ্রব্যের যে-কোন একটির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়, তখন এই দ্রব্যগুলিকে প্রতিযোগী সরবরাহ-দ্রব্য বলা যাইতে পারে। ভবানীপুর হইতে শ্যামবাজার ট্রাম অথবা বাসে যাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ট্রাম ও বাস্ প্রতিযোগী বা বিকল্প সরবরাহ। একটি অপরটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইজন্য বিকল্প সরবরাহের প্রত্যেকটি দ্রব্যকে পরিবর্তী সামগ্রী (substitutes) বা প্রতিযোগী সামগ্রী (competing goods) বলা যাইতে পারে। ছাগমাংস, মেষমাংস, কুক্কুটমাংস পরিবর্তী সামগ্রী ; চা, কোকো, কফি প্রভৃতিও এই পর্যায়ভুক্ত।

পরিবর্তী বা প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির মূল্য এই দ্রব্যগুলির প্রান্তিক উপযোগিতা ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দ্রব্যগুলির একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করা যায় বলিয়া প্রত্যেকটির মূল্য প্রান্তিক উপযোগিতার সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। মূল্য যদি দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে লোকে ঐ দ্রব্যটি ক্রয় না করিয়া প্রতিযোগী সামগ্রী ক্রয় করিবে। পরিবর্তী সামগ্রীগুলির মূল্যও পরস্পর সম্পর্ক

যুক্ত। একটির মূল্যের পরিবর্তনের সহিত অন্যগুলির মূল্যেরও পরিবর্তন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি ছাগমাংসের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ক্রেতাগণ ছাগমাংস ক্রয় না করিয়া কুক্কুটমাংস ক্রয় করিবে। ফলে কুক্কুটমাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বর্ধিত চাহিদার জন্য কুক্কুটমাংসের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

অপর পক্ষে, ছাগমাংসের মূল্য হ্রাস পাইলে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ছাগমাংসের মূল্য হ্রাস হইলে ক্রেতাগণ কুক্কুটমাংস ক্রয় না করিয়া অধিক ছাগমাংস ক্রয় করিবে, ফলে কুক্কুটমাংসের চাহিদা হ্রাস পাইবে। চাহিদা-হ্রাসের ফলে কুক্কুটমাংসের মূল্য হ্রাস পাইবে।

সুতরাং প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিযোগী সামগ্রী-গুলির মূল্য একাভিমুখী অর্থাৎ একটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অপরটির মূল্য বৃদ্ধি পায়; একটির মূল্য হ্রাস পাইলে অপরটির মূল্যও হ্রাস পায়।

৪। প্রতিযোগী বা বিকল্প চাহিদা—Composite or Rival Demand.

একাধিক ব্যবহারের জন্য যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যটির বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য পৃথক্ চাহিদাগুলিকে প্রতিযোগী চাহিদা বলা হয়। লৌহ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি একাধিক ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। সেতু, গৃহ, কল-কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ নির্মাণকার্যের জন্য লৌহের প্রয়োজন হয়। যদি লৌহের এই বিভিন্ন ব্যবহারের কোন একটি ব্যবহারের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে লৌহ ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে। প্রতিযোগী চাহিদার ক্ষেত্রেও মূল্য দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়। সমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র অনুসারে এই দ্রব্যটি বিভিন্ন উৎপাদনের জন্য এরূপভাবে ব্যবহৃত হইবে যে, প্রত্যেক ব্যবহার হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

একচেটিয়া ব্যবসায়ে মূল্যনির্ধারণ

(Value under Monopoly)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার সমাবেশ হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা তাহাদের খুসীমত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে একই বাজারে একই দ্রব্যের সাধারণতঃ বিভিন্ন মূল্য থাকিতে পারে না।

কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা বা একটি বিক্রেতা-সংঘ বাজারে একটি দ্রব্যের সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতার কোন স্থান নাই। চাহিদার উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা না থাকিলেও সমগ্র সরবরাহ তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে সে এরূপভাবে সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, সে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে অথবা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। যদি সে বাজারে অধিক পরিমাণ সরবরাহ করে, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাইয়া তাহার মুনাফাও হ্রাস পায়। অপর পক্ষে, সে যদি বাজারে কম পরিমাণ সরবরাহ করে তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে তাহার মোট মুনাফা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে উপরি-উক্ত কোন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার স্বার্থের অনুকূল নহে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) সমান হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী একটি দ্রব্যের প্রতিটি ২৲ টাকা হিসাবে ১৫টি দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ৩০৲ টাকা। যদি সে ১৬টি দ্রব্য প্রতিটি ১৸৶০ হিসাবে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৩১৲ টাকা। এস্থলে তাহার প্রান্তিক আয় হইল (৩১—৩০) ১৲ টাকা। প্রান্তিক অর্থাৎ ষোড়শ দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচা যদি প্রান্তিক আয় অর্থাৎ ১৲ টাকা হইতে কম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ষোড়শ সংখ্যক দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভজনক হয়। কিন্তু ষোড়শ সংখ্যক দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচা যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন লাভজনক নহে। সেইজন্য সে ১৫টির অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিবে না। কারণ, ১৫টি উৎপাদন করিলেই তাহার সর্বাধিক মুনাফা হয়। সুতরাং দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে, কারণ এই উৎপাদন-বৃদ্ধি দ্বারা তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সমান থাকে, সে সেই পরিমাণের অধিক বা কম উৎপাদন করে না; কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মোট আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৮নং চিত্র
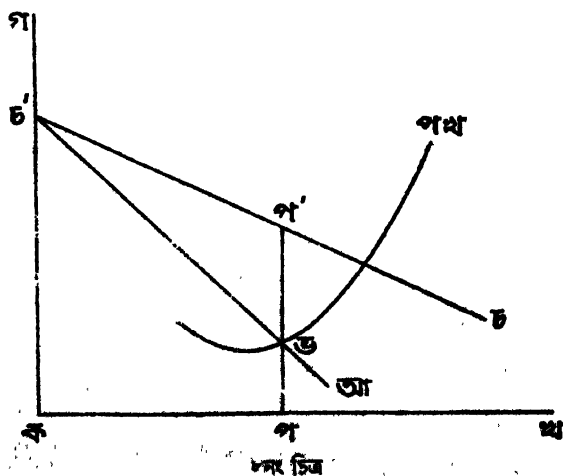
এই নক্সায় চচ' রেখা দ্বারা বিক্রেতা কত মূল্যে কত পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ

করিতে সক্ষম তাহা বুঝান হইয়াছে। **আর্চ** রেখাদ্বারা তাহার প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। **পখ** বক্ররেখা প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সূচিত করে। প্রান্তিক খরচা রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা অর্থাৎ **পখ** রেখা ও **আর্চ´** রেখা **ভ** বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যায় যে, যখন **কপ** পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং যখন **কপ** পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তখন মূল্য হইতেছে **পপ´**। যখন সে **কপ** পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিবে, তখনই তাহার সর্বাধিক মুনাফা হইবে। সুতরাং একচেটিয়া ক্ষেত্রে মূল্য হইল **পপ´**।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কি উপায়ে দ্রব্যমূল্য স্থির করে তাহা আরও সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক, একজন ব্যবসায়ী নূতন একধরণের ফাউন্‌টেন কলম বাজারে বাহির করিল। প্রতিটি কলমের উৎপাদন ব্যয় হইল ৫৲ টাকা। এখন ব্যবসায়ী কোন্ মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হইবে দেখা যাউক।

প্রতি কলমের মূল্য	মোট বিক্রয় পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ আয়	মোট ব্যয়	নীট মুনাফা
৮ টাকা	১০০	৮০০ টাকা	৫০০ টাকা	৩০০ টাকা
৭ "	২০০	১৪০০ "	১০০০ "	৪০০ "
৬ "	২৭৫	১৬৫০ "	১৩৭৫ "	২৭৫ "

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, কলম ব্যবসায়ী যদি প্রতি কলমের দাম ৮৲ টাকা ধার্য করে তাহা হইলে তাহার ১০০টি কলম বিক্রয় হইয়া খরচ বাদ দিলে ৩০০ টাকা নীট মুনাফা থাকে। কলমের দাম ৭৲ টাকা ধার্য করিলে ৪০০ টাকা এবং ৬ টাকা ধার্য করিলে ২৭৫ টাকা নীট মুনাফা থাকে। সুতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য অর্থাৎ ৮ টাকা অথবা সর্বনিম্ন মূল্য অর্থাৎ ৬ টাকা ধার্য না করিয়ে ৭ টাকা মূল্য ধার্য করিবে। কারণ একমাত্র এই মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তাহার খুসীমত মূল্য ধার্য করিতে পারে না।

কিসের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্যনির্ধারণ নির্ভর করে —Conditions on which monopoly price depends.

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্যনির্ধারণকালে চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কিত অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়। চহিদার উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া সে অধিক মুনাফা লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে হয়ত দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দ্রব্যটির চাহিদা হ্রাস পাইয়া তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে—ফলে তাহার মুনাফাও সর্বাধিক হয় না। এইজন্য মূল্য স্থির করিবার পূর্বে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে দ্রব্যটির চাহিদার প্রকৃতি (Nature of the Demand) ও উৎপাদন-খরচা (Cost Condition) সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

১। দ্রব্যটির চাহিদা যদি পরিবর্তনশীল (Elastic) হয়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি হইলে দ্রব্যটির চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মোট মুনাফা হ্রাস পায়। সুতরাং পরিবর্তনশীল চাহিদার ক্ষেত্রে তাহার প্রান্তিক আয় মূল্য অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং পরিবর্তনশীল চাহিদার ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে।

২। কিন্তু দ্রব্যটির চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় (Inelastic হয়), তাহা হইলে সে মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে এবং এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস না পাইতে পারে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, পরিবর্তনশীল চাহিদার ক্ষেত্রে নিম্নমূল্য ও অপরিবর্তনীয় চাহিদার ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য ধার্য হয়।

৩। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দ্রব্য যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-খরচা নীতির অন্তবর্তী হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাস করা অধিকতর লাভজনক হয়। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাসের ফলে তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৪। অপর পক্ষে দ্রব্যটির উৎপাদন যদি ক্রমহ্রাসমান নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাস করা সম্ভব হয়। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাসের ফলে তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে বৈষম্যমূলক মূল্য—Price-discrimination under Monopoly.

অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাহার ক্রেতাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য আদায় করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে। বৈষম্যমূলক মূল্যের তিনটি প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ব্যক্তিগত বৈষম্য—Personal discrimination.

এই ব্যবস্থার দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার খরিদ্দারগণকে সামর্থ্যানুসারে বা দ্রব্যটির চাহিদার তীব্রতানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিভিন্ন মূল্য আদায় করে। একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করা দৃষ্টিকটু বলিয়া অনেক-সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যটির বহিরাবরণে একটু পরিবর্তন সাধন করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের দ্রব্য হিসাবে বাজারে বাহির করে। রেল ও ট্রাম কোম্পানী যাত্রীসাধারণকে ২।৩ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ভ্রমণের সুবিধার কিছু তারতম্য করিয়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণের নিকট অধিক মাশুল আদায় করে। প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একই সময়ে তাঁহাদের গন্তব্য স্থলে পৌছিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণ ভ্রমণকালে যে অতিরিক্ত সুখ-সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহার তুলনায় তাঁহাদের অনেক বেশী মাশুল দিতে হয়। পুস্তক-প্রকাশকগণও অনেক সময় পুস্তকের দামী ও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে বৈষম্যমূলক মূল্য আদায় করিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করেন।

২। ব্যবসায়গত বা দ্রব্যগত বৈষম্য—Trade or Use discrimination.

অনেক সময় আবার একচেটিয়া ব্যবসায়ী দ্রব্যটির বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎসরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ-প্রবাহের বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে। আলো ও পাখার জন্য যে হারে মূল্য দিতে হয়, বেতার যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম হারে মূল্য দেওয়া চলে।

৩। স্থানগত বৈষম্য—Place or Locality discrimination.

একচেটিয়া ব্যবসায়ী একই দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। স্থানগত বৈষম্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল -অল্প দরে বিদেশে বিক্রয়

করা (Dumping)। অনেক সময় একই দ্রব্য একই সহরের অভিজাত অঞ্চলে অধিক মূল্যে ও অন্যত্র অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করা কখন সম্ভব নয়—Under what conditions Price-discrimination is not possible.

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করা সম্ভব নহে। ইহাতে ক্রেতাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া পরিবর্তী সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে বা একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। নিম্নলিখিত অবস্থায় বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করা সম্ভব নয় :

(ক) যখন যে সমস্ত ক্রেতা কমমূল্যের দ্রব্য ক্রয় করে তাহাদের পক্ষে উচ্চমূল্যে ক্রয়-ক্ষমতাযোগ্য ক্রেতাগণের নিকট পুনর্বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা না থাকে। শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রীত সস্তা বিদ্যুৎপ্রবাহের যদি সাধারণ ব্যবহারের জন্য পুনর্বিক্রয় করা যাইত, তাহা হইলে এই উভয় ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা সম্ভব হইত না।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, যদি উচ্চমূল্যে ক্রয়-সমর্থ ক্রেতাগণ উচ্চমূল্যে ক্রয় না করিয়া সস্তা মূল্যের দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহা হইলেও সেক্ষেত্রে বৈষম্য-মূলক মূল্য ধার্য করা সম্ভব হয় না। রেলের উচ্চ শ্রেণীর যাত্রিগণ যদি উচ্চ শ্রেণীতে যাতায়াত না করিয়া নিম্ন শ্রেণীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন, তাহা হইলে রেল কর্তৃপক্ষ বৈষম্যমূলক মাশুল ধার্য করিতে পারে না।

বৈষম্যমূলক মূল্যের সুবিধা—Advantages of discriminating price.

একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করিয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় যে, ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু একথা সত্য নহে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিভিন্ন মূল্য ধার্য করিয়া চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতাবস্থা আনয়ন করিয়া সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে। যদি সে তাহার দ্রব্যের জন্য একটি মাত্র মূল্য ধার্য করে, তাহা হইলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয় না এবং ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ধরা যাউক, একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার দ্রব্যের জন্য

একটি মাত্র মূল্য স্থির করিল এবং এই মূল্যটি যদি উচ্চমূল্য হয় তাহা হইলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মুনাফার পরিমাণও হ্রাস পাইতে পারে। অপর পক্ষে, সে যদি কমমূল্য ধার্য করে তাহা হইলে হয়ত বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু কমমূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক না হইতে পারে। সুতরাং এই উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ উচ্চ অথবা নিম্ন একটি মাত্র মূল্য হইলে, মুনাফা হ্রাসের সম্ভাবনায় সে হয়ত উৎপাদন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করিয়া সে বিক্রয়লব্ধ আয়ের দ্বারা তাহার মোট খরচা সংকুলান করিতে সমর্থ হয়। বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্যের ফলে সমাজের ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর ক্রেতাগণই তাহাদের সামর্থ্যানুসারে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য হইবার ফলে দরিদ্র ক্রেতাগণ অধিকতর লাভবান হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রেলে যদি শ্রেণীবিভাগ না থাকে তাহা হইলে রেলের মোট খরচা সংকুলান করিবার জন্য সকল শ্রেণীর যাত্রীর জন্য এক মাশুল নির্ধারিত হইত যাহা বর্তমান প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাশুল অপেক্ষা কম ও তৃতীয় শ্রেণীর মাশুল অপেক্ষা অধিক হইত। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের সুবিধা হইত কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইত। বৈষম্যমূলক মাশুল ধার্যের ফলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ অপেক্ষাকৃত কম মাশুলে রেলে ভ্রমণ করিতে পারেন। পুস্তক-প্রকাশনার ক্ষেত্রেও মূল্যের এই বৈষম্য আবার পাঠকের স্বার্থের অনুকূল।

বিভিন্ন বাজারে বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্য করা—Dumping.

কখনও কখনও একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ বিদেশে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। বিদেশে কমমূল্যে বিক্রয় করিবার নানা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, যদি একচেটিয়া ব্যবসায়ী এত অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া থাকে যাহার সমগ্র পরিমাণ দেশে লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উৎপাদনের এই অতিরিক্ত অংশ সে বিদেশে কমমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। দেশী বাজার স্থায়ী ও নিশ্চিত। সেজন্য দেশের মধ্যে অত্যধিক উৎপাদনের জন্য যদি সে একবার মূল্য হ্রাস করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর মূল্য বৃদ্ধি করা কঠিন। এইজন্য

সে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বিদেশে কমমূল্যে বিক্রয় করিয়া দেশী বাজারের মূল্য অপরিবর্তনীয় রাখে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি করিবার বা বিদেশে একটি নূতন বিক্রয়-বাজার সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেও সে কমমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণকে বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় কমমূল্য ধার্য করিতে পারে। চতুর্থতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদনের সর্ববিধ সুবিধাগুলি পাইবার উদ্দেশ্যে সে অত্যধিক উৎপাদন করিতে পারে এবং এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিদেশে কমমূল্যে বিক্রয় করে।

যে দেশে বিদেশী উৎপাদক কমমূল্যে বিক্রয় করে সে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য প্রায় সকল দেশে বিদেশীগণ কর্তৃক কমমূল্যে বিক্রয় রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্যধার্য ক্ষমতার সীমারেখা—Limits to the price-fixing power of a monopolist.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার কোন সীমা নাই। সে তাহার দ্রব্যের জন্য যে-কোন মূল্য ধার্য করিতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষেও ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মূল্যনির্ধারণ ব্যাপারে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরও কতকগুলি পরোক্ষ অন্তরায় আছে।

১। সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা—Potential Competition.

অবিমিশ্র একচেটিয়া ব্যবসায় না থাকিলেও সাধারণতঃ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। সুতরাং মনে হয় সে তাহার দ্রব্যের জন্য যে-কোন মূল্য ধার্য করিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে কোন প্রতিযোগিতা না থাকিলেও ভবিষ্যতে যদি তাহাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে সে বর্তমানে অধিক মূল্য ধার্য করিতে বিরত থাকে। বর্তমানে অধিক মূল্য ধার্য দ্বারা তাহার মুনাফার পরিমাণ যদি স্ফীত হয়, তাহা হইলে এই কারণে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকে এবং ভবিষ্যতের এই প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা তাহাকে উচ্চমূল্য ধার্য করিতে বাধা দেয়।

২। পরিবর্তী বা বিকল্প সামগ্রী—Substitutes.

একচেটিয়া ব্যবসায়ী যদি অত্যধিক মূল্য ধার্য করে, তাহা হইলে বিকল্প সামগ্রী আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং ইহার ফলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ ও সেইজন্য লাভের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং তাহার নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বাজারে যাহাতে বিকল্প সামগ্রী আমদানী না হয় তজ্জন্য উচ্চমূল্য ধার্য করিতে পারে না।

৩। বিদেশী প্রতিযোগিতা—Foreign Competition.

দেশের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হইতে হইলেও একচেটিয়া ব্যবসায়ী কর্তৃক ধার্য উচ্চমূল্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিদেশী বিক্রেতাগণ অল্প মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। দেশী খদ্দরের দাম এত অধিক ছিল যে, জাপানীরা অল্পমূল্যে ভারতে খদ্দর বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে দেশী খদ্দরের দাম হ্রাস পায়। সুতরাং বিদেশী প্রতিযোগিতাও তাহার মূল্যনির্ধারণ-ক্ষমতার এক বিষম অন্তরায়।

৪। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ—State Interference.

একচেটিয়া ব্যবসায়ী কর্তৃক অত্যধিক মূল্য ধার্য হইলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে অথবা সরকার স্বয়ং ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে পারে।

৫। ব্যবসায়ীর সমাজচেতনা—Social conscience of the Monopolist.

পরিশেষে বলা যায় যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ী সামাজিক পরিবেশে বাস করে। ক্রেতাসাধারণের সদিচ্ছাই হইল তাহার ব্যবসায়ের প্রধান মূলধন। এক্ষেত্রে সে যদি ক্রেতাগণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া উচ্চমূল্য ধার্য করে, তাহা হইলে সে ক্রেতাগণের সহানুভূতি লাভে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত হয়। দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতাগণের যদি কোন ভোগোদ্বৃত্ত না থাকে, তাহা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে তাহার অভীপ্সিত মুনাফা লাভ ঘটে না।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য কি সর্বদা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মূল্য অপেক্ষা অধিক ?—Is Monopoly price always higher than Competitive price ?

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সাধারণতঃ কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। সুতরাং স্বভাবতই মনে হয় যে, সর্বাধিক লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সে যে মূল্য ধার্য করে তাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মূল্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এ কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ী কর্তৃক ধার্য মূল্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মূল্য অপেক্ষা কম হইতে পারে।

প্রথমতঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ী একাকী সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিয়া অতিরিক্ত উৎপাদন যাহাতে না হয় তাহা করিতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শুধু যে অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে তাহা নয়, উৎপাদনক্ষেত্রে অনেক অপচয়ও ঘটে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী উৎপাদনের অপচয় রহিত করিয়া উৎপাদনে নানাভাবে ব্যয়সংকোচ করিয়া তাহার উৎপাদন-খরচা হ্রাস করিতে পারে, যাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভব নহে, সুতরাং সে যে মূল্য ধার্য করে তাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মূল্য অপেক্ষা যে সর্বদা অধিক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সে যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-খরচা নীতিতে তাহার দ্রব্য উৎপাদন করে তখন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হ্রাস পাইলে তাহার পক্ষে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণ বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে উচ্চদরে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ী বর্তমানে নিম্নমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার মনস্তুষ্টি করিতে পারে। এইরূপে ক্রেতাগণ যখন দ্রব্যটি ব্যবহারে অভ্যস্ত হন, তখন সে মূল্য বৃদ্ধি করে।

চতুর্থতঃ, দেশের মধ্যে মূল্য যাহাতে হ্রাস না পায় তজ্জন্য একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার উৎপাদন-পরিমাণের এক অংশ বিদেশে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রের মূল্য ও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রের মূল্যের পার্থক্য—Difference between Monopoly price and Competitive price.

একচেটিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রের মূল্যনির্ধারণ নীতি ও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রের মূল্যনির্ধারণ নীতি মূলতঃ এক হইলেও এই উভয়নীতির প্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবে মূল্য সাধারণতঃ প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সমান হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও উৎপাদন-খরচার দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য সে উৎপাদন-খরচার উপরে মূল্য স্থির করে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হইল সর্বোচ্চ সীমা, অপর পক্ষে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক-উৎপাদন-খরচা হইল সর্বনিম্ন সীমা—একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য সাধারণতঃ প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার ঊর্ধ্বে নির্ধারিত হয়—নতুবা ব্যবসায়ীর সর্বাধিক লাভ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত কারণে কোন বিক্রেতাই শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। অপর পক্ষে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা শুধু সম্ভব নয়, এই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ সে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যত সময় পর্যন্ত উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা মূল্য অপেক্ষা কম থাকে, কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা মূল্যের সমান হইলে তাহাকে উৎপাদন স্থগিত রাখিতে হয়। অপর পক্ষে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে অথবা অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় সমান হওয়া পর্যন্ত সে উৎপাদন করিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ—State Control of Monopolies.

একচেটিয়া ব্যবসায় মাত্রই যে জনস্বার্থবিরোধী এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সুনিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া ব্যবসায় চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ও উৎপাদনে অপচয় রহিত করিয়া নানাভাবে ব্যয়সংকোচ করিতে পারে। ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র অপেক্ষাও একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস পায় এবং মূল্যহ্রাসের ফলে ক্রেতার সুবিধা হয়।

অপরপক্ষে বলা যায় যে, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিযোগিতা রহিত করিয়া উচ্চমূল্য ধার্য করে। ইহাতে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় ও তাহার পছন্দমত খোলা বাজারে স্বাধীনভাবে দ্রব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজে অর্থ নৈতিক সাম্যের অভাব সৃষ্টি করে ও শোষণের পথ উন্মুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত জনহিতকর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে, যথা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহন-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না, কারণ তাহাতে খরচ বেশী এবং অপচয়ও বেশী হয়। সুতরাং এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির সরবরাহক্ষেত্রে রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এরূপ অপরিহার্য যে, এই দ্রব্যগুলির সরবরাহ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সংঘবিশেষের খামখেয়ালির উপর নির্ভরশীল হয় তাহা হইলে জনস্বার্থ সর্বাধিকরূপে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সকল দেশেই এই জাতীয় একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা একান্তভাবে অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত উপায়ে ইহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

১। অনেক সময় রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় গঠন রহিত করিতে পারে। মার্কিন দেশে একসময়ে এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু এই উপায় সব সময় কার্যকরী হয় না।

২। রাষ্ট্র মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া উদ্বৃত্ত মুনাফা স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে মূলধন-স্ফীতির (over-capitalization)

সম্ভাবনা থাকে এবং ইহাতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত অধিক মুনাফার অনুপ্রেরণার অভাবে পরিচালনা-ব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা যায়।

৩। অনেক সময় রাষ্ট্র মূল্যনির্ধারণের উচ্চ সীমা (ceiling price) স্থির করিয়া দিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র-নির্ধারিত মূল্য অত্যধিক হইলে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। আবার, মূল্য অত্যল্প হইলে বিক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রেতার স্বার্থ ব্যাহত করিতে পারে।

৪। রাষ্ট্র স্বয়ং এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের ফলে এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ মুনাফা অর্জন করা অপেক্ষাও জনস্বার্থের উৎকর্ষ সাধনের দিকে অধিকতর যত্নবান হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার আবার অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইতে পারে অথবা রাষ্ট্র স্বয়ং ইহাদের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রেও বে-সরকারী পরিচালকগণ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম না হইলেও উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষের হানি করিতে পারে।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ—Value under imperfect competition.

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদক এরূপ ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করে যে, একজন উৎপাদক অন্য আর একজন কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের ঠিক অনুরূপ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না। প্রত্যেক উৎপাদকের দ্রব্যেরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেজন্য প্রত্যেকেরই একটি নির্ধারিত পরিমাণে চাহিদা বাজারে থাকে এবং এইজন্য এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের সাধারণতঃ কোন প্রতিযোগিতা হয় না। এরূপ অবস্থায় যদি কোন বিক্রেতা তাঁহার দ্রব্যের বিক্রয়-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তাঁহাকে হয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হয় অথবা বিজ্ঞাপন প্রভৃতির মারফৎ পরোক্ষভাবে ক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে হয়।

মূল্য হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিলে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় স্বভাবতই হ্রাস পায়। কিন্তু যত সময় পর্যন্ত বিক্রেতার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক

খরচা অপেক্ষা অধিক হয়, তত সময় পর্যন্ত সে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় সমান হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার মোট আয় সর্বাধিক হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ ব্যাপারে এই একই নীতি প্রযোজ্য হইলেও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রয়-খরচার (selling costs) উপস্থিতির জন্য মূল্যনির্ধারণ নীতিতে জটিলতা দেখা যায়। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি যদি একই জাতীয় ও একই গুণবিশিষ্ট হয় এবং ক্রেতাগণ যদি সহজেই দ্রব্যগুলির পার্থক্য বুঝিতে পারে তাহা হইলে বিক্রেতার আর অতিরিক্ত খরচ করিয়া ক্রেতাকে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভব নয় সেখানে বিক্রেতাকে বিজ্ঞাপন মারফৎ, বা অন্য নানা উপায়ে ক্রেতাকে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে হয়। এইজন্য বিক্রেতাকে উৎপাদন-খরচা ব্যতীতও একটা অতিরিক্ত বিক্রয়-খরচা বহন করিতে হয়। সুতরাং অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার মুনাফা গড় আয় (সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ গুণ মূল্য) হইতে উৎপাদন-খরচা ও বিক্রয়-খরচার যোগফল বিয়োগ করিয়া পাওয়া যায়।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন উৎপাদকই পূর্ব মূল্যে অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ তাহার প্রান্তিক আয় মূল্য অপেক্ষা কম হয়। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা প্রান্তিক আয়ের সমান হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক উৎপাদকই উৎপাদন করিবে। যেহেতু মূল্য প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক, সেইহেতু মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা অপেক্ষা অধিক হয়।

মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বতন মতবাদ—Earlier Theories regarding determination of value.

মূল্য সম্পর্কে প্রচলিত আধুনিক মতবাদ ব্যতীত আরও কয়েকটি পূর্বতন মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা এই মতবাদগুলি ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও এই মতবাদগুলিকে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলা যায় না—সুতরাং ইহাদের আলোচনা আবশ্যক।

১। উপযোগিতা মতবাদ—Utility Theory.

এই মতবাদে বলা হয় যে, দ্রব্যমূল্য উপযোগিতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই

মতবাদের আধুনিক পরিমার্জিত রূপ হইল প্রান্তিক উপযোগিতা মতবাদ। দ্রব্যমূল্য উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহা বলা যায় না যে, একমাত্র উপযোগিতাই হইল দ্রব্যমূল্যের পরিমাপক। বাতাস, জল প্রভৃতি সর্বাধিক উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের কোন মূল্য নাই। আবার দ্রব্যমূল্য উপযোগিতার আনুপাতিকও নহে। চা অপেক্ষা লবণ অধিক প্রয়োজনীয় কিন্তু চায়ের মূল্য লবণের মূল্য অপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে, উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে মূল্যনিরপেক্ষ নহে। উপযোগিতার পরিমাণ দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভরশীল।

২। উৎপাদন-খরচ মতবাদ—Cost of production Theory.

এই মতবাদ অনুসারে দ্রব্যমূল্য ইহার উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। খাজনা ব্যতীত সুদ, পারিশ্রমিক, মুনাফা, কাঁচামালের খরচ প্রভৃতি হইল উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা যাইতে পারে। (ক) এই মতবাদে মূল্যনির্ধারণে উপযোগিতার প্রভাব উপেক্ষিত হয়। উপযোগিতাবিহীন কোন দ্রব্যেরই চাহিদা হইতে পারে না—সুতরাং চাহিদার অভাবে দ্রব্যের মূল্য থাকিতে পারে না। (খ) প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্যের পুনরুৎপাদন সম্ভব নহে, সে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য এই মতবাদ দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। (গ) যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও মূল্যের পরিবর্তন ঘটে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও এই মতবাদ মূল্যনির্ধারণ ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (ঘ) সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক সামগ্রীগুলির মূল্য-নির্ধারণ ব্যাপারেও এই মতবাদ কোনরূপ আলোক সম্পাত করিতে পারে না। (ঙ) এতদ্ব্যতীত, উপযোগিতার ন্যায় উৎপাদন-খরচাও মূল্যনিরপেক্ষ নহে।

৩। শ্রমই মূল্যের কারণ মতবাদ—Labour Theory of value.

এই মতবাদ য়্যাডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো ও বিশেষ করিয়া কার্ল মার্ক্স কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই মতবাদে শ্রমকেই মূল্যের একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম প্রযুক্ত হয়, সেই শ্রমপরিমাণ দ্বারাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এই মতবাদের ত্রুটি সহজেই লক্ষ্য

করা যায়। (ক) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকা উচিত, কারণ দ্রব্য উৎপাদনে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ উৎপাদনের পর আর হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলেও মূল্যের পরিবর্তন সচরাচর ঘটিয়া থাকে। (খ) বাজারে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের মূল্য সমান হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ সমান হয় না। (গ) কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রযুক্ত শ্রম যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যর্থ শ্রমের কোন মূল্য থাকিতে পারে না।

৪। মূল্য সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ—Socialist Theory of value.

কার্ল মার্ক্স হইলেন এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাঁহার মতে শ্রমই হইল মূল্যের প্রধান কারণ এবং দ্রব্যমূল্যের পরিমাণ সেই দ্রব্যটির উৎপাদনের জন্য সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি বলেন যে, শ্রমিকই সর্বপ্রকার মূল্য সৃষ্টি করে কিন্তু শ্রমিকের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মালিকগণ সম্পূর্ণরূপে শ্রম দ্বারা সৃষ্ট এই মূল্যের একটা অংশ খাজনা, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি নানা অজুহাতে আত্মসাৎ করে। এই মতবাদের ত্রুটি হইল যে, (ক) ইহা মূল্যনির্ধারণে উপযোগিতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। (খ) শ্রম ব্যতীত উৎপাদন-খরচার অন্যান্য উপাদানগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করে। (গ) এতদ্ব্যতীত শ্রমই মূল্যের কারণ মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা প্রযোজ্য, এই মতবাদের বিরুদ্ধেও সেই সমালোচনাগুলি প্রযোজ্য।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূল্য নির্ধারণ—Pricing in a Socialistic State.

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হইল অবাধ প্রতিযোগিতা এবং দ্রব্যমূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার দ্বারা স্থির হয়। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়

এবং সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ মূল্যে নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হয়। এই ব্যবস্থায় মূল্য অনুসারে উৎপাদন-পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় এবং মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োজিত হয়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-পরিমাণ সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়, মূল্য হ্রাস হইলে উৎপাদনের পরিমাণও হ্রাস পায়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নাই। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের সমগ্র উপাদান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সমিতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কখন কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে কোন্ পদ্ধতিতে কি কি উপাদানের সাহায্যে উৎপাদিত হইবে তৎসমুদয়ই রাষ্ট্রনির্দেশে পরিকল্পনা সমিতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার ঘাত-প্রতিঘাতে মূল্য ধার্য হয়—উৎপাদক তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনির্ধারিত বণ্টন-নীতি অনুযায়ী মূল্য স্থির হয়। কি নীতি অনুসারে উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হইবে, সে সম্পর্কে রাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকে এবং এই পূর্বনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য স্থির হয়।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও ক্রেতার রুচি অনুযায়ী কিছু ক্রয়স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্রেতাকে যদি রাষ্ট্রনির্ধারিত মান অনুযায়ী ক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রয়স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ক্রেতার এই ক্রয়স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ক্রেতার জন্য কিছু পরিমাণ আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা থাকা চাই, যে আয় ব্যয় করিয়া সে তাহার পছন্দমত দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য সংগ্রহ করিতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী যদি বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু দ্রব্যমূল্য রাষ্ট্র ইহার খুসীমত স্থির করিতে পারে না। খামখেয়াল দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও দ্রব্যমূল্য শেষ পর্যন্ত একদিকে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা ও অপর দিকে সমাজের উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

বাজার—

বাজার বলিতে ধনবিজ্ঞানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। বাজার বলিতে এক বা একাধিক দ্রব্য বুঝায় যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যটির মূল্য সমান হয়। প্রতিযোগিতা যদি স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে জাতীয় বাজার ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যদি পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয় তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। আবার প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ সময়ের দিক দিয়া বাজারকে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী বাজার বলা হয়।

বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির চাহিদার ব্যাপকতা, দ্রব্যটির নমুনা-যোগ্যতা, স্থানান্তর-যোগ্যতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ উপযোগিতা এবং বিনিময়-মূল্য এই দুইটি অর্থে মূল্য শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনবিজ্ঞানে মূল্য শব্দটি বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিনিময়-মূল্য নির্ধারিত হয় দ্রব্যটির চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে। ক্রেতার চাহিদা-মূল্য নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা, আর বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা দ্বারা। যে মূল্যে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার সমান হয়, সেই মূল্যকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়। মূল্য-নির্ধারণে চাহিদা সরবরাহের যেরূপ প্রভাব, চাহিদা ও সরবরাহের উপর মূল্যেরও তদ্রূপ প্রভাব। মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

স্বল্পমেয়াদী বাজারে সরবরাহ (প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা) অপেক্ষা চাহিদাই (প্রান্তিক উপযোগিতা) মূল্যনির্ধারণে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে, আর দীর্ঘমেয়াদী বাজারে প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে।

সম্পর্কযুক্ত মূল্য—

১। যুক্ত চাহিদা—একটি অভাব পূরণের অথবা একটি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য যখন দুই বা ততোধিক অনুপূরক সামগ্রীর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়, তখন এই চাহিদাকে যুক্ত চাহিদা বলা হয়, যথা, মোটর গাড়ী চড়িতে হইলেই গাড়ী ও পেট্রল উভয়েরই প্রয়োজন হয়। যুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক সামগ্রী-গুলির একটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অপরটির মূল্য হ্রাস পায় ও একটির মূল্য হ্রাস পাইলে অপরটির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

২। যুক্ত সরবরাহ—যখন একই উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও একই খরচায় একাধিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তখন তাহাকে যুক্ত সরবরাহ বলা হয়, যথা, ধান ও খড়, মাংস ও চামড়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও একটির মূল্য বাড়িলে অপরটির মূল্য কমে ও একটির মূল্য কমিলে অপরটির মূল্য বাড়ে।

৩। বিকল্প সরবরাহ—যখন কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব একাধিক দ্রব্য দ্বারা পূরণ করা যায়, তখন এই দ্রব্যগুলিকে প্রতিযোগী দ্রব্য বলা হয়, যথা, ট্রাম, বাস্‌: চা, কোকো, কফি প্রভৃতি। এক্ষেত্রে একটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অপরটির মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং একটির মূল্য কমিলে অপরটির মূল্য কমে।

৪। বিকল্প চাহিদা—লৌহ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির একাধিক ব্যবহারের জন্য চাহিদা হয়। বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য এই পৃথক চাহিদাকে বিকল্প চাহিদা বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যটির কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যটির ব্যবহারের সকল ক্ষেত্রেই উহার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

একচেটিয়া ব্যবসায়—

একচেটিয়া ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। *একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে,* **যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় সমান হয়।**

মূল্য নির্ধারণ করিবার কালে ব্যবসায়ীকে দ্রব্যটির চাহিদা পরিবর্তনশীল কি অপরিবর্তনশীল ও দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হয়।

অনেক সময় আবার ব্যবসায়ী অধিক পরিমাণ লাভের উদ্দেশ্যে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে। কিন্তু যে স্থলে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে বা সকল ক্রেতাই কমমূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, সে সমস্ত স্থলে বৈষম্য-মূলক মূল্য ধার্য করা সম্ভব নয়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার খুসীমত যে-কোন মূল্য ধার্য করিতে পারে না। ইহার অনেক অন্তরায় আছে, যথা—

১। সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা, ২। বিকল্প সামগ্রী, ৩। বিদেশী প্রতিযোগিতা, ৪। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, ৫। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সমাজ-চেতনা।

প্রশ্নাবলী

1. Define a market and discuss the factors which determine its size for different commodities. (C. U. 1920)

2. When does competition in the market for a commodity become perfect? When and why does it become imperfect? (C. U., B. Com. 1955)

3. Distinguish between value and price. There can be a general rise and fall in prices, but can there be a general rise and fall of values? Give reasons. (P. U. 1941)

4. Show that the price of a commodity under perfect competition tends to coincide with the marginal utility on the one side and the marginal cost of production on the other. (C. U. 1945)

5. Distinguish between the market price and the normal price. Point out the dominant influences that determine them. (C. U. 1951)

6. What is the relationship between cost of production, utility and value ? (C. U. B. Com. 1947)

7. Show how competitive prices are determined under conditions of decreasing costs.

"The state of decreasing costs is in fact an unstable one." Discuss the statement. (C. U. 1953)

8. On what principles does the Monopolist fix the price of his products ? Can he charge any price he likes ?

(C. U., B. Com. 1956)

9. Show how the prices of railway services are fixed for transport. How do the principles conform to the theory of value. (C. U. 1953)

10. State briefly the relation between the prices of (a) Competing goods, (b) of Complementary goods and (c) of joint cost goods. (C. U. 1952)

11. "There are potent restrictions on the price fixing power of the monopolist." Elucidate the statement.

(C. U. 1941)

12. What do you understand by the term 'cost of Production' ? Distinguish between Prime cost and Supplementary cost, and examine the bearing of this distinction on the theory of value. (C. U. 1957)

13. What is competition ? Can more than one price prevail in a market, when there is unlimited competition ?

(C. U. 1949)

14. Analyse the effects of an increase in demand for the product of a monopolist on his price and on his output.

(C. U., B. Com. 1951)

15. In every market some possible buyers are willing to bid very high and some possible sellers to sell very low. Why then, do lower bids and higher offers not become effective? (P. U. 1935)

16. Indicate the methods and objects of price discrimination under monopoly. (P. U. 1945)

17. Indicate how the problem of value is influenced by short and long term considerations. Illustrate. (P. U. 1949)

18. How does monopoly price differ from price determination under competition? Is monopoly price always higher than competitive price?

19. Explain the meaning of 'Elasticity of Supply' and 'Elasticity of Demand' and point out the importance of these concepts in the theory of value. (C. U. 1957)

20. Distinguish between average cost and marginal cost and show the relation of each to normal value under (a) perfect competition, and (b) monopoly. (C. U., B. Com 1958)

21. What are overhead costs? Is it correct to say that such costs are true only in the long run? (C. U. 1959)

22. Explain how a monopolist can practise price discrimination. (C. U., B. Com 1961)

23. Explain the principles which determine the prices of goods which are jointly produced. (C. U., B. Com 1960)

24. What are the conditions of perfect competition? How is the value of a commodity determined under perfect competition? (C. U. 1962)

25. Show how in perfectly competitive equilibrium, the price of a commodity is equal to its marginal and average cost of production. (C. U. B. Com. 1962)

সপ্তদশ অধ্যায়

ফাট্‌কা ব্যবসায়

(Speculation)

বাজারে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ক্রেতা নগদ মূল্য প্রদান করে ও বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করিয়া ক্রেতাকে দ্রব্যটি সরবরাহ করে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় কার্য যৎতৎক্ষণাৎ সমাপ্ত হয়। ইহাকে নগদ কারবার বলা হয়। আবার, অনেক সময় ভবিষ্যতে মূল্য প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া ক্রেতা বর্তমানে বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহাকে বাকী কারবার বলা হয়। ফাট্‌কা কারবারের বৈশিষ্ট্য হইল যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় বর্তমান বাজার দরে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু দ্রব্যের কোন আদান-প্রদান বর্তমানে হয় না। ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পূর্বধার্য ক্রয় ও বিক্রয়-মূল্যের যে পার্থক্য হয়, ভবিষ্যতে শুধু মূল্যের সেই পার্থক্যই প্রদত্ত হয়। ফাট্‌কা কারবারের উদ্দেশ্যই হইল মুনাফা অর্জন করা।

ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সুযোগে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয় করাকে সাধারণতঃ ফাট্‌কা বলা হয়। ফাট্‌কা ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য বর্তমানে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে এবং ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা-ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর মুনাফা তাহার মূল্যের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যদি মূল্যের গতি তাহার পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী না হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। পেশাদার ফাট্‌কা ব্যবসায়ীকে ভবিষ্যৎ মূল্য-পরিবর্তনের সমস্ত ঝুঁকি বহন করিতে হয়।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের দুইটি ভিন্নরূপ আছে, যথা, **তেজী কারবার ও মন্দা কারবার**। তেজী কারবারে মূল্য-বৃদ্ধির অনুমান করা হয় ও মূল্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। মন্দা কারবারে মূল্য-হ্রাসের অনুমানের ভিত্তিতে মূল্য-হ্রাসের চেষ্টা করা হয়।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের প্রধান অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল যে, এই ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর পক্ষে ঝুঁকি গ্রহণ অনিবার্য। সুপরিচালিত ফাট্‌কা মূল্যের সমতা আনয়ন করে এবং চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ী যদি ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বর্তমানে দ্রব্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ক্রয় করিবার জন্য মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং এই বর্তমান ক্রয়ের জন্য ভবিষ্যতে আকস্মিকভাবে মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়। অপর পক্ষে ফাট্‌কা ব্যবসায়ী যদি বুঝিতে পারে যে, ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস পাইবে তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে কমমূল্যে ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ক্রয় করা স্থগিত রাখে। ইহার ফলে বর্তমান মূল্য হ্রাস পায় এবং বর্তমান চাহিদার একটি অংশ ভবিষ্যৎ চাহিদার সহিত যুক্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে ভবিষ্যতে আকস্মিকভাবে মূল্যের যে-পরিমাণ পতনের সম্ভাবনা থাকে তাহা রহিত হয়। এইরূপে সুদক্ষ ব্যবসায়িগণ তাহাদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়। ভবিষ্যৎ চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য-পরিবর্তন সম্পর্কিত সমস্ত ঝুঁকি ফাট্‌কা ব্যবসায়িগণ বহন করে এবং তাহাদের এই কার্যের ফলে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয় ও মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন হ্রাস পায়।

সমাজের সুবিধা—Advantages derived by society.

মূল্যের অত্যধিক পরিবর্তন হ্রাস করিয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় সমাজের নানা-ভাবে উপকার করে।

প্রথমতঃ, ফাট্‌কা ব্যবসায় চাহিদা ও সরবরাহের সমতা আনয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য অপরিবর্তিত রাখিতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যদি সচরাচর পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে ক্রেতাগণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া সর্বাধিক পরিমাণ সন্তোষ লাভ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ফাট্‌কা ব্যবসায়িগণ তাহাদের কার্যের দ্বারা ভবিষ্যতে কোন বিশেষ দ্রব্যের সরবরাহের স্বল্পতার দিকে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

তাহাদিগকে দ্রব্যটির ব্যবহার সম্পর্কে মিতব্যয়ী হইতে পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ফাট্‌কা ব্যবসায়ী একদিকে কাঁচামালের মূল্যের উত্থান-পতন রহিত করিয়া উৎপাদকের ঝুঁকির পরিমাণ লাঘব করে, অপর দিকে শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন রহিত করিয়া শিল্প-উৎপাদন-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা দূর করিতে সাহায্য করে।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ী কাঁচামাল-উৎপাদকের দ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করিবার জন্য চুক্তি করে, আবার শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদকের সহিত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য সরবরাহের চুক্তি করে। ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর এই কার্যের ফলে কাঁচামালের উৎপাদক ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদক—উভয়েই লাভবান হয় এবং প্রত্যেকেই দ্রব্যমূল্য-পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। কাঁচামাল-উৎপাদক তাহার উৎপাদন-খরচার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য স্থির করিয়া ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর নিকট অগ্রিম বিক্রয় করে। সুতরাং ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিবর্তনে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর পক্ষে, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদক নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ পাইবে এই চুক্তিতে নির্দিষ্ট মূল্যে ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অগ্রিম ক্রয় করে। সুতরাং ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিবর্তনে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ফাট্‌কা ব্যবসায়ী একাকী বহন করে। ইহার ফলে উৎপাদকগণ অনিশ্চয়তার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া উৎপাদন-কার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ফাট্‌কা ব্যবসায় দেশে মূলধন-গঠনে সাহায্য করিয়া নূতন নূতন শিল্পগঠনে সহায়তা করে এবং পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও মূলধন সরবরাহ করে। ফাট্‌কা বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যের উত্থান-পতন দেখিয়া মূলধনের মালিকগণ যে শেয়ারে ভবিষ্যতে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে, সেই শেয়ারে তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করে।

পঞ্চমতঃ, ফাট্‌কা বাজারে শেয়ারগুলি যখন তখন ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য—এইজন্য কোন মূলধনের মালিকেরই মূলধন অধিক দিন আটক থাকে না। মূলধনের মালিক খুসীমত শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ পাইতে পারে।

সুতরাং ফাট্‌কা বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করিলে মূলধনের নগদ অর্থের যে ক্রয়শক্তি তাহা নষ্ট হয় না।

অসুবিধা—Evils of Speculation.

ফাট্‌কা কারবার যখন অভিজ্ঞ ও সাধু লোক দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ফাট্‌কা কারবার সমাজের অশেষ হিতসাধন করে। কিন্তু অত্যধিক লাভের উদ্দেশ্যে যখন অনভিজ্ঞ ও অসাধু লোক এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই লোকগুলির কার্যকলাপ সমাজের পক্ষে মারাত্মক হয়। যখন অনভিজ্ঞ লোক ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্যের গতি, সামাজিক পরিবেশের সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রভৃতি যথাযথভাবে বিচার না করিয়া এই কারবারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের অনুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল হয় এবং এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন রহিত হওয়া দূরের কথা—দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন বৃদ্ধি পায়।

অসাধু ফাট্‌কা ব্যবসায়িগণ অনেক সময় মিথ্যা গুজব প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। অনেক সময় তাহারা কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া মিথ্যা গুজব প্রচার করে এবং জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে হয়ত কিছু পরিমাণ দ্রব্য স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ও করিতে পারে। এই গুজবের ফলে বাজারে যখন দ্রব্যমূল্য কমিতে লাগিল তখন তাহারা গোপনে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়া মজুত করিল। এইরূপে দ্রব্যটির উপর যখন তাহারা প্রায় একচেটিয়া অধিকার লাভ করিল, তখন চড়া দামে বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে।

এতদ্ব্যতীত অসাধু ফাট্‌কা ব্যবসায়ী দ্বারা যদি শেয়ার বাজারের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিল্পে মূলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ ব্যাহত হয়। ফলে দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সংভার বিনিময়—Stock Exchange.

দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীতও বড় বড় অংশীদারী কারবারের শেয়ার, বন্ধকী পত্র (Security), ঋণপত্র (Debenture) প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়ে ফাট্‌কা ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এই কারবার সাধারণতঃ দুই জাতীয় ব্যবসায়ীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাইকার দালালগণই (Jobbers) হইল শেয়ার ক্রয়-

বিক্রয়ের প্রকৃত কর্মকর্তা এবং ইহারাই শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে। খুচরা দালালগণ (Brokers) পাইকার দালালগণ দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে শেয়ারের সাধারণ ক্রেতাগণের সহিত আদান-প্রদান করে।

সংভার বিনিময় দ্বারা ব্যবসায়ে মূলধন-বিনিয়োগ বর্ধিত হয়। শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি বিক্রয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া সংভার বিনিময় নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করে। শেয়ারগুলি সহজেই বিক্রয় করিয়া নগদ মূল্য পাওয়া যায় বলিয়া মূলধনের অধিকারী বিনা দ্বিধায় মূলধন ধার দেয়। ইহার ফলে শুধু যে নূতন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহা নয়, পুরাতন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত সংভার বিনিময় মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। পাইকার ও খুচরা দালালগণ তাহাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কার্য এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প লাভজনক ব্যবসায় হইতে মূলধন অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক ব্যবসায়ে স্থানান্তরিত হয়।

ফাট্‌কা ব্যবসায় কখন সম্ভব—Conditions for the growth of speculative dealings.

সকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে ফাট্‌কা কারবার সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, যে-সমস্ত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফাট্‌কা কারবার সমধিক সাফল্য লাভ করে। ধান, পাট, গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যগুলির চাহিদা ব্যাপক এবং বিক্রেতা এই দ্রব্যগুলি বর্তমানে বিক্রয় না করিয়াও বিক্রয়কার্য ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিতে পারে। কিন্তু মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয় বলিয়া এই দ্রব্যগুলি সম্পর্কে ফাট্‌কা কারবার চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ফাট্‌কা কারবারের উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে দ্রব্যগুলির অভিন্ন হওয়া একান্ত অপরিহার্য, যাহাতে এমন কি দূর দেশের ক্রেতাগণও দ্রব্যটি সহজেই চিনিতে পারে। সুতরাং যে দ্রব্য যতই অভিন্ন অর্থাৎ একজাতীয় ও নমুনাযোগ্য হইবে, সেই দ্রব্যটি ততই ফাট্‌কা ব্যবসায়ের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই অভিন্নতা-বৈশিষ্ট্যের জন্যই বড় বড় ব্যবসায়ের শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতির

ফাট্‌কা কারবার পৃথিবীব্যাপী পরিচালিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে-সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহে কোন অনিশ্চয়তা নাই, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফাট্‌কা ব্যবসায় সম্ভব। ভবিষ্যতে যোগান দিবার যদি কোনরূপ অনিশ্চয়তা বা অন্তরায় থাকে, তাহা হইলে সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফাট্‌কা কারবার সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, সরবরাহের অনুরূপভাবে দ্রব্যটির চাহিদাও অবিচ্ছিন্ন ও নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এইরূপ চাহিদা দেখা যায়।

বৈধ ও অবৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায়—Legitimate and Illegitimate speculation (Gambling).

ফাট্‌কা ব্যবসায় যখন বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কার্যের ফলে চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য দ্বারা মূল্যের উত্থান-পতন রহিত হয়, তখন তাহাকে বৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায় বলা যাইতে পারে। প্রকৃত ফাট্‌কা ব্যবসায় দ্বারা সমাজ লাভবান হয়। ফাট্‌কা ব্যবসায়ী স্বয়ং উৎপাদন ও বিনিময়-সম্পর্কিত সমস্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করে এবং এই ঝুঁকি বহনের পুরস্কারস্বরূপ সে অধিক মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর ঝুঁকি-বহনের একটি সামাজিক সার্থকতা আছে। এই ঝুঁকি-বহন নিরর্থক নহে। ফাট্‌কা ব্যবসায়ী নিজে লাভবান হয় এবং তাহার কর্মতৎপরতায় সমাজের সকলেই লাভবান হয়।

বৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায় ও অবৈধ ফাট্‌কা বা জুয়াখেলা (Gambling) উভয় কার্যই অনিশ্চয়তাপূর্ণ হইলেও ফাট্‌কা ব্যবসায় কোনক্রমেই জুয়াখেলার সম-পর্যায়ভুক্ত নহে। জুয়াড়ী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি; চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে তাহার আদৌ কোন ধারণা নাই। ফাট্‌কা ব্যবসায়ীর কার্য দ্বারা মূল্যের উত্থান-পতন প্রশমিত হয়, কিন্তু জুয়াড়ীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবের জন্য মূল্যের উত্থান-পতন বৃদ্ধি পায়, সুতরাং জুয়াড়ী যে ঝুঁকি বহন করে তাহার দ্বারা সমাজ লাভবান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য জুয়াড়ীর ঝুঁকি-বহন নিরর্থক হয়।

ফাট্‌কা কারবার নিয়ন্ত্রণ—Control of Speculation.

বৈধভাবে পরিচালিত ফাট্‌কা ব্যবসায় মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন রহিত

করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার অশেষ হিতসাধন করে। এ জাতীয় ফাট্‌কা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যখন অনভিজ্ঞ লোক শুধুমাত্র অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিচার-বিবেচনা না করিয়া এই কার্যে লিপ্ত হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয়। এ জাতীয় ফাট্‌কা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। অনেক দেশে আইন প্রণয়ণ করিয়া অবৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, আইনের অসম্পূর্ণতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অবৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায়িগণ অন্যভাবে এই ব্যবসায় পরিচালনা করে। অধ্যাপক টাউসিগ্‌ বলেন যে, আইন দ্বারা ফাট্‌কা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে যদি বলিষ্ঠ জনমত গঠন করা যায়, তাহা হইলে দুর্নীতির পরিবর্তে সততাই ব্যবসায়ের প্রধান পুঁজি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

ফাট্‌কা—অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনায় বর্তমানের ক্রয়-বিক্রয় করাকে ফাট্‌কা ব্যবসায় বলা যায়। দ্রব্যজাত ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীতও শেয়ার, ঋণপত্র, বন্ধকীপত্র প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়েও এই ব্যবসায় প্রচলিত দেখা যায়।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ী নিজে লাভবান হইলেও তাহার কার্যের দ্বারা সমাজও লাভবান হয়। বৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায় দ্বারা নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়ঃ

১। ইহা মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন রহিত করে। ২। চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য-বিধানে সহায়তা করে। ৩। ফাট্‌কা ব্যবসায়ী নিজে সমস্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ঝুঁকি মুক্ত করে।

যে দ্রব্যের চাহিদা যত ব্যাপক এবং যে সমস্ত দ্রব্য নমুনাযোগ্য ও স্থানান্তরযোগ্য সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে ফাট্‌কা ব্যবসায় চলিতে পারে। কিন্তু যখন অজ্ঞ লোক ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া শুধু লাভের আশায় এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, তখন তাহার কার্যের ফলে মূল্যের পরিবর্তন অধিক হয়

এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ ব্যাহত হয়। ইহাকে অবৈধ ফাট্‌কা ব্যবসায় বলা হয় এবং এই জাতীয় কারবার আইন প্রণয়ন করিয়া বন্ধ করা আবশ্যক।

প্রশ্নাবলী

1. Explain how speculators render within limits a necessary economic service. (C. U: 1948)

2. Do you think that the modern productive organisation would suffer a great loss, if all Stock and Produce Exchanges are closed down? (C. U., B. Com. 1955)

3. Discuss the functions of Stock Exchanges, including in particular, how they promote the investment of capital. (C. U. 1956)

4. Explain carefully the possible beneficial and harmful results of the actions of speculation. (C. U., B. Com. 1953)

5. Discuss the nature and necessity of speculation in a modern community. (C. U. 1958)

6. What are the economic functions of speculation? Do you think it necessary to put restrictions on speculation? (C. U., B. Com. 1961)

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপাদানগুলির মূল্য-নির্ধারণ

(Pricing of the Factors of Production)

উৎপাদনের উপাদানগুলির মূল্য-নির্ধারণ—Pricing of the Factors of Production.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটিই উৎপাদন-কার্যে অপরিহার্য এবং এই অপরিহার্যতার জন্যই ইহাদের চাহিদা হয়। একটি সাধারণ দ্রব্যের ক্রেতার ক্রয়মূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, উপাদানগুলির মূল্যনির্ধারণ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ উপাদানগুলির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারাই ইহাদের মূল্য নির্ধারিত হয়।

চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ নীতি ও উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলির মূল্যনির্ধারণ নীতির মধ্যে অন্ততঃ কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সরবরাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় নীতির মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ বাজার দর অপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ বাজার মূল্য যদি দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে সে দ্রব্যটি বাজারে বিক্রীত হইতে পারে না, ফলে দ্রব্যটির সরবরাহ বন্ধ হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পর্কে কিন্তু উপরি-উক্ত যুক্তি প্রযোজ্য নহে। সুদের হার হ্রাস হইলে বা সুদ-প্রদান বন্ধ হইলে মূলধন-সঞ্চয় একেবারে রহিত হয় না। অনুরূপভাবে জমির খাজনা বা শ্রমিকের মজুরী হ্রাস পাইলে জমির পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা অন্তর্হিত হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বণ্টন-ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি উপাদানের প্রাপ্য আয়-নির্ধারণ ক্ষেত্রে সাধারণ দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ তত্ত্বের 'চাহিদা ও সরবরাহ' সূত্রটি অবিকৃতভাবে প্রযোজ্য নহে। উৎপাদনের সহায়ক প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য চাহিদা ও সরবরাহের সাধারণ সূত্রটির পরিবর্তন সাধন করিয়া উপাদানগুলির মূল্য-নির্ধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্র—Marginal Productivity Theory of Distribution.

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ ও উৎপাদনের উপাদানগুলির মূল্য-নির্ধারণ—এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ একই নীতি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্রব্যক্রয়কালে ক্রেতা যেরূপ বাজার মূল্য তাহার প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হওয়া পর্যন্ত দ্রব্যটি ক্রয় করে, উৎপাদনের উপাদানগুলির ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপক সেইরূপ যে-কোন উপাদানের মূল্য সেই উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমান হওয়া পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। দ্রব্যক্রয়কালে ক্রেতা যদি মনে করে যে, বাজার দর দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে সে দ্রব্যটি ক্রয় করে না। অনুরূপ-ভাবে ব্যবস্থাপক যদি মনে করে যে, ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক উপাদানগুলির বাজার মূল্য তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক আর সেই উপাদান উৎপাদনে নিযুক্ত করে না। এখন প্রশ্ন হইল এই প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভোগের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা যেভাবে স্থিরীকৃত হয়, বণ্টন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অনুরূপভাবে নির্ধারিত হয়। যত সময় না পর্যন্ত ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা সমান হয়, তত সময় পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করে। শেষ ক্রয়মাত্রা হইতে ক্রেতা যে উপযোগিতা পায়, তাহাই প্রান্তিক উপযোগিতা। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপক যত সময় না পর্যন্ত তাহার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত উপাদান হইতে প্রাপ্ত দান সমান হয়, তত সময় পর্যন্ত উৎপাদনে উপাদান নিযুক্ত করে। উপাদানটির জন্য প্রদত্ত মূল্য ও নিযুক্ত উপাদানটি হইতে প্রাপ্ত দান সমান হইলে ব্যবস্থাপক আর সেই উপাদানটি নিযুক্ত করিবে না। এই শেষ উপাদানটি নিযুক্ত করিয়া ব্যবস্থাপক যে অতিরিক্ত উৎপন্ন পায়, তাহাই হইল সেই উপাদানটির প্রান্তিক দান। উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন একটি উপাদানের একমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণে এই হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, তাহাকেই সেই উপাদানের প্রান্তিক দান বলা হয়। এস্থলে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমগ্র উৎপাদনকার্যের এই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। একটি উদাহরণ দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা

সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, যখন কোন একজন ব্যবস্থাপক **ক খ গ** উৎপাদনের এই তিনটি উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সমাবেশ করেন তখন তাঁহার উৎপাদনের পরিমাণ হয় **উ**। উৎকৃষ্টতর উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থাপক পরে **খ** ও **গ** উপাদান দুইটির মাত্রা অপরিবর্তিত রাখিয়া **ক** উপাদানটি একমাত্রা বৃদ্ধি করেন। **ক** উপাদানটির একমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া **উ´** হইল। সুতরাং **ক** উপাদানটির একমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমগ্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল এবং এই বর্ধিত উৎপাদনের পরিমাণ হইল **উ´—উ**। **উ´—উ** হইতে অন্যান্য আনুসংগিক খরচ বাদ দিলে **ক** উপাদানটির একমাত্রার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা বা প্রান্তিক দান পাওয়া যায়।

প্রান্তিক উপযোগিতা সংজ্ঞাটি যেরূপ ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্র হইতে উদ্ভূত, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রটিও তদ্রূপ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র হইতে উদ্ভূত। কোন উৎপাদন-ক্ষেত্রে যদি অন্য দুইটি উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে কিছু দিন পর্যন্ত হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ সমানুপাতিক হারের অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু অচিরাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন সেই উপাদানটির অতিরিক্ত মাত্রা বিনিয়োগ করিয়াও এমন কি সমানুপাতিক হার অপেক্ষা কম উৎপাদনবৃদ্ধি হয়। যদি কোন ব্যবস্থাপক, মূলধন বা শ্রমিক—কোন একটির বিনিয়োগ-মাত্রা উৎপাদনকার্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে থাকেন তাহা হইলে এমন একটি অবস্থা উদ্ভূত হইবে যখন এই উপাদানটির অতিরিক্ত মাত্রা বিনিয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদনে সেই উপাদানটির দানের মাত্রা হ্রাস পাইয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যে অবস্থায় উপাদানটির শেষ অতিরিক্ত মাত্রার দান ও সেই উপাদানটিকে ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য সমান হইবে। এই মাত্রার পর ব্যবস্থাপক যদি সেই উপাদানটির আরও এক অতিরিক্ত মাত্রা বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই মাত্রার প্রান্তিক দান অপেক্ষা সেই মাত্রার মূল্য অধিক হইবে ও ব্যবস্থাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সুতরাং কোন উপাদানের যে পরিমাণ বিনিয়োগ করিলে শেষ মাত্রার প্রান্তিক দান ও দেয় মূল্য সমান হয়, সেই বিন্দুতেই উপাদানগুলির মূল্য নির্ধারিত হয় এবং শেষ মাত্রাকেই প্রান্তিক মাত্রা বলা হয়। প্রান্তিক মাত্রা

সমগ্র উৎপাদনে যে পরিমাণ দান করে, সেই দানের পরিমাণের বাজার মূল্য দ্বারা সেই মাত্রার ও উপাদানটির অন্যান্য মাত্রার মূল্য নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেকটি উপাদানকে ব্যবস্থাপকের প্রচলিত বাজারমূল্য প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি এরূপভাবে সমাবেশ করেন যে, তাঁহার উৎপাদন-খরচা সর্বাপেক্ষা কম হয়। যদি ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, অধিক ভূমি অথবা অধিক মূলধন বিনিয়োগ না করিয়া অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিযুক্ত করিলে তাঁহার সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে তিনি ভূমি ও মূলধনের পরিবর্তে অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ব্যয় সংকোচ করিবেন। এইরূপে ব্যবস্থাপক ক্রমাগত উৎপাদনের উপাদানগুলির বৈকল্পিক ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থা এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, উপাদানগুলির যে-কোন একটির অতিরিক্ত মাত্রা বিনিয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, নিযুক্ত অতিরিক্ত মাত্রা উপাদানটিকে দেয় মূল্য কোনক্রমেই উপাদানটির প্রান্তিক দান অপেক্ষা অধিক না হয় অর্থাৎ উপাদানটির প্রান্তিক দান ও দেয় মূল্য সর্বক্ষেত্রে সমান হয়। উপাদানটিকে দেয় মূল্য যদি উৎপাদানটির প্রান্তিক দান অপেক্ষা বেশী বা কম হয় তাহা হইলে ব্যবস্থাপক উৎপাদনে সেই উপাদানটিকে কম অথবা বেশী ব্যবহার করিবে। উৎপাদনে উপাদানটির প্রয়োগের এই হ্রাসবৃদ্ধির ফলে উৎপাদনব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং উৎপাদন-ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে উপাদানগুলির মূল্য তাহাদের প্রান্তিক দানের সমান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কি কি অনুমানের উপর প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্র নির্ভর করে—Assumptions of the Marginal Productivity Theory.

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রের সত্যাসত্য কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রত্যেকটি উৎপাদনের উপাদানের বিভিন্ন মাত্রাগুলি একান্তরূপে সমজাতীয় (Homogeneous) অর্থাৎ কোন একটি মাত্রা অপর যে-কোন মাত্রার সমান তাহা হইলেই এই সূত্রটি উপাদানগুলির মূল্যনির্ধারণে কার্যকরী হয়। যদি বিভিন্ন মাত্রাগুলি সমান না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মূল্যের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ,

ধরিয়া লইতে হইবে যে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরিবর্তী সামগ্রী হিসাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে অর্থাৎ প্রান্তিক (শেষ মাত্রা) ব্যবহারের ক্ষেত্রে একমাত্রা জমির পরিবর্তে একমাত্রা মূলধন বা শ্রম প্রযোজ্য। প্রান্তিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি এই বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রান্তিক দান সমান হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, উপরি-উক্ত অনুমান হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কোন একটি উপাদান প্রয়োগের মাত্রা সব সময়েই পরিবর্তন করা যাইতে পারে অর্থাৎ ঐ উপাদানটির একটু অধিক বা কম মাত্রা উৎপাদন-কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উপাদানটির প্রয়োগের মাত্রা এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব না হইলে উপাদানটির প্রান্তিক দান ইহার মূল্যের সমান হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রটি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রটি ব্যবসায় সংগঠনে প্রযোজ্য। জমিতে ক্রমবর্ধমান হারে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিলে জমির উৎপাদনের পরিমাণের হার যেরূপ হ্রাস পাইতে থাকে, ব্যবসায়-সংগঠনেও তদ্রূপ কোন একটি উপাদানের ক্রমবর্ধমান হারে প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সূত্রের সমালোচনা—Criticism of the Marginal Productivity Theory of Distribution.

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রটির সম্পর্কে নানা দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হয় যে, প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্য উপাদানগুলির সমবেত প্রচেষ্টার ফল—কোন একটি উপাদান-বিশেষের একক পরিশ্রমের ফল নহে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যটিকে শুধুমাত্র ভূমি, বা শ্রম অথবা মূলধনের অবদান বলা যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ, হব্‌সন্‌ কর্তৃক এই সূত্রটির আর একটি সমালোচনা করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে যদি কোন একটি উপাদানের একমাত্রা অপসারণ করা হয় তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতির পরিমাণ উপাদানটির অপসারিত মাত্রার দান অপেক্ষা অনেক অধিক। কারণ উপাদানটির অপসারিত মাত্রার অভাবে অন্যান্য উপাদানগুলির কার্যকারিতা হ্রাস পাইয়া সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হয়। তৃতীয়তঃ, বলা হয় যে, কোন উপাদানেরই প্রান্তিক-

উৎপাদন-ক্ষমতা সঠিকভাবে নির্ণয়যোগ্য নহে। বিশেষ করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন-ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা পরিমাপ করা আদৌ সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, এই সূত্র অনুসারে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে বৈকল্পিক ব্যবহারযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু হব্‌সন্‌ বলেন যে, এই অনুমান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। মেশিন প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন ব্যবহার-ক্ষেত্রে উপাদানগুলির মাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি স্বল্প। পঞ্চমতঃ, একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই এই সূত্রটি প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। নানা প্রকার সামাজিক প্রভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয় এবং ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির ন্যায্য মূল্য ইহাদের প্রান্তিক দানের সমান হয় না। ষষ্ঠতঃ, এই সূত্রটির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, উপাদানগুলির মূল্যনির্ধারণ তত্ত্বে ইহা সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না, কারণ এই মতবাদ উপাদানগুলির চাহিদার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু উপাদানগুলির যোগান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যবস্থাপকের চাহিদার তীব্রতা অনুসারে উপাদান-গুলির মূল্য নির্ধারিত হয়—ইহা ধরিয়া লইলেও বাস্তব জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি উপাদানের পারিতোষিকের পরিমাণের উপর সেই উপাদানটির যোগান বহুলাংশে নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রটি নৈতিক দিক দিয়াও সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ এই সূত্রটি বর্তমানে প্রচলিত বণ্টন-ব্যবস্থা সমর্থন করিবার প্রয়াস পায়। এই সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদান সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহার দানের পরিমাণের অনুপাতে পারিতোষিক পায়। ইহা হইতে স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে, সমাজ-ব্যবস্থায় ধনীর অবদান দরিদ্রের অবদান অপেক্ষা অধিকতর, সুতরাং ধনিগণ অধিক আয় ভোগ করেন এবং দরিদ্রগণ স্বল্প আয় ভোগ করেন। এরূপ যুক্তি অলীক ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কাজের অনুপাতে যদি পারিতোষিকের পরিমাণ স্থির হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনিগণের অধিকতর বিত্তভোগের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বিত্তের অধিকার ও ভোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গুণ বা কর্মদক্ষতা অপেক্ষা উত্তরাধিকার-সূত্র বা অনুপার্জিত আয় বা অন্য সামাজিক কারণের উপর নির্ভর করে। গণিত-

শাস্ত্রবিদের পুত্র ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও যোগ্যতা না থাকিলে শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রের বলে গণিতশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু জমিদার পুত্র নির্গুণ হইলেও উত্তরাধিকার-বলে জমিদারীর মালিক হইয়া বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়। অপর পক্ষে মেধাবী ও কর্মদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রের সন্তান সুযোগ-সুবিধার অভাবে দারিদ্র্য বরণ করিতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা অর্জিত বিত্ত ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রাপ্ত বিত্তের অধিকার ও ভোগ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এই মাপকাঠিতে দেখিলে বর্তমান সমাজে যে ধনবণ্টন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অতি কমসংখ্যক ধনীর ধনের অধিকার ও ভোগ সমর্থন করা যায়। সমান প্রতিযোগিতার অভাবেই এইরূপ অসম বণ্টন-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্রটি সরাসরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা হইতে বর্তমান বণ্টন-ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আয়-বৈষম্য—Inequality of Incomes.

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষে মানুষে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। মানুষে মানুষে এই পার্থক্য সমাজ ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। মানুষ হিসাবে সকল মানুষই সমান ও পশু-জগৎ হইতে পৃথক—এ কথা স্বীকৃত হইলেও মানব সমাজ হইতে উচ্চ-নীচ—এই ভেদজ্ঞান কোন দিনই বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার কারণ হইল যে, মানুষ হিসাবে সকল মানুষ সমান হইলেও কোন দুইজন মানুষই সমান দেহ ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আকৃতি, প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রচারের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীভূত হইয়া সাম্য ও মৈত্রীভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এখনও পর্যন্ত এই সাম্য নীতি স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই। অর্থনৈতিক জীবনে যদি সাম্যের অভাব ঘটে তাহা হইলে সমাজ-জীবনের অন্যক্ষেত্রে এই
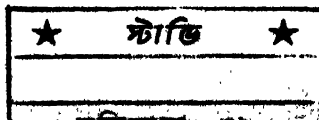
সাম্যনীতি কার্যকরী হইতে পারে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণ সাফল্যের প্রধান অন্তরায় হইল অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব এবং এই সাম্যের অভাবের মূল কারণ হইল আয়-বৈষম্য।

মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় আয়-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী, কারণ অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ ইহা নয় যে, সকল মানুষই সমান আয় করিবে বা সমান পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হইবে। যতদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম-ক্ষমতার পার্থক্য থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সমাজে এই আয়-বৈষম্য থাকিবেই। কিন্তু এই আয়-বৈষম্য সমর্থনযোগ্য হয় তখনই যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শিক্ষা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী আয় করিবার সুযোগ পায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনধারণের উপযুক্ত উপায় সুনিশ্চিত থাকে। সকলের জন্য ডাল-ভাতের ব্যবস্থা না হইলে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য পলান্নের ব্যবস্থা কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নহে ("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few")। যে আয়-বৈষম্য গুণগত বা সমাজ সেবা-মূলক কার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথবা যে আয়-বৈষম্য দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কোন ক্রমেই সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না।

আধুনিক কালে আয়-বৈষম্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই উৎকট সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আয়-বৈষম্য হইল সর্বাধিক। গ্রেট বৃটেনে জনসংখ্যার মাত্র এক-দশমাংশ সমগ্র জাতীয় আয়ের অর্ধেকের বেশী ভোগ করে, অবশিষ্ট নব্বই অংশের মধ্যে জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ বণ্টিত হয়। ইহা হইতে বৃটেনের ধন-বৈষম্যের পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

আয়-বৈষম্যের কারণ—Causes of Inequality of Income.

নানা কারণে সমাজে এই আয়-বৈষম্যের উদ্ভব হয়।

১। গুণ ও যোগ্যতার পার্থক্য—Difference in inborn gift and ability.

অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত গুণ ও কর্মক্ষমতার পার্থক্য হেতু আয়-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক সময়

উপযুক্ত শিক্ষা ও সুবিধার অভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্মশক্তির প্রকাশ সম্ভব নহে। সুতরাং সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যে পরিবেশে সকল ব্যক্তিই সমান সুযোগের অধিকারী হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পর যে আয়-বৈষম্য থাকে তাহা সমর্থনযোগ্য।

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব—Existence of Private Property.

সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবী স্বীকৃত হওয়ার ফলে আয়-বৈষম্য উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে ব্যক্তির পক্ষে সঞ্চয় এবং সঞ্চিত সম্পদ হইতে অতিরিক্ত আয় অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে। এইজন্য সম্পত্তির মালিক অধিকতর ধনবান হন ও সম্পত্তি-হীন ব্যক্তি নির্ধন হন। ফলে ধন-বৈষম্য সৃষ্ট হয়।

৩। উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা—System of Inheritance.

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবশ্যম্ভাবী সহচররূপে সমাজে উত্তরাধিকার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজের একশ্রেণীর হস্তে সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হয়। ফলে সম্পত্তির মালিকের উত্তরাধিকারিগণ জীবনের প্রারম্ভেই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার জন্য সম্পত্তিহীন ব্যক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

৪। সামাজিক পরিবেশ ও অনায়াসলব্ধ সুযোগ—Social environment and easy opportunity.

প্রায় সকল দেশেই বিত্তবান ব্যক্তিগণ সমাজে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায় এবং ইঁহারাই সামাজিক জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। ফলে এই অভিজাত সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় যে সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হন তাহা অভিজাত শ্রেণী বহির্ভূত লোকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধনীগণ ধনী থাকেন আর দরিদ্র জীবনব্যাপী দরিদ্রই থাকিয়া যায়। বর্তমান ধন বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটি ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য স্থায়ী করে।

আয় বৈষম্যের কুফল—Evil effects of Inequality of Income.

অত্যধিক ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজ ব্যবস্থার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইয়াছে। ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজ প্রধানতঃ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ধনীগণ অধিকতর শক্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে দরিদ্রের স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধনীগণ তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুবিধামত উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন—তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন করেন। ফলে দরিদ্রের স্বার্থ হানি হয়। শেষ পর্যন্ত স্বার্থের এই সংঘর্ষে সমাজ-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ধর্মঘট ও দরিদ্র শ্রেণী কর্তৃক ধ্বংসাত্মক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক জীবনে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চরম ধন-বৈষম্যই হইল বিপ্লবের মূল কারণ। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের মূলেও এই ধন বৈষম্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। ধন-বৈষম্যের সর্বাধিক অনিষ্টকর ফল হইল যে, এই ব্যবস্থায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। মুষ্টিমেয় লোকের সুখ-সুবিধার জন্যই দেশের শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি পরিচালিত হয়। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থাও অভিজাত শ্রেণীর রুচি অনুযায়ী অভিজাত শ্রেণীর সুবিধার জন্যই পরিচালিত হয়। আয়-বৈষম্য দরিদ্রের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় ঘটায়।

প্রতিকার—Remedies.

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় যে পরিমাণ আয়-বৈষম্য দেখা যায় তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু কি উপায়ে এই আয়-বৈষম্য দূর করা যায় বা আয়-বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব, সে সম্পর্কে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চরমপন্থিগণের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া একমাত্র সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা ধন-বৈষম্য দূর করা সম্ভব। এই ব্যবস্থা রুশ দেশে প্রবর্তিত হইলেও সে দেশে চরম ধন-বৈষম্য না থাকিলেও ধন-বৈষম্য

একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে আয়-বৈষম্য দূর করিবার প্রয়াসের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হইলে দরিদ্রের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধন-বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু চরম ধন-বৈষম্য থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং ধন-বৈষম্যের পরিমাণ হ্রাস করা নিতান্ত আবশ্যক। ধন-বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক বহু রাষ্ট্রই ক্রমবর্ধমান হারে কর ও উত্তরাধিকার কর স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ, সামাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল আয়-বৈষম্য হ্রাস করা।

উপাদানগুলির মূল্য নির্ধারণ—

উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। ইহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় ধন উৎপাদিত হয়। সুতরাং ইহারা প্রত্যেকেই একটা পারিতোষিক পায়। খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা হইল যথাক্রমে ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনার পারিতোষিক। এই পারিতোষিকগুলি বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার-মূল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। খাজনা, সুদ প্রভৃতি এক জাতীয় মূল্য, সুতরাং দ্রব্যমূল্যের ন্যায় এই উপাদানগুলির মূল্যও মূলতঃ চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদানের এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যে জন্য এই উৎপাদানগুলির মূল্য নির্ধারণ কালে চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি কিছু পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্র—

এই সূত্র অনুসারে উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদানকে তাহার দেয় মূল্য নির্ধারিত হয় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা। দ্রব্যমূল্য যেরূপ

দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা দ্বারা নির্ধারিত হয়, উৎপাদনের উপাদানগুলির মূল্যও তদ্রূপ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপাদানটির দান যদি মূল্য অপেক্ষা বেশী বা কম হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি প্রয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া যদি একটি মাত্র উপাদানের একমাত্রা পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণে যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয় সেই অতিরিক্ত বৃদ্ধিকে ঐ উপাদানটির প্রান্তিক দান বলা হয়।

কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে, কারণ উৎপাদিত দ্রব্য উপাদানগুলির সমবেত প্রচেষ্টার ফল, কোন একটি উপাদানের একক প্রচেষ্টার ফল নহে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবর্তমানে অথবা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।

আয়-বৈষম্য—ইহার কারণ ও প্রতিকার—

আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুল প্রসারের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য হ্রাস পাইলেও আয়-বৈষম্য বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক সমাজেই ধনী ও দরিদ্র পাশাপাশি দেখা যায়। গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যে আয়-বৈষম্য দেখা যায়, তাহা সমর্থনযোগ্য হইলেও অন্যক্ষেত্রে যে আয়-বৈষম্য দেখা যায় তাহা কোন মতে সমর্থনযোগ্য নহে। আয়-বৈষম্যের ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয় ও সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লব সৃষ্টি করে। আয়-বৈষম্যের কারণ হইল :—

১। গুণ ও যোগ্যতার পার্থক্য, ২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব, ৩। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ও ৪। সামাজিক পরিবেশ ও অনায়াসলব্ধ সুযোগ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা আয়-বৈষম্য দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য আধুনিক অনেক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান হারে কর, উত্তরাধিকার কর স্থাপন, এবং ন্যূনতম মজুরির

হার নির্ধারণ, সামাজিক বীমা-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া আয়-বৈষম্য হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রশ্নাবলী

1. How far is the general theory of value applicable to the distribution of National Income ?

2. How far is it true to suggest that in the economic society in which we live "the poor are poor because they are bad and the rich are rich because they are good ?"

(C. U., B. Com. 1948)

3. Discuss the statement that the earnings of any factor of production tend to be equal to the value of its marginal product. (C. U., B. Com. 1960)

ঊনবিংশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

খাজনার অর্থ—Meaning of Rent.

সাধারণভাবে বলিতে গেলে 'খাজনা' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী, গাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাময়িক ব্যবহারের জন্য যে মূল্য বা ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকে খাজনা বলা হয়। প্রচলিত অর্থে প্রজা কর্তৃক গৃহ বা জমির ব্যবহারের জন্য মালিককে যে মূল্য প্রদান করা হয়, তাহাই খাজনা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রজা কর্তৃক মালিককে মূল্য প্রদান সম্পর্কে একটি প্রশ্নের সমাধান হওয়া আবশ্যক। প্রজা মালিককে যে মূল্য প্রদান করে তাহা শুধু জমির ব্যবহারিক মূল্য অথবা জমিতে যে মূলধন প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই প্রযুক্ত মূলধনের মূল্য ? অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে জমির ব্যবহার হইতে যে আয় হয় তাহাকেই খাজনা বলা হয়, আর, মূলধন বিনিয়োগের ফলে যে আয় হয় তাহাকে সুদ বলা হয়। অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে খাজনা বলিতে উৎপাদনে ভূমির যে কার্যকারিতা, সেই কার্যকারিতার মূল্যকে খাজনা বলা হয়।

খাজনা-তত্ত্ব আলোচিত হওয়ার পূর্বে খাজনা সংজ্ঞাটি আরও স্পষ্টতর হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রজা জমির মালিককে যে পরিমাণ মূল্য প্রদান করে তাহা নিছক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন নহে। প্রজাকর্তৃক যে পরিমাণ মূল্য মালিককে প্রদত্ত হয় তাহা হইল মোট খাজনা, নীট্ খাজনা নহে। নিছক খাজনা ব্যতীতও মালিক কর্তৃক জমিতে নির্মিত গৃহাদির ব্যবহার-মূল্য, জমির উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত মূলধনের সুদ, মালিকের জমি সম্পর্কিত নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি এবং ক্ষেত্রবিশেষে জমি সম্পর্কিত ঝুঁকি গ্রহণের মূল্যও খাজনার অন্তর্ভুক্ত হয়। এস্থলে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খাজনা শব্দটি যদি প্রধানতঃ জমি হইতে আয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা সত্ত্বেও উৎপাদনের যে-কোন উপাদানের যোগান যদি সম্পূর্ণরূপে

পরিবর্তনীয় না হয়, তাহা হইলে সেই সীমিত উপাদানের আয় সম্পর্কেও এই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য।

রিকার্ডো কর্তৃক ব্যাখ্যাত খাজনা-তত্ত্ব—Ricardian Theory of Rent.

ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো খাজনা-তত্ত্বের প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার মতে খাজনা হইল, জমির উৎপন্ন পরিমাণের সেই অংশ যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে প্রদত্ত হয়। ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.") রিকার্ডোর মতে যখন কোন দেশে প্রথম বসতি স্থাপিত হয় তখন এই নবাগত জনগণ প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া যে ফসল পাওয়া যায় তাহা অধিবাসিগণের চাহিদা পূরণ করিতে সমর্থ হয় এবং যতদিন পর্যন্ত এই প্রথম শ্রেণীর জমি সহজপ্রাপ্য থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের এই জমির জন্য কোন প্রকার মূল্য প্রদান করিতে হয় না। এখন যদি মনে করা যায় যে, সেই দেশে নূতন একদল লোক উপস্থিত হয় তাহা হইলে ফসলের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় ও প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া সমগ্র চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। প্রথম শ্রেণীর জমি পূর্বে আগত জনগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে, দ্বিতীয় দল লোকের পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০৲ টাকা মূল্যের শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ২০/ মণ ফসল পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উক্ত পরিমাণ খরচ করিয়া ১৫/ মণ পাওয়া যায়। ফসলের বাজার মূল্য এরূপ হওয়া চাই যাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-খরচ সংকুলান হয়, নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষ সম্ভব হয় না। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০৲ টাকা খরচ করিয়া ২০/ মণ পাওয়া গেলে মণ প্রতি উৎপাদন-খরচ হইল ॥০ আনা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০৲ টাকা খরচ করিয়া

১৫৴ মণ পাওয়া গেলে মণ প্রতি উৎপাদন-খরচ হইল প্রায় ॥৵১০। সুতরাং বাজারে ফসলের মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-খরচ (॥৵১০) দ্বারা নির্ধারিত হয় ; নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে না। সুতরাং একই পরিমাণ খরচ করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫৴ মণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত ফসল হইল খরচার অতিরিক্ত আয়। এই খরচাতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া শুধু উৎপাদন-খরচ (স্বাভাবিক মুনাফাসহ) সংকুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। এইজন্য এই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু যদি খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি নিঃশেষিত হইলে লোকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি নিঃশেষিত হইলে চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করে। যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি একই খরচায় চাষ হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎপন্নের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে ১০৲ টাকা ব্যয় করিলে মাত্র ১০৴ মণ পাওয়া যায় এবং মণ প্রতি উৎপাদন খরচ হয় ১৲ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি উৎকৃষ্টতর পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত হয় ৫৴ মণ এবং এই উদ্বৃত্তই হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর খাজনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রথম শ্রেণীর উদ্বৃত্ত আরও অধিক হয়। এইরূপে যখন তিন শ্রেণীর জমির চাষ হয় তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং এই প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পাওয়া যায়, ধনবিজ্ঞানে সেই উদ্বৃত্তকেই খাজনা বলা হয়। এই উদ্বৃত্ত দেশের সরকার ভোগ করুন, বা জমির মালিক অথবা চাষী স্বয়ং ভোগ করুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

খাজনার কারণ—Causes of Rent.

রিকার্ডোর মতে খাজনা হইল সমপরিমাণ খরচ করিয়া বিভিন্ন জমির উৎপাদন পরিমাণের পার্থক্য অর্থাৎ জমি হইতে প্রাপ্ত খরচাতিরিক্ত আয়। এখন প্রশ্ন হইল এই উদ্বৃত্তের অর্থাৎ খরচাতিরিক্ত আয়ের কারণ কি? দ্বিতীয়

শ্রেণীর জমি অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর জমির এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণ কি? ইহার উত্তরে রিকার্ডো বলেন. বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য অর্থাৎ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই এই উদ্বৃত্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর জমি অধিকতর উৎপাদনক্ষম ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অধিকতর উৎপাদনক্ষম এবং এই উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে খরচাতিরিক্ত একটি উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। যখন শুধু প্রথম শ্রেণীর জমির চাষ হয় তখন কোন খাজনা থাকে না, কিন্তু যেইমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষ হয় তখনই উভয় জমির উৎপন্নের পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায় ও প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত থাকে এবং এই উদ্বৃত্তই খাজনা বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর জমির দুষ্প্রাপ্যতাই হইল খাজনার প্রথম কারণ। প্রথম শ্রেণীর জমি যদি অফুরন্ত হইত তাহা হইলে লোকে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিত না এবং জমির ফসলের পরিমাণের কোন পার্থক্য হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডোর মতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নীতিটিও খাজনা-তত্ত্বে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্য লোকে ফসলের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করিবার জন্য নিকৃষ্টতর জমি চাষ করে। জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিলে যদি ক্রমাগত বর্ধিত হারে ফসল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর নিম্নস্তরের জমি চাষের প্রয়োজন হইত না। দেশের সমগ্র খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া পূরণ করা সম্ভব হইত। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্যই নিকৃষ্টতর জমি চাষের প্রয়োজন হয় এবং এইজন্য বিভিন্ন স্তরের জমির উৎপন্ন-পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডো বলেন যে, জমি হইতে খরচাতিরিক্ত আয় শুধুমাত্র বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য হেতু হয় না, জমির অবস্থানের পার্থক্যের উপরও ইহা নির্ভর করে। যদি দুই খণ্ড জমি সমান উর্বর হয় তাহা হইলে যে জমি লোকালয় বা বিক্রয়স্থলের নিকটে অবস্থিত, সেই জমিকেই দূরে অবস্থিত সম-উর্বর জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলা যায়, কারণ, বিক্রয়স্থলের নৈকট্যহেতু এই জমির উৎপাদন-খরচা কম এবং সেইহেতু খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক।

এস্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, যদি সমস্ত জমির উৎপাদন-ক্ষমতা ও অবস্থানের সুবিধা সমান হয় তাহা হইলে কোন জমিতেই অতিরিক্ত আয় হইতে পারে না, সুতরাং কোন খাজনা হইবে না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই সমস্ত জমিতেও খাজনা উদ্ভূত হইবে। কারণ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্য একই জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে প্রতিবারই সমান পরিমাণ উৎপন্ন পাওয়া যায় না। শ্রম ও মূলধনের মাত্রাগুলি ক্রমাগত প্রয়োগের ফলে এই বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগজনিত উৎপাদন-পরিমাণের পার্থক্য উপস্থিত হইবে এবং যে-কোন কারণেই হউক না কেন এই পার্থক্যই হইল খাজনা।

খাজনা ও মূল্য—Rent and Price.

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, খাজনার পরিমাণ মূল্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু মূল্যের উপর খাজনার কোন প্রভাব নাই। রিকার্ডোর মতে প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচা দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হয়। যদি বাজার মূল্য প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান না হয় তাহা হইলে প্রান্তিক জমির চাষ বন্ধ হইবে। ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান হ্রাস পাইবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে পুনরায় প্রান্তিক জমির চাষ সম্ভব হইবে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার কম হইতে পারে না। রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, শুধুমাত্র উৎপাদন-খরচা সংকুলান হয়। সুতরাং প্রান্তিক জমিতে কোন খাজনা হয় না। খাজনা হইল খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত। যাহা উদ্বৃত্ত তাহা উৎপাদন-খরচার অংশ হইতে পারে না। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রান্তিক জমির কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। যেহেতু খাজনা (উদ্বৃত্ত) উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, সেই হেতু খাজনা মূল্যেরও অংশ নহে অর্থাৎ মূল্যনির্ধারণে খাজনার কোন প্রভাব নাই। খাজনা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হইতে প্রদত্ত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে খাজনা বেশী হইলে মূল্য বেশী হইতে পারে না, বরঞ্চ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকের খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও খাজনা অধিক হয়।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সারাংশ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। খাজনা উৎপত্তির কারণ হইল—১। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রের কার্যকারিতা, ২। নিকৃষ্ট জমি ও উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য অর্থাৎ খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ হইতেই পরিমাপ করা যায়, ৩। খাজনা মূল্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রিকার্ডোর মতবাদের সমালোচনা—Criticism of the Ricardian Theory of Rent.

কেরি, রসার, মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম সমালোচনা হইল যে, রিকার্ডো জমির যে আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে জমির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। বহুকালব্যাপী ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উৎপাদন-শক্তি নষ্ট হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু উপরি-উক্ত সমালোচনা আংশিক সত্য হইলেও রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক প্রমাণিত হয় না। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, অবস্থানের সুবিধা, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ইহার আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয় যে, রিকার্ডো যে প্রণালীতে জমিচাষের কথা বলিয়াছেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। তাঁহার মতে উৎকৃষ্টতর জমি সর্বাগ্রে চাষ করা হয়, কিন্তু কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমি চাষ হইবার পূর্বে নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট জমি বলিতে রিকার্ডো শুধু উর্বর জমির কথা বলেন নাই, উৎকৃষ্ট জমির অর্থ দ্বারা তিনি উর্বর ও অবস্থানের সুবিধাজনক জমির কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং খাজনা-তত্ত্বে জমির অবস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডোর মতে খাজনা হইল উদ্বৃত্ত, সুতরাং মূল্যের অংশ

হইতে পারে না। রিকার্ডোর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে মূল্যের উপর খাজনার প্রভাব বর্তমান। সুতরাং রিকার্ডোর মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রিকার্ডো-প্রদত্ত খাজনাতত্ত্ব অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ একটি সূত্র। অপরিবর্তনীয় অবস্থায়ই এই সূত্রটি প্রযোজ্য। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য। যেখানে জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায় সেখানে এই সূত্রটি কার্যকরী নাও হইতে পারে।

খাজনাতত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যা—Modern Theory of Rent.

রিকার্ডো-প্রদত্ত খাজনাতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্জিত না হইলেও আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ খাজনাতত্ত্ব নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রিকার্ডো-প্রদত্ত খাজনাতত্ত্বের মূল কথা হইল (১) খাজনা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির উৎপন্নের পার্থক্য এবং (২) নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রান্তিক জমি হইতে খাজনার পরিমাপ করা হয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ খাজনা নির্ধারণে এই উভয় সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অস্বীকার করেন। রিকার্ডো খাজনার উৎস ভূমিকে ইহার যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্য উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি হইতে পৃথক করিয়া ভূমির আয়কে একটি অনুপার্জিত আয় (unearned income) পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ ভূমিকে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া মূল্য-নির্ধারণতত্ত্বের সাধারণ সূত্রটি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খাজনা হইল ভূমির ব্যবহারের মূল্য এবং অন্যান্য মূল্যের ন্যায় এই মূল্যও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। খাজনা সম্পর্কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসলের অপ্রাচুর্য। প্রকৃত-পক্ষে ভূমির অপ্রাচুর্যের কারণ হইল ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসলের অপ্রাচুর্য। বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য দ্বারা খাজনার পরিমাণের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—ইহার দ্বারা খাজনা কেন হয় তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। খাজনা দেওয়া হয় তাহার একমাত্র কারণ হইল যে, ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। ফসলের অপ্রাচুর্য হইলেই সকল জমি সমজাতীয় হইলেও খাজনা দিতে হইবে। মজুরি, সুদ ও মুনাফার

ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। চাহিদার তুলনায় মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উপাদান-গুলির অবদান অপ্রচুর বলিয়া সুদ ও মজুরি দিতে হয়। যে কারণে একজন অধিকতর দক্ষ শ্রমিককে উচ্চহারে মজুরি দিতে হয়, ঠিক সেই কারণে একখণ্ড উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বেশী হয়। সুতরাং মজুরি বা সুদ নির্ধারণতত্ত্ব ও খাজনা নির্ধারণতত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক নহে।

খাজনাতত্ত্বে প্রান্তিক জমির উপর রিকার্ডো যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, আধুনিক লেখকগণ তাহাও অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রান্তিক জমি চাষ হইলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা হ্রাস করে, অপর পক্ষে এই জমি চাষ না হইলে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রান্তিক জমির সংজ্ঞা খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

সহরাঞ্চলে অবস্থিত জমির খাজনা—Urban Site Rent.

সহরাঞ্চলে অবস্থিত জমির খাজনা একই নীতিতে নির্ধারিত হয়। সহরাঞ্চলে জমির আপেক্ষিক উর্বরতার কোন গুরুত্ব নাই—অবস্থানের সুবিধার দ্বারা খাজনা স্থিরীকৃত হয়। যে জমি অবস্থানের জন্য যত সুবিধার অধিকারী, সেই জমির খাজনা তত অধিক হয়। এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক সুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে সেই জমির খাজনা তত বেশী হয়। বাসগৃহের জন্য জমির খাজনা আবাস-স্থলের সুবিধার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জমির অবস্থান যদি প্রশস্ত রাস্তার উপর হয় যেখানে আলো ও হাওয়া পাওয়া যায়, পার্ক, বাজার, যানবাহন ও শিক্ষায়তনের অদূরে হয়, তাহা হইলে এই সুবিধাগুলির জন্য বাড়ী ভাড়া অধিক হয়। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের নিকটে একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হইতে পছন্দ করে। সুতরাং পারস্পরিক নৈকট্যের চাহিদার তীব্রতার জন্য এরূপ স্থলে জমি বা গৃহাদির ভাড়া অধিক হয়।

সহরাঞ্চলে জমি বা গৃহাদির ক্ষেত্রেও বলা যাইতে পারে যে, উচ্চহারে ভাড়া বা খাজনা দেওয়া উচ্চমূল্য স্থির করিবার কারণ হইতে পারে না। উচ্চহারে ভাড়া নির্ধারণ করিবার প্রধান কারণ হইল সেই জমির বা গৃহের

বিশেষ সুবিধা—যে সুবিধা গৃহের বাসিন্দাকে অধিক পরিমাণ আয় করিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখে চৌমাথায় অবস্থিত একটি চার বর্গ হাত পরিমিত পানের দোকানের মাসিক ভাড়া ৪৫ টাকা, অপর পক্ষে একটি গলির মধ্যে অবস্থিত ঐ পরিমিত স্থানের একটি পানের দোকানের ভাড়া হইল মাসিক ১৫ টাকা। ৪৫ টাকা ভাড়া দেয় বলিয়া প্রথমোক্ত পানের দোকান দ্বিতীয় দোকান অপেক্ষা প্রতি পানের জন্য তিনগুণ অধিক মূল্য দাবী করিতে পারে না। প্রথমোক্ত দোকানের অবস্থিতির সুবিধার জন্য অধিক পান বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ (উদ্বৃত্ত) পায় এবং অধিক লাভ পায় বলিয়া অধিক ভাড়া দিতে সমর্থ হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, সহরের অভিজাত অঞ্চলে অবস্থিত দোকানগুলিতে সাধারণ অঞ্চলে অবস্থিত দোকানগুলি অপেক্ষা মূল্য অধিক। অভিজাত অঞ্চলের দোকানগুলি অধিক বাড়ী ভাড়া দেয় বলিয়া অধিক মূল্য আদায় করে না। অধিক মূল্যের কারণ হইল অভিজাত অঞ্চলের সুবিধা—এই অঞ্চলে অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহাদের রুচিমত দ্রব্য ক্রয় করিয়া উচ্চমূল্য দিতে কার্পণ্য করে না। সুতরাং উচ্চ মূল্য পাইয়া উচ্চহারে মুনাফা লাভ করে বলিয়া অভিজাত অঞ্চলে দোকান ভাড়া অধিক হয়। সুতরাং খাজনা মূল্যের কারণ নহে, মূল্যই খাজনার কারণ। মূল্য উচ্চ হইলে উদ্বৃত্ত অধিক হয় এবং সেই কারণে খাজনা অধিক হয়।

খনি ও মৎস্যস্থলীর খাজনা—Rents of mines and fisheries.

ভূমির ও খনির পার্থক্য হইল যে, ভূমি চাষ করিলে কিছু-না-কিছু ফসল পাওয়া যায়, কিন্তু ভূমির ন্যায় খনি খনিজ পদার্থের অফুরন্ত উৎস নহে। কালক্রমে খনিজ পদার্থ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং খনির জন্য যে খাজনা প্রদত্ত হয় তাহা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, খনি হইতে ক্রমাগত খনিজ পদার্থ উত্তোলনের ফলে ইহা একেবারে নিঃশেষিত হয় বলিয়া খনির মালিককে একটি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ইহাকে মালিকের স্বত্বাধিকারের প্রাপ্যাংশ (Royalty) বলা হয়। ভূমির অন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিককে এরূপ কোন প্রাপ্যাংশ দিতে হয় না। অপর পক্ষে, ভূমির ন্যায় বিভিন্ন খনির খাজনা খনি চালু রাখিবার আপেক্ষিক সুবিধার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে খনিতে

অপেক্ষাকৃত স্বল্প খরচায় খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা যায় ও কম খরচে বিক্রয়স্থলে প্রেরণ করা যায়, সেই খনির উদ্বৃত্ত অধিক হয় ও খাজনা বেশী হয়।

মৎস্যস্থলীর ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে খাজনা স্থির হয়। যে সমস্ত জলাশয়ে অফুরন্ত মৎস্য পাওয়া সম্ভব, সে সমস্ত জলাশয়ের খাজনা প্রান্তিক জলাশয় (যেখানে মৎস্যের অপ্রাচুর্য অথবা দুর্গমতা হেতু প্রায় অব্যবহার্য) হইতে পরিমাপ করা হয়।

খাজনার উপর সামাজিক প্রগতির প্রভাব—Influence of Social Progress on Rent.

বিভিন্নমুখী সামাজিক প্রগতির ফলে খাজনার পরিমাণ নানাভাবে প্রভাবিত হইতে পারে।

১। যদি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের এই বর্ধিত চাহিদা ভাল জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া অথবা নিকৃষ্ট জমির ব্যাপক চাষ করিয়া পূরণ করা হয়। ইহার ফলে আরও নিম্নস্তরের জমি প্রান্তিক জমিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং অধিক নিম্নস্তরের জমি চাষের কারণ,—এই জমির উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় উচ্চস্তরের জমির উৎপাদন-পরিমাণ অধিক হয় এবং উদ্বৃত্ত অধিক হইলেই খাজনা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি হয়।

২। যদি কৃষিকার্যের উন্নতি সাধিত হয়, অর্থাৎ জমিতে যদি সেচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফসলের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে প্রান্তিক জমি অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি আর চাষ হইবে না, কারণ এই জমির উৎপাদন-খরচা পরিবর্তিত ব্যবস্থায় বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক। সুতরাং প্রান্তিক জমির চাষ না হইলে খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এ সম্পর্কে যদি ধরা যায় যে, উন্নত ধরণের চাষ-প্রণালী একমাত্র উৎকৃষ্ট জমিতে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত অধিক হয়। ফলে উৎকৃষ্ট জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে, উন্নত ধরণের চাষপ্রণালী যদি শুধুমাত্র নিকৃষ্ট জমিতে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে নিকৃষ্ট জমির উৎপাদনের

পরিমাণ বৃদ্ধি পায়,—এমন কি, উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন-পরিমাণের সমানও হইতে পারে। ফলে পূর্বের উৎকৃষ্ট জমির খাজনা হ্রাস পায়, এমন কি খাজনা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইতে পারে।

৩। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি (Improvement in transport) হইলে খাজনার উপর এই উন্নতির প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যদি পরিবহন-খরচা হ্রাস পায়, তাহা হইলে দূর অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্প খরচায় আমদানী করা সম্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নিকটস্থ জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ইহার ফলে নিকটস্থ জমির খাজনা হ্রাস পায় ও দূরের জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। বাষ্পচালিত জলযান প্রচলন হওয়ার ফলে ইংলণ্ড স্বল্প খরচায় মার্কিন দেশ হইতে গম আমদানী করিতে লাগিল। ফলে ইংলণ্ডে গম-উৎপাদক জমির চাহিদা হ্রাস পাইয়া খাজনা হ্রাস পাইল এবং মার্কিন দেশে গম-উৎপাদক জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি হইল।

৪। যদি দেশে জনসাধারণের আয়বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, তাহা হইলে জমির খাজনা অন্যান্য উৎস হইতে আয়বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। ইহার কারণ হইল যে, আয় বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে লোকে অন্য নানাপ্রকারে ব্যয়বৃদ্ধি করিলেও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে ব্যয়বৃদ্ধি করে না। সুতরাং আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় হ্রাস পায় অর্থাৎ যে হারে আয় বৃদ্ধি পায় সে হারে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি পায় না—বরঞ্চ আয়ের তুলনায় এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পায়। ফলে আয়বৃদ্ধি হইলে খাজনা সে তুলনায় বৃদ্ধি পায় না।

খাজনা কখন মূল্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে

When does Rent enter into Price ?

রিকার্ডোর মতে খাজনা মূল্যের অংশ হইতে পারে না, কারণ, খাজনা খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত হইতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণে যে খাজনার পরিমাণ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১। যে সমস্ত দেশে রাষ্ট্রই হইল সমগ্র জমির একচেটিয়া মালিক এবং জমি হইতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত নিরপেক্ষভাবে সকল জমি হইতে খাজনা আদায় করে, সে সমস্ত স্থলে দেয় খাজনার পরিমাণ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাল জমি, খারাপ জমি, এমন কি যে সমস্ত জমির চাষ হয় না, সে সমস্ত জমি হইতেও খাজনা আদায় করা হয়।

২। অনেক সময় জমির ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য প্রান্তিক জমিরও খাজনা হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে খাজনা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে জমি কৃষিকার্যের জন্য প্রান্তিক জমি বলিয়া পরিগণিত হয়, সে জমি গোচারণ-ভূমি হিসাবে উৎকৃষ্ট ভূমি বলিয়া গণ্য হইলে সে জমির খাজনা হয়।

খাজনার সহিত উৎপাদন-খরচার সম্পর্ক—Rent in relation to cost of production.

রিকার্ডোর মতে খাজনা হইল জমি হইতে প্রাপ্ত একটা উদ্বৃত্ত। উৎপন্ন ফসলের বিক্রয়মূল্য ও উৎপাদনের খরচা এই উভয়ের পার্থক্য হইল খাজনা। যেহেতু মূল্য প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচা দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেই হেতু উৎকৃষ্ট জমি ও নিকৃষ্ট (প্রান্তিক) জমির উৎপাদন-খরচার পার্থক্য দ্বারা খাজনার পরিমাপ করা হয়। উৎকৃষ্ট জমির খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত হইতে খাজনা দেওয়া হয়, সুতরাং খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং এইজন্য মূল্যের উপরও ইহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই। খাজনা-নিরপেক্ষভাবে এবং খাজনা নির্ধারিত হইবার পূর্বেই প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা নির্ধারিত হয়।

সমষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে রিকার্ডোর এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত। খাজনা উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, কারণ খাজনা প্রদত্ত না হইলেও জমির উৎপাদন-ক্ষমতা নষ্ট হয় না বা লোপ পায় না। কিন্তু মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যথাযথভাবে সুদ বা মজুরি না দিলে মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পায়। সুতরাং সুদ, মজুরি প্রভৃতি উৎপাদনের অপরিহার্য খরচা বলিয়া পরিগণিত হইলেও খাজনা উৎপাদনের অপরিহার্য খরচা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত যুক্তি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও ব্যক্তির দিক দিয়া

দেখিতে গেলে প্রযোজ্য নহে। খাজনা না দিলে জমি অন্তর্হিত হয় না—ইহা সত্য। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ জমি ব্যবহার করিয়া যদি খাজনা না দেয়, তাহা হইলে সে আর সে জমি ভোগদখলে রাখিতে পারে না। জমি হস্তান্তরিত হইয়া যে ব্যক্তি খাজনা দিতে সক্ষম তাহার দখলে চলিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে জমি একাধিক চাষের উপযুক্ত অর্থাৎ যে জমিতে ধান ও গম উভয় শস্যই উৎপাদন করা সম্ভব, সে জমির চাষী ধান্য উৎপাদনের জন্য যদি গম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ খাজনা হইত তাহা যদি দিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত জমি ধান-চাষীর হস্ত হইতে গম-চাষীর হস্তে চলিয়া যাইবে। গম-চাষী যদি ধান-চাষী অপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ধান-চাষীও খাজনা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে এবং এই খাজনা বৃদ্ধির ফলে ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। 'এইরূপ ক্ষেত্রে খাজনাকে খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত বলা যায় না, কারণ খাজনা মূল্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া ধরা হয়।

খাজনার তাৎপর্য—Significance of Rent.

খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্টতর জমির চাষ হয় এবং যতই নিকৃষ্টতর জমির চাষ প্রসারিত হয়, উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎকৃষ্টতর জমির মালিকগণ যে উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করেন, তাহাকে কোন মতেই তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ আয় বলা যাইতে পারে না। সামাজিক কারণে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই তাঁহারা এই অনায়াসলভ্য আয়ের অধিকারী হন। এইজন্য খাজনাকে 'অনুপার্জিত আয়' (Unearned Income) বলা হয়।

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন, যেহেতু খাজনা অনুপার্জিত আয়, সেই হেতু সরকার কর্তৃক করধার্যের ইহা একটি উপযুক্ত উৎস। খাজনা জমির মালিকের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জিত আয় নহে, সুতরাং ইহার উপর কর স্থাপন করিলে কাহারও কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত খাজনা হইল খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত, ইহা জমির সরবরাহ-মূল্যের অংশ নহে। সুতরাং সরকার যদি এই উদ্বৃত্তের উপর কর স্থাপন করে তাহা হইলে জমির সরবরাহ ও জমির উৎপাদন-ক্ষমতা কোনরূপে ব্যাহত হইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা

নাই। অধিকন্তু এই অনুপার্জিত আয়ের জন্য সমাজে যে এক শ্রেণীর শ্রমবিমুখ পরজীবীর অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে ও বর্তমান ধনবণ্টন-ব্যবস্থার অসমতা দূরীভূত হইবে।

অনুপার্জিত আয়—Unearned Income.

সামাজিক অগ্রগতির ফলে সহরাঞ্চলের উপকণ্ঠে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তা-ঘাট, যানবাহন পার্ক, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি জীবনের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সহরের উপকণ্ঠের জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য বৃদ্ধি পায়। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য মালিককে কোন প্রকার পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্যই জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূল্যের সমগ্র পরিমাণ ভূম্যধিকারী স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। এইজন্য সহরাঞ্চলের জমির এই বর্ধিত মূল্যকে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। জমির মালিক বিনা আয়াসেই ইহা ভোগ করেন এবং এইজন্য অনেকে বলেন যে, এই অনুপার্জিত আয়ের উপর করস্থাপন করিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক এই আয় গ্রহণ করা উচিত। সামাজিক কারণেই যখন জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক হিতের জন্য রাষ্ট্রই হইল এই আয়ের প্রকৃত অধিকারী।

উপরি-উক্ত মতবাদ যুক্তিযুক্ত হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। রাষ্ট্র কর্তৃক অনুপার্জিত আয় আদায় সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। প্রথম অসুবিধা হইল যে, রাষ্ট্র কাহার নিকট হইতে এই কর আদায় করিবে। রাষ্ট্র যদি জমির বর্তমান মালিকের উপর কর স্থাপন করে তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মালিককে পরোক্ষভাবে দুইবার কর প্রদানে বাধ্য করা হয়। বর্তমান মালিক জমির পূর্ব মালিকের নিকট হইতে একবার বর্ধিত মূল্যে জমি ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহাকে যদি পুনরায় কর দিতে হয় তাহা হইলে একই জমির জন্য তাঁহাকে দুইবার বর্ধিত হারে মূল্য দিতে হয়। সুতরাং বর্তমান মালিকের নিকট হইতে এই কর আদায় করা সমীচীন নহে। অপর পক্ষে জমির পূর্ব মালিক কে ছিলেন বর্তমানে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং নির্ণয় করিতে পারিলেও বর্তমানে জমির স্বত্বাধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন কর আদায় করা আইনসম্মত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, জমির মূল্যবৃদ্ধিতে জমির মালিকের যে কোনই অবদান নাই এরূপ ধারণা করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। জমির মালিক জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া অন্ততঃ কিছু ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছিলেন— ইহা অনস্বীকার্য এবং এই ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বর্ধিত মূল্য তাঁহারই প্রাপ্য। জমির জন্য যদি চাহিদা বৃদ্ধি না পাইত তাহা হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি হইত না ও ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইত না।

তৃতীয়তঃ, অনুপার্জিত আয়ের উপর কর স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, রাষ্ট্র যদি সামাজিক অগ্রগতির যুক্তির ভিত্তিতে সহরাঞ্চলের জমির বর্ধিত মূল্য জমির মালিকগণের নিকট হইতে আদায় করে, তাহা হইলে পল্লী অঞ্চলে সামাজিক অধঃপতনের ফলে জমির মূল্য হ্রাস পাইয়া মালিকগণ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন রাষ্ট্রের পক্ষে সে ক্ষতিপূরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

খাজনা ও নিম্‌-খাজনা—Rent and Quasi-Rent.

নিম্‌-খাজনা সংজ্ঞাটি ধনবিজ্ঞানে অধ্যাপক মার্শালের অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম। নিম্নলিখিতভাবে মার্শাল নিম্‌-খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। স্বল্প মেয়াদে যন্ত্রপাতি, গৃহ প্রভৃতি মনুষ্য-সৃষ্ট উৎপাদনের উপাদানগুলি হইতে যে আয় পাওয়া যায়, তাহাই হইল ঐ উপাদানগুলির নিম্‌-খাজনা। জমির আয় অর্থাৎ খাজনার সহিত এই আয়ের স্বল্প মেয়াদে যে সাদৃশ্য বর্তমান, সেই সাদৃশ্যের জন্যই ইহাকে নিম্‌-খাজনা বলা হইয়াছে। জমি ও অন্যান্য প্রকৃতিদত্ত সহায়ক সামগ্রী হইতে যে আয় হয় তাহাকে খাজনা বলা হয়, কারণ জমি ও অন্যান্য প্রকৃতিদত্ত সহায়ক সামগ্রীগুলির যোগান স্থায়িভাবে সীমাবদ্ধ। মানুষ চেষ্টা করিয়াও এইগুলির যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে না। নিম্‌-খাজনা হইল মনুষ্য-সৃষ্ট সেই সমস্ত সহায়ক সামগ্রীগুলির আয়, যে সামগ্রীগুলির সরবরাহ স্বল্প মেয়াদে জমির সরবরাহের ন্যায় বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং স্বল্প মেয়াদে সরবরাহের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে জমি হইতে প্রাপ্ত আয় ও মনুষ্যসৃষ্ট উপাদানগুলির আয় অনেকটা সমপর্যায়ভুক্ত কারণ জমি ও এই জাতীয় উপা-দানের সরবরাহ স্বল্প মেয়াদে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, খাজনা অর্থাৎ জমি হইতে প্রাপ্ত আয় যেরূপ জমির যোগান ও জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের মূল্য প্রভাবিত

করে না, অনুরূপ ভাবে নিম্-খাজনাও উপাদানগুলির যোগান বা উপাদানগুলির দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যমূল্য প্রভাবিত করিতে পারে না।

কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে খাজনা ও নিম্-খাজনার মধ্যে উপরি-উক্ত সাদৃশ্য অন্তর্হিত হয়। জমির সরবরাহ কি স্বল্প মেয়াদ—কি দীর্ঘ মেয়াদ—সর্বকালের জন্য সীমাবদ্ধ। সুতরাং জমি হইতে প্রাপ্ত আয় অর্থাৎ খাজনা কোন কালেই জমির যোগান বা ফসলের মূল্য প্রভাবিত করে না, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মনুষ্যসৃষ্ট উপাদানগুলির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং এই উপাদানগুলির অতিরিক্ত সরবরাহের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ উপাদানগুলির অতিরিক্ত সরবরাহ-খরচ যদি মূল্য দ্বারা পূরণ না হয়, তাহা হইলে ঐ উপাদানগুলির অতিরিক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়।

অধ্যাপক মার্শাল নিম্-খাজনা সংজ্ঞাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। স্বল্প মেয়াদী উপাদানগুলি হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় ব্যতীতও মানুষের অর্জিত বিদ্যা বা শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাহাও নিম্-খাজনা নামে অভিহিত হয়।

মজুরি, সুদ ও মুনাফা প্রভৃতি আয়ের সহিত খাজনার সাদৃশ্য—Rent, Wages, Interest and Profit compared.

ধনবিজ্ঞানে উৎকৃষ্টতর জমির খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয়কে খাজনা বলা হয়। চাহিদার তুলনায় উৎকৃষ্টতর জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া এই উদ্বৃত্ত আয় উদ্ভূত হয়। সুতরাং খাজনার এই সংজ্ঞাটি উৎপাদনের উপাদানগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কোন কারণে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগান স্বল্প মেয়াদে অথবা দীর্ঘ মেয়াদে সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ উপাদানটি হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় হয় তাহাকে খাজনা-সদৃশ আয় বলা যাইতে পারে।

যদি দক্ষতর কোন শ্রমিক শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীর শ্রমিক অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক পায়, তাহা হইলে দক্ষতর ও নিম্নতর শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পার্থক্যকে খাজনা-সদৃশ আয় বলা যায়। বিভিন্ন জমির যেরূপ উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের জন্য উৎকৃষ্টতর জমিতে যে অধিক আয় হয় তাহাকে খাজনা বলা হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্যের হেতু দক্ষতর শ্রমিক শ্রেণী যে অধিক পারিশ্রমিক পায় সে

পারিশ্রমিককেও পার্থক্যজনিত আয় (differential income) বলা যাইতে পারে। জমির ক্ষেত্রে যেরূপ প্রান্তিক জমি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-হীন জমি (No-rent land) দেখা যায়, শ্রমিক সম্পর্কেও সেরূপ একেবারে দক্ষতা-হীন শ্রমিকের কল্পনা করা যায়।

মূলধনের আয় সুদের মধ্যেও এই খাজনা-সদৃশ পার্থক্যমূলক আয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিকৃষ্টতর যন্ত্রপাতিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যে পরিমাণ আয় পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ আয় (সুদ) পাওয়া যায়—এইরূপে প্রান্তিক জমির ন্যায় এমন অকেজো যন্ত্রপাতি আছে যাহা ব্যবহার করিয়া আদৌ কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না। সুতরাং খাজনার ন্যায় সুদকেও মূলধনের কার্যকারিতার পার্থক্য-জনিত আয় বলা যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মুনাফাকেও খাজনার ন্যায় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা-দক্ষতার পার্থক্যজনিত আয় বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন জমির ন্যায়, বিভিন্ন ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের পার্থক্য আছে এবং এই কারণে দক্ষতর ব্যবস্থাপক সাধারণ ব্যবস্থাপক অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে, মজুরি, সুদ ও মুনাফা—প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এই খাজনা-সদৃশ পার্থক্যমূলক আয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। (**Rent element in wages, interest and profit.**)

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খাজনার সহিত মজুরি, সুদ ও মুনাফার এই সাদৃশ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে। একমাত্র প্রতিযোগিতার অপূর্ণতার ক্ষেত্রেই খাজনার সহিত মজুরি, সুদ ও মুনাফার তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ণ ও অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মজুরি, সুদ ও মুনাফার পার্থক্য হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রাপ্য আয় অর্থাৎ মজুরি, সুদ ও মুনাফার পরিমাণ সমান হইবে। ভূমির যোগান স্থায়িভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভূমি হইতে প্রাপ্য আয় স্থায়ী উদ্বৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু অন্যান্য উপাদানের আয় হইল সাময়িক কালের উদ্বৃত্ত—পূর্ণ প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে কোন উপাদানই উদ্বৃত্ত আয় পাইতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার

খাজনা—

জমি ও প্রকৃতিদত্ত অন্যান্য উপাদানগুলি ব্যবহারের জন্য যে মূল্য প্রদত্ত হয়, তাহাকে খাজনা বলা হয়। মোট প্রদত্ত খাজনা হইতে জমির মালিকের নিজস্ব মূলধনের সুদ ও পরিশ্রমের মজুরি বাদ দিলে নীট্ খাজনা পাওয়া যায়।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব—

রিকার্ডোর মতে জমির উৎপন্ন পরিমাণের যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাহাই হইল খাজনা। নূতন দেশে লোকে প্রথমতঃ ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে খারাপ জমি চাষ করা হয়। সমপরিমাণ খরচ করিয়া খারাপ জমি অপেক্ষা ভাল জমিতে যে পরিমাণ খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত অথবা খাজনা নামে অভিহিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায় অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি ততই বেশী চাষ করা হয় এবং এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জমির চাষের ফলে উৎকৃষ্টতর জমির উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাজনা বৃদ্ধি পায়।

রিকার্ডোর মতে খাজনার প্রধান কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-নীতির কার্যকারিতা। এই নীতিটি জমিতে কার্যকরী হইবার ফলে উৎকৃষ্ট জমি হইতে অধিক শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে চাষ করিলেই উৎকৃষ্ট জমিতে উদ্বৃত্ত দেখা যায়। রিকার্ডো আরও বলেন যে, ভাল জমির এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ জমির উর্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা—এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দুইখণ্ড জমি সমান উর্বর হইলেও অবস্থানের সুবিধার জন্য উদ্বৃত্তের তথা খাজনার পার্থক্য হইতে পারে। সমান উর্বর ও অবস্থানের সমান সুবিধা থাকিলেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্যও খাজনা হইতে পারে।

খাজনা ও মূল্য—

রিকার্ডোর মতে উৎকৃষ্ট জমি চাষ করিয়া যে খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত পাওয়া

যায় তাহাই খাজনা। ফসলের মূল্য নিকৃষ্ট জমির (প্রান্তিক) উৎপাদন-খরচা দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিলে মূল্য দ্বারা উৎপাদন-খরচ পূরণ হয়, কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত থাকে না অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমির কোন খাজনা নাই। যেহেতু খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, সেইহেতু খাজনা মূল্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অধিক মূল্য হইলে একটি খাজনা হয়, কিন্তু অধিক খাজনা হইলে অধিক মূল্য হয় না।

রিকার্ডোর মতবাদের সমালোচনা—

১। রিকার্ডোর মতবাদের প্রথম সমালোচনা হইল যে, জমির রিকার্ডো-বর্ণিত কোনরূপ আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা নাই। মানুষ জমির উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হয়, ভূমির অবস্থান, রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

২। ভাল জমি যে সবসময়ে সর্বাগ্রে চাষ হয় তাহা সঠিক নহে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, ভাল জমি অর্থে রিকার্ডো উর্বর ও অবস্থানের সুবিধা-জনক জমিরই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

৩। খাজনা অনেক ক্ষেত্রে মূল্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া রিকার্ডোর মতবাদ গ্রহণীয় নহে—একথা যুক্তিযুক্ত নহে। রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ অর্থাৎ এই সূত্রটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতিযোগিতার অবর্তমানে এই সূত্রটি অন্যান্য সূত্রের ন্যায় কার্যকরী হয় না।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ ভূমিকে ইহার সীমাবদ্ধতার জন্য উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি হইতে পৃথক না করিয়া মূলধন, শ্রম প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলির ব্যবহারের মূল্য যে নীতি অনুসারে নির্ধারিত হয়, ভূমির ক্ষেত্রেও সেই চাহিদা ও যোগানের সূত্র প্রয়োগ করিয়া ভূমির ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ খাজনা নির্ধারণ করেন। সহরাঞ্চলে জমি বা গৃহাদির খাজনা প্রধানতঃ অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করে।

খাজনার উপর সামাজিক অগ্রগতির প্রভাব—

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নস্তরের জমির চাষ হয় ও উচ্চস্তরের জমির উদ্বৃত্ত বেশী হওয়ায় ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়।

২। কৃষিকার্যের উন্নতি হইলে যদি এই উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালী (ক) সব জমিতে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নিম্নস্তরের জমির চাষ বন্ধ হয় ও খাজনা হ্রাস পায়। (খ) উন্নত প্রণালী যদি শুধু উৎকৃষ্ট জমিতে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে এই জমির উদ্বৃত্ত খারাপ জমির তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি করে। (গ) উন্নত প্রণালী যদি শুধু খারাপ জমিতে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে খারাপ জমি ও পূর্বের ভাল জমির উৎপাদন-পরিমাণের পার্থক্য হ্রাস পাইয়া খাজনা হ্রাস পায়।

৩। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যদি পরিবহন-খরচ হ্রাস পায়, তাহা হইলে নিকটস্থ জমির ফসলের চাহিদা হ্রাস পাইয়া খাজনা হ্রাস পায় ও দূরে অবস্থিত জমির ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি পায়।

খাজনা ও নিম্-খাজনা—

স্বল্প মেয়াদে যন্ত্রপাতি, গৃহ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান হইতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, সেই আয় খাজনার অনুরূপ উদ্বৃত্ত বলিয়া অধ্যাপক মার্শাল এই আয়কে নিম্-খাজনা বলিয়াছেন। এই উভয়বিধ আয়ের প্রধান সাদৃশ্য হইল যে, স্বল্প মেয়াদে ভূমি ও মনুষ্যসৃষ্ট উপাদানগুলির যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং খাজনার ন্যায় নিম্-খাজনা এই উপাদানগুলির যোগান ও উপাদানগুলির সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এই সাদৃশ্য অন্তর্হিত হয়। তাহার কারণ ভূমির যোগান দীর্ঘ মেয়াদেও সীমাবদ্ধ কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট উপাদানগুলির যোগান দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি করা যায় সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদে এইগুলির সরবরাহ-খরচা উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুবা এইগুলির সরবরাহ বন্ধ হয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." Discuss. (C. U. 1928)

2. How does rent of land arise? Will there be any rent, if all plots of lands were equally fertile and equally favourably situated? (C. U. B. Com. 1955)

3. Show how (a) the quality of lands, (b) the margin of cultivation, and (c) the price of the produce affect the amount of economic rent. (C U. 1942)

4. A shopkeeper in a fashionable street says that he charges high prices for his goods because he has to pay high rent for his premises. Is this contention valid? (C. U. 1940)

5. "Corn is not high because a rent is paid, but rent is paid because corn is high." Discuss this statement of Ricardo. (C. U. B. Com. 1949)

6. Distinguish between rent and quasi-rent. Show how the two are related to transfer-earnings. (P. U. 1951)

7. Explain, giving reasons, the effect on Rent of (i) an improvement in transport, (ii) an increase in population, (iii) improvements in methods of cultivation, (iv) economic progress in general. (C. U. 1957)

8. Discuss the causes and significance of rent.

9. State the theory of rent and discuss whether there is any 'rent element' in Wages, Interest and Profits. (C. U. B. Com. 1957)

10. Explain the relation between rent of land and the price of agricultural crops. (C. U. 1959)

11. What is the difference between rent and quasi-rent? How are rent and quasi-rent related to the inelasticity of supply of a particular factor? (C. U. B. Com. 1961)

12. Do you agree with the view that the rent of land does not enter into the price of crops? (C. U. 1962)

———

বিংশ অধ্যায়

মজুরি

(Wage)

মজুরির সংজ্ঞা—Definition of Wage.

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিকের পারিশ্রমিককে 'মজুরি' বলা হয়। 'মজুরি' শব্দটি একটি ব্যাপক ও একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সর্বশ্রেণীর কাজের পারিশ্রমিককেই মজুরি বলা হয়। যে শ্রমিক স্বাধীনভাবে তাহার নিজের তত্ত্বাবধানে নিজে কাজ করে, তাহারও একটা মজুরি আছে। আবার, যখন কোন শ্রমিক কোন ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাহার নির্দেশমত কাজ করে, তখন এই নিযুক্ত শ্রমিকের পারিশ্রমিককেও মজুরি বলা হয়। ইহাই হইল মজুরির সংকীর্ণ অর্থ।

ধনবিজ্ঞানে 'মজুরি' শব্দটি সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কর্মী তাহাদের শারীরিক অথবা মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, তাহারাই সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা অংশ মজুরি হিসাবে পাইয়া থাকে। জাতীয় আয়ের একটি অংশ হইলেও মজুরির সহিত জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশগুলির যথা, খাজনা, সুদ প্রভৃতির কিছু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্ন জমির খাজনার যে পরিমাণ পার্থক্য হয়, সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির মধ্যে সে পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া অতি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। সুদের সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদের একটি স্বাভাবিক হার আছে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একই বাজারে সাধারণতঃ সুদের হার সমান থাকে, কিন্তু একই বাজারে মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায়।

কি হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়—Methods of Wage payments.

দুইটি হিসাবে সাধারণতঃ মজুরি প্রদান করা হয়—এক হইতেছে সময়ের মাপে (Time wage), আর একটি হইতেছে কাজের মাপে (Piece wage)। সময়ের মাপে মজুরি প্রদান করার অর্থ হইল যে, একটা নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে (প্রতি দিন বা রোজ, প্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতিমাস কাজ করিয়া) মজুরি প্রদান করা হয়। দৈহিক শ্রমের জন্য সাধারণ শ্রমিকগণ সময়ের মাপে অর্থাৎ রোজ প্রতি অথবা হপ্তা প্রতি মজুরি পায়। উচ্চস্তরের অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ কর্মিগণ মাস প্রতি মাহিনা পায়। অপর পক্ষে যখন কাজের মাত্রা স্থির করিয়া প্রত্যেক মাত্রার জন্য কি পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয়, তখন ইহাকে কাজের মাত্রা অনুসারে মজুরি বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দর্জির মজুরি কাজের মাপে স্থির করা হয়। প্রত্যেকটি জামা কাটা ও সেলাইয়ের জন্য দর্জির একটি মজুরি নির্ধারিত হয় এবং এই নির্ধারিত মজুরির ভিত্তিতে সে যতগুলি জামা প্রস্তুত করে তাহার সেইমত মজুরি নির্ধারিত হয়। অনেক সময় কয়লার খনি ও চা-বাগানের কাজে এই হিসাবে মজুরি প্রদত্ত হয়। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ সময়ের হিসাবে মজুরি পাইতে চায়, অপর পক্ষে মালিকগণ কাজের হিসাবে মজুরি দিতে পছন্দ করে।

অর্থমজুরি ও প্রকৃত বা সামগ্রী মজুরি—Nominal or Money Wage and Real Wage.

শ্রমিকগণ তাহাদের কাজের প্রতিদানরূপে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে অর্থমজুরি বলা হয়। অর্থমজুরি প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দ্বারা মাপ করা হয়। কিন্তু অর্থ হইল শুধু বিনিময়ের বাহন। অর্থের দ্বারা শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য প্রকৃত মজুরির কল্পনা করা হয়। আর্থিক মজুরি ব্যতীতও শ্রমিকেরা কাজ করিয়া আনুষংগিক অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত মজুরি বলা যায়। কাজের আনুষংগিক সুখ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করা হয়। শ্রমিকগণও শুধুমাত্র প্রদত্ত অর্থমজুরির পরিমাণ দ্বারা কার্যে আকৃষ্ট হয় না, কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহারা কাজের আনুষংগিক সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে।

প্রকৃত মজুরি কিসের উপর নির্ভর করে—Factors determining Real Wage.

১। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি প্রধানতঃ অর্থের ক্রয়ক্ষমতার (Purchasing power of money) অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে অর্থমজুরির পরিমাণ যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়, আবার দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে অর্থমজুরির পরিমাণ যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনের কর্মী যে সুখ-সুবিধা পাইত অর্থাৎ যে মান অনুসারে সে জীবনযাত্রা পরিচালিত করিত, যুদ্ধোত্তরকালে দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধির ফলে ১০০৲ টাকা বেতনে তাহার পক্ষে জীবনযাত্রার পূর্বমান বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার কারণ হইল যুদ্ধপূর্বে ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সে যে সুখস্বাচ্ছন্দের অধিকারী ছিল, যুদ্ধের পরবর্তী কালে ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সে পূর্ব সুখস্বাচ্ছন্দের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণও পাইতে পারে না। সুতরাং অর্থমজুরির পরিমাণ সমান থাকিলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহার প্রকৃত মজুরি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

২। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কাজের প্রকৃতির (Nature of the employment) উপর নির্ভর করে। কাজটি যদি কষ্টসাধ্য হয় যাহাতে লোকের জীবনীশক্তির অপচয় ঘটে অথবা কাজটি যদি অরুচিকর হয় অথবা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থমজুরির পরিমাণ অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কম হয়। অপর পক্ষে, স্বল্প সময়ের জন্য রুচিকর কার্যের অর্থমজুরির পরিমাণ কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক।

৩। অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা (Possibility of subsidiary earnings) থাকিলে, সে কাজের অর্থমজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজের সময়ের দীর্ঘতা যদি কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ প্রচুর অবসর পায় এবং এই অবসর সময়ে তাহারা অন্য নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের কাজের সময়ের দীর্ঘতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া তাঁহারা গৃহশিক্ষকতা করিয়া, পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

সুতরাং শিক্ষা-ব্যবসায়ের অর্থমজুরির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক।

৪। প্রকৃত মজুরির পরিমাণ মজুরি-প্রদান পদ্ধতির (Form of payment) উপরও কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। অনেক কাজে দেখা যায় যে, শ্রমিকগণ অর্থমজুরি ব্যতীত বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রী পাইয়া থাকে। অনেক চাকুরীতে বিনাভাড়ায় বাসগৃহ, পরিধেয় এবং স্বল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে এই সুখ-সুবিধাগুলি গণনা করিতে হইবে।

৫। কাজের স্থায়িত্বের (Regularity of employment) উপরও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজ যত বেশী স্থায়ী বা যে কাজে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, সে কাজের অর্থমজুরির পরিমাণ কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষানবিশীর খরচা, সামাজিক মর্যাদা, কাজের ঝুঁকি প্রভৃতির দ্বারাও প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয়।

সুতরাং শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে অথবা বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন কালের শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে হইলে তাহা আর্থিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না। একমাত্র প্রকৃত মজুরির ভিত্তিতে এই তুলনামূলক আলোচনা সার্থক হয়।

মজুরি-নির্ধারণতত্ত্বসমূহ—Theories about the determination of Wages.

মজুরি-নির্ধারণতত্ত্ব সম্পর্কে বহু মতবাদ প্রচলিত ছিল। অধুনা সেই মতবাদগুলি পরিত্যক্ত হইলেও সেগুলি মজুরি-নির্ধারণের আধুনিক মতবাদের উপর আলোকসম্পাত করে।

১। ভরণপোষণোপায় সূত্র—Subsistence theory of Wage.

এই সূত্র অনুসারে শ্রমিকের শ্রমকে একটি সাধারণ দ্রব্যের সহিত তুলনা করা হয়। অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় শ্রমিকের শ্রমের মূল্যও ইহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া উক্ত হয়। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা হইল পরিবারসহ শ্রমিকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার ন্যূনতম খরচ।

মজুরি যদি শ্রমিকের জীবনযাত্রা-পরিচালন খরচের সর্বনিম্ন মান অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ পরিবার-প্রতিপালনের অক্ষমতা হেতু বিবাহ করিয়া পরিবার বৃদ্ধি করিবে না। ফলে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে ও পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, মজুরি যদি জীবনযাত্রার সর্বনিম্ন মান অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার সর্বনিম্ন মানে নির্ধারিত হইবে। সুতরাং মজুরি শ্রমিকের পরিবারসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার ন্যূনতম খরচের উর্ধ্বে বা নিম্নে হইতে পারে না।

মজুরির ভরণপোষণোপায় সূত্রটির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা করা হইয়াছে। (ক) বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট মানের অবর্তমানে মজুরি নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে।

(খ) বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকগণের মধ্যে মজুরির পার্থক্য এই সূত্রটির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

(গ) এই সূত্রটি শুধুমাত্র শ্রমিকের সরবরাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু মজুরি-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

(ঘ) এই সূত্র দ্বারা পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রচলিত মজুরির হারের ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ ঐসমস্ত দেশে মজুরির হার সাধারণতঃ জীবনযাত্রার সর্বনিম্ন মান বজায় রাখিবার খরচের অনেক উর্ধ্বে স্থিরীকৃত হয়।

২। অবশিষ্টাংশের দাবিদার সূত্র—Residual claimant theory.

এই সূত্র অনুসারে শ্রমিককে অবশিষ্টাংশের দাবিদার বলা হয়। খাজনা, সুদ ও মুনাফা ভাগ করিয়া দিবার পর জাতীয় আয়ের যে অবশেষ থাকে, তাহাই শ্রমিকের মজুরি হিসাবে প্রদত্ত হয়। এই সূত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সূত্র অনুসারে শ্রমকে একটি দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত না করিয়া ইহাকে উৎপাদনের একটি উপাদানের মর্যাদা দেওয়া হয়। শ্রমিকগণ যদি তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বারা সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে জাতীয় আয় পুষ্ট হইয়া শ্রমিকগণের প্রাপ্য অংশও বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকগণ সমগ্র উৎপাদনে তাহাদের দান বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিতে পারে।

এই সূত্রটির (ক) প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা শ্রমিকগণকে অবশিষ্টাংশের দাবিদার বলিয়া গণ্য করে কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, শিল্প-উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরিই হইল সর্বপ্রথম উৎপাদন-খরচা এবং মজুরিই উৎপাদন-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম দেয় মূল্য। বণ্টন-ব্যবস্থায় মুনাফাই হইল প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্টাংশ।

(খ) এই সূত্র অনুসারে মজুরি-নির্ধারণে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের উপরই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মজুরি-নির্ধারণে শ্রমিকের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের প্রভাব স্বীকৃত হয় না।

(গ) শ্রমিকসংঘ শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া কি প্রকারে মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে, এই সূত্রটির দ্বারা তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

৩। মজুরি-তহবিল সূত্র—Wages fund theory.

য়্যাডাম্ স্মিথের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জন্ স্টুয়ার্ট মিল এই মতবাদ প্রবর্তন করেন। মিল্ বলেন, মজুরি প্রদান করিবার জন্য দেশের পুঁজির পরিমাণ হইতে একটি অংশ পৃথক করিয়া রাখা হয়। পুঁজির এই পৃথকীকৃত অংশকে মজুরি-তহবিল বলা হয় এবং এই তহবিলের পরিমাণ দ্বারা শ্রমিকের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রমিকসংখ্যা দ্বারা এই তহবিলের পরিমাণকে ভাগ দিয়া মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

মিলের এই সূত্রটিরও নানা সমালোচনা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) মজুরি পুঁজি হইতে দেওয়া হয় বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। প্রকৃত সত্য হইল যে, মজুরি পুঁজি হইতে অগ্রিম দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মজুরি হইল জাতীয় আয়ের একটি অংশ এবং এই জাতীয় আয় একটি প্রবাহমাত্র, সঞ্চিত তহবিল নহে। (খ) এই মতবাদ অনুসারে শ্রমিকের মজুরি সর্বত্র সমান হওয়ার কথা কিন্তু সর্বত্রই মজুরির পার্থক্য দেখা যায় এবং এই মতবাদ মজুরির পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) এই মতবাদে বলা হয় যে, মজুরি প্রদানের একটি নির্দিষ্ট তহবিল আছে। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি না করিয়া কি প্রকারে মজুরি-বৃদ্ধি সম্ভব তাহা এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। শ্রমিকের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি না করিয়াও শ্রমিকসংঘ তাহাদের কর্মতৎপরতার দ্বারা মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে পারে।

৪। মজুরি-নির্ধারণে টাউসিগের মতবাদ—**Taussig's theory of discounted marginal product of labour.**

মজুরি-নির্ধারণে অধ্যাপক টাউসিগ্ একটি অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, (১) মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক দান দ্বারা নির্ধারিত হয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ, এই প্রান্তিক দান হইতে বাট্টা (discount) বাদ দিয়া শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হয়। আধুনিক কালে দীর্ঘ ও জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া বাজারে ভোগ্যবস্তু বিক্রয় করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা ভোগ্যবস্তু বিক্রীত হওয়ার জন্য যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় তাহাদের মজুরির জন্য সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। সেইজন্য পুঁজিপতিগণ শিল্পের পুঁজি হইতে তাহাদের মজুরি অগ্রিম দিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকের মজুরি, উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দানের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু শ্রমিকগণের উৎপাদনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার অক্ষমতাহেতু পুঁজিপতিগণ তাঁহাদের মূলধন হইতে শ্রমিকগণকে অগ্রিম দেন এবং এই অগ্রিম দেওয়ার জন্য পুঁজিপতিগণ শ্রমিকের প্রান্তিক দানের ভিত্তিতে নির্ধারিত মজুরি হইতে চলিত হারে তাঁহাদের মূলধনের সুদ আদায় করেন। প্রান্তিক দানের সমান মূল্যের মজুরি পাইতে হইলে শ্রমিকগণকে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রীত হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাহারা অপেক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া পুঁজিপতিগণ তাহাদের মজুরি অগ্রিম দেন এবং এই অগ্রিম মজুরির পরিমাণ হইতে পুঁজির সুদ বর্তমান হারে কাটিয়া রাখেন। সুতরাং শ্রমিকগণ প্রান্তিক দান অপেক্ষা কম পাইয়া থাকে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই সূত্র অনুসারে মজুরিবাবদ অগ্রিম প্রদানের পরিমাণ হইতে সুদ বাদ দিয়া মজুরি নির্ধারিত হয়, সুতরাং সুদের হার দ্বারা মজুরির পরিমাণ স্থির হয়। অপর পক্ষে দেখা যায় যে, সুদের হার এই অগ্রিম প্রদানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি ফল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

৫। মজুরি-নির্ধারণে প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্র—Marginal productivity Theory of Wage.

বর্তমানে দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণের চাহিদা ও যোগানের সাধারণ সূত্রটি মজুরি-নির্ধারণে প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ যে নীতি অনুসারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়, সেই নীতি অনুসারেই শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়। দ্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের মূল্যও অনুরূপভাবেও শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

চাহিদার দিক দিয়া দ্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়, শ্রমের মূল্যও তদ্রূপ উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার (Marginal productivity) সমান হয়। যত সময় পর্যন্ত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ব্যবস্থাপক লাভবান হন, তত সময় পর্যন্ত অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করেন। যে অবস্থায় একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিলে তাহার উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না ও ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, সে অবস্থায় তিনি অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করেন না। শেষ অতিরিক্ত শ্রমিকই হইল প্রান্তিক শ্রমিক এবং সমগ্র উৎপাদনে এই অতিরিক্ত শ্রমিকের দানকেই প্রান্তিক দান বলা হয়। প্রান্তিক দানের বাজার মূল্যই হইল প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরি এবং এই মজুরি দ্বারাই উক্ত শ্রেণীর সমস্ত শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়। সুতরাং চাহিদার দিকে প্রান্তিক দান দ্বারাই শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়।

যোগানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দ্রব্যমূল্য দ্রব্যটির প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের উৎপাদন-খরচার অর্থ হইল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার খরচা। মজুরির পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যে, শ্রমিক ঐ পরিমাণ মজুরি দ্বারা তাহার প্রচলিত জীবনযাত্রার মান অব্যাহত রাখিতে পারে। মজুরির পরিমাণ জীবনযাত্রার মান অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হইলে, শ্রমিকগণ বিবাহ করিয়া পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না। ফলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া শ্রমিকের প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পাইবে। প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পাইবে।

চাহিদা ও যোগানের সাধারণ সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া মজুরি-নির্ধারণ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইলেও মজুরি-নির্ধারণতত্ত্বে এই সূত্রটি অবিকৃতভাবে প্রযোজ্য নহে। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের এরূপ কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

দেখা যায়, যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য মজুরি-নির্ধারণতত্ত্বে চাহিদা ও যোগানের সূত্রটির কিছু পরিবর্তনের আবশ্যক হয়। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সাধারণ দ্রব্যসমূহ হইতে শ্রমের পার্থক্য করা হয়।

(ক) শ্রম শ্রমিক হইতে অবিচ্ছেদ্য (inseparable)। অন্যান্য দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বাজারে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে, কারণ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি বিক্রেতার বহিঃস্থ দ্রব্য। কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে সমস্ত স্থলে শ্রমের বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিক যাইতে অনিচ্ছুক, সে সমস্ত স্থলে শ্রম বিক্রয় করা যায় না। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় শ্রমের অবাধ গতিশীলতা নাই।

(খ) শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে কিন্তু শ্রম করিবার ক্ষমতা তাহার নিজ আয়ত্তে রাখে। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় একবার বিক্রয় করিলে দ্বিতীয়বার শ্রম বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় না।

(গ) শ্রমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা একটি সহজে ধ্বংসশীল পণ্য দ্রব্য। অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয়কার্য স্বল্প সময় বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব হয় কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্রে তাহা আদৌ সম্ভব নহে। শ্রমিক যদি আজ তাহার পণ্য বিক্রয় না করে অর্থাৎ আজ যদি কাজ না করে তাহা হইলে আজিকার কাজ অন্য কোন দিন করিয়া আজিকার মজুরি পাইতে পারে না। এই কারণের জন্যই শ্রমিকগণ মালিকের সহিত দর-কষাকষি ব্যাপারে অসমর্থ।

(ঘ) শ্রমিকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র এবং মালিকদের মত তাহাদের কোন মজুত অর্থ নাই। মজুত অর্থের অভাবে তাহারা দর-কষাকষির জন্য যে সময়ক্ষেপ করিতে হয় তাহাতে অসমর্থ। কর্মে বিরতি হইলে তাহারা মজুরি পায় না এবং মজুরি না পাইলে মজুত অর্থের অভাবে তাহাদের অনশনের সম্মুখীন হইতে হয়। উপরি-উক্ত দুইটি কারণের জন্য শ্রমিকগণ মালিকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিয়া ন্যায্য মজুরি আদায় করিতে পারে না।

(ঙ) শ্রমিকের চাহিদার সহিত শ্রমিকের যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রমিকের স্বাভাবিক মজুরি নির্ধারিত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

৬। মজুরি-নির্ধারণ সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ—Modern Theory of Wages.

মজুরি নির্ধারণতত্ত্বের মূল কথা হইল চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব। কোন দ্রব্যের যেরূপ বাজার মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্য থাকে, মজুরির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ দুই জাতীয় মজুরি দেখিতে পাওয়া যায়। মজুরির একটি অস্থায়ী হার থাকে এবং এই অস্থায়ী হার ব্যবস্থাপক শ্রমিকের প্রান্তিক দান অনুসারে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রমিকের স্বাভাবিক মজুরির হার শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একদিকে শ্রমিকের প্রান্তিক দান ও অপরদিকে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ যোগান-খরচা দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়। বর্তমান যুগে নানা জাতীয় শ্রমিকসংঘ ও উৎপাদকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। এই সমস্ত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মজুরির হার এই সংঘগুলির আপেক্ষিক দর-কষাকষির ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি—Standard of living and Wages.

জীবনযাত্রার মান বলিতে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বুঝায় না। খাদ্য, পরিধেয় ও বস্ত্র ব্যতীতও কর্মক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদয়ই জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক। এই অর্থে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য, উত্তম বস্ত্র ও আবাসগৃহ, শিক্ষালাভের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর ও আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। জীবনযাত্রার মান যদি উচ্চ হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ জীবনযাত্রার এই উচ্চ মান বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তাহার প্রান্তিক দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান শ্রমিকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়াও প্রান্তিক দানের পরিমাণ প্রভাবিত করে। মজুরির পরিমাণ যদি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার পক্ষে

যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ বিবাহ করিয়া পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না। ফলে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ভবিষ্যতে মজুরি বৃদ্ধি পাইবে।

অপর পক্ষে, মজুরি হ্রাস পাইলে জীবনযাত্রার মানেরও অবনতি ঘটে এবং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইলে প্রান্তিক দানের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে মজুরি আরও হ্রাস পায়। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাসের ফলে মজুরি হ্রাস পাইতে থাকিলে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হয়। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। কৃত্রিম উপায়ে মজুরি হার বৃদ্ধি করিলেই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

সুতরাং মজুরির উপর জীবনযাত্রার মানের প্রভাব পরোক্ষমাত্র। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে মালিকগণের সহিত দর-কষাকষি ব্যাপারেও তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

দ্রব্যমূল্যের উপর মজুরির প্রভাব—Influence of wage on Price.

এখন প্রশ্ন হইল দ্রব্যমূল্যের সহিত মজুরির কি সম্পর্ক? মজুরি অধিক হইলে কি দ্রব্যমূল্য অধিক হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্যমূল্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপদান-খরচার সমন্বয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু মজুরি প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার একমাত্র উপাদান নহে। মূলধনের সুদ, ব্যবস্থাপনার পুরস্কার, কাঁচামালের মূল্য প্রভৃতিও উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং মজুরি হইল উৎপাদন-খরচার একটি অংশমাত্র। স্বল্প মেয়াদ না হইলেও দীর্ঘ মেয়াদে প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ উৎপাদন-খরচার একটি প্রধান অংশ। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদে দ্রব্যমূল্যের উপর মজুরির প্রভাব উপেক্ষণীয় না হইলেও ইহাকে মূল্য-নির্ধারণের একমাত্র কারণ বলা সমীচীন নহে। কোন শিল্পবিশেষে হয়ত একশ্রেণীর শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সাময়িকভাবে উচ্চহারে মজুরি দিবার ফলে উক্ত শিল্পজাত

দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সর্বক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য নহে।

মূল্যের উপর মজুরির প্রভাব সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উচ্চ হারে মজুরি দেওয়া সত্ত্বেও কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হয়। উৎপাদনে সাধারণ শ্রমিকের প্রান্তিক দান অপেক্ষা দক্ষ-শ্রমিকের দান অনেক অধিক। উৎপাদনে দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়, কারণ দক্ষ শ্রমিকের অবদান অধিক। সুতরাং দক্ষ শ্রমিককে উচ্চহারে মজুরি দিলেও উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায় না। উচ্চহারে মজুরি-প্রদত্ত দক্ষ-শ্রমিক নিম্নহারে মজুরি-প্রদত্ত শ্রমিক অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদন-ক্ষম বলিয়া সুলভ বলা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি যদি ভারতে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা তিনগুণ অধিক হয় এবং ইংলণ্ডের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যদি ভারতের শ্রমিকের দক্ষতার তিনগুণের বেশী হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ভারতের মজুরির তুলনায় ইংলণ্ডের মজুরি অপেক্ষাকৃত সস্তা। সুতরাং উচ্চহারের মজুরির দ্বারা সাধারণতঃ উচ্চহারের উৎপাদন-ক্ষমতা সূচিত হয়।

মজুরির পার্থক্যের কারণ—Causes of difference in Wages.

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একই বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য সাধারণতঃ হইতে পারে না। দ্রব্যমূল্য যে নীতিতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরিও প্রধানতঃ সেই নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণ বিভিন্ন হারে মজুরি পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

১। মজুরির পার্থক্যের প্রথম ও প্রধান কারণ হইল কর্মদক্ষতার পার্থক্য (Differences in efficiencies)। শ্রমিকগণের সহজাত গুণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্যই কর্মক্ষমতার পার্থক্য দেখা যায়। কর্ম-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য মজুরির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবর্তমানে শ্রমিকের গতিশীলতা রুদ্ধ হয়। গতিশীলতার অভাবে (Lack of mobility) নিম্নস্তরের শ্রমিকের পক্ষে

উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়। প্রত্যেক দেশেই সামাজিক নানা কারণে এইরূপ অবরুদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক কারণে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অবরুদ্ধ হইবার ফলে কোন শ্রেণীতে শ্রমিক-সংখ্যা অধিক, আবার কোন শ্রেণীতে শ্রমিক-সংখ্যা অত্যল্প। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির পার্থক্য হয়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা দ্বারা কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও গতিশীলতার অভাবের কারণ দূর করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি মজুরির পার্থক্য বর্তমান থাকিতে পারে? উত্তরে বলা যায় যে, সমান সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরির পার্থক্য বর্তমান থাকিবে।

৩। বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিগুলি সমান আনন্দদায়ক নহে বলিয়া (Differences in agreeableness of the occupation) কোন বৃত্তিতে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়, আবার কোন বৃত্তিতে অল্পসংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। যে বৃত্তিগুলি কষ্টসাধ্য বা সামাজিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়া পরিগণিত হয়, সে বৃত্তিগুলিতে শ্রমিককে আকর্ষণ করিতে হইলে উচ্চহারে মজুরি প্রদান করিতে হয়। এইজন্য কশাইয়ের মজুরি অন্যান্য সমজাতীয় মজুরির হার অপেক্ষা অধিক হয়।

৪। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ের (Expenses of training) পার্থক্যের জন্যও মজুরির পার্থক্য হইয়া থাকে। যে সমস্ত বৃত্তি শিক্ষা করিতে অধিকতর সময়-ক্ষেপ ও ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, সাধারণতঃ সে সমস্ত বৃত্তিতে কর্মীর সংখ্যা স্বভাবতই কম হয়। কর্মীর সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম বলিয়া মজুরি বেশী হয়।

৫। কাজের স্থায়িত্বের উপরও (Constancy or inconstancy of occupation) মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজ বৎসরে বারমাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, কোন সময়ে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সে সকল কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে লোক পাওয়া সম্ভব। অপর পক্ষে ঋতুগত কাজের জন্য শ্রমিককে অধিক মজুরি দিতে হয়, কারণ শ্রমিক সারা বৎসর উপার্জন করিতে পারে না।

৬। যে কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব (Risk and responsibility) যত বেশী, সে কাজে তত কম লোক আকৃষ্ট হয়। সুতরাং লোক আকৃষ্ট করিবার জন্য অধিক হারে মজুরি দিতে হয়। এরোপ্লেন-চালক মোটর-চালক অপেক্ষা অধিক বেতন পায়, তাহার কারণ হইল এরোপ্লেন-চালনা কার্যের ঝুঁকি ও বিপদাশংকা এত বেশী যে, উচ্চহারে বেতন প্রদান না করিলে চাহিদার তুলনায় উপযুক্ত সংখ্যক চালক পাওয়া সম্ভব নয়। কাজের দায়িত্বের পার্থক্যের জন্যও মজুরির পার্থক্য হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কলেজের অধ্যক্ষ সাধারণ শিক্ষক বা সাধারণ অধ্যাপক অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। অধিক বেতন না পাইলে এই জাতীয় দায়িত্ব-বহনযোগ্য লোক দুষ্প্রাপ্য হয়।

৭। যে সমস্ত বৃত্তিতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা (Future prospect) অধিক, সে সমস্ত বৃত্তিতে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা, অবসর গ্রহণের পর ভাতা পাইবার সুবিধা, চাকুরির স্থায়িত্ব প্রভৃতি সুবিধার জন্য অধিক সংখ্যক লোক সরকারী কাযে আকৃষ্ট হয় ও কম বেতনে কার্য করিতে ইচ্ছুক থাকে।

স্ত্রীলোকের অপেক্ষাকৃত কম মজুরির কারণ—Causes of low wages of Women.

নারীশ্রমিক সাধারণতঃ পুরুষশ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরি পাইয়া থাকে। পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মজুরিব এই তারতম্য নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ঘটিয়া থাকে।

১। পুরুষের দৈহিক শক্তি অপেক্ষা নারীর দৈহিক শক্তি সাধারণতঃ কম। এই জন্য স্ত্রীলোকগণ অধিকতর শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষম। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের মজুরি কম হওয়া স্বাভাবিক।

২। সামাজিক নানা কারণে ও শিক্ষার অভাবে স্ত্রীলোকগণের নিয়োগ-ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ-পরিসর। কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্যেই স্ত্রীলোকগণ নিযুক্ত হইতে পারে এবং এই কার্যগুলিতে স্ত্রীলোকের চাহিদা অপেক্ষা এত বেশী ভিড় হয় যে, মজুরি হ্রাস পাইতে বাধ্য হয়।

৩। স্ত্রীলোকের জীবনধারণের মান পুরুষের জীবনধারণের মান অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাহাদের অভাবও অপেক্ষাকৃত কম, কারণ স্ত্রীলোকের

সাধারণতঃ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় না। এই কারণে তাহারা স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে পারে।

৪। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ স্থায়িভাবে শ্রমিক বৃত্তি অবলম্বন করে না। বিবাহের পর অথবা সন্তানের জননী হইবার পর বা পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হইলে তাহারা শ্রমিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে। নারী শ্রমিকগণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কোন শ্রমিকসংঘও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইজন্য দর-কষাকষি করিয়া উচ্চ মজুরি আদায় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বর্তমান যুগে অবশ্য মজুরি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নারী আজ পুরুষের সমানাধিকারের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমান কাজের জন্য নারীগণ আজ পুরুষের সমান মজুরি পাইয়া থাকে। রুশ দেশে সর্বপ্রথম এই সমানাধিকার নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতেও এই নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

ন্যায্য মজুরি, জীবনধারণোপযোগী মজুরি ও ন্যূনতম মজুরি—Fair Wage, Living Wage and Minimum Wage.

ধনবিজ্ঞানে মজুরির নির্ধারণ সম্পর্কে এই তিনটি সংজ্ঞা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই সংজ্ঞাগুলি ব্যবহার কালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহারা আপেক্ষিক, দেশ-কাল-ভেদে এই সংজ্ঞাগুলি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতে পারে।

ন্যায্য মজুরি—শ্রমিক যখন তাহার প্রান্তিক দানের মূল্যের সমমূল্য মজুরি পায়, তখন তাহাকে ন্যায্য মজুরি বলা হয়। যদি কোন বৃত্তিতে মজুরির পরিমাণ প্রান্তিক দানের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে তাহাকে অন্যায্য মজুরি বলা হয়। ন্যায্য মজুরি সম্ভব হয় তখন, যখন শ্রমিকের গতিশীলতার কোন অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ শ্রমিকেরা স্বাধীনভাবে তাহাদের বৃত্তি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবর্তমানে শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পাইতে পারে। কিন্তু মালিকগণ যদি সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রমিকের প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করে, তাহা হইলে প্রতিযোগিতার অসামর্থ্য হেতু শ্রমিক-গণ ন্যায্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি লইতে বাধ্য হয়।

জীবনধারণোপযোগী মজুরি—জীবনধারণোপযোগী মজুরি বলিলে সাধারণতঃ

বুঝা যায় সেই পরিমাণ মজুরি, যে মজুরি দ্বারা শ্রমিক সচরাচর অসুস্থ না হইলে একটি নাতিবৃহৎ পরিবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু শ্রমিক যদি সচরাচর অসুস্থ হয় এবং তাহাকে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনধারণোপযোগী মজুরি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় জীবনধারণোপযোগী মজুরি যথেষ্ট হইলেও পরিবর্তিত অবস্থায় এই মজুরিকে আর জীবনধারণোপযোগী মজুরি বলা যাইতে পারে না। যদি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পূর্বপরিমাণ মজুরিকে আর জীবনধারণোপযোগী মজুরি বলা যায় না।

ন্যূনতম মজুরি—শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনেক দেশের জাতীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির একটি সর্বনিম্ন মান স্থির করিয়া দিয়াছে। সর্বনিম্ন মজুরির পরিমাণ এরূপভাবে নির্ধারিত হয়, যাহাতে শ্রমিকগণের পক্ষে মোটামুটি ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয়। মজুরির একটা মান নির্ধারণ করিয়া এই মান বলবৎ করিতে হইলে সরকারের পক্ষে নূতন কাজ সৃষ্টি করিতে হয়।

সরকার কর্তৃক মজুরির একটি সর্বনিম্ন মান নির্ধারণ করিবার বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

১। নির্ধারিত পরিমাণ মজুরি যদি শ্রমিকের প্রান্তিক দান অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে মজুরি-নির্ধারণ বিফল হয়, অপর পক্ষে প্রান্তিক দান অপেক্ষা অধিক হইলে মালিকের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর।

২। সর্বনিম্ন মজুরির পরিমাণ যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস হইবে এবং শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া বেকার-সমস্যা দেখা দিবে।

৩। যে সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু কম মজুরিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিশ্রম-সাধ্য কার্যে নিযুক্ত হইত, সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারিত হওয়ার ফলে তাহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়।

বেশী মজুরি দেওয়ার ফলে ব্যয় সংকোচ—Economy of high Wages.

অনেকে মনে করে যে, মালিক শ্রমিককে যত কম মজুরি দিতে পারে

তাহার লাভের অংশ তত বেশী হয়। কিন্তু এ ধারণা সব সময়ে নির্ভুল নহে। মালিকের মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যের উপর। মোট ব্যয় অপেক্ষা মোট আয় যখন বেশী হয় তখন মালিকের লাভ হয়। মালিকের মুনাফা পরিমাণ মজুরকে দেয় মজুরি পরিমাণ অপেক্ষা তাহার উৎপাদন পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর বেশী নির্ভর করে। মালিক যদি দক্ষতার সহিত উৎপাদন কার্য পরিচালনা করিতে পারে এবং দক্ষতার ফলে যদি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় তাহা হইলে মজুরি একটু বেশী দিলেও তাহার মুনাফা পরিমাণ বেশী হইবে। যে উপাদানগুলি লইয়া উৎপাদন ব্যয় গঠিত, মজুরি হইল তাহার একটি অংশ মাত্র। মালিক যদি শ্রমিককে বেশী মজুরি দেয় তাহা হইলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকের কর্মশক্তি ও উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান (Marginal productivity) বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি একক উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে বেশী মজুরি দিলে মালিকেরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে মজুরি যদি কম হয় তাহা হইলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে। ইহার ফলে তাহার কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইয়া উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান কম হয়। ফলে উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস পায় ও প্রতি একক উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মজুরকে মালিক যদি কম মজুরি দেয়, তাহা হইতে আপাতদৃষ্টিতে মালিকের লাভ বেশী হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং শ্রমিককে উচ্চ মজুরি দিলে শেষ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে ব্যয় সংকোচ দ্বারা অধিকতর লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইহা ছাড়াও, শ্রমিককে উচ্চ মজুরি দিলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর হইয়া উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ হয়। ধর্মঘট প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা উৎপাদন ব্যাহত হয় না। বেশী মজুরি দিয়া মালিক দক্ষ শ্রমিক আকর্ষণ করিতে পারে। ফলে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ইংলণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের মজুরির হার অনেক বেশী হইলেও মালিকের মুনাফা পরিমাণ কম হয় না।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ

(Labour Problems)

শ্রমিক সম্পর্কিত সমস্যার কারণ--Causes of Labour Problems.

উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ম হিসাবে জাতীয় আয়ের একটি অংশ শ্রমিকের প্রাপ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে শ্রমিকগণ তাহাদের প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি পাইতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। দর-কষাকষি ব্যাপারে শ্রমিকগণ নানা কারণে মালিকগণের সহিত সমপর্যায়ে প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। এইজন্য তাহাদের অনেক সময় সংঘবদ্ধ হইয়া সমবেতভাবে দর-কষাকষি (collective bargaining) করিয়া তাহাদের প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি আদায় করিতে হয়। শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হয়। শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধতা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে বর্তমানে শ্রমিকগণের মজুরির হার বৃদ্ধি ও কার্যের অন্যান্য অনেক সুবিধা হইয়াছে।

শ্রমিকসংঘ—Trade Unions.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিকের কতকগুলি আপেক্ষিক দুর্বলতা আছে এবং দুর্বলতাগুলির জন্যই তাহারা মালিকগণের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিয়া ন্যায্য মজুরি আদায় করিতে পারে না। এই কারণে তাহারা সংঘবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকসংঘ গঠন করে। ওয়েবস্-দম্পতি শ্রমিকসংঘের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কার্যের পূর্বস্থিত অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অথবা পূর্বস্থিত অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকগণের অবিচ্ছিন্ন সমিতিকে শ্রমিকসংঘ বলা হয়। ("A trade union is a continuous association of wage-

earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of employment.") ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকই মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। তাই তাহারা সমবেতভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং শ্রমিকসংঘের মূলনীতি হইল 'একতাই বল'। শ্রমিকসংঘের একজন কর্মকর্তা থাকেন এবং কর্মকর্তা শ্রমিকগণের মুখপাত্র হিসাবে মালিকের সহিত শ্রমিক-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করিয়া কার্যের শর্তাদি স্থির করেন। শ্রমিকসংঘ গঠন করিবার বিস্তারিত **উদ্দেশ্য** হইল: (ক) কোন নির্দিষ্ট শিল্প সর্বাধিক যে পরিমাণ মজুরি বহন করিতে পারে, শ্রমিকগণের জন্য সেই সর্বাধিক হারে মজুরি স্থির করা, (খ) শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবসর-যাপনের জন্য কার্যের সময়ের দীর্ঘতা হ্রাস করা, (গ) কার্যের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করা, (ঘ) মালিক যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ শ্রমিকের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে না পারে অথবা তাহার খুসীমত শ্রমিককে বরখাস্ত করিতে না পারে, শ্রমিকসংঘ সে বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকে ও (ঙ) কার্যের স্থায়িত্ব বলবৎ করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রমিকসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নপূর্বক যাহাতে তাহারা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত শ্রমিকসংঘ সাধারণতঃ তিন প্রকার কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, তাহারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্টা হয়। বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায়, অথবা আকস্মিক বিপদকালে যাহাতে তাহাদের অবস্থার অবনতি না ঘটে সেজন্য সমবেতভাবে তাহারা বিপন্ন শ্রমিককে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থা তাহাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও একাত্মবোধের পরিচায়ক। মালিকের সহিত সম্পর্কেও তাহারা সম্ভবমত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা তাহাদের কার্যের শর্তাদি আলোচনা করে। এইজন্য শ্রমিকসংঘের এই কার্যপ্রণালী কল্যাণমূলক কার্য (Ministrant functions) বলিয়া অভিহিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তখন তাহারা বিবদমান মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। মালিককে

তাহাদের শর্তে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিতে তাহারা কর্মে বিরতি বা ধর্মঘট করিতে বাধ্য হয়। এই কার্যকে বিবদমান কার্য (Militant functions) বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকসংঘ তাহাদের সমস্যাগুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। তাহারা রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। উদ্দেশ্য হইল যে, যদি তাহারা নির্বাচনে জয়ী হইতে পারে তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহারা শ্রমিক-সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের, রুশিয়ার সাম্যবাদী দলের অভ্যুত্থানের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে শ্রমিকসংঘের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রমিকসংঘের কার্যকারিতা—Utility of Trade Unions.

১। শ্রমিকসংঘ গঠিত হইলে শ্রমিকগণের প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২। শ্রমিকসংঘ গঠিত হইবার ফলে মালিকগণ এই সংঘের প্রতিনিধির মারফৎ শ্রমিকগণের অভাব-অভিযোগ, অসুবিধার কারণ ও তাহাদের ন্যূনতম দাবী জ্ঞাত হইয়া এ-সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন।

৩। শ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে শ্রমিকগণ অধিকতর আত্মসচেতন হইয়াছে। সংঘগুলি শ্রমিকগণের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসান ঘটাইতে শ্রমিকসংঘের অবদান উপেক্ষণীয় নহে।

৪। শ্রমিকগণের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত করিয়া শ্রমিকসংঘগুলি সদস্যবর্গের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে, শ্রমিকসংঘের কর্মতৎপরতার পরোক্ষভাবে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রমিকসংঘের অসুবিধা—Disadvantages of Trade Unions.

শ্রমিকসংঘ যখন সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদের

শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যধিক তৎপর হয়, তখন এই সংঘের কার্যগুলি সমর্থনযোগ্য নহে।

১। অনেক ক্ষেত্রে সংঘগুলির সমান মজুরির দাবীর ফলে দক্ষ শ্রমিকের মজুরি হ্রাস পাইয়াছে।

২। অনেক সময় এই সংঘগুলি উৎপাদন-ব্যবস্থায় নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করিতে বাধা দেয়। নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হইলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া কালে মজুরির হার কমিতে পারে এই আশংকায় সংঘগুলি উন্নত-ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগের বিরোধিতা করিয়া উৎপাদন-খরচা হ্রাসের সম্ভাবনা রুদ্ধ করে। ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। সংঘগুলি অনেক সময়ে বলপূর্বক অথবা কৃত্রিম উপায়ে শ্রমিকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া উৎপাদন ব্যাহত করে। ফলে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং পরোক্ষভাবে শ্রমিকের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়।

৪। শ্রমিকসংঘ অনেক সময় অত্যধিক উচ্চহারে মজুরি দাবী করে। ইহার ফলে শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া উৎপাদন ব্যাহত করে।

মজুরির উপর শ্রমিকসংঘের প্রভাব—Influence of Trade Union on Wage.

শ্রমিকসংঘের কর্মতৎপরতা প্রধানতঃ মজুরি-বৃদ্ধি ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে। পূর্বে শ্রমিক-নেতাগণের ধারণা ছিল যে, শ্রমিকসংঘের কর্মতৎপরতা দ্বারা শ্রমিকগণের প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু অপর পক্ষে বলা হয় যে, যদি কৃত্রিম উপায়ে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মালিকগণের মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ ব্যাহত হয়। পুঁজির অভাবে শিল্প-ব্যবসায় প্রসারলাভ দূরের কথা, এইগুলি সংকুচিত হয়। ফলে, মজুরি হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শ্রমিকসংঘ কৃত্রিম উপায়ে স্থায়িভাবে মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে না।

উপরি-উক্ত আলোচনা সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, শ্রমিকসংঘগুলি তাহাদের কর্মতৎপরতার দ্বারা তিন প্রকারে মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে। মজুরি যদি শ্রমিকের প্রান্তিক দান অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকসংঘগুলি

(ক) শ্রমিকের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মালিককে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সমপরিমাণ মজুরি দিতে বাধ্য করিতে পারে। (খ) শ্রমিকসংঘগুলি শ্রমিকের মধ্যে সততা, কর্তব্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাহার মজুরিও বৃদ্ধি পায়। (গ) এতদ্ব্যতীত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রমিকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শ্রমিকসংঘগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ কোন শ্রেণীর মজুরি বৃদ্ধি করিতে পাবে। (ঘ) শ্রমিকের মজুরি যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ হয়, তাহা হইলে মজুরি বেশী হইতে পারে। কারণ মজুরি একটু বাড়িলে উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্য হয় না। সুতরাং মালিক শ্রমিকদের সহিত বিরোধ এড়াইবার জন্য কিছু মজুরি বেশী দিতে পারে।

ধর্মঘট করিবার অধিকার—Right to strike.

মালিকগণের সহিত শ্রমিকগণের প্রতিযোগিতা করিবার একমাত্র অস্ত্র হইল কর্মবিরতি। কর্মবিরতির দ্বারা শ্রমিকগণ উৎপাদন ব্যাহত করিয়া মালিকগণকে তাহাদের শর্ত স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। পক্ষান্তরে মালিকগণও তাহাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া শ্রমিকগণকে কর্মচ্যুত করিতে পারে। কাজে অধিকতর সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকগণ যখন সংঘবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ করে এবং প্রার্থিত এই অধিকতর সুবিধা না পাইলে কাজে পুনরায় যোগদান করে না, তখন এই কর্মবিরতিকে শ্রমিকের ধর্মঘট বলা হয়। শ্রমিকদের দিক দিয়া কর্মবিরতি অথবা মালিকের দিক দিয়া কাজ বন্ধ—এই উভয় পদ্ধতিই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এখন প্রশ্ন হইল যে, শ্রমিকের কর্মে বিরতি দিবার আইনসম্মত ও ন্যায়সম্মত কোন অধিকার আছে কি না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, প্রত্যেক শ্রমিকেরই একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় কাজ করিবার বা না-করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। শ্রমিক যদি মনে করে যে, তাহার কার্যের পরিবেশ দুঃসহ এবং মালিক যদি শ্রমিকের ন্যায়সংগত দাবীপূরণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মে বিরতি দিবার অধিকার মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বে-সরকারী

কাজে এই অধিকার সাধারণতঃ স্বীকৃত হইলেও কতিপয় ক্ষেত্রে শ্রমিকের কর্মে বিরতি দিবার এই অবাধ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। পরিবহন, জল, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে শ্রমিকগণ যদি এই অবাধ অধিকার প্রয়োগ করে তাহা হইলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে কর্মবিরতির অধিকার বিনা শর্তে গ্রহণ করা যায় না। তবে এ কথাও সত্য যে, জনসাধারণের জনমত সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকগণের ন্যায্য অধিকার যাহাতে মালিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। সমষ্টির স্বার্থ সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান পায়, কিন্তু যেখানে দুর্বল ব্যক্তি সবল কর্তৃক অত্যাচারিত ও শোষিত হয়, সেখানে দুর্বলকে রক্ষা করাই হইল সমষ্টির কর্তব্য। বলপূর্বক শ্রমিকগণকে ধর্মঘট হইতে বিরত করিলে তাহার দ্বারা স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। ধর্মঘট নিরোধ করিবার একমাত্র উপায় হইল শ্রমিকের ন্যায়সংগত দাবী পূরণ করা।

শিল্পে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা—Agencies for industrial peace.

শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই বিরোধের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়া জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং সার্বজনীন স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই যাহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ আদৌ না ঘটে, সেইজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই ব্যবস্থাগুলি এরূপ হওয়া উচিত যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ অংকুরেই বিনষ্ট হয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ যাহাতে আদৌ না ঘটে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইয়াছে।

১। কর্মী-সমিতি—Works Committee.

এই সমিতিগুলি সর্বপ্রথমে ইংলণ্ডে গঠিত হয়। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকশ্রেণীর সমসংখ্যক সদস্য লইয়া এই সমিতিগুলি গঠিত হয় এবং ইহারাই সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধের মীমাংসা করে।

২। মূল্যের অনুপাতে মজুরির অনুপাত নির্ধারণ—Sliding Scale.

এই ব্যবস্থানুসারে দ্রব্যমূল্য, জীবনযাত্রার খরচ অথবা মুনাফার পরিমাণ পরিবর্তনের সহিত মজুরিরও পরিবর্তন করা হয়। প্রথমে দ্রব্যমূল্যের একটা প্রাথমিক স্তরের সহিত মজুরি গ্রথিত হয় অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যখন একটা নির্ধারিত

মানে থাকে তখন সেই মূল্যমানের দ্বারা শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ স্থির করা হয়। দ্রব্যমূল্যের নির্ধারিত মান অপেক্ষা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে মজুরির পরিমাণও একটি নির্দিষ্ট হারে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। তবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলেও মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া পূর্বনির্ধারিত একটি সর্বনিম্ন সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতির জন্য, অথবা পরিবহন-খরচা বা উৎপাদন-ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ার ফলে মূল্য হ্রাস হইলে যদি এই মূল্যহ্রাসের ভিত্তিতে মজুরির পরিমাণ হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় ও মালিক লাভবান হয়। এইজন্য উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত নির্ধারিত মূল্যমানের সহিত সম্পর্কিত মজুরির হার পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। জীবনযাত্রার খরচের ভিত্তিতে নির্ধারিত মজুরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সূচক সংখ্যার (Index number) অসম্পূর্ণতার জন্য জীবনযাত্রা-খরচ পরিবর্তনের নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই ভিত্তিতে মজুরি-নির্ধারিত হইলে শ্রমিকগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

৩। মুনাফা-ভাগ—Profit-sharing.

এই ব্যবস্থানুসারে শ্রমিকগণ মুনাফার একটি অংশ পাইয়া থাকে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমগ্র আয় হইতে উৎপাদন-খরচা বাদ দিয়া যে নীট্ আয় হয় সাধারণতঃ সেই আয় আধাআধিভাবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বণ্টিত হয়। অনেক সময় আবার এই লভ্যাংশ শ্রমিককে সরাসরিভাবে না দিয়া শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। ইহার ফলে শ্রমিকগণও শিল্পের অংশীদার হন।

মুনাফা-ভাগের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, শিল্পব্যবস্থাপনায় মুনাফা হইলেই মুনাফা-ভাগের প্রশ্ন ওঠে। যে সমস্ত শিল্পে মুনাফা হয় না বা হিসাবপত্র কৌশলে এরূপ-ভাবে প্রস্তুত হয় যাহাতে মুনাফা থাকে না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ এই ব্যবস্থার দ্বারা লাভবান হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, শ্রমিকগণ যদি মুনাফার ভাগের অধিকারী হয় তাহা হইলে শিল্পে মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হইলে এই লোকসানের ভাগও তাহাদের বহন করা উচিত। পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রমিক বা মালিকের কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি ব্যতীতও চাহিদা-বৃদ্ধি বা অন্য কারণে মুনাফা বৃদ্ধি হইতে পারে।

শিল্প-বিরোধের মীমাংসা—Settlement of Industrial disputes.

শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান করা সম্ভব নয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া বিরোধের মীমাংসা করা হয়।

১। আপোষ—Conciliation.

এই পদ্ধতি অনুসারে বিবদমান দুইটি পক্ষ সম্মিলিতভাবে তাহাদের বিরোধ সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করিবার প্রয়াস পায়। বিরোধ আরম্ভ হইলে অবশ্য এইরূপ আলাপ-আলোচনা সম্ভব না হইতে পারে, তজ্জন্য বিরোধ ঘটিবার পূর্বে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য স্থায়ী আপোষ-সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে এবং বিরোধ ঘটিলেই স্থায়ী আপোষ-সমিতি বিরোধের মীমাংসা করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিল্প-বিরোধ আইনের বলে ভারত সরকারের উপর এইরূপ আপোষ-সমিতি গঠন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

২। সালিশী—Arbitration.

অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ অবসানের চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থায় বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি সালিশী বিচারালয় গঠিত হয় এবং এই বিচারালয় বিরোধের মীমাংসা করে। এই ব্যবস্থা ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক হইতে পারে। ইংলণ্ডে সালিশী দ্বারা বিরোধের মীমাংসা করা ঐচ্ছিক ব্যাপার, অপরপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ায় ইহা বাধ্যতামূসকভাবে প্রযুক্ত হয়। যেখানে সালিশী বাধ্যতামূলক নহে সেখানে সালিশী বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কোনপক্ষের মনঃপূত না হইলে উপেক্ষিত হইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

মজুরি—

স্বাধীনভাবে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া কায়িক বা

মানসিক শ্রমদ্বারা উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য যে প্রতিদান পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ মজুরি বলা হয়। কাজের মাপে অথবা সময়ের মাপে মজুরি দেওয়া হইতে পারে।

অর্থমজুরি ও প্রকৃতমজুরি—

কাজের প্রতিদান হিসাবে শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহাকে অর্থমজুরি বলা হয়। অর্থমজুরি ব্যতীতও শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে অন্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধাগুলি পায় তাহাকে প্রকৃতমজুরি বলা হয়। প্রকৃতমজুরির পরিমাণ শুধু অর্থদ্বারা পরিমাপ করা যায় না। প্রকৃতমজুরির পরিমাণ অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথা, দ্রব্যমূল্য, কাজের সুবিধা-অসুবিধা, বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা, কাজের স্থায়িত্ব ইত্যাদি। প্রকৃতমজুরির পরিমাণ-দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক মান পরিমাপ করা যায়।

মজুরি নির্ধারণ-তত্ত্ব—

মজুরি নির্ধারণ-তত্ত্ব সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত ছিল। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণতত্ত্বের চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া মজুরি নির্ধারণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। চাহিদার দিক দিয়া উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক দান ও যোগানের দিক দিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার খরচার দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের এরূপ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে সেজন্য চাহিদা ও যোগানের সূত্রটির একটু পরিবর্তন সাধন করিয়া মজুরি নির্ধারণে প্রয়োগ করিতে হয়।

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি—

শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ তাহার জীবনযাত্রার মান দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমতঃ, জীবনযাত্রার মান যদি উচ্চ হয়, তাহা হইলে শ্রমিক ঐ মানের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাইলে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক দান অধিক হয়। ফলে, মজুরি বৃদ্ধি হয়। তৃতীয়তঃ, জীবনযাত্রার উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি না পাইলে শ্রমিক বিবাহ দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি করিতে

পারে না। ফলে, শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ভবিষ্যতে মজুরি বৃদ্ধি করে।

অপরপক্ষে জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইয়া মজুরির পরিমাণ হ্রাস পায়।

মজুরির পার্থক্যের কারণ—

কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও প্রতিযোগিতার অভাবই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান কারণ। সকলে সমান কর্মদক্ষ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য দেখা যায়ঃ ১। বৃত্তিগুলি সমান রুচিকর নহে, ২। বৃত্তিগুলির ঝুঁকি ও দায়িত্বের পার্থক্য, ৩। কার্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব বা স্বল্পস্থায়িত্ব, ৪। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়, ৫। ভবিষ্যৎ উন্নতির বা অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা।

স্ত্রীলোকের অপেক্ষাকৃত কম মজুরির কারণ—

(১) স্ত্রীলোকের নিয়োগক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং এইজন্য প্রতিযোগিতার তীব্রতা। (২) নিম্নতর জীবনযাত্রার মান এবং পুরুষের ন্যায় পোষ্যের অভাব। (৩) ইহারা সাধারণতঃ স্থায়ী শ্রমিক নহে এবং ইহাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য কোন সংঘ নাই।

শ্রমিকসংঘ—

মালিকের তুলনায় শ্রমিকের এককভাবে প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য স্বল্প। শ্রমিকগণ মালিকগণের নিকট হইতে তাহাদের বৃত্তি-সম্পর্কিত নানা সুখ-সুবিধা পাইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে। এইজন্য তাহারা শ্রমিকসংঘ গঠন করিয়া যুক্তভাবে দর কষাকষি করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের অবসান না ঘটিলে তাহারা উগ্র মনোভাবাপন্ন হইয়া কর্মে বিরতি দেয়। কর্মবিরতি দ্বারা তাহারা মালিককে তাহাদের শর্তপূরণ করিতে বাধ্য করে। অনেক সময় শ্রমিকসংঘ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়ী হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তাহাদের দাবী পূরণ করে।

শ্রমিকসংঘ তাহাদের উগ্র কর্মতৎপরতার দ্বারা অর্থাৎ ধর্মঘট করিয়া সাময়িকভাবে মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু এই মজুরি-বৃদ্ধি স্থায়ী হইতে

পারে না। শ্রমিকগণ তাহাদের সংঘের মাধ্যমে তাহাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনে যদি তাহাদের প্রান্তিক দান বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহারা ন্যায্য মজুরি পাইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রান্তিক দান অপেক্ষা মজুরি অধিক হইতে পারে না।

শিল্প-বিরোধের মীমাংসা—

শিল্পব্যবস্থায় যাহাতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ না ঘটে তজ্জন্য কর্মি-সমিতি, মুনাফা-ভাগ, মূল্যের অনুপাতে মজুরির পরিমাণ পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিরোধ ঘটিলে বিরোধের মীমাংসার জন্য আপোষ সমিতি বা সালিশী ব্যবস্থার সাহায্যে বিরোধের মীমাংসা করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. How are wages determined? What relation, if any, do they have to the standard of life of the worker? (C. U. 1940)

2. Indicate the forces that set higher and lower limits to wages. (C. U. 1942)

3. Show how wages are determined by the demand for and the supply of labour. (C. U. 1947)

4. Examine the marginal productivity theory of wages. (C. U. 1956)

5. How do you account for the fact that labourers in different occupations earn strikingly different rates of wages?

6. Distinguish between real and nominal wages. What factors would you take into consideration in determining real wage? (Allahabad, 1942)

7. Explain what is meant by the economy of high wages.

Point out the limits to the bargaining power of Trade Union to raise wage permanently. (C. U. 1958)

8. Can you suggest a method by which society can avoid the persent conflict between labour and capital ?

(C. U. 1949)

9. .Is it possible for trade unions to raise wages without lowering profits or raising prices to the consumers ? State your reasons.

10. Examine the extent of and limits to the bargaining power of Trade Unions to raise Wages.

(C. U. B. Com. 1957)

11. Contrast the different purposes for which producers and labourers combine. (C. U. 1950)

12. Under what conditions are the Trade Unions able to raise wage rate in a particular industry ?

(C. U. B. Com. 1961)

13. Explain the factors which account for differences in wages (a) between different occupations and (b) between men and women in the same occupation (C. U. 1962)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

সুদের সংজ্ঞা—Definition of Interest.

উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধন ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে সুদ বলা হয়। সুদকে মূলধনের ব্যবহার-মূল্য বলিলে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ মূলধন বলিলে যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক দ্রব্য বুঝায়, কিন্তু এই সমস্ত সহায়ক দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ ভাড়া সর্বত্র সমান নহে। সুতরাং সুদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে টাকাকড়ি অর্থে-ই মূলধন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মূলধন অন্যান্য উপাদানগুলির মতই উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, সেইজন্য জাতীয় বিভাজ্য আয়ের একটা অংশ মূলধনের প্রাপ্য এবং মূলধনের এই প্রাপ্য অংশকে সুদ বলা হয়।

মোট ও নীট্ সুদ—Gross and Net interest.

ঋণদান সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধুমাত্র ঋণের পরিমাণের জন্য ঋণদাতাকে যে প্রতিদান দেওয়া হয়, তাহাকে নীট্ সুদ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেনাদার পাওনাদারকে ধার-করা অর্থের জন্য যে পরিমাণ প্রতিদান দেয়, তাহাকে মোট সুদ বলা হয়। মোট সুদ নীট্ সুদ অপেক্ষা অধিক। কারণ মোট সুদ নীট্ সুদ ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদান লইয়া গঠিত হয়। নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া মোট সুদ গঠিত হয়।

১। উৎপাদন-কার্যে ব্যবহারের জন্য মূলধনের মূল্য অর্থাৎ নীট্ সুদ।

২। ঋণের ঝুঁকি—ঋণগৃহীতার ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা ও বন্ধকের মূল্যের ভিত্তিতে ঋণের ঝুঁকি স্থির হয়। যে ক্ষেত্রে ঋণের ঝুঁকি বেশী, সেখানে ঝুঁকির জন্য অতিরিক্ত সুদ দিতে হয়।

৩। ঋণ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত কাজ—যে সমস্ত স্থলে ধার দেওয়া টাকা-পয়সা আদায় করিতে বেগ পাইতে হয় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়,

সেখানেও এই অতিরিক্ত অসুবিধা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়।

সুদের হারের পার্থক্যের কারণ—Causes of the variation in interest rates.

সুদের হার সর্বত্র সমান নহে। আবার, একই স্থলে হয়ত বিভিন্ন জাতীয় ঋণদাতাকে বিভিন্ন হারে সুদ আদায় করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি? নীট্ সুদ সাধারণতঃ সর্বত্রই প্রায় সমান হয়, কিন্তু মোট সুদের পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। টাকা-পয়সার চাহিদার তীব্রতা সর্বত্র সমান নহে বা ঋণ পাওয়ার সুবিধারও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য একই স্থলে হয়ত বিভিন্ন ধরণের ধারের ব্যবস্থা দেখা যায়, যথা, কৃষি-ঋণ, শিল্প-ঋণ, ভোগ অথবা অপব্যয়ের জন্য ঋণ। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প-মেয়াদের জন্য ঋণ করা হয়, আবার কোথাও বা দীর্ঘ-মেয়াদের জন্য ঋণ করা হয়। শ্রমের ন্যায় মূলধনেরও গতিশীলতা কম। অনেক সময় সেই কারণে দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সুদের হারের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

টাকা ধার দিলে ঋণদাতাকে তাহার হিসাব রাখিতে হয়। সময়মত তাগিদ দিয়া টাকা আদায় করিতে হয়। অনেক সময় টাকা আদায় করিবার জন্য বিচারালয়ের সাহায্য লইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত আসল টাকা আদায় নাও হইতে পারে। নিযুক্ত টাকার নিরাপত্তার অভাব এবং ঝুঁকির পরিমাণ যত বেশী হয়, সুদের হারও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের সুদ অপেক্ষা কাবুলিওয়ালা বা গ্রাম্য মহাজনের সুদের হার উপরি-উক্ত কারণে বেশী হয়। দেনাদারের ঋণ শোধ করিবার সামর্থ্যের পার্থক্যের জন্যও সুদের হারের পার্থক্য হয়। কোন ব্যবসায়ীর যদি বাজারে সুনাম থাকে তাহা হইলে সে বিনা বন্ধকে, কম সুদে টাকা পাইতে পারে। ভারত সরকার ধার চাইলেই কম সুদে ধার পায়, তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা ও ঋণ শোধ করিবার সংগতি। কিন্তু গ্রাম্য কৃষক চড়া সুদ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও ধার পায় না, কারণ তাহার সংগতি নামমাত্র এবং প্রাকৃতিক অবস্থার উপরই তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য নির্ভর

করে, সুতরাং এ জাতীয় ধারের ঝুঁকি অত্যধিক বলিয়া কৃষকের অতি উচ্চ হারে সুদ দিতে হয় এবং এই সুদই হইল মোট সুদ।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুদের হারের পার্থক্যের কারণ হইল মূলধনের গতিশীলতার অভাব। সাধারণতঃ ঋণদাতৃগণের বিদেশী বাজার সম্পর্কে জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অথবা অন্য কোন কারণে বিদেশী সরকার ঋণ শোধ না করিবার আইন পাস করিতে পারে। এই অনিশ্চয়তার জন্যই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুদের পার্থক্য দেখা যায়।

সুদের হার-নির্ধারণ তত্ত্বসমূহ—Theories of Interest.

১। শোষণ সূত্র—The exploitation theory.

কার্ল মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের ভিত্তিতে এই মতবাদ গঠিত হইয়াছে। মার্কসের মতে শ্রমই হইল মূল্যের একমাত্র কারণ, সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য সমগ্রভাবে শ্রমিকের প্রাপ্য। পুঁজিপতিগণ শ্রমিকের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুঁজির প্রাপ্য হিসাবে সুদ আদায় করেন, সুতরাং মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। মূল্য নির্ধারণ-তত্ত্বে এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে।

২। ভোগবিরতি সূত্র—The abstinence theory.

এই সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, মূলধনের মালিক বর্তমানে তাহার মূলধন ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় না করিয়া যে সংযমের পরিচয় দেন, সেই সংযমের মূল্যই হইল সুদ। বর্তমানে ভোগ-ব্যবহার না করিবার তাৎপর্য হইল ত্যাগ স্বীকার করা। ভবিষ্যতে যদি বর্তমান এই ত্যাগ স্বীকার করিবার জন্য মূল্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকে বর্তমান ভোগ-ব্যবহারে বিরত হইবে না। ফলে মূলধন সঞ্চিত হইবে না।

এই সূত্রের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, পুঁজিপতিগণ বর্তমানে ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত পুঁজি রাখিতে পারেন, পুঁজির অধিকাংশ পরিমাণই তাঁহারা যোগান দেন। সুতরাং এই সমস্ত ধনীর পক্ষে ভোগবিরতির দ্বারা ত্যাগ-স্বীকারের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই সূত্র পুঁজির চাহিদা সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারে না।

৩। পুঁজির দান সূত্র—The productivity theory.

এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, যেহেতু মূলধন উৎপাদনের একটি অপরিহার্য সহায়ক, সেইহেতু এই সহায়ক সামগ্রীর মূল্য হিসাবে সুদ দিতে হয় এবং এই সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক দান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন-ক্ষমতার জন্যই মূলধনের চাহিদা হয় এবং উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারাই সুদের হার স্থিরীকৃত হয়। মূলধনের বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন সূত্র অনুযায়ী সুদের হার হ্রাস পায়, অপরপক্ষে বিনিয়োগ-পরিমাণ হ্রাস পাইলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক দানের সমান হয়। এই সূত্রটির ত্রুটি হইল যে, ইহা মূলধনের চাহিদার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু মূলধনের যোগান-মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

৪। অস্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সূত্র—The Austrian or the agio theory.

এই সূত্রটি অস্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানী বম্ বয়ার্ক ও তাঁহার অনুগামিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রাপ্য দ্রব্য অপেক্ষা বর্তমানে তাহার আয়ত্তাধীন দ্রব্যকে অধিকতর মূল্যবান মনে করে। এইজন্য ভবিষ্যতে ১০৫৲ টাকা পাইবার আশা না থাকিলে সে বর্তমানে তাহার সঞ্চিত ১০০৲ টাকা হস্তান্তরিত করিতে রাজী হয় না। ভবিষ্যতে প্রাপ্য ৫৲ টাকাই হইল তাহার বর্তমান ১০০৲ টাকা হাত ছাড়া করিবার মূল্য। এই মূল্যকেই সুদ বলা হয়।

এই সূত্রটি মূলধনের যোগান-মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মূলধনের প্রান্তিক যোগানদার তাহার বর্তমান ভোগবিরতির জন্য কি পরিমাণ মূল্য চায় তাহা ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সুদের উপর মূলধনের চাহিদার কি পরিমাণ প্রভাব তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। তবে এই সূত্রটির সহিত পুঁজির দান সূত্রটির সমন্বয়সাধন করিলে সুদ নির্ধারণ-তত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

৫। সুদনির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের সূত্র—The Demand and Supply theory.

অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় মূলধনের ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ সুদ ও মূলধনের

চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে স্থিরীকৃত হয়। মূলধনের চাহিদার কারণ হইল ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা। আবার, অনেক সময় ভোগ-ব্যবহার বা যুদ্ধ প্রভৃতি অনুৎপাদক কার্যের জন্যও মূলধনের চাহিদা হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদক অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি ক্রমাগত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে এরূপ একটি অবস্থা উপস্থিত হইবে যখন অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া আর সমানুপাতিক হারে অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হয় না। যে অবস্থায় সমগ্র উৎপাদন পরিমাণে মূলধনের দান মূলধনকে দেয় মূল্যের সমান হয়, সেই অবস্থায় মূলধনের বিনিয়োগ স্থগিত রাখিতে হইবে অর্থাৎ শেষ অতিরিক্ত মাত্রা মূলধন বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ যে হারে বর্ধিত হয়, এই শেষ মাত্রা মূলধনের মূল্যও বর্ধিত উৎপাদন-মাত্রার মূল্যের সমান হইবে ও উৎপাদনে প্রযুক্ত মূলধনের পূর্ববর্তী মাত্রাগুলির মূল্যও এই শেষ মাত্রার দানের মূল্যের সমান হইবে। সুতরাং চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনের ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ সুদ মূলধনের প্রান্তিক দানের পরিমাণ (Marginal productivity) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

যোগানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, যে পরিমাণ মূলধনের চাহিদা বর্তমান, সে পরিমাণ মূলধন অনায়াসপ্রাপ্য নহে। বহুলোকে সুদ না পাইলেও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বা পারিবারিক কারণে একটা মূল্য দিয়াও মূলধন সঞ্চয় করিবে। কিন্তু এই জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারা সমগ্র চাহিদা পূরণ করা যায় না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ যাহাতে সঞ্চয় করিতে আকৃষ্ট হন সেজন্য তাঁহাদিগকে একটা মূল্য প্রদান করিয়া সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ করা প্রয়োজন হয়। সমগ্র চাহিদা পূরণ করিবার জন্য সঞ্চয়ে কম আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যে সুদ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহাই হইল মূলধনের যোগান-মূল্য। এই যোগান-মূল্য না দিলে চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্য অসম্ভব। সুতরাং যোগানের দিকে প্রান্তিক ভোগ-নিবৃত্তির (Marginal forbearance) দ্বারা মূলধনের মূল্য অর্থাৎ সুদ নির্ধারিত হয়।

সুদের হার চাহিদা ও যোগানের প্রভাবে সেই বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, যেখানে চাহিদার ও যোগানের পরিমাণ সমতা প্রাপ্ত হয়। একটি নির্দিষ্ট

অবস্থায় যে হারে স্থদ হইলে একটি নির্দিষ্ট বাজারে মূলধনের সমগ্র চাহিদার সহিত সমগ্র যোগানের একটা সামঞ্জস্য হয়, সেই হারকেই সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ের নির্ধারিত স্থদের হার বলা হয়। এই হার একদিকে যেরূপ মূলধনের প্রান্তিক দানের পরিমাপক, অপর দিকে সেইরূপ মূলধনের প্রান্তিক ভোগ-নিবৃত্তির পরিমাপক।

৬। স্থদনির্ধারণে ঋণদানযোগ্য তহবিল তত্ত্ব—**Loanable Fund theory of Interest.**

আধুনিক বহু ধনবিজ্ঞানীর মতে স্থদ হইল ঋণদানযোগ্য মূলধনের মূল্য এবং এই মূল্য অর্থাৎ স্থদ ঋণদানযোগ্য মূলধনের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে স্থির হয়।

ঋণদানযোগ্য মূলধনের চাহিদা পরিমাণ ঐ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উৎপাদনে অতিরিক্ত পরিমাণ ঋণদানযোগ্য মূলধন নিয়োগ করিলে যে অতিরিক্ত আয় হয়, স্থদের হার তাহার বেশী হইতে পারে না। স্থতরাং চাহিদার দিক দিয়া স্থদের হার ও ঋণদানযোগ্য মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণ সমান হয়।

ঋণদানযোগ্য মূলধন পরিমাণের যোগান নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে: ১। মোট সঞ্চয় পরিমাণ, ২। ব্যাংক-প্রদত্ত অতিরিক্ত ঋণ, ৩। সঞ্চিত টাকা যাহা বর্তমানে ধার দেওয়া হইতেছে ও ৪। বিনিয়োগ উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থের সেই অংশ যাহা বর্তমানে ধারে নিযুক্ত করা হইতেছে।

স্থদের হার বেশী হইলে মোট যোগান পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর স্থদের হার কম হইলে যোগান পরিমাণ হ্রাস পায়। অপরপক্ষে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের চাহিদা কমে, আর স্থদের হার কমিলে চাহিদা বাড়ে। এইরূপে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যে হারে মূলধনের চাহিদা পরিমাণ যোগান পরিমাণের সমান হয়, সেই হারকেই স্থিতাবস্থার স্থদের হার বলা হয়।

ঋণদানযোগ্য তহবিল তত্ত্বটির স্বপক্ষে বলা যায় যে, এই তত্ত্বটি মূলধনের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল যে, ঋণদানযোগ্য তহবিলের চাহিদা যাহারা

ধার করে তাহাদের আয়ের উপর নির্ভর করে, কারণ, সঞ্চয় পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আয়ের পরিমাণ জানা না থাকিলে ঋণদানযোগ্য মূলধনের চাহিদা বা যোগান কি পরিমাণ হইবে তাহা জানা যায় না। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুসারে নির্ধারিত সুদের হারকে খাটি সুদ বলা যায় না।

সুদ সম্পর্কে কেইন্‌স্ প্রদত্ত নূতন ব্যাখ্যা প্রদানের ফলে উপরি-উক্ত মতবাদ আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেইন্‌স্ বলেন, সঞ্চয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। কারণ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যদি সুদের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে আগ্রহশীল হন তাহা হইলে ইহার ফলে সমগ্র সমাজের ব্যয়ের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে। যদি সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে সমাজের সমগ্র আয়ের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সমগ্র সঞ্চয়ের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কেইন্‌সের মত অনুসারে সঞ্চয়ের পরিমাণের সহিত সুদের হারের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানতঃ দেশের সমগ্র আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপরপক্ষে এই আয়ের পরিমাণ বিনিয়োগ-পরিমাণ (Volume of investment) এবং ভোগ-ব্যবহারের ব্যয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

৭। সুদ সম্পর্কে কেইন্‌সের মত—The Liquidity Preference theory.

কেইন্‌স্ বলেন সুদ হইল একটি টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত ব্যাপার, ইহার সহিত সঞ্চয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। টাকা-পয়সা ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ সুদ প্রদত্ত হয় এবং টাকা-পয়সার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারাই সুদ নির্ধারিত হয়।

সুদ সম্পর্কে কেইন্‌স্ প্রদত্ত ব্যাখ্যার মূল কথা হইল মানুষের নগদ টাকার প্রতি অধিকতর আসক্তি (Liquidity preference)। টাকা-পয়সার চাহিদার মূলে রহিয়াছে নগদ টাকার প্রতি এই অত্যধিক আসক্তি। কারণ নগদ টাকা যে-কোন উদ্দেশ্যে যে-কোন সময়ে ব্যয় করিয়া মানুষ তাহার বাঞ্ছিত সামগ্রী

ভোগ করিতে পারে। এইজন্যই মানুষ তাহার আয় নগদ অর্থে অথবা চাহিবামাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষেত্রে ব্যাংকে মজুত রাখে। কেইন্‌সের মতে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য লোকে নগদ টাকা অধিকতর পছন্দ করে।

লোকে সাধারণতঃ সপ্তাহে বা মাসে একবার আয় করে। কিন্তু সমস্ত সপ্তাহব্যাপী অথবা মাসব্যাপী প্রতিদিনই তাহাকে নানাভাবে ব্যয় করিতে হয়। আয় করিবার একটা নির্ধারিত সময় আছে, কিন্তু ব্যয়ের কোন নির্ধারিত সময় নাই। ইহা দুইবার আয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত সময়ব্যাপী চলিতে থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যয়ের এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সদাসর্বদাই লোকের ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, এইজন্যই লোকে নগদ টাকা হাতে রাখিতে পছন্দ করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন অদৃষ্টপূর্ব কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশংকায়ও লোকে নগদ টাকা হাতে রাখে। নগদ টাকা হাতে না থাকিলে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য ও বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত উঠা-নামা করে। লোকে সস্তায় ক্রয় ও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জনের আশায়ও অনেক সময় নগদ টাকা মজুত রাখে। সুতরাং ভবিষ্যতে লাভ করিবার উদ্দেশ্যেও লোকে বর্তমানে নগদ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত কারণে নগদ টাকার প্রতি মানুষের যে আসক্তি তাহা সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা সাধারণতঃ প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে অথবা হ্রাস পাইলে লোকের প্রথম দুই শ্রেণীর নগদ টাকার প্রতি আসক্তির বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু লোকে ভবিষ্যতে মুনাফা অর্জনের জন্য যে নগদ অর্থ মজুত রাখে, তাহা সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ধার দেওয়ার অর্থ হইল নগদ টাকা রাখিবার সুবিধা সমর্পণ করা। ধার দিলে নগদ টাকা হইতে প্রাপ্য সুবিধাগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই কারণে লোকে নগদ টাকার সুবিধা সমর্পণের জন্য একটা মূল্য দাবী করে। একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য নগদ টাকা অপরকে দিবার বাবদ যে মূল্য পাওয়া যায় তাহাই হইল সুদ।

নগদ টাকার চাহিদা কিন্তু একেবারে স্থায়ী নয়। সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে লোকে হাতে কম পরিমাণ নগদ টাকা রাখিয়া অধিকাংশই বিনিয়োগ করিবে। অপরপক্ষে সুদের হার হ্রাস পাইলে তাহারা নগদ টাকা বিনিয়োগ করিবে না এবং নিযুক্ত টাকা নগদ টাকায় পরিবর্তিত করিয়া নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

টাকার যোগানের পরিমাণ দেশের অর্থ সম্বন্ধীয় নীতি ও ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থ-কর্তৃপক্ষ ও ব্যাংক-গুলি সুদের হার নির্ধারণ করিতে পারে। সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে যদি টাকার যোগানের পরিমাণ টাকার চাহিদার সমান হয় তাহা হইলে সুদের এই হারকে স্থিতিশীল হার বলা হয়। কিন্তু টাকার যোগান যদি চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বা কম হয় তাহা হইলে সুদের হারেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কেইন্‌সের মতে নিম্নলিখিত দুইটি কারণের সমন্বয়ে সুদের হার নির্ধারিত হয়: ১। দেশের অর্থসম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষ ও ব্যাংকগুলি কর্তৃক অর্থের যোগান পরিমাণ এবং ২। বিভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া লোকের নগদ টাকার প্রতি আসক্তি।

কেইন্‌স্ প্রদত্ত সুদতত্ত্বের নিম্নলিখিত সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কি অর্থে কেইন্‌স্ টাকা-পয়সা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা-পয়সাও কি ইহার অন্তর্ভুক্ত? দ্বিতীয়তঃ, কেইন্‌সের মতে মূলধনের প্রান্তিক দানের সূত্র অসার এবং সুদ-নির্ধারণে প্রযোজ্য নহে। তাঁহার মতে সুদের প্রচলিত হারও ব্যবস্থাপকের কর্মতৎপরতার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপকের কর্মতৎপরতা প্রকৃতপক্ষে মূলধনের প্রান্তিক দান-নিরপেক্ষ নহে অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক দানের পরিপ্রেক্ষিতেই উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রান্তিক দানের সংজ্ঞা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

সুদের হারের পরিবর্তনের কারণ—Causes of changes in the rate of interest.

চাহিদা ও যোগানের সূত্র দ্বারা সুদের হারের পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা যায়, আবার কেইন্‌স্ প্রদত্ত সূত্রের দ্বারাও এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়।

পূর্বতন মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, দীর্ঘমেয়াদে সুদের হার পরিবর্তিত হয় প্রধানতঃ দুইটি কারণে: ১। যদি মূলধনের প্রান্তিক দান পরিমাণের পরিবর্তন হয় কিংবা ২। যদি মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায়। মূলধনের প্রান্তিক দান উৎপাদনে প্রযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ব্যতীতও উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও উৎপাদনের কলাকৌশল-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। নূতন নূতন আবিষ্কার ও নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে সাধারণতঃ মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার ফলে অধিক মূলধন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় অর্থাৎ স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত সময়ের অগ্রগতিতে দেশেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মূলধনের যোগান অধিক হয়। ফলে সুদের হার নিম্নাভিমুখী হয়।

যোগানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে লোকের দূরদৃষ্টি, মিতব্যয়িতার অভ্যাস, সঞ্চয়ের সুযোগ প্রভৃতি অবস্থার উপর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে। এই অবস্থাগুলির পরিবর্তনের সহিত সুদের হারেরও পরিবর্তন হয়।

স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়।

কেইন্‌সের মতে সুদের হার নির্ভর করে (ক) লোকের নগদ অর্থের প্রতি অধিকতর আসক্তি এবং (খ) টাকা-পয়সার পরিমাণের উপর। মানুষের নগদ টাকার প্রতি এই আসক্তি ও টাকা-পয়সার পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেই সুদের হারেরও পরিবর্তন ঘটে।

সুদের হার হ্রাস পাইয়া কি একেবারেই বিলীন হইতে পারে?—Can the rate of interest fall to Zero?

সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ভবিষ্যৎকালে সুদের হার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, হ্রাস পাইয়া সুদের হার কি একেবারেই শূন্যে নামিতে পারে?

সুদের হার শূন্যে নামিতে পারে যদি উৎপাদনে মূলধনের প্রান্তিক দান শূন্য

হয়। যখন উৎপাদন সর্বাধিক হয় তখন উৎপাদনে অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিলেও এই অতিরিক্ত মাত্রা মূলধনের দান শূন্য হয়। এই অবস্থায় উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের আর চাহিদা থাকিতে পারে না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় পৌছিতে গেলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের সর্ববিধ অভাবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়াছে। মূলধন প্রয়োগের আর নূতন কোন ক্ষেত্র আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থা কখনও হইতে পারে না; কারণ মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই, অভাবগুলি বৈচিত্র্যময় এবং এই অভাবগুলি ক্রম-বর্ধনশীল। মানুষ তাহার নূতন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা নূতন ভোগ্যবস্তুর আবিষ্কার করে এবং এই নব-আবিষ্কৃত ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের জন্য মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা যদি অসীম হইত, অপরপক্ষে কর্মতৎপরতা সসীম হইত, তাহা হইলে অবশ্য শেষ পর্যন্ত মানব-সমাজ হইতে সুদ অন্তর্হিত হইত। কিন্তু মানুষ যতদিন নূতন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা নূতন ভোগ্যবস্তুর সন্ধানে তৎপর থাকিবে ততদিন পর্যন্ত মূলধনের চাহিদা থাকিবে, ফলে সুদপ্রদান অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যোগানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সুদের হার শূন্যে নামিতে পারে এমন কি যাহারা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তাহারা সঞ্চিত টাকার নিরাপত্তার জন্য একটা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থা ঘটিবার পূর্বে চাহিদার অনুপাতে মূলধনের যোগান কম হইবে। সুদের অবর্তমানে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে, কারণ যাহারা সুদ না পাইলে সঞ্চয় করে না তাহারা আর সঞ্চয় করিবে না। ফলে নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিয়োগযোগ্য উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব ঘটিবে। সুতরাং মূলধনের চাহিদা পূরণ করিবার নিমিত্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি মূল্য প্রদান করিতে হইবে। এই মূল্য প্রদান না করিলে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হইবে না, ফলে যোগানের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

সুদ প্রদান করিবার যুক্তিযুক্ততা—Justification of interest.

অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের লেখকগণের মতে সুদগ্রহণ নিন্দনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে লোকেসাধারণতঃ ভোগ-ব্যবহারের

উদ্দেশ্যেই ঋণ গ্রহণ করিত, সুতরাং ভোগ-ব্যবহারের জন্য ঋণ হইতে সুদ আদায় করা দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি উগ্র সমাজতন্ত্র-বাদিগণ সুদকে পরস্বাপহরণ বৃত্তি আখ্যা দিয়াছিলেন। অধুনা উপরি-উক্ত মতবাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং সুদপ্রদান বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রথমতঃ, মূলধনের সাহায্যে অধিকতর উৎপাদন সম্ভব হয়, সুতরাং ঋণ-গ্রহীতা মূলধনের সাহায্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদন করে সেই অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদনের একটি অংশ ঋণদাতার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদনের একটি অংশ অর্থাৎ সুদ না পাইলে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সুদ প্রদান না করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মূলধনের যোগান হ্রাস পাইবে। ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ না হওয়ার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইয়া জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়তঃ, সুদের অস্তিত্বের জন্যই বিভিন্ন প্রতিযোগী শিল্পের মধ্যে যথাযথ-ভাবে মূলধনের বিনিয়োগ সম্ভব হয়। বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে মূলধন এরূপভাবে বিনিয়োগ করা হয় যে, এই বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে প্রদত্ত সুদের পরিমাণের ভিত্তিতে উৎপাদন-পরিমাণ সর্বাধিক হয়।

এতদ্ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে, যতদিন পর্যন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইবে ততদিন পর্যন্ত সুদ প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। নতুবা প্রয়োজনানুরূপ মূলধন দুষ্প্রাপ্য হইবে। এমন কি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও সুদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিতে পারে না। বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সুদ নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইবে।

সুদ প্রদানের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, ইহার ফলে সমাজে একশ্রেণীর নিষ্কর্মা পরজীবীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা অন্যের পরিশ্রমলব্ধ আয় ভোগ করেন। সমাজ-ব্যবস্থায় আজ যে অত্যধিক ধন-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, সুদগ্রহণই হইল তাহার অন্যতম কারণ। মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত রকমের ধন-বৈষম্য আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজব্যবস্থা

হইতে এই চূড়ান্ত ধন-বৈষম্য দূর করিবার জন্য সুদগ্রহণের একটা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

সংক্ষিপ্তসার

সুদ—

উৎপাদনে মূলধনের কার্যকারিতার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে সুদ বলে। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাহা হইল মোট সুদ। মূলধন ধার দিলে পাওনাদারকে যে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও ধার-দেওয়া অর্থ আদায় করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার মূল্য সমেত মূলধনের ব্যবহার-মূল্যকে মোট সুদ বলা হয়। নীট্ সুদ হইল শুধুমাত্র মূলধনের কার্যকারিতার মূল্য।

ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা, ধার-দেওয়া অর্থের নিরাপত্তার পার্থক্যের জন্যই সুদের হারের পার্থক্য হয়। যেখানে ঝুঁকি বেশী, সেখানে সুদের হারও বেশী। ভারত সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায়। তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা। ভারত সরকারকে টাকা ধার দিলে সে টাকার নিরাপত্তার কোন অভাব হয় না, সুতরাং লোকে অল্পসুদে টাকা ধার দেয়।

সুদের হার নির্ধারণ তত্ত্ব—

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় এ সম্পর্কে নানা মত আছে। কার্ল মার্কসের মতে সুদ হইল শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের সেই অংশ, যে অংশ মালিকগণ শ্রমিককে না দিয়া নিজেরা আত্মসাৎ করেন। কেহ বলেন যে, মূলধনের অধিকারিগণ বর্তমানে মূলধন ভোগ-ব্যবহার না করিয়া যে সংযম করেন, সুদ হইল তাহার পুরস্কার। আবার, কেহ কেহ সুদকে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক দান আখ্যা দিয়াছেন। অষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলিয়া ভবিষ্যতে অধিক পাইবার আশায় বর্তমানে সঞ্চিত মূলধন হাতছাড়া করা হয়। ভবিষ্যতে প্রাপ্য অধিক পরিমাণই হইল সুদ। দ্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের সূত্রদ্বারাও সুদতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়। চাহিদার দিকে উৎপাদনে মূলধনের প্রান্তিক দান ও যোগানের দিকে প্রান্তিক ভোগনিবৃত্তির দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়।

কেইন্‌স্‌ কর্তৃক সুদতত্ত্বের একটি নূতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে সুদ হইল টাকা-পয়সা সংক্রান্ত একটি ব্যাপার—সঞ্চয়ের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। টাকা-পয়সার ব্যবহার-মূল্য স্বরূপ ইহা প্রদত্ত হয় এবং টাকা-পয়সার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবদ্বারাই সুদ নির্ধারিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। Show how the law of supply and demand determines interest in the same way as value of a commodity. (C. U. 1941)

২। Indicate the influences that determine the demand for and supply of loans, and show how the market rate of interest is determined. (C. U. 1946)

৩। Is interest a price ? Explain how it is determined. (C. U. 1949)

৪। What is interest ? Briefly state how Keynes explains interest. (C. U. 1955)

৫। Discuss the nature of interest and explain the necessity of paying it. (C. U. B. Com. 1952)

৬। Discuss the Keynsian theory of interest. (C. U. 1956)

৭। Discuss the statement that the rate of interest is determined by loanable funds. (C. U. 1959)

৮। Distinguish between the different motives for holding money. Which of these motives gives rise to the phenomenon of 'hoarding' money ? (C. U. 1960)

৯। Discuss the liquidity preference theory of the rate of interest. (C. U. 1961)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

(Profit)

মুনাফার অর্থ—Meaning of Profit.

জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি প্রদান করিয়া উৎপাদনের যে উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যবস্থাপকের হস্তে থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ মুনাফা বলা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থপরিমাণ হইতে উৎপাদন-খরচা বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই সাধারণতঃ মুনাফা নামে অভিহিত হয়। এই উদ্বৃত্ত পরিমাণকে মোট মুনাফা বলা হয়। মোট মুনাফাকে খাঁটি বা নীট্ মুনাফা বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ খাঁটি মুনাফা ব্যতীতও অন্যান্য আরও কয়েকটি উপাদান লইয়া মোট মুনাফা গঠিত হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থপরিমাণ ও উৎপাদন-খরচার পার্থক্য অর্থাৎ মোট মুনাফা নিম্নলিখিত উপাদানের সমষ্টি মাত্র :—

(ক) উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব্যবস্থাপকের নিজস্ব জমি অথবা গৃহাদির খাজনা।

(খ) উৎপাদনে প্রযুক্ত ব্যবস্থাপকের নিজস্ব মূলধনের সুদ।

(গ) ব্যবস্থাপকের নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি।

মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব করা হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য নীট্ মুনাফা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, ব্যবস্থাপক যদি অন্যের জমি বা বাড়ী ভাড়া করিত এবং নিজস্ব মূলধন প্রয়োগ না করিয়া মূলধন ধার করিত, তাহা হইলে জমির খাজনা ও মূলধনের সুদ তাহাকে দিতে হইত ও সমগ্র আয়ের পরিমাণ হইতে খাজনা ও সুদ উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংশ হিসাবে বাদ দিতে হইত। শুধু খাজনা ও সুদ বাদ দিলেও মুনাফার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। ব্যবস্থাপকের নিজস্ব পরিচালনা-কার্যের যে মজুরি তাহাও উৎপাদন-খরচার অঙ্গ, কারণ ব্যবস্থাপক অন্য লোকের অধীনে পরিচালক হিসাবে কার্য করিলে যে বেতন

পাইতেন তাহাও উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং নীট্ মুনাফা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে খাজনা ও সুদের সহিত ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা-কার্যের মজুরি যোগ দিয়া সমগ্র আয় হইতে বাদ দিলে নীট্ মুনাফা পাওয়া যায়। যৌথ কারবারের মুনাফা নির্ধারণক্ষেত্রে যৌথ কারবারের পরিচালনা-কার্যে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের বেতন বাদ দিয়াই যৌথ কারবারের নীট্ মুনাফা স্থিরীকৃত হয় এবং এই নীট্ মুনাফাই অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টিত হয়।

নীট্ মুনাফার উপাদান—Elements of Net Profit.

উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের নানা ধরণের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এই নানা ধরণের কার্য হইল মুনাফার উৎস। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য ব্যবস্থাপক মুনাফা অর্জন করিয়া থাকেন :

(ক) ব্যবস্থাপক উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং ঝুঁকি বহন করিবার জন্য যে পুরস্কার পাইয়া থাকেন তাহা তাঁহার নীট্ মুনাফার একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

(খ) কোন অদৃষ্টপূর্ব সুবিধাজনক অবস্থা হইতে উদ্ভূত লাভ।

(গ) একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী হওয়ার ফলে অথবা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহাও ব্যবস্থাপকের নীট্ মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঘ) নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের (Innovations) ফলে ব্যবস্থাপক যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হন তাহাও নীট্ মুনাফার একটি অংশ।

মুনাফা ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির আয়ের মধ্যে পার্থক্য—Difference between Profit and other factor-incomes.

খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা প্রভৃতি হইল উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়। উৎপাদনের উপাদানের আয় হইলেও মুনাফার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই মুনাফা ও অন্যান্য আয়গুলির মধ্যে কতিপয় পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

১ প্রথমতঃ, মুনাফা হইল জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ (residual income)। জমি, মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উপাদানগুলির ব্যবহার-মূল্য প্রদান করিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে, ব্যবস্থাপক তাহাই গ্রহণ করেন। অন্যান্য আয়গুলি যথা, খাজনা, সুদ, মজুরি পূর্বচুক্তি অনুযায়ী হারে প্রদত্ত হয়—ইহাদের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না।

২। দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। সচরাচর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিন্তু অন্যান্য আয়ের পরিমাণের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

৩। সুদ বা মজুরির হার হ্রাস পাইতে পারে কিন্তু এই আয়গুলি কখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় না। অপরপক্ষে মুনাফার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুনাফার পরিবর্তে অনেক সময় লোকসানও হইতে পারে।

৪। মুনাফা অর্জনের সহিত ঝুঁকি-বহন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিবার ক্ষমতার উপরই মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে। এইজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপকের মুনাফার পরিমাণ হয় বিভিন্ন, কিন্তু শ্রমিকের মজুরির মধ্যে এতটা পার্থক্য দেখা যায় না।

মুনাফা নির্ধারণ তত্ত্বসমূহ—Theories of Profit.

১। খাজনার ভিত্তিতে মুনাফা-নির্ধারণ সূত্র—Rent theory of Profit.

এই সূত্রে বলা হয় যে, মুনাফা খাজনার অনুরূপভাবেই স্থিরীকৃত হয়। বিভিন্ন জমির উর্বরতা ও অবস্থানের পার্থক্যহেতু যেরূপ অধিকতর উর্বর অথবা অবস্থানের অধিকতর সুবিধাজনক জমির খাজনা হয়, তদ্রূপ অধিকতর দক্ষতা অথবা অভাবনীয় সুবিধার অধিকারী বলিয়া ব্যবস্থাপক মুনাফা অর্জন করে। প্রান্তিক জমির কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, মূল্যদ্বারা শুধুমাত্র উৎপাদন-খরচা পূরণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমির খাজনা এই জমির ও প্রান্তিক জমির উৎপাদন-পরিমাণের পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। মুনাফার ক্ষেত্রেও প্রান্তিক ব্যবস্থাপক কোনরূপ মুনাফা অর্জন করে না। বিক্রয়লব্ধ আয়দ্বারা তাহার মোট উৎপাদন-খরচা পূরণ হয় মাত্র। দক্ষ ব্যবস্থাপকের আয় ও প্রান্তিক ব্যবস্থাপকের আয়ের পার্থক্য দ্বারাই মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে মুনাফা খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া পরিগণিত হয় ও

খাজনার ন্যায় মুনাফাও উৎপাদন-খরচা তথা মূল্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই সূত্রটির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এই সূত্রটি মুনাফা-অর্জনের প্রধান কারণ ঝুঁকি-বহনের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্র অনুসারে প্রান্তিক ব্যবস্থাপক কোন মুনাফা অর্জন করে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু মুনাফা অর্জন না করিয়া কোন ব্যবস্থাপকই দীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, স্বল্পমেয়াদে না হইলেও দীর্ঘ-মেয়াদে মুনাফা উৎপাদন-খরচার অংশ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং মূল্যের উপর ইহার প্রভাব অনুভূত হয়। তাহা না হইলে ব্যবস্থাপকগণ ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন না।

সুতরাং খাজনার ভিত্তিতে মুনাফার পার্থক্য ব্যাখ্যা করিতে পারা গেলেও খাজনা-নির্ধারণ তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা এই সূত্রদ্বারা সম্ভব নহে।

২। মজুরির ভিত্তিতে মুনাফা-নির্ধারণ তত্ত্ব—**Wages theory of Profit.**

টাউসিগের মতে মুনাফাকে একজাতীয় মজুরি বলিয়া গণ্য করাই হইল সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ("are best regarded simply as a form of wages")। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিবার জন্য কতকগুলি গুণ অপরিহার্য এবং এই গুণগুলির অধিকারী বলিয়াই ব্যবস্থাপক গুণের পুরস্কার বাবদ মুনাফা পাইয়া থাকে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকের কার্য প্রায় সমজাতীয়, তবে ব্যবস্থাপকের কার্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা-বহন করা হইল অন্যতম।

মজুরির ভিত্তিতে মুনাফা-নির্ধারণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি হইল নিশ্চিত (certain), অপরপক্ষে ব্যবস্থাপকের প্রাপ্য মুনাফা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত (uncertain)। দ্বিতীয়তঃ, মুনাফা হইল মূল্য-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল, কিন্তু মজুরি তাহা নহে। তৃতীয়তঃ, মুনাফার প্রধান উপাদান হইল ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার, কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নহে। এতদ্ব্যতীত মুনাফার একটি বৃহৎ অংশ অপ্রত্যাশিত ঘটনার উপর নির্ভর করে।

৩। ঝুঁকিগ্রহণের ফল সূত্র—**Risk-taking theory of Profit.**

ব্যবস্থাপকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল ঝুঁকি গ্রহণ করা। বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন না করিয়া উৎপাদনে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়, সুতরাং এই ঝুঁকি-বহনের পুরস্কারই হইল মুনাফা।

এই সূত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তাহার কারণ হইল যে, বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদককে দুই জাতীয় ঝুঁকি বহন করিতে হয়। উৎপাদনে একজাতীয় ঝুঁকি আছে যাহা পূর্বেই অনুমান করিয়া তাহার প্রতিকার করা সম্ভব হয়। কিন্তু যে ঝুঁকিগুলি পূর্বে অনুমান করা যায় না অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্ব সেগুলির কোন প্রতিকার সম্ভব নয়। এই ঝুঁকিগুলিই হইল ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা (uncertainty) এবং ব্যবস্থাপককে এইগুলি বহন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা হইল এই অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার।

৪। প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা সূত্র—**Marginal productivity theory of Profit.**

এই সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, মুনাফা-উৎপাদনে ব্যবস্থাপকের প্রান্তিক দান-পরিমাণের সমান হয়। ব্যবস্থাপকের সাহায্যে সমাজ যে পরিমাণ উৎপাদন করে ও ব্যবস্থাপকের সাহায্য ব্যতীত যে পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারিত—এই উভয়ের পার্থক্যের দ্বারাই ব্যবস্থাপকের প্রান্তিক দান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

এই সূত্রটির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির ন্যায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপকের প্রান্তিক দান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। অন্যান্য উপাদানগুলির ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, উপাদানটির প্রত্যেকটির মাত্রা বিনিময়যোগ্য (interchangeable) এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ং উপাদানগুলির বিভিন্ন মাত্রাগুলি প্রয়োগ করেন। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনার এই বিভিন্ন মাত্রাগুলির প্রয়োগ শুধুমাত্র ব্যবস্থাপকগণের প্রতিযোগিতার দ্বারাই পরোক্ষভাবে নির্ধারিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলির অতিরিক্ত একমাত্রার প্রয়োগ বা একমাত্রা অপসারণে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয় ব্যবস্থাপকগণের ক্ষেত্রে একমাত্রা অপসারণের ফলে তদপেক্ষা অধিকতর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়।

ব্যবস্থাপকের মাত্রা-পরিবর্তনের ফলে হয়ত উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা উপস্থিত হইতে পারে।

৫। সামাজিক পরিবর্তনের ফল সূত্র—Dynamic theory of Profits.

মার্কিন ধনবিজ্ঞানী ক্লার্ক ও তাঁহার অনুগামিগণের মতে মুনাফা হইল সামাজিক দ্রুত পরিবর্তনের ফল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেই পরিবর্তিত অবস্থার জন্য মুনাফা অর্জন সম্ভব হইতেছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও উৎপাদন-খরচার পার্থক্যের দ্বারা মুনাফা স্থিরীকৃত হয়। সমাজে যদি কোন পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে সকল ব্যবস্থাপকের অবস্থা সমান হইবে। ফলে মুনাফা অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, অহরহ পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং নানা কারণে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হইতেছে। সামাজিক এই পরিবর্তনগুলির জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাবে ব্যবস্থাপকগণের পক্ষে মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত সূত্রের প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে, পরিবর্তন মুনাফার একমাত্র কারণ নহে ও সকল পরিবর্তনের সুযোগ লইয়া মুনাফা অর্জন সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটিলেও ব্যবস্থাপকের কার্যের কতকগুলি স্বাভাবিক ঝুঁকি আছে এবং এই স্বাভাবিক ঝুঁকি বহনের জন্য ব্যবস্থাপক মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

৬। মুনাফা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সূত্র—Socialist theory of Profits.

কার্ল মার্কস্ প্রমুখ উগ্র সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকগণ মুনাফা অর্জনকে আইন-সিদ্ধ দস্যুবৃত্তি (Legalised robbery) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রমই হইল দ্রব্যমূল্যের একমাত্র কারণ। সুতরাং শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের যে অংশগুলি অন্যান্য উপাদানগুলি খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করে তাহা শ্রমিকেরই ন্যায্য প্রাপ্য। শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়াই এই অংশগুলি আত্মসাৎ করা হয়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিও উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের একটি অংশ তাহাদেরও ন্যায্য প্রাপ্য। সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকগণ অন্যান্য উপাদানগুলির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা একেবারেই অস্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতবাদ যুক্তিযুক্ত নহে।

৭। মুনাফা সম্পর্কে মার্কিণ ও ইংরাজ ধনবিজ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত —**Theories of Profit as given by the American and the English Economists.**

খাজনার ভিত্তিতে মুনাফা-নির্ধারণ সূত্র আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ ধনবিজ্ঞানীদের মতে মুনাফা খাজনার অনুরূপভাবে নির্ধারিত হয়। মুনাফা হইল দক্ষ ব্যবস্থাপক ও প্রান্তিক ব্যবস্থাপকের আয়ের পার্থক্য। মুনাফা দক্ষ ব্যবস্থাপকের অধিকতর দক্ষতার জন্য উদ্বৃত্ত আয়। খাজনা যেরূপ উৎপাদন-খরচাতিরিক্ত আয় বলিয়া মূল্যের উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয় না, মুনাফাও তদ্রূপ উৎপাদন-খরচার অংগীভূত নহে এবং সেই কারণে উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের অংশ নহে। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে মুনাফা হইল উদ্বৃত্ত আয় এবং ইহা মূল্যের উপাদান হইতে পারে না।

মতান্তরে অনেক ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, মুনাফা উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংশ এবং সেই কারণে মুনাফা স্বাভাবিক মূল্যের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রথমোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকিগ্রহণ অপরিহার্য। সুতরাং প্রান্তিক ব্যবস্থাপকের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত এই ঝুঁকিগ্রহণের জন্য কিছু পরিমাণ মুনাফা না পাইলে টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। এই কারণে স্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক উৎপাদন-খরচার একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উৎপাদন-খরচার অংশ বলিয়াই স্বাভাবিক মুনাফা শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যের উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

কিন্তু স্বল্পমেয়াদে দেখা যায় যে, প্রান্তিক ব্যবস্থাপকগণ মুনাফা অর্জন না করিয়াও কিছুদিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদের ক্ষেত্রে মুনাফা মূল্যের অংশ বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ কারবারের ক্ষেত্র মুনাফা নির্ধারণ —**Calculation of Profit in the case of (i) a Private firm and (ii) a Joint-stock Company.**

মোট মুনাফা ও নীট্ মুনাফার পার্থক্য আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সমস্ত ব্যবসায় পরিচালিত হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে

মুনাফা নির্ধারণকালে ব্যবস্থাপক তাঁহার নিজস্ব পরিচালনা কার্যের প্রতিদান বাবদ পৃথক কোন পারিশ্রমিক উৎপাদন-খরচার অন্তর্ভুক্ত করেন না; সমগ্র বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে উৎপাদন-খরচা বাদ দিয়া মুনাফা নির্ধারণ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের পরিচালনা-কার্যের পারিশ্রমিকও নির্ধারিত মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হইয়া মুনাফার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইহা হইল মোট মুনাফা।

অপর পক্ষে যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারগণের মধ্যে যে মুনাফা বণ্টন করা হয় তাহা হইল নীট্ মুনাফা। যৌথ ব্যবসায়ের পরিচালনা-কার্য বেতনভুক পরিচালক ও পরিদর্শকগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। যৌথ ব্যবসায়ের মুনাফা নির্ধারণকালে এই বেতনভুক ব্যবস্থাপকগণের পারিশ্রমিক বাদ দিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহাই নীট্ মুনাফা এবং নীট্ মুনাফাই অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশরূপে বণ্টিত হয়। সুতরাং যৌথ-ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপকের মজুরি উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংগ বলিয়া পরিগণিত হয়।

বাৎসরিক হারে প্রাপ্ত মুনাফা ও বিনিয়োগ-ক্ষিপ্রতা-জাত মুনাফা—Profit per annum and profit on the turn-over.

অধ্যাপক মার্শাল বাৎসরিক হারে প্রাপ্ত মুনাফা ও বিনিয়োগ-ক্ষিপ্রতা-জাত মুনাফার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যখন উৎপাদনে প্রযুক্ত সমগ্র পরিমাণ মূলধনের একটি আনুপাতিক হারে মূলধন হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় নির্ধারিত হয় তখন তাহাকে বাৎসরিক হারে প্রাপ্ত মুনাফা বলা হয়। যদি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের মূলধন বিনিয়োগ করা হয় এবং ঐ পরিমাণ মূলধন হইতে যদি বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা অতিরিক্ত আয় হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, মুনাফার হার হইল শতকরা এক টাকা।

প্রযুক্ত মূলধন দ্বারা ক্রীত দ্রব্যগুলির বিক্রয়কার্য যতবার শেষ হয়, ততবারই প্রযুক্ত মূলধন হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ের হিসাব করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী যতই ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে তাহার মুনাফার পরিমাণ ততই অধিক হয়।

উপরি-উক্ত দুইজাতীয় মুনাফার ধারণা একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। একজন মুদীর মূলধনের পরিমাণ হইল পাঁচ শত টাকা মাত্র। এই মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিতে তাহার বহু সময় অতিবাহিত হয়। কারণ

তাহার দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় হয়। সুতরাং পাঁচশত টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় শেষে তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব হয়। এইজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুনাফার হার অধিক না হইলে ব্যবসায়ীর পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে একজন পাইকার বিক্রেতা এক সংগে বহুমূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করে এবং এইজন্য তাহার অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বিক্রয় হয়। ফলে পাইকার তাহার মূলধন অধিক ক্ষিপ্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে পারে। সুতরাং পাইকারী বিক্রেতার মুনাফার হার খুচরা বিক্রেতার মুনাফার হার অপেক্ষা কম হইলেও সে মূলধন পুনঃ পুনঃ বিনিয়োগ করিয়া গড়ে অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিতে পারে। পাইকারী বিক্রেতার মূলধনের পরিমাণ অধিক বলিয়া সে কম হারে মুনাফা পাইলেও তাহার লোকসান হয় না, অপর পক্ষে খুচরা বিক্রেতার মূলধনের পরিমাণ কম বলিয়া মুনাফার হার অধিক না হইলে তাহার পোষায় না। এইজন্যই একজন পাইকারী বিক্রেতা শতকরা এক টাকা মুনাফায় সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু একজন খুচরা বিক্রেতার শতকরা ২৫৲ টাকা মুনাফা না হইলে ব্যবসায়ে সে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

মুনাফার পরিমাণ কি সর্বত্র সমান হয়—Do profits tend to equality ?

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে সুদ, মজুরি প্রভৃতি অন্যান্য আয় অপেক্ষা মুনাফার পার্থক্য অধিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যবসায় অধিক হারে মুনাফা অর্জন করে, আবার কোন কোন ব্যবসায়ে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত স্বল্প। যে সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অধিক, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ঝুঁকির জন্য অধিক মুনাফা না পাইলে ব্যবসায়িগণ ঐ ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয় না। অপর পক্ষে, যে সমস্ত ব্যবসায় গতানুগতিকভাবে পরিচালিত হয় এবং ঝুঁকির পরিমাণও কম, সে সমস্ত ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণও কম হয়। সুতরাং বিভিন্ন ব্যবসায়ে ঝুঁকির পার্থক্যের জন্য মুনাফারও পার্থক্য হয়। একই জাতীয় শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও পরিচালনা-দক্ষতার পার্থক্যের জন্য সাময়িকভাবে মুনাফার পার্থক্য হইতে পারে। সুতরাং সাধারণতঃ মুনাফার পরিমাণ সর্বত্র সমান হইতে পারে না।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যখন বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে

না অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতাবস্থায় মুনাফার পরিমাণ সমান হয়। এরূপ অবস্থায় যদি মুনাফার পার্থক্য হয় তাহা হইলে ব্যবসায়িগণ কম মুনাফার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অধিক মুনাফার ব্যবসায়ে যোগদান করিবে। ফলে অধিক-মুনাফার ব্যবসায়গুলির প্রসারলাভ ঘটিবে ও কম-মুনাফার ব্যবসায়গুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। সুতরাং স্থিতাবস্থা সমান পরিমাণ মুনাফার উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু কার্যতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা কখনও স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। সামাজিক নানা কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চাহিদা, যোগান, উৎপাদন-খরচা, মূল্য প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এই পরিবর্তনগুলির জন্য ব্যবস্থাপকের মুনাফার পরিমাণের পার্থক্য হইতেছে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে মুনাফা কদাচিৎ সমান হয়।

মুনাফা কি সমর্থনযোগ্য—Are profits justifiable ?

সমাজতান্ত্রিক লেখকদের চক্ষে হেয় ও নিন্দনীয় হইলেও মুনাফা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়িগণ মুনাফা অর্জন করেন তাহার সব পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য না হইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে মুনাফা-অর্জনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। প্রতারণার দ্বারা অথবা অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বা জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে মুনাফা অর্জিত হয় তাহা সর্বক্ষেত্রে নিন্দনীয় এবং এইরূপ অন্যায়ভাবে মুনাফা-অর্জন রাষ্ট্র কর্তৃক রহিত করা উচিত। ব্যক্তিগত লাভের আকর্ষণ না থাকিলে লোকের কর্ম-তৎপরতা ও কর্মদক্ষতার সম্যক পরিস্ফুরণ হয় না। সুতরাং যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী বৈধভাবে তাঁহার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে মুনাফা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। ব্যবসায়ী যদি তাঁহার দূরদৃষ্টি, সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সমাজের হিতসাধন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সমাজের কর্তব্য হইল তাঁহার কার্যের জন্য তাঁহাকে যথাযথ প্রতিদান করা। সুতরাং একমাত্র সামাজিক হিতের পরিপ্রেক্ষিতেই মুনাফার বৈধতা বিবেচনা করিতে হইবে। মুনাফার অবর্তমানে সামাজিক হিত ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা। এমন কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও এই ব্যক্তিগত মুনাফা-অর্জনের পথ একেবারে অবরুদ্ধ করা হয় নাই।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুনাফা—Influence of Progress on Profit

অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মুনাফা পরিমাণ কখনও কখনও বৃদ্ধি পায়, আবার কখনও বা হ্রাস পায়। যখন পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর নূতন যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয় তখন উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। এই উন্নতির ফলে অনেক সময় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর মুনাফা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সর্বাগ্রে এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদন করিতে পারে, সেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অধিক হয় —কারণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই নূতন আবিষ্কারের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় স্ফীত হয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির সহিত ব্যবস্থাপনার মজুরি অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, উৎপাদন ব্যবস্থায় নূতন নূতন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইলে উৎপাদন-কার্যের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপকগণ যদি তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে অধিকতর লাভবান হইতে পারেন।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, নূতন আবিষ্কারের ফলে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির পরিবর্তে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায়। সে সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা—Profit in a Socialist State.

কার্ল মার্কস্ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত মূল্য সূত্র অনুসারে দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহারা এই শ্রম প্রয়োগ করে মালিকেরা তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদের প্রযুক্ত শ্রমের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করে। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি মালিক শ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া শ্রমিকগণ মালিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মূল্যের

সামান্য একটি অংশ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহারা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মার্কসের মতে মুনাফা আইনসিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত হয়, সেখানেই এই জাতীয় মুনাফার অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে রাষ্ট্রই হইল সমগ্র সম্পত্তির মালিক সেখানে কোন শ্রেণীবিশেষ এই মুনাফা অর্জন ও ভোগ করিতে পারে না। যাহারা উৎপাদক অর্থাৎ একমাত্র শ্রমিকগণই তাহাদের উৎপাদিত সম্পদের অধিকারী হইবে। এরূপক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয় হিসাবে মুনাফার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

মার্কস্ প্রদত্ত উপরি-উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, ধনোৎপাদনের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রমই মূল্য সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ধনোৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের অবদান উপেক্ষণীয় না হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে শ্রম প্রয়োগ করিলেই ধন উৎপাদন দূরের কথা—এমন কি কোন মূল্য সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যথাযথভাবে শ্রম প্রয়োগ করিয়া চাহিদা অনুসারে ধনোৎপাদন করিতে হইলে মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক শ্রম প্রয়োগ করিতে হয়। নতুবা শ্রমের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। শ্রমিকগণ পরিচালকদের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। সুতরাং সুসংবদ্ধ ও দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য পরিচালনা-কার্য একান্ত অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও এই পরিচালনা-কার্যের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। কি পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হইলে সমাজ সর্বাধিক পরিমাণে লাভবান হইবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও উৎপাদন-ব্যবস্থার এই আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করিতে হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও যে সমস্ত শিল্পে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিলে উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়, সেই সমস্ত শিল্পে অধিকতর মূলধন ও শ্রম প্রযুক্ত হইবে। নতুবা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও মুনাফার আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারণ একান্ত অপরিহার্য। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন হওয়া উচিত অথবা রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন হওয়া উচিত—ইহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

সংক্ষিপ্তসার

মুনাফা—

বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাকে ব্যবস্থাপকের মোট মুনাফা বলা হয়। মোট মুনাফা হইতে ব্যবস্থাপকের নিজস্ব জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও নিজের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট্ মুনাফা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া নীট মুনাফা গঠিত হয়।

(ক) ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার, (খ) আকস্মিক সুবিধা হইতে প্রাপ্ত লাভ, (গ) একচেটিয়া ব্যবসায়জনিত লাভ, (ঘ) নূতন উদ্ভাবন-জনিত লাভ।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য—

(১) মুনাফা হইল অবশিষ্ট আয় অর্থাৎ খাজনা, সুদ ও মজুরি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল মুনাফা। (২) মুনাফার পরিমাণের অন্যান্য আয়ের পরিমাণের মত কোন স্থিরতা নাই। (৩) মুনাফা একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে। (৪) মুনাফার অন্যতম কারণ হইল ঝুঁকি-বহন এবং এই ঝুঁকি-বহন ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য ব্যবস্থাপকগণের মুনাফার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

মুনাফা-নির্ধারণ তত্ত্বসমূহ—

কেহ কেহ খাজনার ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করেন। জমির উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য যেরূপ খাজনার সৃষ্টি হয়, ব্যবস্থাপকগণের দক্ষতার পার্থক্যের হেতু তদ্রূপ মুনাফা দেখা যায়। অনেকে বলেন, মুনাফা হইল এক-জাতীয় মজুরি কিন্তু এই মজুরির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আবার, অনেক ধনবিজ্ঞানী মুনাফাকে ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার বলিয়া গণ্য করেন। প্রান্তিক দান সূত্রের সাহায্যেও অনেকে মুনাফা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মার্কিণ ধনবিজ্ঞানিগণ খাজনার ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খাজনা যেরূপ উদ্বৃত্ত আয় এবং মূল্যের উপর ইহার কোন প্রভাব নাই, মুনাফাও তদ্রূপ ব্যবস্থাপকের খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় এবং এই কারণে মূল্যের উপর ইহার কোন প্রভাব নাই। অপরপক্ষে ইংরাজ ধনবিজ্ঞানি-গণের মতে মুনাফা উৎপাদন-খরচার অপরিহার্য অংশ এবং সেই কারণে মূল্যের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, স্বল্প

মেয়াদে মুনাফা মূল্যের উপাদান না হইলেও দীর্ঘমেয়াদে ইহা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্যক্তিগত মালিকানা-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের পরিচালনার জন্য মজুরি বাদ না দিয়া মুনাফা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ সমগ্র আয় হইতে সমগ্র ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা মুনাফা বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা-কার্যের জন্য বেতনভুক কর্মচারী থাকে। এই বেতনভুক পরিচালকের পারিশ্রমিক বাদ দিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাহাই হইল যৌথ ব্যবসায়ের নীট্ মুনাফা এবং এই মুনাফা অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

মুনাফা কি সর্বত্র সমান হয়—

যে সমস্ত ব্যবসায়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অধিক, অধিক মুনাফা না হইলে সে সকল ব্যবসায়ে লোকে আকৃষ্ট হয় না। সব ব্যবসায়ে সমান ঝুঁকি-বহন করিতে হয় না, সুতরাং মুনাফাও সমান হইতে পারে না। ঝুঁকির তারতম্যের জন্য মুনাফারও তারতম্য হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতাবস্থা ঘটিলে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সকল ব্যবসায়ে সমান মুনাফা লাভ হয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, নানা কারণে অর্থনৈতিক অবস্থায় স্থিতাবস্থা ঘটিতে পারে না। সামাজিক নানারূপ পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকির হ্রাস-বৃদ্ধিতে মুনাফার পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে।

মুনাফা কি সমর্থনযোগ্য—

প্রতারণা, অন্যায় অধিকার দ্বারা ও জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া যে মুনাফা অর্জিত হয় তাহা সমর্থনযোগ্য না হইলেও ব্যবসায়ী বৈধভাবে তাহার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের ফলস্বরূপ যে মুনাফা অর্জন করেন তাহা সমর্থনযোগ্য। ব্যক্তিগত মুনাফার আকর্ষণ না থাকিলে লোকের কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না—সুতরাং সামাজিক প্রয়োজনেই মুনাফা প্রদান অপরিহার্য।

প্রশ্নাবলী

1. Define profit. Show how you will calculate profit in a joint-stock company. (C. U. 1948)

2. Define normal profit and explain why it is included in the normal cost of production. (C. U. 1954, B. Com. 1959)

3. Indicate the nature and composition of Profits and discuss the position of Profits under a socialistic regime. (C. U. 1957)

4. What are the different elements of profits? How would you determine profits in the case of (*a*) individual firms and (*b*) joint-stock companies? (C. U. B. Com. 1961)

5. Discuss the constituent elements of profits. "Profits are like Rent and do not enter into Price". Do you agree? Give reasons for your answer. (C. U. B. Com. 1962)

অর্থতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

(Money)

অর্থের উৎপত্তি—Evolution of money.

সভ্যতার প্রথম স্তরে মানুষ টাকাকড়ির ব্যবহার জানিত না। অভাব পূরণের জন্য মানুষ তাহার নিজ পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের সহিত অন্যের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময় করিত। তাঁতি কাপড় প্রস্তুত করিয়া কৃষকের নিকট হইতে কাপড়ের পরিবর্তে ধান্য সংগ্রহ করিত এবং কৃষক ধান্যের পরিবর্তে কাপড় পাইত। একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যখন আর একটি দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয়, তখন তাহাকে **প্রত্যক্ষ বিনিময় (Barter)** বলা হয়।

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা—Disadvantages of Barter System.

প্রত্যক্ষ বিনিময়ব্যবস্থা দ্বারা দ্রব্যসংগ্রহ সম্ভব হইলেও এই পদ্ধতির কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ বিনিময় দ্বারা সকল রকম অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার অভাবের মিল না হইলে এইরূপ দ্রব্যবিনিময় হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে কাপড় সংগ্রহ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এমন একজন কাপড়ের অধিকারী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে, কাপড়ের পরিবর্তে চাউল লইতে রাজী আছে। কাপড়ের অধিকারীর যদি চাউলের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে চাউলের পরিবর্তে সে কাপড় বিনিময় করিবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অভাবের সামঞ্জস্য হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময়ের হারের কোন নিশ্চয়তা বা স্থিরতা থাকে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার তীব্রতা অনুসারে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং একই দ্রব্যের চাহিদার তীব্রতার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে অন্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় হয়। একখানা কাপড়ের পরিবর্তে কি পরিমাণ চাউল, কি পরিমাণ তৈল বা কি পরিমাণ মাংস পাওয়া যাইতে পারে তাহার কোন নির্দিষ্ট হার থাকে না।

সুতরাং প্রত্যেকটি জিনিসের অসংখ্য বিনিময় হার দেখা যায়। ইহার কারণ হইল যে, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য কোন মাধ্যম নাই।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনেক জিনিস ভাগ করা সম্ভব নয় বলিয়া বিনিময়ের অসুবিধা হয়। একটি লোক যদি একটি গরুর পরিবর্তে তাহার অভাব পূরণের জন্য চাউল, তৈল, কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে, গরু লইতে স্বীকৃত আছে এবং গরুর পরিবর্তে প্রথমোক্ত ব্যক্তির যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ ধরণের বিনিময় অসম্ভব। গরুর মালিক তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যে পৃথকভাবে সংগ্রহ করিবে এরূপ সম্ভাবনাও নাই, কারণ গরুটিকে ভাগ করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সামগ্রীর সহিত বিনিময় করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনেক দ্রব্যের বিভাজ্যতার অভাবের জন্য প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্ভব হয় না।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা সম্ভব নয়, কারণ দ্রব্যগুলি পচনশীল। দ্রব্যগুলি সহজে স্থানান্তরযোগ্য নয় বলিয়াও প্রত্যক্ষ বিনিময়ে অসুবিধা হয়।

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিনিময়ের একটি সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ইহার ফলে প্রত্যেক সমাজে এক একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য, যথা, কড়ি, তামাক, লবণ প্রভৃতি সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর হইল না বলিয়া মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। যে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণগুলির অবস্থিতির জন্যই এই ধাতুগুলি বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল।

উৎকৃষ্ট টাকাকড়ির গুণাবলী—Qualities of Good Money.

১। **সর্বজনগ্রাহ্যতা—General Acceptability.**

বিনিময়ের মাধ্যমের সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া চাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলির অর্থমূল্য ব্যতীতও নিজস্ব একটি ব্যবহার-মূল্য আছে এবং এইজন্য সকলেই এই ধাতুগুলি বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে।

২। মূল্যের স্থায়িত্ব—Stability in value.

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্যটির মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হওয়া চাই, নতুবা বিনিময়ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য অন্যান্য দ্রব্যমূল্য অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী।

৩। দ্রব্যটির স্থায়িত্ব—Durability.

বিনিময়ের মাধ্যম দ্রব্যটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ইহা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। মূল্যবান ধাতুগুলি এদিক দিয়া অধিকতর স্থায়ী।

৪। সহজ বহনযোগ্যতা—Portability.

স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলিয়া সহজে বহন করা যায়। মূল্যের তুলনায় ইহারা অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা কম ভারী। স্বল্প ওজনের স্বর্ণ, রৌপ্যের যে মূল্য, সেই পরিমাণ মূল্যের লৌহ, চাউল বা অন্য দ্রব্য বহনযোগ্য নহে। টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য সহজ বহনযোগ্যতা একটি অপরিহার্য গুণ এবং মূল্যবান ধাতুগুলির এই গুণ আছে বলিয়া তাহারা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৫। দ্রবণীয়তা ও বিভাজ্যতা—Malleability or Fusibility and Divisibility.

যে দ্রব্যটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার দ্রবণীয়তা গুণ থাকা চাই। দ্রব্যটি দ্রবণীয় অর্থাৎ সহজে গলান যায়—না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিতে না পারিলে ছোট-খাট বিনিময় সম্ভব হয় না। এইজন্য বিনিময়ের মাধ্যম দ্রবণীয় ও বিভাজ্য হওয়া চাই। মূল্যবান ধাতুতে এই গুণ দুইটির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। সমজাতীয়তা—Homogeneity.

বিনিময়ের মাধ্যম এরূপ দ্রব্য হইবে যাহার গঠন-উপাদান অভিন্ন হয় অর্থাৎ দ্রব্যটির যে গুণ তাহা যেন বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই গুণ না থাকিলে দ্রব্যটি নমুনাযোগ্য হয় না বা ক্রমানুসারে সাজান যায় না।

৭। সহজে চিনিবার যোগ্যতা—Cognisability.

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এরূপ দ্রব্য ব্যবহৃত হইবে যাহা সহজেই চেনা যায়। সহজে চেনা না গেলে আসল ও নকল জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ইহার ফলে জাল মুদ্রার আবির্ভাব হইতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু সমজাতীয় বলিয়াই তাহাদের শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সহজেই চেনা যায়। যদি কোন ব্যক্তিকে দুইটি পৃথক নমুনার গম দেওয়া হয় তাহা হইলে সে বলিতে পারে যে, এক নমুনা গম হইল ক্যানাডার গম, অন্য নমুনা হইল ভারতীয় গম, কেননা এই গম সমজাতীয় নহে। কিন্তু দুই নমুনা রৌপ্যের ক্ষেত্রে সে বলিতে পারে না যে, এক নমুনা মেক্সিকোর খনি হইতে প্রাপ্ত ও অন্য নমুনা সাইবেরিয়ার খনি হইতে প্রাপ্ত, কারণ সব রৌপ্যই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়া ইহার গুণও সমান, সুতরাং সহজেই চেনা যায়।

অর্থের সংজ্ঞা—Definition of Money.

যাহা কিছু সর্বজনগ্রাহ্য এবং ঋণদাতা ঋণপরিশোধ হিসাবে যাহা লইতে বাধ্য তাহাকেই ধনবিজ্ঞানে অর্থ বলা হয়। অর্থের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অর্থের দ্বারা পণ্যের মূল্য ও কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া যায় এবং ইহার দ্বারা ঋণপরিশোধ করা যায়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সর্বজনগ্রাহ্যতা ও ইহার আইনসিদ্ধ বাধ্যবাধকতা। আইনসিদ্ধ বাধ্যবাধকতার অর্থ হইল যে, পণ্যের মূল্য ও কাজের মজুরি হিসাবে এবং ঋণপরিশোধ ব্যাপারে অর্থ লইতে সকলেই বাধ্য। এই সংজ্ঞা অনুসারে সরকার বা অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রবর্তিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা অর্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ চেক দ্বারা তুলিয়া লওয়া যায় এরূপ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা-পয়সাকেও অর্থ বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই অর্থে ব্যাংকে গচ্ছিত স্থায়ী আমানত বা পোস্ট অফিসে গচ্ছিত আমানত অর্থপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না, কারণ এই আমানত চেক দ্বারা তুলিয়া লওয়া যায় না।

অর্থের কার্যাবলী—Functions of Money.

অর্থের উপযোগিতা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

১। বিনিময়ের মাধ্যম—Medium of exchange.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য অর্থের প্রচলন হয়। সুতরাং ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, অর্থের প্রধান উপযোগিতা হইল বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। মানুষ প্রথমে তাহার আয়ত্তাধীন দ্রব্য বা কাজগুলিকে অর্থে রূপান্তরিত করে এবং এই অর্থের দ্বারা সে তাহার প্রয়োজনীয় অন্য দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করে। এইরূপে অর্থের সাহায্যে বিনিময় সহজ ও সরল হইয়াছে।

২। মূল্যের পরিমাপক—Measure of value.

অর্থের দ্বারা পণ্যদ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূল্যের মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হয়। চাউল, কাপড়, গৃহ, মোটর গাড়ী, গরু প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থদ্বারা পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। সুতরাং দ্রব্য ও কাজের মূল্যপরিমাণের প্রকাশের একমাত্র মাপকাঠি হইল অর্থ। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যের কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিনিময়-পদ্ধতির দ্বারা দ্রব্যের আদান-প্রদান চলে তখনও বিনিময়যোগ্য দ্রব্যগুলির মূল্য অর্থের পরিমাপে প্রকাশ করা হয় এবং এই আদান-প্রদানের হিসাবনিকাশও অর্থের মাপকাঠিতে রাখা হয়।

৩। স্থগিত আদান-প্রদানের মান—Standard of Deferred payments.

ঋণগ্রহণ ও ঋণপ্রত্যর্পণও অর্থের মাপকাঠিতে করা হয়। অর্থের এই কার্যকারিতার জন্য ঋণদান ও ঋণগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাংক, সংভার বিনিময় প্রভৃতি মূলধন-সঞ্চয়কারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে। অর্থ বর্তমান মূল্যের সহিত ভবিষ্যৎ মূল্যের সংযোগ সাধন করে, সেইজন্য বর্তমানে অর্থ ধার করিয়া বা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অর্থের মাপকাঠিতে ধার শোধ বা দ্রব্যমূল্য শোধ করা সহজ হয়।

৪। মূল্যের ভাণ্ডার—Store of value.

অর্থ সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক বলিয়া অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ও কাজ পাওয়া যায়। মানুষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঞ্চয় করে। কিন্তু জিনিসপত্রের আকারে যদি সঞ্চয় করা হয় তাহা

হইলেও সঞ্চিত জিনিসপত্র সহজে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু অর্থ সহজে নষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত মূল্যের ভাণ্ডার হিসাবে অর্থের বিনিময়ে যে-কোন সময়ে জিনিসপত্র পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য লোকে সাধারণতঃ জিনিসপত্র সঞ্চয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। সুতরাং মূল্যের ভাণ্ডার বলিয়া অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসাবেও কার্য করে।

অর্থের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ইহার আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগের জটিল ও দীর্ঘপ্রসারিত উৎপাদন-ব্যবস্থা অর্থ বা অর্থের বিকল্প বিনিময় মাধ্যম ব্যতীত পরিচালিত হইতে পারে না। দেশের উৎপাদন ও ভোগব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করিতে অর্থ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কেইন্‌সের মতে একমাত্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তথা সর্বাংগীণ উন্নতি ইহার অর্থসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Money.

অর্থকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা, (১) ধাতব মুদ্রা (Metallic money) ও (২) কাগজী টাকা (Paper money)। ধাতব মুদ্রা আবার (ক) প্রামাণিক মুদ্রা (Standard money) ও (২) প্রতীক মুদ্রা (Token money) হইতে পারে। এইগুলি পুনরায় (অ) অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited legal tender money) ও (আ) সসীম বিহিত মুদ্রা (Limited legal tender money) হইতে পারে। কাগজী টাকা বা নোট সাধারণতঃ (১) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা (Representative paper money), পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা (Convertible paper money) এবং অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা (Inconvertible paper money) ভাগে বিভক্ত হয়। কাগজী টাকা আবার সরকার অথবা সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা প্রবর্তিত হইতে পারে এবং এই কাগজী টাকাগুলি বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। অপর পক্ষে, অন্যান্য ব্যাংক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি চেক্, ড্রাফ্‌ট, হুণ্ডি প্রভৃতি আকারে যে কাগজী টাকা চালু করে তাহা বিহিত মুদ্রা

বলিয়া পরিগণিত হয় না। দেশের সমস্ত প্রকার টাকা-পয়সা নিম্নলিখিত-ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। টাকা-পয়সা বলিতে এস্থলে একটি দেশে প্রচলিত সমগ্র পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা বুঝান হইয়াছে।
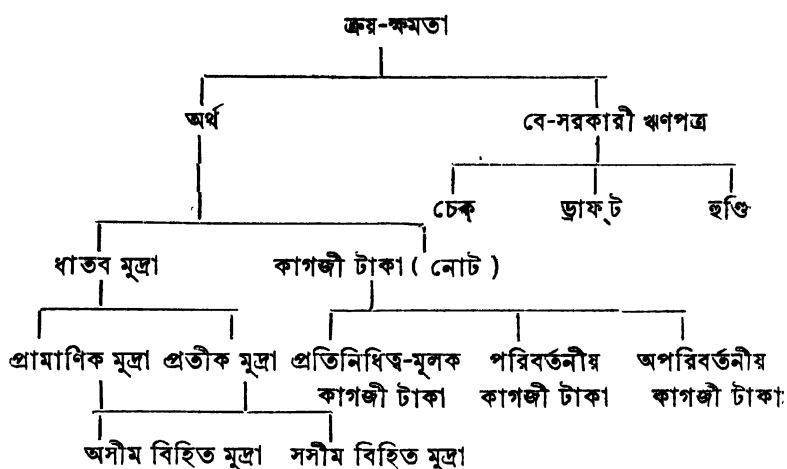
ধাতব মুদ্রা—Metallic Money or Coins.

নির্ধারিত ওজনের নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের শীলাংকিত ধাতুখণ্ডকে মুদ্রা বলা হয়।

প্রামাণিক মুদ্রা—Standard Coin.

একটি দেশে বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রায় সব হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রামাণিক মুদ্রার অর্থ-মূল্য এই মুদ্রার ধাতব মূল্যের সমান হয় অর্থাৎ প্রামাণিক মুদ্রায় যে পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে, তাহার দ্বারাই ইহার মুদ্রামূল্য স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং প্রামাণিক মুদ্রা গলাইয়া ধাতুহিসাবে বিক্রয় করিলে কোন লাভ হয় না। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইজন্ত পাওনাদার তাহার প্রাপ্য পাওনা এই মুদ্রায় গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য। প্রামাণিক মুদ্রার প্রচলন সাধারণতঃ অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। জনসাধারণ তাহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য

টাঁকশালে লইয়া গেলে সরকার একটি নির্ধারিত হারে আনীত ধাতুকে মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়া দিত। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড-স্টার্লিং, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার প্রভৃতি প্রামাণিক মুদ্রার উদাহরণ। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হয়।

প্রতীক মুদ্রা—Token or Subsidiary Coins.

প্রতীক মুদ্রা দ্বারা সাধারণতঃ ছোট-খাট ক্রয়-বিক্রয় কার্য পরিচালিত হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার ধাধব মূল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম। প্রতীক মুদ্রায় যে পরিমাণ ধাতু থাকে তাহা গলাইলে তাহার মূল্য মুদ্রামূল্যের কম হয়। এই মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সাধারণতঃ সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হয় অর্থাৎ পাওনাদার এই মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট সীমার পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা তাহার পাওনা লইতে আইনতঃ বাধ্য নহে। প্রতীক মুদ্রায় অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা থাকে না। ভারতের সিকি, দুয়ানী, আনি প্রভৃতি ও ইংলণ্ডের শিলিং, পেন্স প্রভৃতি হইল প্রতীক মুদ্রা। ইংলণ্ডে শিলিং মোট ২ পাউণ্ড পর্যন্ত গ্রাহ্য এবং ভারতে সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি প্রতীক মুদ্রা মোট এক টাকা পর্যন্ত গ্রাহ্য, কারণ ইহারা প্রতীক মুদ্রা বলিয়া গৃহীত। উক্ত পরিমাণের অর্থাৎ ৪০ শিলিং বা ৪টি সিকির অধিক গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে।

ভারতের টাকা—The Indian Rupee.

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই ভারতে প্রচলিত টাকার মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। ভারতের টাকা প্রামাণিক অর্থ না প্রতীক অর্থ ইহাই হইল প্রশ্ন।

ভারতের টাকা ভারতে বিনিময়ের মান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেজন্য ইহাকে ভারতের প্রামাণিক অর্থ বলা হয়। কিন্তু প্রামাণিক অর্থের এই একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য ব্যতীত ভারতের টাকার প্রামাণিক অর্থের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, ভারতের টাকার অর্থমূল্য ইহার ধাতব মূল্যের অনেক বেশী। ভারতের টাকায় এক টাকা মূল্যের রৌপ্য ত নাই-ই, অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত টাকায় রৌপ্যের অস্তিত্ব অতি

কম। ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিকেলের তৈয়ারী। সুতরাং টাকাকে প্রামাণিক অর্থ না বলিয়া প্রতীক অর্থ বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের টাকায় অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা নাই—এই মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা একমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিদেশী পাওনাদারগণের ঋণ এই মুদ্রায় পরিশোধ করা যায় না। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও ভারতের টাকাকে খাঁটি প্রামাণিক অর্থ বলা যায় না। ভারতের টাকার প্রামাণিক ও প্রতীক এই উভয় অর্থের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

বিহিত অর্থ—Legal tender Money.

বিহিত অর্থ বলিলে সেই সমস্ত অর্থ বুঝায়, যাহা সরকার কর্তৃক বিহিত বলিয়া ঘোষিত হইবার ফলে পাওনাদারগণ এই অর্থে তাহাদের পাওনা লইতে আইনতঃ বাধ্য থাকে। বিহিত অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু একটি দেশে প্রচলিত সব রকমের অর্থই বিহিত অর্থ না হইতে পারে। চেক্ বিহিত অর্থ নহে, সুতরাং ইহা গ্রহণ করিতে কেহ আইনতঃ বাধ্য নহে। বিহিত অর্থের আবার দুইটি প্রকার ভেদ আছে, যথা, অসীম বিহিত অর্থ (Unlimited legal tender) এবং সসীম বিহিত অর্থ (Limited legal tender)। যে অর্থ পাওনাদার যে-কোন পরিমাণ গ্রহণ করিতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়, অপর পক্ষে যে অর্থ পাওনাদার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লইতে আইনতঃ বাধ্য নহে তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। ভারতে টাকা হইল অসীম বিহিত মুদ্রা, সিকি, দুয়ানী, আনি প্রভৃতি হইল সসীম বিহিত মুদ্রা। এই শেষোক্ত মুদ্রাগুলিতে কোন পাওনাদার এক টাকা পরিমাণের অধিক গ্রহণ নাও করিতে পারে।

মুদ্রাংকন—Coinage.

মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনাকালে মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। মুদ্রা তৈয়ারী করাকেই মুদ্রাংকন বলা হয়। সাধারণতঃ দেশের সরকারই হইল মুদ্রাংকনের অবাধ অধিকারী। মুদ্রাসংখ্যার পরিমাণ, মুদ্রার বৈচিত্র্য প্রভৃতি মুদ্রা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলেও কতিপয় বিশেষ

ক্ষেত্রে সরকার পূর্বে জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে মুদ্রাংকন করিবার কিছু স্বাধীনতা দিয়াছিল।

১। অবাধ মুদ্রাংকন—Free Coinage.

এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের স্বর্ণ-রৌপ্য টাঁকশালে লইয়া গেলে সরকার ঐ আনীত স্বর্ণ-রৌপ্যের আনুপাতিক উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দেয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ ইচ্ছানুসারে তাহাদের আয়ত্তাধীন ধাতুকে মুদ্রায় পরিণত করিতে পারে। সুতরাং দেশে অর্থের চাহিদা জনসাধারণের চাহিদা দ্বারাই অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হয় এবং মূল্যবান ধাতুগুলি অধিকতরভাবে সঞ্চিত না হইয়া মুদ্রা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

২। বিনা শুল্কে মুদ্রাংকন—Gratuitous Coinage.

মুদ্রাংকন করিতে সরকারের খরচ হয়। কিন্তু সরকার যদি মুদ্রাংকন করিবার খরচ জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় না করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজে বহন করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাকে বিনা শুল্কে মুদ্রাংকন বলা হয়। এই ব্যবস্থায় মুদ্রামূল্য ও মুদ্রার ধাতব মূল্য সমান হয়।

৩। উপযুক্ত খরচ গ্রহণে মুদ্রাংকন—Brassage or Mintage.

সরকার যদি মুদ্রাংকন করিবার জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়, ঠিক সেই পরিমাণ খরচ জনসাধারণের নিকট হইতে মুদ্রাংকন কালে আদায় করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাকে উপযুক্ত খরচ গ্রহণে মুদ্রাংকন ব্যবস্থা বলা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক মুদ্রা হইতে খরচের সমান মূল্যের ধাতু বাদ দিয়া মুদ্রাংকন করা হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় মুদ্রামূল্য মুদ্রাটির ধাতব মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়।

৪। বানি গ্রহণ করিয়া মুদ্রাংকন—Seigniorage.

মুদ্রাংকন করিতে সরকার অনেক সময় মুদ্রাংকন করিবার জন্য আসল যে খরচ হয় তদপেক্ষা অধিক শুল্ক আদায় করে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রাংকন করিয়া সরকার প্রচুর লাভ করে।

কাগজী টাকার প্রকার ভেদ—Different forms of Paper Money.

সকল দেশেই বর্তমানে কাগজী টাকা-পয়সার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজী টাকা-পয়সাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা—Representative paper Money.

প্রবর্তিত কাগজী টাকার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু যখন গচ্ছিত রাখা হয় তখন এই কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা হয়। যদি ৫০ লক্ষ মূল্যের কাগজী টাকা বাজারে চালু করা হয় এবং ঐ পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য তহবিলে সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা যাইতে পারে।

(খ) পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Convertible paper Money.

যখন কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী টাকার অধিকারিগণ তাহাদের ইচ্ছামত কাগজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে পারে এবং যে কর্তৃপক্ষ এই কাগজী টাকা প্রবর্তন করেন তাঁহারা কাগজী টাকা মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকেন। ভারতে প্রচলিত ১০, ৫, ২৲ প্রভৃতি মূল্যের কাগজী টাকা পরিবর্তনীয় কাগজী টাকার উদাহরণ।

(গ) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Inconvertible paper Money.

যখন কাগজী টাকার পরিবর্তে ধাতব টাকা পাওয়া যায় না, তখন এই কাগজী টাকা অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলিয়া অভিহিত হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা প্রবর্তিত হইবার সময় হইতেই অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহারা এই জাতীয় টাকা চালু করে তাহারা ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিতে প্রথম হইতেই কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৲ টাকার নোট, বিলাতের পাউণ্ড, ষ্টার্লিং এই জাতীয় কাগজী টাকা।

অনেক সময় আবার পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা কর্তৃপক্ষের ধাতব মুদ্রা দিবার অক্ষমতাহেতু ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইতে পারে। অন্যান্য বে-সরকারী কাগজী টাকা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

কাগজী টাকার সুবিধা—Advantages of Paper Money.

১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা, সহজে চিনিবার সুবিধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট টাকার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী টাকায় আদান-প্রদান করা অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে কাগজী টাকার ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে।

২। কাগজী টাকা তৈয়ার করিবার ব্যয়ও অনেক কম। খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া সেই ধাতুকে পরিশ্রুত করিয়া নির্দিষ্ট ওজনের ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে নানাজাতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় কাগজী টাকা অর্থাৎ নোট ছাপাইবার খরচ অতি নগণ্য। সুতরাং নোট ব্যবহারের ফলে যে অনেক ব্যয়সংকোচ হয় ইহা অনস্বীকার্য।

৩। টাকা-পয়সা প্রতিনিয়তই হস্তান্তরিত হইতেছে। এই হস্তান্তরের ফলে বহুপরিমাণ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় অপচয় ঘটে। কাগজী টাকা ব্যবহার করিলে এই সকল মূল্যবান ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়।

৪। কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্যের ধাতব মুদ্রা সঞ্চয় হয় তাহা বিদেশে ধার দিলে সুদ পাওয়া যায় বা অন্য নানা উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

৫। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি ধাতব মুদ্রার অভাবে কাগজী মুদ্রা চালু করিয়া তাহাদের ব্যয় সংকুলান করিতে পারে।

৬। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থপরিমাণকে চাহিদা অনুপাতে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের অর্থপরিমাণ যদি শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাবে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা সহজসাধ্য হইয়াছে। যদিও কাগজী অর্থের পরিবর্তে ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয় তথাপি এই গচ্ছিত ধাতুর পরিমাণ প্রবর্তিত কাগজী অর্থমূল্য পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। কাগজী টাকার একটি অসুবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক।

২। কাগজী টাকার প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে নোট ছাপান যায় বলিয়া আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। দেশে যদি ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু না থাকিলে সরকার তাহার খুসীমত মুদ্রা চালু করিতে পারে না। কিন্তু কাগজী টাকার ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত না রাখিয়াও নোট প্রবর্তন করিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রবর্তনের ফলে সরকারের পক্ষে নোটগুলিকে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। নোটের জন্য যে পরিমাণ ধাতু জমা থাকে তাহা নিঃশেষিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। নোটগুলিকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব না থাকিলে সরকার খুসীমত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। অত্যধিক পরিমাণ নোট চালু হওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়—আর মুদ্রাস্ফীতির চরম পরিণতি হইল মূল্যবৃদ্ধি।

৩। কাগজী টাকার আর একটি অসুবিধা হইল যে, ইহা একমাত্র দেশের মধ্যেই চালু হইতে পারে, বিদেশে এই টাকার দ্বারা লেনদেন সম্ভব নয়। বিদেশিগণ দ্রব্যমূল্য বা ঋণশোধ বাবদ স্বর্ণ লইতে আপত্তি করে না, কিন্তু কাগজী টাকা তাহারা গ্রহণ করে না। সুতরাং কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

ঐচ্ছিক অর্থ—Optional Money.

ঐচ্ছিক অর্থ বলিতে বিনিময়ের সেই সমুদয় মাধ্যমকে বুঝায় যাহা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও সাধারণতঃ ঋণ-পরিশোধ ও অন্যান্য লেনদেন ব্যাপারে গৃহীত হয়। ঐচ্ছিক অর্থ দ্বারা ব্যাংক নোট, চেক্, হুণ্ডি প্রভৃতি নানাজাতীয় ঋণপত্র (credit money) বুঝায়।

আদিষ্ট অর্থ—Fast Money.

যে অর্থ সরকারী আদেশের জন্য লোকে গ্রহণ করে তাহাকে আদিষ্ট অর্থ

বলা হয়। কাগজী টাকা আদিষ্ট অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাগজী টাকার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কিন্তু সরকারী আদেশের জন্যই লোকে এইগুলি অর্থরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। প্রতীক মুদ্রাকেও আদিষ্ট অর্থ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মুদ্রামূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও লোকে সরকারী আদেশের জন্য এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

গ্রেসামের সূত্র—Gresham's Law.

গ্রেসামের সূত্রটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। "নিকৃষ্ট অর্থ সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট অর্থকে বিতাড়িত করে" (Bad money tends to drive good money out of circulation.")

সার্ টমাস্ গ্রেসাম রাণী এলিজাবেথের সময় বৃটিশ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি উপরি-উক্ত সূত্রটির আবিষ্কারক না হইলেও এই সূত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই সূত্রটির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সূত্রটির তাৎপর্য হইল যে, যদি একটি দেশে নিকৃষ্ট অর্থ ও উৎকৃষ্ট অর্থ যুগপৎ প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উৎকৃষ্ট মুদ্রা ক্রমশঃ বাজার হইতে অন্তর্হিত হয় ও শুধুমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে চালু থাকে। বাজার হইতে উৎকৃষ্ট মুদ্রার এই অন্তর্ধান এবং নিকৃষ্ট মুদ্রার অবস্থিতি 'গ্রেসামের সূত্র' নামে অভিহিত হয়।

নিকৃষ্ট অর্থ দ্বারা উৎকৃষ্ট অর্থ কিভাবে বাজার হইতে বিতাড়িত হয় সে সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে তৎপূর্বে নিকৃষ্ট অর্থ ও উৎকৃষ্ট অর্থ কাহাকে বলা হয় তাহা জানা প্রয়োজন।

(ক) যখন একই ধাতু-নির্মিত, টাঁকশাল হইতে সদ্য আগত, নূতন ও পূর্ণ ওজনের মুদ্রা এবং ব্যবহারজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বাজারে পাশাপাশি চলিতে থাকে, তখন নূতন মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট ও পুরাতন মুদ্রাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা হয়। কারণ বহু ব্যবহারের ফলে পুরাতন মুদ্রার ক্ষয় হয় এবং ধাতুর পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু নূতন মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ সমান থাকে এবং এইজন্য নূতন মুদ্রার তুলনায় পুরাতন মুদ্রাকে নিকৃষ্ট বলা হয়। গ্রেসামের সূত্র অনুসারে এই ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন মুদ্রা বাজারে চালু থাকে এবং নূতন মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়।

(খ) বাজারে যদি একই সঙ্গে কাগজী টাকা ও ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা হইলে নিজস্ব মূল্যহীনতার জন্য কাগজী টাকাকে নিকৃষ্ট অর্থ এবং মূল্যবত্তার জন্য ধাতব মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট অর্থ বলা হয় এবং গ্রেসামের সূত্র অনুসারে কাগজী টাকা চালু থাকে এবং ধাতব মুদ্রা অন্তর্হিত হয়।

(গ) দেশে দ্বি-ধাতুমান (Bi-metallism) প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই প্রামাণিক অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অধিক মূল্যবান বলিয়া স্বর্ণমুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা বলিয়া গণ্য হয় এবং গ্রেসামের সূত্র অনুসারে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে বিতাড়িত করে। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরকার-নির্ধারিত মূল্য ও বাজার-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটিলে অনেক ক্ষেত্রে রৌপ্যমুদ্রাই উৎকৃষ্ট মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার ১ : ১৫ হয় অর্থাৎ এক তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ১৫ তোলা রৌপ্য পাওয়া এবং এই অবস্থার পর যদি রৌপ্যের বাজার দর হ্রাস পাইয়া বিনিময় হার ১ : ১৪ হয় অর্থাৎ এক তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ১৪ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তাহা হইলে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা হইল নিকৃষ্ট অর্থ ও রৌপ্যমুদ্রা হইল উৎকৃষ্ট অর্থ এবং গ্রেসামের সূত্র অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু থাকিবে ও রৌপ্যমুদ্রা অন্তর্হিত হইবে।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজার হইতে বিতাড়িত হইতে পারে।

১। সঞ্চয়—Hoarding.

মানুষের স্বভাব হইল উৎকৃষ্ট অর্থ সঞ্চয় করা ও নিকৃষ্ট অর্থ দ্বারা লেনদেন করা। কোন লোকের নিকট নূতন ও পুরাতন দুই জাতীয় মুদ্রা থাকিলে লোকটি সাধারণতঃ নূতন মুদ্রা যত সময় সম্ভব নিজের কাছে রাখিতে চেষ্টা করে এবং পুরাতন মুদ্রাকে যথাসম্ভব সত্বর খরচ করে। এইরূপে নূতন মুদ্রার প্রচলন হ্রাস পায় ও পুরাতন মুদ্রা হস্তান্তরিত হইয়া বাজারে চালু থাকে।

২। গলানো—Melting.

স্বর্ণকারগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার প্রস্তুত করিবার জন্য ধাতব মুদ্রা গলাইয়া থাকে। পুরাতন মুদ্রা অপেক্ষা নূতন মুদ্রা গলাইয়া তাহারা অধিকতর

লাভবান হয়, কারণ নূতন মুদ্রায় পূর্ণ ওজনের ধাতু থাকে। উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি এইরূপে অলংকার নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তাহাদের প্রচলন হ্রাস পায়। ফলে বাজারে ক্ষয়প্রাপ্ত কম ওজনের নিকৃষ্ট মুদ্রার আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়।

৩। বিদেশে রপ্তানি—Exportation abroad. (Foreign payment)

বিদেশীরা কাগজী টাকায় অথবা প্রতীক অর্থে তাহাদের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করে না। তাহারা ধাতব মুদ্রায় তাহাদের প্রাপ্য দাবী করে। এইজন্য উৎকৃষ্ট মুদ্রা অর্থাৎ যাহার ধাতব মূল্য অধিক তাহা বিদেশে চলিয়া যায় এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা অর্থাৎ যাহার ধাতব মূল্য কম তাহা দেশের মধ্যে প্রচলিত থাকে।

উপরি-উক্ত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ বিতাড়িত হয় ও নিকৃষ্ট অর্থ বাজারে চালু থাকে।

কি কি অবস্থায় গ্রেসামের সূত্র কার্যকরী হয়—Conditions of Operation of Gresham's law.

গ্রেসামের সূত্র একটি অর্থনৈতিক সূত্র এবং অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই সূত্রটিও অনুমানসিদ্ধ অর্থাৎ ইহার কার্যকারিতা নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে এই সূত্রটি আর কার্যকরী হয় না।

১। প্রথমতঃ, জনসাধারণ যদি নিকৃষ্ট মুদ্রা লইতে আপত্তি না করে তাহা হইলে বাজারে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ অর্থই চালু থাকে এবং এরূপ ক্ষেত্রে গ্রেসামের সূত্র কার্যকরী হয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থ অন্তর্হিত হয় ও নিকৃষ্ট অর্থ চালু থাকে। কিন্তু লোকে যদি নিকৃষ্ট অর্থ লইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে বাজারে শুধু উৎকৃষ্ট অর্থ ই চালু থাকে।

২। বাজারে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা সমেত মোট অর্থপরিমাণ যদি বাজারের প্রয়োজনীয় অর্থপরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই সূত্রটি কার্যকরী হয়। ধরা যাউক, কোন একটি দেশের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৫০ কোটী টাকার প্রয়োজন এবং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অর্থ সমেত সেদেশে যদি ৬০ কোটী টাকা বাজারে চালু থাকে তাহা হইলেই এই সূত্রটি কার্যকরী হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থপরিমাণ অপেক্ষা বাজারে প্রচলিত সমগ্র অর্থপরিমাণ যদি কম

হয় বা সমান হয় তাহা হইলে আর এই সূত্রটি কার্যকরী হয় না—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ অর্থই ব্যবহৃত হইবে।

মুদ্রা-ব্যবস্থা—Monetary Systems.

একটি দেশে যেভাবে মুদ্রা চালু করা হয় এবং যে পদ্ধতিতে এই মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হয় তাহাকে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থাগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা (১) এক ধাতুমান (স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান) (Monometallism), (২) দ্বি-ধাতুমান (Bi-metallism) ও (৩) পরিচালিত কাগজীমান (Managed Paper Standard).

এক ধাতুমান—Monometalism.

দেশের প্রামাণিক অর্থ যখন স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একটি ধাতুর তৈয়ারী হয় এবং এই প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য ইহার ধাতব মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় তখন ইহাকে এক ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রৌপ্যমান চালু ছিল এবং ইংলণ্ডে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্ণমান চালু ছিল। বর্তমানে কোন দেশেই আর রৌপ্যমান দেখা যায় না।

দ্বি-ধাতুমান—Bi-metallism.

দ্বি-ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা উভয়েই প্রামাণিক মুদ্রারূপে বাজারে চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উভয়বিধ মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয় ও উভয়ের মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয়। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা থাকে। চতুর্থতঃ, সরকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করিয়া দেয়।

দ্বি-ধাতুমানের আর একটি প্রকার-ভেদকে অসম্পূর্ণ দ্বি-ধাতুমান (Limping Bi-metallism) বলা হয়। এই ব্যবস্থায়ও প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর তৈয়ারী হয় এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, স্বর্ণেরই অবাধ মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা থাকে, রৌপ্য মুদ্রাংকন সরকার ইচ্ছামত পরিচালিত করে। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণ

ও রৌপ্যের আনুপাতিক সংমিশ্রণ দ্বারা একটি প্রামাণিক মুদ্রা প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব মার্শাল কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এই সংযুক্ত মুদ্রামান (Symmetallism) দ্বারা মুদ্রার ধাতব মূল্য পরিবর্তনের ফলে যাহাতে মুদ্রামূল্য পরিবর্তিত না হয়, তাহার প্রতিকার সম্ভব হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনটির ধাতব মূল্য পরিবর্তিত হইলে মুদ্রাস্থিত উভয় ধাতুর পরিমাণ পরিবর্তিত করিয়া মুদ্রামূল্য অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়।

দ্বি-ধাতুমানের সুবিধা—Advantages of Bi-metallism.

১। দ্বি-ধাতুমানের সমর্থকগণ বলেন যে, এই ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব আনয়ন করে। প্রামাণিক অর্থ হিসাবে দুইটি ধাতু ব্যবহৃত হয় বলিয়া অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা কম এবং একটি ধাতু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপর ধাতুর তৈয়ারী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র মুদ্রা-পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখা যায়।

২। এই ব্যবস্থায় বহির্বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটে ও বহির্বাণিজ্যে আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। যে দেশে দ্বি-ধাতুমান প্রচলিত থাকে সে দেশ স্বর্ণমান দেশ ও রৌপ্যমান দেশ—উভয় দেশের সহিতই অনায়াসে বাণিজ্য করিতে পারে।

৩। দ্বি-ধাতুমান যদি সর্বদেশ কর্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে ইহা স্বর্ণমান অপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রদান করে। কারণ আন্তর্জাতিক দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বিনিময় হার অধিক পরিমাণে অপরিবর্তনীয় রাখিতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। দ্বি-ধাতুমানের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় গ্রেসামের সূত্র কার্যকরী হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিকৃষ্ট অর্থ চালু থাকে।

২। এই ব্যবস্থার আর একটি অসুবিধা হইল যে, পাওনাদারগণ স্বর্ণমুদ্রায় তাহাদের পাওনা দাবী করিতে পারে, অপর পক্ষে দেনাদার রৌপ্যমুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করিবার জিদ করিতে পারে। ফলে মুদ্রা-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

৩। দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যও স্থায়ী হয় না।

যদি একাধিক দেশ সম্মিলিতভাবে দ্বি-ধাতুমান প্রবর্তিত করে তাহা হইলেই এই মুদ্রা-ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিতে পারে। দ্বি-ধাতুমানের সাফল্য বহু

পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য এই উভয় ধাতুর সরকার-নির্ধারিত বিনিময়ের হার ও বাজারে বিনিময়ের হারের সমতার উপর নির্ভর করে। একটি মাত্র দেশের পক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের এই উভয় হারের সমতা স্থির রাখা দুঃসাধ্য।

স্বর্ণমান—Gold Standard.

স্বর্ণমান বলিতে এরূপ একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট হারে বিহিত মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্তিত করা যায়। এই ব্যবস্থায় অর্থমূল্য স্বর্ণমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্তনের সহিত অর্থমূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। স্বর্ণের সহিত অর্থের এই সম্পর্ক নানাভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। স্বর্ণমানের নানা প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে ধরণের স্বর্ণমান চালু ছিল, যুদ্ধোত্তর কালে তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটে। স্বর্ণের সহিত অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

১। স্বর্ণমুদ্রামান—Gold Currency Standard.

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে কতিপয় দেশে এই মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা-ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা, (ক) দেশের প্রামাণিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট ওজনের ও নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতাসম্পন্ন স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হইত। ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড মূল্যের একটি মুদ্রায় ২২৩'২৭৪৪ গ্রেণ স্বর্ণ থাকিত এবং এই স্বর্ণের ১২ ভাগের ১১ ভাগ বিশুদ্ধ ছিল। (খ) বাজারে চালু অন্যান্য মুদ্রা ও কাগজী নোট একটি নির্ধারিত হারে ইচ্ছামত স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাইত। (গ) স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা ছিল এবং অবাধভাবে স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি করা হইত।

২। স্বর্ণপিণ্ডমান—Gold Bullion Standard.

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিত স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই ব্যবস্থায় কোন স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু ছিল না বা স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাংকন ছিল না। কাগজী নোট ও প্রতীক মুদ্রাগুলি বিহিত মুদ্রা হিসাবে বাজারে চালু থাকিত এবং এই নোট ও প্রতীক মুদ্রাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ডে (Gold bar) পরিবর্তিত

করা যাইত। ইংলণ্ডে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এবং ভারতে ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বিনিময়ের ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণের ব্যবহার রহিত করিয়া স্বর্ণব্যবহারে মিতব্যয়িতা করা। এইজন্য দেশের স্বর্ণ শুধুমাত্র বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই পাওয়া যাইত। আভ্যন্তরীণ মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণ ব্যবহার না করিয়া ইহার অপচয় নিরোধ করা হইল।

৩। স্বর্ণবিনিময়মান—Gold Exchange Standard.

স্বর্ণপিণ্ডমানের ন্যায় এই ব্যবস্থায়ও কোন স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু থাকে না। বিহিত মুদ্রাগুলি সাধারণতঃ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়, কিন্তু স্বর্ণপিণ্ডমানের সহিত ইহার পার্থক্য হইল যে, স্বর্ণপিণ্ডমান ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষ একটি নির্ধারিত হারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে, কিন্তু স্বর্ণবিনিময়মানে কর্তৃপক্ষ দেশের বিহিত মুদ্রাকে স্বর্ণপিণ্ডে পরিবর্তিত না করিয়া পূর্ব-নির্ধারিত একটি হারে ভিন্ন দেশের স্বর্ণ-ভিত্তিক মুদ্রায় পরিবর্তিত করে। সুতরাং স্বর্ণ-বিনিময়মানে দেশের প্রামাণিক অর্থের মূল্য স্বর্ণ-মূল্যের সহিত গ্রথিত থাকিলেও কি আভ্যন্তরীণ কি বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় না। ১৮৯৮ হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে এই মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু ছিল।

৪। স্বর্ণতহবিলমান—Gold Reserve Standard.

ইহাও যুদ্ধোত্তরকালীন স্বর্ণমানের একটি প্রকারভেদ। এই ব্যবস্থায়ও স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে। কিন্তু বিদেশের সহিত বিনিময়-হারের সমতা রাখিবার জন্য একটি তহবিল (Exchange equalisation fund) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই তহবিল হইতে স্বর্ণ বা বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হারের সমতা সংরক্ষিত হইত।

স্বর্ণমানের সুবিধা—Advantages of Gold Standard.

১। স্বর্ণমানের প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় সহসা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না। দেশের মুদ্রা

পরিমাণ আভ্যন্তরীণ স্বর্ণপরিমাণের উপর নির্ভর করে বলিয়া স্বর্ণপরিমাণের বৃদ্ধি না হইলে মুদ্রা-পরিমাণ বর্ধিত হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না।

২। উৎকৃষ্ট মুদ্রা-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মুদ্রা-ব্যবস্থার সহজ প্রসারণ ও সংকোচন-শক্তি। স্বর্ণমানেই মুদ্রা-ব্যবস্থার সংকোচন ও প্রসারণ সম্ভব হয়, কারণ জনসাধারণ তাহাদের চাহিদা অনুসারে ইচ্ছামত কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিতে পারে বা স্বর্ণ লইতে পারে।

৩। স্বর্ণমানের প্রধান সুবিধা হইল যে, ইহা বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থায়ী রাখিতে পারে। বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রার ধাতব মূল্যের অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয় বলিয়া স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময়-হারের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না। স্থায়ী বিনিময়ের হার বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধনের বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়।

৪। স্বর্ণের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এইজন্য দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। স্বর্ণমুদ্রামান চালু রাখা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় কাগজী নোট দ্বারা যদি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহা হইলে যে অর্থ ও পরিশ্রম স্বর্ণমুদ্রামান চালু রাখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা অনায়াসে অন্য উৎপাদন-কার্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারে।

২। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য ও ব্যক্তিগত আয়ের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। এই ব্যবস্থায় একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হার অন্য দেশের ব্যাংকের বাট্টার হারের সমান রাখিতে হয়, নতুবা অপর দেশের উচ্চ বাট্টা হারের জন্য দেশ হইতে স্বর্ণরপ্তানীর সম্ভাবনা থাকে। স্বর্ণরপ্তানী রহিত করিবার জন্য বাধ্য হইয়া সেই দেশের বাট্টার হারও বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্যের উপর ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৩। কেইন্‌সের মতে যে সমস্ত দেশে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক হয় সে সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রবর্তিত থাকিলে মুদ্রা-কুঞ্চন (Deflation) ও বেকার-সমস্যা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় স্বর্ণ রপ্তানী হয় এবং স্বর্ণের রপ্তানী প্রতিরোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টার হার বৃদ্ধি করে। ফলে উৎপাদনে মূলধনের বিনিয়োগ-পরিমাণ হ্রাস পায় ও বেকার সমস্যার আবির্ভাব হয়।

পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থা বা কাগজী মান—Managed Currency or the Paper Standard.

পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় সর্বদেশেই প্রচলিত দেখা যায়। এই ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের অর্থ সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। স্বর্ণমূল্যের সহিত এই বিহিত অর্থের একটি সম্পর্ক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও এই বিহিত অর্থের মূল্য স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভরশীল নহে। বিহিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখে। ইহার জন্য কোন স্বর্ণতহবিল রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বা বিনিময় সমতা রক্ষা করিবার জন্য তহবিল সৃষ্টি করিয়া এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থায়ী রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, প্রত্যেক দেশ অন্যদেশ-নিরপেক্ষ-ভাবে তাহার মুদ্রাব্যবস্থা নিজ সুবিধামত পরিচালিত করিতে পারে। এই ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য কোনরূপ ব্যয়বহুল স্বর্ণতহবিল রাখিবারও প্রয়োজন হয় না। কেইন্‌সের মতে এই মুদ্রাব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হইল যে, সরকার ইচ্ছামত নূতন অর্থ সৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন সরকারী উদ্যম কার্যকরী করিয়া বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করিতে সক্ষম হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বর্ণের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বর্ণের প্রতি মানুষের এই স্বাভাবিক আকর্ষণের জন্য স্বর্ণসম্পর্ক-বিহীন কান মুদ্রাব্যবস্থাই মানুষের মনে মুদ্রাব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না। কাগজীমান প্রবর্তিত হইলে মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার ফলে মূল্য-

বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়ের হারেরও অত্যধিক পরিমাণ উত্থান-পতন ঘটে। এই উত্থান-পতন রোধ করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের লভ্যাংশের পরিমাণ যে ব্যাহত হয় তাহা অনস্বীকার্য।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থ—

একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যখন আর একটি দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয়, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ বিনিময় বলা হয়। আদিম যুগে বিনিময়ের এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার নিম্নলিখিত অসুবিধা ছিল—(১) প্রত্যক্ষ বিনিময় দ্বারা সকল রকম অভাব পূরণ করা যাইত না, (২) বিনিময়ের হারের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, ও (৩) অনেক দ্রব্যের বিভাজ্যতা না থাকার জন্য বিনিময়ের অসুবিধা হইত। এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম আবিষ্কৃত হয় এবং মূল্যবান ধাতু অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

উৎকৃষ্ট টাকা-কড়ির গুণাবলী—

যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে কোন দ্রব্য টাকা-পয়সা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুতে সেই গুণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গুণগুলি হইল :—

(১) সর্বজনগ্রাহ্যতা, (২) মূল্যের স্থায়িত্ব, (৩) দ্রব্যটির স্থায়িত্ব, (৪) সহজ বহনযোগ্যতা, (৫) দ্রবণীয়তা ও বিভাজ্যতা, (৬) সমজাতীয়তা ও (৭) সহজে চিনিবার যোগ্যতা।

যাহা সর্বজনগ্রাহ্য অর্থাৎ বিনা দ্বিধায় লোকে গ্রহণ করে ও যাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়, তাহাকে অর্থ বলা হয়।

অর্থের কার্যাবলী—

(১) বিনিময়ের মাধ্যম, (২) মূল্যের পরিমাপক, (৩) স্থগিত লেনদেনের মান ও (৪) মূল্যের ভাণ্ডার।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ—

অর্থকে সাধারণতঃ ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ধাতব মুদ্রা প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা—এই দুই ভাগে বিভক্ত। এইগুলিকে আবার অসীম বিহিত মুদ্রা ও সসীম বিহিত মুদ্রায় ভাগ করা হয়। দেশের মধ্যে বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয় তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। ইহার মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয় ও ইহার অবাধ মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা থাকে। প্রতীক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা অধিক থাকে। ইহা সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অবাধ মুদ্রাংকন হয় না।

কাগজী টাকার পরিবর্তে যখন ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায় তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হয়, কিন্তু কাগজী টাকা যখন আইনতঃ ধাতব-মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায় না তখন তাহাকে অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হয়।

কাগজী টাকার সুবিধা—

(১) ইহা সহজে বহনযোগ্য, সহজে বিভাজ্য ও সহজে চেনা যায়, (২) নোট ছাপিবার খরচ স্বল্প, (৩) ধাতুর ক্ষয়-ক্ষতিজনিত অপচয় বন্ধ করে, (৪) কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত ধাতু অন্য লাভজনক কার্যে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়, (৫) নবপ্রতিষ্ঠিত সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে।

অসুবিধা—

(১) ব্যবহারের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক। (২) মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জন্য দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। (৩) বিদেশে এই টাকার দ্বারা লেন-দেন সম্ভব নয়।

গ্রেসামের সূত্র—

এই সূত্র অনুসারে নিকৃষ্ট অর্থ সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট অর্থকে বিতাড়িত করে।

ইহার তাৎপর্য হইল যে, যদি (১) পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত টাকা ও নূতন টাকা, (২) কাগজী অর্থ ও ধাতব মুদ্রা এবং (৩) রৌপ্য টাকা ও স্বর্ণ টাকা একই সঙ্গে বাজারে চালু থাকে তাহা হইলে পুরাতন অর্থ, কাগজী টাকা ও রৌপ্য টাকা নূতন অর্থ, ধাতব মুদ্রা ও স্বর্ণ টাকার তুলনায় নিকৃষ্ট অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং এই নিকৃষ্ট অর্থই বাজারে চালু থাকে ও উৎকৃষ্ট অর্থ অপসারিত হয়।

উৎকৃষ্ট অর্থ বাজার হইতে অপসারিত হইবার কারণ হইল :—

(১) লোকজন কর্তৃক উৎকৃষ্ট অর্থের সঞ্চয়, (২) গলানো ও (৩) বিদেশে রপ্তানী। কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থ যদি লোকে গ্রহণ না করে এবং অর্থের পরিমাণ যদি অর্থের চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক না হয় তাহা হইলে এই সূত্রটি কার্যকরী হয় না।

মুদ্রাব্যবস্থা—

মুদ্রাব্যবস্থা এক-ধাতুমান বা দ্বি-ধাতুমান হইতে পারে। দেশের প্রামাণিক অর্থ যদি এক ধাতুতে তৈয়ারী হয় তাহা হইলে তাহাকে এক-ধাতুমান বলা হয় এবং প্রামাণিক মুদ্রা যদি দুই ধাতুর দ্বারা তৈয়ারী হয় তাহা হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতুমান বলা হয়। দ্বি-ধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার অবাধ মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা থাকে এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়।

স্বর্ণমান—

স্বর্ণমান হইল এক-ধাতুমান। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকালে বিভিন্ন দেশে যে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এবং স্বর্ণ-মুদ্রাই দেশের প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং প্রামাণিক মুদ্রার সকল বৈশিষ্ট্যই এই মুদ্রায় বর্তমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে যে স্বর্ণমানের আবির্ভাব হয় তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেশের প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য স্বর্ণমূল্যের সহিত সম্পর্কিত থাকিলেও আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না। বিদেশী ঋণপরিশোধকালে প্রচলিত প্রতীক মুদ্রার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ড অথবা বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইত। যে ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণের জন্য স্বর্ণপিণ্ড পাওয়া যাইত, তাহাকে স্বর্ণপিণ্ডমান বলা হইত

এবং যে ব্যবস্থায় এই স্বর্ণপিণ্ডের পরিবর্তে বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইত তাহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলা হইত।

বর্তমানে অধিকাংশ দেশ কাগজী মান প্রবর্তন করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. "Money is what money does." Explain this statement. (C. U. 1940)

2. Money has been classified in your textbook as follows :—

(i) Standard money ; (ii) Representative money ; (iii) Credit money :—

(a) Token money ; (b) Government Notes ; (c) Bank Notes.

Explain and illustrate this classification. (C. U. 1952)

3. Give a brief account of the different forms of Currency. (C. U. B. Com. 1949)

4. When is a country said to be on a gold standard? "There are degrees of gold standard." Illustrate the statement. (C. U. B. Com. 1947)

5. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard. (C. U. 1947)

6. What is Gresham's Law? Point out the different forms of its application and the conditions essential to its operation. (C. U. 1948)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋণ ও ঋণপত্র

(Credit and Credit Instruments)

ক্রেডিট্ (credit) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্বাস। ধনবিজ্ঞানে এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঋণদাতার যদি ঋণগৃহীতার সততা ও ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহা হইলে এই সততা ও ঋণপরিশোধ ক্ষমতাকেই ঋণগৃহীতার ক্রেডিট্ বলা যাইতে পারে এবং ক্রেডিটের বলেই ঋণগৃহীতা ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে অপরের মূল্যবান দ্রব্য অথবা অর্থ ব্যবহার করিতে পারেন। ধারে দুই প্রকারের কারবার হইতে পারে। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে মূল্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে দ্রব্যের বিক্রয় হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে পরিশোধ করিবার অংগীকারে বর্তমানে টাকা ধার করা যায়। নগদ কারবারের সহিত ধারের কারবারের প্রধান পার্থক্য হইল যে, নগদ কারবারে নগদ মূল্য দিয়া যৎতৎক্ষণাৎ দ্রব্য ক্রয় করা যায় এবং মূল্য প্রদান ও দ্রব্যপ্রাপ্তির সংগে সংগেই কারবারটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু ধারের কারবারে দ্রব্যটি নগদ মূল্যে বিক্রীত হয় না। বিক্রয়-সময়ের পরে ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য প্রদান করা হয়, সুতরাং বিক্রয়-কার্য ও মূল্য প্রদানের মধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কারবার ক্রেতা ও বিক্রেতার, দেনাদার ও পাওনাদারের পারস্পরিক সততা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

ঋণপত্র—Credit Instruments.

যখন ধারে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্রীতদ্রব্যের মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে ক্রয়-বিক্রয় কার্য পরিচালিত হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত সম্পর্কে একটা চুক্তি হয়। এই লিখিত চুক্তিপত্রই ঋণপত্র নামে অভিহিত হয়। এই ঋণপত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) এবং একই ঋণপত্র একাধিকবার কারবারে ব্যবহৃত হইতে পারে। চেক,

ড্রাফ্‌ট্‌, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া খ-এর নিকট হইতে যে হুণ্ডির বলে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায় করিতে পারে, সেই হুণ্ডির দ্বারা ক গ-এর নিকট তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

ঋণপত্রের প্রকার ভেদ—Different types of Credit Instrument.

ঋণপত্রের নানা প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। প্রতিশ্রুতি-পত্র—Promissory Note.

প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল একটি অংগীকারপত্র। কোন ব্যক্তি বিনা শর্তে চাহিবামাত্র অথবা একটা নির্ধারিত সময়ে ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে লিখিত অংগীকার করে, তাহাকে প্রতিশ্রুতি-পত্র বলা হয়। যদি প্রতিশ্রুতি-পত্র সম্পাদনকারীর সততা ও ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতা সন্দেহাতীত হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিশ্রুতি-পত্র হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নানা মূল্যের কাগজী নোট চালু হয়। এই নোটে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি লিখিত থাকে। সুতরাং এই নোটগুলিকেও প্রতিশ্রুতি-পত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই নোটগুলির বিশেষত্ব হইল যে, জনসাধারণের আর ইহার বিনিময়ে প্রামাণিক মুদ্রা চাহিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ নোটগুলি অর্থ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

২। হুণ্ডি—Bill of Exchange.

হুণ্ডি হইল একটি আজ্ঞাপত্র। বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া একটি নির্ধারিত সময়ে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিবার জন্য ক্রেতার উপর যে লিখিত আদেশ প্রদান করে, তাহাকে হুণ্ডি বলা হয়। যে ব্যক্তি মূল্য প্রদানের জন্য আদেশপত্রে স্বাক্ষর করে অর্থাৎ বিক্রেতা, তাহাকে হুণ্ডিদাতা (Drawer) বলা হয়। যাহার নামে হুণ্ডি কাটা হয় তাহাকে দেনাদার (Drawee) বলা হয়। হুণ্ডিতে লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে পাওনাদার (Payee) বলা হয়।

পরিশোধ করিবার সময়ের ব্যাপকতার দিক দিয়া হুণ্ডিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়; যথা, (ক) অবিলম্বে দেয় হুণ্ডি (Sight bill), (খ) স্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডি (Short bill) ও (গ) দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি (Time bill)।

যে হুণ্ডি দেনাদারের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র দেনা পরিশোধ করিতে

হয়, তাহাকে অবিলম্বে-দেয় হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডিতে লিখিত মূল্য যখন বিক্রয়ের ৭ দিন, বা ১৫ দিন পরে আদায় করা হয়, তখন তাহাকে স্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। আর, বিক্রয়ের ১ মাস, ২ মাস বা ৩ মাস পরে মূল্য দেয় হইলে, তাহাকে দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডিকে আবার দেশীয় (Internal) অথবা বিদেশীয় (Foreign) হুণ্ডি বলা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে আদেশপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই হইল দেশীয় হুণ্ডি, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হয় তাহা হইলে এই আজ্ঞাপত্র বিদেশী আজ্ঞাপত্র বলিয়া অভিহিত হয়। বিদেশী আজ্ঞাপত্র সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী হয় অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ২।৩ মাস সময় দেওয়া হয়।

প্রতিশ্রুতি-পত্র ও হুণ্ডির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল পরিশোধ করিবার একটি লিখিত অংগীকার, আর হুণ্ডি হইল বিক্রেতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ক্রেতার উপর একটি আদেশ। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র শুধুমাত্র দেনাদার ও পাওনাদারের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। দেনাদার হইল অংগীকারাবদ্ধ ব্যক্তি এবং পাওনাদার অংগীকার পূরণের দাবীদার। অপরপক্ষে হুণ্ডির ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থাৎ যে হুণ্ডি কাটে এবং ক্রেতা অর্থাৎ যাহার উপর হুণ্ডি কাটা হয় ব্যতীতও একজন তৃতীয় পক্ষ থাকিতে পারে। এই তৃতীয় পক্ষ হইল পাওনাদার অর্থাৎ যাহাকে দ্রব্যমূল্য প্রদান করিতে হয়।

৩। চেক—Cheque.

চেক হুণ্ডির মতই একটি লিখিত আজ্ঞাপত্র। ব্যাংকের আমানতকারী চেকে উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা চেক-বহনকারী ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র দিবার নির্দেশ দিয়া যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে চেক বলা হয়। চেক আজ্ঞাপত্র হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা ব্যক্তি কর্তৃক অর্থাৎ আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের উপর প্রদত্ত হয় এবং চেক ব্যাংকে উপস্থিত করিলেই চেকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ব্যাংককে দিতে হয়। কিন্তু চেক সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ নহে। ইহা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং চেক দ্বারা মূল্য প্রদান সম্পূর্ণ আদান-প্রদান নহে। সুতরাং চেক বিহিত অর্থ নহে।

৪। ড্রাফ্‌ট্‌—Draft.

একটি ব্যাংক অপর ব্যাংকের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে ড্রাফ্‌ট্‌ বলা হয়।

৫। ব্যাংক পরিচালিত নোট—Bank Notes.

চাহিবামাত্র বিহিত মুদ্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে ব্যাংক যে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে ব্যাংক নোট বলা হয়। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে।

৬। সরকারী নোট—Government Notes.

সরকারও অনেক সময় নোট প্রবর্তন করে, কিন্তু এই নোটগুলি সর্বত্র বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে।

৭। খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব—Book Credit.

ব্যবসায়িগণ যখন ধারে বিক্রয় করে অথবা ব্যাংক অগ্রিম ঋণ দান করে তখন এই বিক্রয় ও ঋণের হিসাব খাতায় লিখিত হয়। এই লিখিত হিসাব দেনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলেও আইনসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারগুলিও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বলিয়া ঋণপত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়।

ব্যাংক কর্তৃক চালু ঋণপত্র ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক চালু ঋণপত্র—Bank Credit and Commercial Credit.

চেক্‌, ড্রাফ্‌ট্‌ প্রভৃতি হইল ব্যাংক কর্তৃক চালু ঋণপত্র। এই ঋণপত্র দ্বারা চাহিবামাত্র ব্যাংক কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বাধ্য-বাধকতা সূচিত হয়। চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ সব সময়েই ব্যাংকের উপর প্রদত্ত হয়। চেক বা ড্রাফ্‌টে উল্লিখিত অর্থপরিমাণ আমানতকারীর ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ-পরিমাণের সমান যে-কোন পরিমাণ অর্থ হইতে পারে। চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ ব্যাংকে উপস্থিত করিবামাত্রই দেয়।

অপরপক্ষে, ব্যবসায়িগণ যে ঋণপত্র চালু করে তাহার ব্যবহার সাধারণতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইগুলি প্রতিশ্রুতি পত্র, হুণ্ডি বা দেনা-পাওনার হিসাব-খাতা বলিয়া পরিচিত। যখন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদক পাইকার ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে অথবা পাইকার খুচরা

বিক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, বা কোন ব্যবসায়ী সাধারণ ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, তখন এই ঋণপত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। এই ঋণপত্রগুলি সাধারণতঃ চেক বা ড্রাফ্‌টের মত উপস্থিত করা মাত্রই দিতে হয় না। এই ঋণপত্রগুলি আদান-প্রদানের মধ্যে একমাস হইতে তিন মাসের মত সময় অতিবাহিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বা ধার করা টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ এই জাতীয় ঋণপত্রে উল্লিখিত হইতে পারে না।

সুতরাং উভয় জাতীয় ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

১। চেক ব্যাংকের উপর প্রদত্ত হয় কিন্তু হুণ্ডি এক ব্যক্তি (বিক্রেতা) কর্তৃক অপর ব্যক্তির (ক্রেতার) উপর প্রদত্ত হয়।

২। চাহিবামাত্র চেকের টাকা দেয় কিন্তু হুণ্ডির টাকা হয় দর্শনমাত্র (at sight) অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে দিতে হয়।

৩। চেকের দ্বারা আদান-প্রদান সাধারণতঃ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, অপর পক্ষে হুণ্ডির দ্বারা দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ আদান-প্রদান সম্ভব।

৪। চেকের দ্বারা দেশী মুদ্রায় আদান-প্রদান হয় কিন্তু হুণ্ডির মারফৎ দেশী ও বিদেশী উভয় মুদ্রায়ই আদান-প্রদান চলিতে পারে।

৫। চেক দ্বারা দেয় অর্থ ব্যাংকের হিসাবে দেওয়া চলে (crossed cheque) কিন্তু হুণ্ডি এ ভাবে ব্যবহার করা চলে না।

৬। চেকের টাকা সময়মত আদায় না করিলেও চেকদাতা অর্থ দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পায় না অর্থাৎ যত সময় না পর্যন্ত চেক গৃহীতা চেক ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে তত সময় পর্যন্ত চেকদাতার ঋণ পরিশোধিত হয় না, অপরপক্ষে হুণ্ডি দাতা যদি সময়মত অর্থাৎ হুণ্ডিতে উল্লিখিত মেয়াদ অন্তে হুণ্ডি-গৃহীতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ না করে তাহা হইলে হুণ্ডিগৃহীতা ও তাহার জামিনদার দায় হইতে মুক্তি পায়।

ঋণের সুবিধা—Advantages of Credit.

১। ধার মূলধনের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার সহায়তা

করে। ধার-করা মূলধন দক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণকে ঝুঁকিপূর্ণ নূতন ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করে।

২। ধারদ্বারা মূলধন উদ্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট হইতে উদ্যমশীল ও দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ধারের সম্যক সদ্ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে।

৩। চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি ধাতব মুদ্রার ব্যবহারজনিত অপচয় নিবারণ করিয়া বিনিময়ের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৪। মূলধন-সঞ্চয় ও মূলধন-বিনিয়োগের উপর ধারের অসীম প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাংক প্রভৃতি ঋণ লেনদেনের প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে মূলধন-সঞ্চয়ে ও মূলধন-বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

৫। দূর দেশের সহিত আদান-প্রদানের ও বৃহৎ পরিমাণে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা অতি সহজেই অল্প সময়ে এবং অধিকতর নিরাপত্তার সহিত ঋণপত্র দ্বারা সম্পন্ন করা যায়।

ঋণের অসুবিধা—Disadvantages of Credit.

১। লোকে যখন ভোগ বা অপচয় উদ্দেশ্যে ধার করে, তখন তাহারা ক্রমশঃই অমিতব্যয়ী হয় এবং অমিতব্যয়িতা অর্থনৈতিক দুর্গতির একটি প্রধান কারণ।

২। উৎপাদন-ক্ষেত্রে সহজে ধার পাইবার ক্ষমতা উৎপাদককে নানারূপ অনিশ্চয়তাপূর্ণ উদ্যমে প্ররোচিত করে। ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

৩। ধারের প্রধান অসুবিধা হইল যে, যদি কর্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণে ঋণপত্র চালু করে বা ব্যাংকগুলি সহজেই ধার দেয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও অন্যান্য আনুষংগিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৪। অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিমাণ ধার দিবার ফলেই ব্যবসায় চক্র (Trade cycle) উপস্থিত হয়।

ঋণ ও মূলধন—Credit and Capital.

মূলধন বলিতে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ও উৎপাদনের অন্যান্য

সহায়ক সামগ্রী বুঝায়। এই অর্থে ঋণ মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ধারদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারের প্রধান কার্যকারিতা হইল যে, যাহারা মূলধনের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারে না ধারদ্বারা হস্তান্তরিত হইয়া তাহাদের সেই মূলধন যোগ্য ব্যক্তির অধীনে আসে এবং যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়া উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধার যদি শুধুমাত্র ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তাহা হইলে এই ধার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে না। ধার একজনের মূলধন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করে, সুতরাং ইহার দ্বারা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না, কে মূলধন ব্যবহার করিবে ধারদ্বারা শুধুমাত্র তাহাই নির্ধারিত হয়। চেক, ড্রাফ্‌ট্‌, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি মূলধনের প্রতিনিধি-মাত্র, তাহারা নিজস্বভাবে মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই ঋণপত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু এইগুলির দ্বারা উৎপাদনের যে সমস্ত সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করা যায় তাহারাই উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধার কখনও মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু ধার অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

মূল্যের উপর ঋণের প্রভাব—Influence of Credit on Price.

মূল্যের উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। মিল্‌ বলেন যে, ধারদ্বারা ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বিহিত অর্থের ন্যায় ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বিহিত অর্থ দ্বারা যেরূপ ক্রয় করা যায়, ধারদ্বারাও তদ্রূপ ক্রয় করা যায়; সুতরাং বিহিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি পায়, ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও অনুরূপভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে ওয়াকার বলেন যে, মূল্যের উপর ধারের আদৌ কোন প্রভাব নাই। কারণ এই বাকী লেনদেনগুলি শেষ পর্যন্ত শোধ হইয়া যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই ধারের জন্য কোন নূতন ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হয় না। ধার শুধু অর্থমূল্য প্রদানের সময় স্থগিত রাখে।

মূল্যের উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে মিল্‌ ও ওয়াকার যে মত প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থ শুধু ক্রয়-ক্ষমতা নহে, ইহার দ্বারা ঋণ পরিশোধও করা যায়। কিন্তু ধারদ্বারা শুধু ক্রয় করা যায়, ঋণ পরিশোধ করা যায় না। ধার পরিশোধ করিবার নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিহিত অর্থ জমা রাখিতে হয় এবং এই গচ্ছিত অর্থ ক্রয়-কার্যের জন্য ব্যয় করা যায় না। ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়-ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একদিকে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ ধার শোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ ক্রয় কার্যের জন্য না পাওয়ার ফলে ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হ্রাস পায় ও মূল্যহ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ধারে যে পরিমাণ লেনদেন হয়, ধার পরিশোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ-পরিমাণ তদপেক্ষা কম, কারণ ধারের দ্বারা যে পরিমাণ লেনদেন হয় তাহার সবটাই অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা হয় না। এই লেনদেনের একটা অংশ সব সময়ই অপরিশোধিত থাকিয়া যায়। এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধারে যে পরিমাণ লেনদেন হয়, সে পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হয় না, শুধুমাত্র অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য-বৃদ্ধি পায়। অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যের উপর তাহার যেরূপ সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, ধারপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যের উপর তাহার প্রভাব তদপেক্ষা কম।

সংক্ষিপ্তসার

ধার শোধ করিবার সততা ও ক্ষমতাকে ক্রেডিট্ বলা হয়। সুতরাং সমস্ত বাকী কারবার ঋণদাতা ও ঋণগৃহীতার পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাসের বলেই ভবিষ্যতে মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে একজনে অপরের মূল্যবান দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে।

ঋণপত্রের প্রকারভেদ—

ঋণের আদান-প্রদান কতকগুলি নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এইগুলিকে ঋণপত্র বলা হয়। ব্যাংক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ এই ঋণপত্রগুলি সৃষ্টি করে।

প্রতিশ্রুতি-পত্র, হুণ্ডি, চেক, ড্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি হইল এই ঋণপত্র। ধারের সুবিধা হইল যে, ইহা (১) মূলধনের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে, (২) মূলধন যোগ্য

ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত করে, (৩) ধাতব মুদ্রার ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে ও (৪) মূলধন-সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

ধারের অসুবিধা হইল যে, ইহা (১) ভোগে প্রযুক্ত হইলে মূলধনের অপচয় ঘটে, (২) সহজে ধার পাইবার সুবিধা উৎপাদনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করে, (৩) ধারদ্বারা মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং (৪) ব্যবসায়-চক্র উপস্থিত হয়।

ঋণ ও মূলধন—

ধার ও মূলধন একার্থবোধক নহে। ধারদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদনের সহায়ক উপাদানগুলি সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ধারদ্বারা মূলধন হস্তান্তরিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবসায়ী দ্বারা উৎপাদনে প্রযুক্ত হইয়া অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি করে।

মূল্যের উপর ধারের প্রভাব—

অর্থ ক্রয় করিতে পারে এবং ঋণ পরিশোধ করিতে পারে—ইহা উভয় ক্ষমতারই অধিকারী। কিন্তু ধার শুধু ক্রয় করিতে পারে, ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। ধার দ্বারা ক্রয়কার্য হইলে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহা ক্রয়কার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হ্রাস হওয়ার ফলে মূল্যহ্রাস হয়। কিন্তু যে পরিমাণ ধার করা হয় সে পরিমাণ শোধ হয় না। সব সময়েই একটা অপরিশোধিত পরিমাণ ধার থাকিয়া যায় এবং অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নাবলী

1. What is Credit? Show how credit can be used as a medium of exchange. (C. U. 1941)
2. What are credit instruments? Discuss their utility. (C. U. 1945)
3. What is Money? Are cheques money? Give reasons for your answer. (C. U. 1950)
4. Distinguish between *bank credit* and *commercial credit*. Show how they serve out society. (C. U. 1953)
5. Distinguish between credit and cash and explain how credit effects an economy of cash. (C. U. B. Com. 1949)
6. Examine the influence of credit on prices. (C. U. 1932)

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থের মূল্য

(Value of Money)

অর্থের মূল্য বলিতে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায়। এক একক অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে, তাহা দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়, অপরপক্ষে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বা অর্থমূল্য এবং দ্রব্য-মূল্যের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, তখন দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়; অপরপক্ষে অর্থমূল্য হ্রাস পাইলে অর্থাৎ যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা অপেক্ষাকৃত কমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়, তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থের মূল্য সম্পর্কে আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, এই অর্থমূল্য দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, (১) **আভ্যন্তরীণ মূল্য (Internal value)**, (২) **বহিঃমূল্য (External value)**। আভ্যন্তরীণ মূল্যের অর্থ হইল দেশের মধ্যে দ্রব্য ও কাজ ক্রয় করিবার ক্ষমতা, আর বহিঃমূল্যের অর্থ হইল বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) ক্রয় করিবার ক্ষমতা। অর্থের এই উভয় প্রকার মূল্য একই দিকে চলে অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ মূল্যও বহিঃমূল্য একই সংগে বাড়ে বা কমে। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্নভাবে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল অর্থমূল্যের এই হ্রাস-বৃদ্ধি কি ভাবে স্থির করা যায়?

সূচক সংখ্যা—Index numbers.

অর্থের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিবর্তন পরিমাপ করিবার জন্য সূচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকরা কত

পরিবর্তন হইয়াছে তাহা সূচক সংখ্যা সাহায্যে স্থির করা সম্ভব হয়। সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করিবার জন্য (১) প্রথমতঃ, একটি বিশেষ বৎসর অথবা নির্দিষ্ট কালকে ভিত্তি হিসাবে ধরিতে হয় (Base year); (২) দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ফর্দ প্রস্তুত করিতে হয় এবং (৩) এই নির্বাচিত দ্রব্যগুলির চল্‌তি দর সংগ্রহ করিতে হয়। (৪) পরবর্তী কালের অর্থাৎ যে সময়ের অর্থমূল্যের পরিবর্তন জানিতে চাওয়া হয় তখন ঐ ঐ দ্রব্যের দামের ভিত্তি-কালের দামের সহিত শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার তুলনা করা হয়। (৫) সর্বশেষে এই পরবর্তী কালের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ঐ সময়ের গড়পড়তা দর পাওয়া যায়। এই সংখ্যাই হইল সূচক সংখ্যা। ভিত্তি কালের সূচক সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরপক্ষে, পরবর্তী কালের সূচক সংখ্যা যদি কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটির দ্বারা সূচক সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

দ্রব্য	ভিত্তিবৎসর (১৯৩৮)		পরবর্তী কাল (১৯৪৫)	
	মূল্য		মূল্য	
চাউল প্রতিমণ	৫৲	১০০	১৫৲	৩০০
ডাইল „	৩৲	১০০	৬৲	২০০
চিনি „	৫৲	১০০	১২॥০	২৫০
গম „	৪৲	১০০	৯৲	২২৫
কাপড় প্রতিজোড়া	৫৲	১০০	১১৲	২২০
মোট দর		৫০০÷৫		১১৯৫÷৫
গড় দর		=১০০		=২৩৯

উপরি-প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, ১৯৩৮ সালে দ্রব্যগুলির গড়পড়তা দর ছিল ১০০, অপর পক্ষে ১৯৪৫ সালের গড়পড়তা দর হইল ২৩৯। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ভিত্তি বৎসর হইতে পরবর্তী কালের দ্রব্য

মূল্যের গড়পড়তা দর ২৩৯ – ১০০ = ১৩৯ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ঐ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

গুরুত্ব-প্রদত্ত সূচক সংখ্যা—Weighted Index numbers.

উপরি-প্রদত্ত সূচক সংখ্যার গঠন-প্রণালী নির্ভুল হইতে পারে না, কারণ উক্ত প্রণালীতে গঠিত সূচক সংখ্যা দ্রব্যগুলির উপযোগিতা নিরপেক্ষভাবে সকল দ্রব্যেই সমান গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যের উপযোগিতা সমান নহে। ডাইল অপেক্ষা চাউলের উপযোগিতা অনেক বেশী। সুতরাং ডাইলের মূল্য অর্ধেক হইয়া চাউলের মূল্য যদি দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে গড়পড়তা মূল্য সমান থাকিলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লোকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগিতার তারতম্যের ভিত্তিতে দ্রব্যগুলিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করিলে সূচক সংখ্যা অর্থমূল্যের পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ প্রকাশ করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি চাউলের উপযোগিতা ডাইলের উপযোগিতা অপেক্ষা তিন গুণ অধিক ধরা যায় তাহা হইলে চাউলের মূল্যকে তিন দ্বারা গুণ করিতে হইবে ও ডাইলের মূল্যকে এক দিয়া গুণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটির দ্বারা সমুচিত গুরুত্ব-প্রদত্ত সূচক সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর (১৯৩৮)		পরবর্তী কাল (১৯৪৫)	
	মূল্য	মূল্য × গুরুত্ব	মূল্য	মূল্য × গুরুত্ব
চাউল	৫৲	১০০ × ৩ = ৩০০	১৫৲	৩০০ × ৩ = ৯০০
ডাইল	৩৲	১০০ × ১ = ১০০	৬৲	২০০ × ১ = ২০০
চিনি	৫৲	১০০ × ২ = ২০০	১২॥০	২৫০ × ২ = ৫০০
গম	৪৲	১০০ × ১ = ১০০	৯৲	২২৫ × ১ = ২২৫
কাপড় প্রতিজোড়া	৫৲	১০০ × ১ = ১০০	১১৲	২২০ × ১ = ২২০
মোট		৮০০		২০৪৫
গড়		৮০০ ÷ ৮ = ১০০		২,০৪৫ ÷ ৮ = ২৫৫·৬

২৫৫·৬ সংখ্যাটি হইল সমুচিত গুরুত্ব-প্রদত্ত সূচক সংখ্যা। উপরি-উক্ত উদাহরণে অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা চাউলে তিন গুণ, ও চিনিতে দ্বিগুণ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

সূচক সংখ্যা গঠন-প্রণালীর অসুবিধা—Difficulties in the construction of Index numbers.

নির্ভুলভাবে সূচক সংখ্যা গঠন করিবার নানাবিধ অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা হইল ভিত্তি বৎসর নির্ধারণ করা। সঠিকভাবে ভিত্তি বৎসর নির্ধারণ না করিতে পারিলে ভিত্তি বৎসরের দ্রব্যমূল্যের সহিত পরবর্তী কালের দ্রব্য-মূল্যের তুলনা করিয়া যে সূচক সংখ্যা পাওয়া যায় তাহা অর্থের ক্রয়-ক্ষমতার নির্ভুল পরিমাপক হইতে পারে না। এইজন্য অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খলা-মুক্ত কোন স্বাভাবিক বৎসরকে ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ১৯১৩-১৪ বা ১৯৩৮-৩৯ সালকে এইরূপ স্বাভাবিক বৎসর বলা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার কতিপয় বৎসরের গড় লইয়া এই ভিত্তি বৎসর স্থির করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য-পরিবর্তন পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে যত অধিক সংখ্যায় দ্রব্য লওয়া যায়, সূচক সংখ্যা ততই নির্ভুল হয়। দ্রব্যনির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যে সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রার ব্যয় মূল্যপরিবর্তনের ফলে কি পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য সূচক সংখ্যা গঠিত হয়, দ্রব্যনির্বাচন কালে সেই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত শুধুমাত্র সেই দ্রব্যগুলিই নির্বাচন করিতে হইবে। শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার খরচের পরির্তন জানিতে হইলে ঘি, সিগারেট বা সরু চাউল নির্বাচন করিলে এই দ্রব্যগুলির ভিত্তিতে গঠিত সূচক সংখ্যা দ্বারা শ্রমজীবীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। তৃতীয়তঃ. দ্রব্যমূল্য সংগ্রহকালেও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। বাজারে পাইকারী, খুচরা বা স্থানীয় দর প্রচলিত থাকিতে পারে। মূল্য সম্পর্কে তথ্য আহরণ কালে সূচক সংখ্যা গঠনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রচলিত বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্য সূচক সংখ্যা গঠনে প্রয়োগ করিতে হইবে। জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কিত সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যই সূচক সংখ্যা গঠনের সহায়ক হয়। কারণ স্বল্প আয়ের লোকজন একসঙ্গে অল্পপরিমাণ দ্রব্য খুচরা দরে ক্রয় করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত

ব্যবহার্য দ্রব্যের উপযোগিতা যত বেশী সে সমস্ত দ্রব্যে সেই পরিমাণে গুরুত্ব প্রদান না করিলে সূচক সংখ্যা নির্ভুল হয় না।

উপরি-উক্ত বাস্তব অসুবিধাগুলি ব্যতীতও সূচক সংখ্যা গঠনের কয়েকটি তত্ত্বগত অসুবিধা দেখা যায়। মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিলে সকল লোক বা সকল সম্প্রদায় একই ভাবে প্রভাবান্বিত হয় না। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গালীর যতটা অসুবিধা হয়, একজন অবাঙ্গালীর ততটা অসুবিধা হয় না। সুতরাং একই সূচক সংখ্যার সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব সঠিকভাবে জানা যায় না। এজন্য পৃথক পৃথক সূচক সংখ্যা গঠন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সকল দ্রব্যসমষ্টি ব্যবহার করি, পরবর্তী কালে এই দ্রব্যসমষ্টির কতকগুলির প্রয়োজনের গুরুত্ব দৈনন্দিন জীবনে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং সময়ের ব্যবধানের ফলে দ্রব্যের উপযোগিতার পরিবর্তন ঘটে এবং এই কারণে মূল্য পরিবর্তনের ফলে আমাদের জীবনযাত্রার মান কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। দ্রব্যের গুরুত্ব পরিবর্তন ছাড়াও দেশ-ভেদেও এই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের গুণ সচরাচর পরিবর্তিত হয়। পূর্বের পাইলট্ কলম ও বর্তমানের পাইলট্ কলমের নাম অভিন্ন হইলেও ইহাদের গুণের পার্থক্য রহিয়াছে। এরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সূচক সংখ্যা দ্বারা অর্থ মূল্যের পরির্তনের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সূচক সংখ্যা দ্বারা কেবলমাত্র অর্থের ক্রয়শক্তি পরিবর্তনের একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব।

সূচক সংখ্যার কার্যকারিতা—Utility of Index numbers.

সূচক সংখ্যার সাহায্যে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সূচক সংখ্যার উপযোগিতা শুধুমাত্র দ্রব্যমূল্য-পরিবর্তনের পরিমাপ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, বস্তুতঃ দ্রব্যমূল্য-পরিবর্তনের পরিমাপ ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনযাত্রার খরচের হ্রাস-বৃদ্ধিও সূচক সংখ্যার দ্বারা পরিমাপ করা যায়। এতদ্ব্যতীত সূচক সংখ্যার সাহায্যে

মজুরি, আমদানী, রপ্তানী, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতির পরিবর্তনের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। সূচক সংখ্যার সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলি সম্পর্কে ধারণা করিয়া তৎসম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ধারিত মূল্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন সময়ে একই শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য সূচক সংখ্যার দ্বারা জানিতে পারা যায়। ঋণদাতা ও ঋণগৃহীতার সম্পর্কও সূচক সংখ্যার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

অর্থের মূল্য—The Value of Money.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারা যায় তাহাই হইল অর্থের মূল্য। অর্থের এই ক্রয়-ক্ষমতা দ্রব্যমূল্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থ তখন কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে—সুতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলিয়া অর্থের মূল্যও হ্রাস পায়। বিপরীতভাবে যখন দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় তখন অর্থ অধিকপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে—সুতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া অর্থের মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

অর্থের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা, (১) অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব ও (২) সঞ্চয়-বিনিয়োগতত্ত্ব।

(১) অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব—The Quantity Theory of Money.

অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব অনুসারে অর্থের মূল্য প্রচলিত অর্থপরিমাণের উপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়: অর্থের পরিমাণ অনুসারে অর্থের মূল্য বিপরীতমুখে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণিত হয় তাহা হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় এবং দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হয়, অপরপক্ষে অর্থের পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তাহা হইলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণিত হয় ও দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হয়। সুতরাং অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাইলে

আনুপাতিক হারে অর্থের মূল্যের হ্রাস হয় অর্থাৎ আনুপাতিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট হারে হ্রাস পাইলে আনুপাতিক হারে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আনুপাতিক হারে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা অর্থ দ্বারা বিনিময়-কার্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদার পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ বিনিময় করা হয়, সেই পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা ও অর্থের চাহিদার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা হইল প্রত্যক্ষ চাহিদা (Direct demand)। এই চাহিদা। দ্রব্যটির উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। চাউলের চাহিদা প্রত্যক্ষ চাহিদা কারণ চাউল প্রত্যক্ষভাবে মানুষের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করে। কিন্তু অর্থের চাহিদা চাউলের চাহিদার ন্যায় প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে—ইহা হইল পরোক্ষ চাহিদা (Indirect or Derived demand)। অর্থ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন অভাব পূরণ হয় না। অর্থ অভাব পূরণের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া পরোক্ষভাবে অভাব পূরণ করে। সুতরাং অর্থের চাহিদা বলিলে অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায় তাহার চাহিদা বুঝায়। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও অর্থের চাহিদা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইতে পারে। অর্থের চাহিদার পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় পরিবর্তিত হয় না, কারণ স্বল্প-মেয়াদী সময়ে অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় অর্থের চাহিদার পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে অর্থের মূল্য ইহার যোগানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। অর্থের চাহিদার পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায়, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়; পক্ষান্তরে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দ্রব্যটির যোগানের পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু দ্রব্যটির মূল্যের পরিবর্তন দ্রব্যটির যোগানের

পরিবর্তনের সমানুপাতিক নাও হইতে পারে। চাউলের যোগান যদি দ্বিগুণিত হয় তাহা হইলে চাউলের মূল্য হ্রাস পায়, কিন্তু মূল্য হ্রাস পাইয়া যে অর্ধেক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ চাউলের যোগান বৃদ্ধি পাইলে চাউলের চাহিদা অপরিবর্তনীয় থাকে না, চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং যোগান বৃদ্ধির অনুপাতে চাউলের মূল্য হ্রাস পায় না কারণ সংগে সংগে চাউলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে যেহেতু অর্থের চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তিত ধরিয়া লওয়া হয় সেইহেতু অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণিত হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় এবং অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হইলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু অর্থের চাহিদার পরিমাণ যদি সংগে সংগে বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে অর্থের পরিমাণের সহিত অর্থের মূল্যের এইরূপ সমানুপাতিক বিপরীতমুখী সম্পর্ক হইত না।

অর্থের মূল্য সম্পর্কে উপরি-উক্ত পরিমাণ-তত্ত্ব অনুমানসিদ্ধ মাত্র। অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের সত্যতা বহুল পরিমাণে অন্যান্য অবস্থার অপরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই অন্যান্য অবস্থাগুলি কি এবং এই অবস্থাগুলি বাস্তবিকই পরিবর্তনীয় কিনা তাহা আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য অপরিবর্তনীয় অবস্থা বলিতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিকে বুঝায়ঃ

১। অর্থের চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় থাকিলে অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব কার্যকরী হয়। অর্থের চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় হইতে হইলে (ক) জনসংখ্যা অপরিবর্তনীয় থাকিতে হইবে, (খ) মাথা-পিছু উৎপাদন-পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে, (গ) উৎপাদকগণ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে, (ঘ) উৎপাদিত দ্রব্যগুলির প্রত্যক্ষ বিনিময়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে, (ঙ) দ্রব্যগুলির গতিক্ষিপ্রতা অপরিবর্তনীয় থাকিতে হইবে। উপরি-উক্ত অবস্থাগুলির যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে অর্থের চাহিদার পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটিবে।

২। অর্থের গতিক্ষিপ্রতা অর্থাৎ অর্থ যতবার ক্রয়-বিক্রয় করে (Velocity of circulation of Money) তাহা অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে। যদি অর্থের গতিক্ষিপ্রতার পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে অর্থের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

৩। ঋণপত্রগুলির (Credit Instruments) অর্থ হিসাবে ব্যবহারের পরিমাণও অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে। যদি চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি টাকা হিসাবে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায়; আবার, এইগুলি যদি কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অর্থপরিমাণ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত অর্থের গতিক্ষিপ্রতার ন্যায় এই ঋণপত্রগুলিরও গতি-ক্ষিপ্রতা আছে এবং এই গতিক্ষিপ্রতাও অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে।

৪। মূল্যবান ধাতুগুলি যে পরিমাণে সঞ্চিত ও শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণও অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে।

অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব অনুসারে অর্থের মূল্য অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আধুনিককালে কোন দেশের মোট অর্থের পরিমাণ শুধুমাত্র বিহিত মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, যে পরিমাণ ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাও বিহিত মুদ্রার সহিত যোগ দিতে হইবে। বিহিত মুদ্রা ও ঋণপত্রের পরিমাণকে এই উভয়ের গতিক্ষিপ্রতার দ্বারা গুণ করিলে মোট অর্থপরিমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকান ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক আরভিং ফিসার একটি সমীকরণ দ্বারা অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফিসার-প্রদত্ত সমীকরণটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

$$ম = \frac{অ \times গ + ঋ \times গ'}{স}$$

$$ম = \frac{অগ + ঋগ'}{স} \left(P = \frac{MV + M'V'}{T} \right)$$

উপরি-উক্ত সমীকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির তাৎপর্য হইল:

ম = মূল্য (Price = P)

অ = বিহিত অর্থ (Legal Tender Money = M)

গ = বিহিত অর্থের গতিক্ষিপ্রতা অর্থাৎ এক একক অর্থ যতবার হস্তান্তরিত হইয়া ক্রয়-বিক্রয় করে (Velocity of circulation of Money = V)

ঋ = ঋণপত্র (Credit Money = M′)

গ′ = ঋণপত্রের গতিক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of credit Money = V′)

স = মোট সামগ্রী (Transaction to be performed by Money = T)

অধ্যাপক ফিসারের মতে মোট সামগ্রী পরিমাণ, বিহিত অর্থ ও ঋণ-পত্রের পরিমাণ স্বল্পমেয়াদী কালে অপরিবর্তিত থাকে। বিহিত অর্থের অনুপাতে ঋণের পরিমাণও অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং বিহিত অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে মূল্যের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ অর্থপরিমাণের পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে অর্থমূল্যের বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে।

কেম্ব্রিজ সমীকরণ—The Cambridge Equation.

ফিসার তাঁহার সমীকরণে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের কারণ হিসাবে অর্থের যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু মার্শাল, পিগু, কেইনস্ প্রভৃতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানী এ বিষয়ে টাকাকড়ির যোগান অপেক্ষা টাকাকড়ির চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। কেম্ব্রিজ সমীকরণ অনুসারে বলা হয় যে, অর্থের চাহিদা বলিতে সেই পরিমাণ অর্থ বুঝা যায় যে পরিমাণ লোকে লেন-দেন ও আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য নগদ টাকা অথবা ব্যাংকে জমা হিসাবে রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নগদ মজুদ অর্থ যোগ করিয়া সমগ্র জনসমষ্টির নগদ মজুদ অর্থের পরিমাণ পাওয়া যায়। ফিসারের মতে বিনিময়-যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয়, কিন্তু কেম্ব্রিজ সমীকরণ অনুসারে বলা হয় যে, মোট দ্রব্য সামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ বিক্রয় বা বিনিময় উদ্দেশ্যে লোকের অর্থের চাহিদা হয়। কেম্ব্রিজ-তত্ত্বকে নিম্নলিখিত সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা যায়।

$$P = \frac{M}{KR}$$

R = জনসমষ্টির বাৎসরিক আসল আয়।

M = অর্থের পরিমাণ

K = আসল আয়ের যে অংশ লোকে নগদ অর্থ হিসাবে রাখিতে চায়

P = উৎপন্ন সম্পদের গড়পড়তা মূল্য

সুতরাং দেখা যায় যে, M পরিমাণ অর্থ দিয়া লোকে KR পরিমাণ দ্রব্য

ক্রয় করিতে চাহে। অর্থের মূল্য বলিলে বুঝা যায় যে, কি পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়,

অর্থাৎ $\frac{KR}{M}$।

অর্থমূল্য ও দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক হইল বিপরীতমুখী। সুতরাং $\frac{KR}{M}$ সমীকরণটিকে বিপরীতভাবে স্থাপন করিলে মূল্যস্তর বা P পাওয়া যায়।

ফিসার-প্রদত্ত সমীকরণ ও কেম্ব্রিজ সমীকরণের মধ্যে কার্যতঃ কোন মূলগত পার্থক্য নাই, কাজেই এই দুইটি সমীকরণের বিরুদ্ধে একই সমালোচনা প্রযোজ্য। ফিসার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় কৃত সকল দ্রব্যের গড়পড়তা দাম (অর্থমূল্য) নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপরপক্ষে কেম্ব্রিজ ধনবিজ্ঞানীগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভবিষ্যতে লেন-দেনের উদ্দেশ্যে হাতে জমা রাখা অর্থের মূল্য স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের সমালোচনা—Criticism of the Quantity Theory of Money.

অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব সম্পর্কে এ যাবৎ নানা সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, এই তত্ত্বটির সত্যতা অনেকগুলি অবস্থার অপরিবর্তনীয়তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই অবস্থাগুলি অপরিবর্তিত থাকে না। অর্থ ও ঋণপত্রের গতিক্ষিপ্রতা এবং মোট সামগ্রীর পরিমাণ সচরাচর পরিবর্তিত হয় এবং ইহার একটির পরিবর্তন ঘটিলে অন্যগুলির উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দেশে মোট সামগ্রী-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটিলে সামগ্রী ও অর্থ উভয়ের গতিক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ কথা সব সময়ে সত্য নহে। দেশের প্রাকৃতিক বা অন্য সম্পদগুলির যদি পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত সম্পদগুলির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ফলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধি না হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, এই সূত্র অনুসারে দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্য হ্রাস হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের মুদ্রা-ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঋণপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বিহিত অর্থ ও ঋণপত্র—এই উভয়ের সমষ্টি লইয়া গঠিত সমগ্র অর্থপরিমাণ দ্রব্যপরিমাণের উপর নির্ভর করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, অর্থের মূল্য অর্থাৎ ক্রয়-ক্ষমতা তথা দ্রব্যমূল্য অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, অধিকন্তু অর্থের পরিমাণ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি ফল তাহা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

চতুর্থতঃ, অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, অর্থের পরিমাণ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও অন্য নানাকারণে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার পরিবর্তন ঘটিলে উৎপাদন-খরচার পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং উৎপাদন-খরচার পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যমূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নানা অসংগতি থাকা সত্ত্বেও অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব অর্থের মূল্যসম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের আরও নানা কারণ আছে এবং অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব দ্বারা সেই কারণগুলি ব্যাখ্যাত না হইলেও মূল্যের উপর অর্থের পরিমাণ যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব তাহা বিশদভাবে পর্যালোচনা করে। অর্থের পরিমাণ যে দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহা একটি অনস্বীকার্য সত্য। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূল্যস্তর—Saving, Investment and Price-level.

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিমাণের

উপরই মূল্যস্তর নির্ভর করে। লোকে যে পরিমাণ আয় করে তাহার সবটাই ব্যয় করিতে পারে অথবা কিছুটা ব্যয় করিতে পারে এবং বাকীটা সঞ্চয় করিতে পারে। মোট আয়-পরিমাণ হইতে মোট ব্যয় পরিমাণ বাদ দিলে মোট সঞ্চয় পরিমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে একটি দেশের সকল ব্যক্তির সঞ্চয় পরিমাণ যোগ দিয়া মোট জাতীয় সঞ্চয় পরিমাণ পাওয়া যায়।

যদি একটি দেশের সকল ব্যক্তিই অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য কমিবে। সুতরাং সঞ্চয় পরিমাণ বাড়িলে মূল্যস্তর হ্রাস পায়।

এখন দেখা যাউক, মূল্যস্তরের উপর বিনিয়োগ পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলাফল কি।

ধনবিজ্ঞানে বিনিয়োগ শব্দটির অর্থ হইল মূলধন দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করা। বিনিয়োগ পরিমাণ বাড়িলে এই সমস্ত মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে, এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন কার্যে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হয় ও তাহাদের আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বিনিয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আয় বৃদ্ধি হয় এবং আয় বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তর ঊর্ধ্বাভিমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিনিয়োগ পরিমাণ বাড়িলেই যে মূল্যস্তর বাড়িবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

বিনিয়োগ বাড়িলে যেখানে লোকে বেকার থাকে সেখানে লোকে নূতন কাজ পায়। যতই বিনিয়োগ পরিমাণ বাড়ে ততই যন্ত্রপাতির বিক্রয় বাড়ে ও নূতন নূতন উৎপাদন বাড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাতে লোকের আয় বাড়ে এবং এই আয় ভোগ্য-দ্রব্যের উপর ব্যয় হয়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে এবং এই নূতন উৎপাদনে নূতন লোকের কর্ম-সংস্থান হয়। সুতরাং বিনিয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে আয় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ফলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি উৎপাদন পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য পরিবর্তিত নাও হইতে

পারে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি যখন শেষ সীমায় উপস্থিত হয়—যখন সকল লোকেরই কর্মসংস্থান হয়, তখন বিনিয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াও আর উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full employment) পর যদি বিনিয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না বলিয়া মূল্যস্তর ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়।

মুদ্রাস্ফীতি—Inflation.

ধনবিজ্ঞানে মুদ্রাস্ফীতি শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এত বিভিন্ন কারণে এই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে যে, ইহার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। যখন বিনিময়ের মাধ্যমের অর্থাৎ টাকাকড়ির চাহিদার তুলনায় সমগ্র অর্থপরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, এই বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হইয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির উপরি-উক্ত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, টাকাকড়ির চাহিদার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একমাত্র মূল্যের ঊর্ধ্বাভিমুখী গতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি সূচিত হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিই মূল্যের এই ঊর্ধ্বাভিমুখী গতির অর্থাৎ উত্থানের একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত অন্য নানাকারণে মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধিজনিত কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতিকে দায়ী করা যায় না। উৎপাদন-খরচা হ্রাস পাইলেও অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে যখন মূল্য হ্রাস না করা হয় তখনও দেশে মুদ্রাস্ফীতির সব লক্ষণই দেখা যায়। উৎপাদন-খরচার অনুপাতে মূল্যের এই আধিক্যও মুদ্রাস্ফীতির ফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যখন দেশে প্রচলিত সমগ্র অর্থপরিমাণের সহিত উৎপাদিত সমগ্র পরিমাণ দ্রব্য ও কাজের সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায় অর্থাৎ যখন দ্রব্য ও কাজ অপেক্ষা অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মূল্যের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধি ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যাপক পিগু বলেন যে, যখন উপার্জন সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার অনুপাতে আর্থিক আয় দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হয়।

"Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income earning activity." বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের অনুপাতে অর্থব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তনই হইল মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ। অধিকতর কর্মসংস্থানের ফলে যদি সমগ্র আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্য ও কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যত সময় পর্যন্ত উৎপাদন-পরিমাণ অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সমানুগতিক হয় তত সময় পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, কারণ উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান দ্বারা উৎপাদন-বৃদ্ধি শেষ সীমায় উপস্থিত হয় তখন অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে আয়বৃদ্ধি হইলেও আর নূতন কর্মসংস্থান বা অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ অবস্থায়ই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি পরিদৃষ্ট হয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ—Different types of Inflation.

১। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি—Hyper or Galloping Inflation.

মুদ্রাস্ফীতি অনেক সময় সহজেই বুঝা যায়। যখন আর্থিক আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যাদির চাহিদাও বৃদ্ধি পায় তখন প্রকাশ্যভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যবৃদ্ধিকে প্রকাশ্য মুদ্রাস্ফীতি (*open inflation*) বলা হয়। মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা যদি প্রতিরোধ না করা যায় তাহা হইলে ইহা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চস্তরে উপনীত হয়। মূল্যের এইরূপ দ্রুতগতিতে উত্থানকে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি (*Hyper or Galloping inflation*) বলা হয়। সরকার কর্তৃক নূতন অর্থ সৃষ্টি করিবার ফলে অনেক সময়ে এইরূপ অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়।

(২) চাপা বা নিরুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতি—Suppressed Inflation.

মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির একটা প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ্যতঃ মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া অন্য প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পাইয়া জনসাধারণ কর্তৃক নগদ অর্থসঞ্চয়ের পরিমাণ, ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ও নানাপ্রকারের নগদ অর্থে সহজে পরিবর্তনীয় বন্ধকীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ হইল যে, দেশের সরকার নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ

সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। যুদ্ধোত্তরকালে প্রায় সকল দেশের সরকারই দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া ও অন্য নানাভাবে জনসাধারণের ব্যয় করিবার ক্ষমতা সংকুচিত করিয়াছিল। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হইলেও সেই মুদ্রাস্ফীতি মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। এরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে নিরুদ্ধ বা চাপা মুদ্রাস্ফীতি (*Suppressed Inflation*) বলা হয়।

৩। মজুরি-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি—Wage-induced Inflation.

মুদ্রাস্ফীতি আবার অনেক সময় মজুরিবৃদ্ধির ফলে ঘটিয়া থাকে। মূল্যবৃদ্ধি হইলে অর্থমজুরির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে দ্রব্যমূল্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মজুরি-বৃদ্ধির কারণে যখন মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে মজুরি-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি (*Wage-induced Inflation*) বলা হয়।

৪। ঘাটতি ব্যয়-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি—Deficit-induced Inflation.

সরকারী আয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য আবার অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ব্যয় বা অন্য কোন আকস্মিক জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে সরকার যদি কর ধার্য বা ঋণ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ না পায় তাহা হইলে এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে এবং ইহার ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহাকে ঘাটতি ব্যয়-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি—(*Deficit-induced inflation*) বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির কুফল—Evils of Inflation.

১। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং ইহার ফলে স্বল্প-আয়ের লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে আয়বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং স্বল্প-আয়ের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। মুদ্রাস্ফীতি হইলে মুদ্রাস্ফীতি কালে ও মুদ্রাস্ফীতির পরবর্তী কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের

মনে একটা অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

৩। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ অধিকতর লাভবান হইয়া থাকে, অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিগণ, মজুরশ্রেণী প্রভৃতি মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪। মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা সরকার ব্যক্তিগত সম্পদের উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারে। কাগজী নোট প্রবর্তন করিয়া সরকার তাহার ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কর প্রবর্তন করিয়া সরকার যেরূপ ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করিতে সক্ষম হয় কাগজী নোট প্রবর্তন করিয়া সরকার তদ্রূপ ব্যক্তিগত সম্পদের উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং এই জাতীয় মুদ্রাস্ফীতিকে এক ধরণের কর-স্থাপনা বলা যাইতে পারে। কিন্তু করধার্যের সহিত এই জাতীয় মুদ্রাস্ফীতির প্রধান পার্থক্য হইল যে, সরকার জনসাধারণের সামর্থ্যানুসারেই করধার্য করিয়া থাকে এবং করধার্যকালে করধার্যের প্রচলিত অন্যান্য নীতিগুলিও মানিয়া চলে, কিন্তু কাগজী নোট চালু করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা পরোক্ষভাবে কর ধার্য করা হয় তাহাতে করধার্য নীতিগুলির কোন স্থান নাই। সুতরাং এ জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি অন্যায় ও অনুচিত বলিয়া পরিগণিত হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায়—How to combat Inflation.

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যেরূপ সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় তাহা নিরোধ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ব্যয়পরিমাণ অর্থ যদি অর্থ দ্বারা বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সুতরাং দ্রব্যপরিমাণের তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থপরিমাণের আধিক্য হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা যাইতে পারে। সমগ্র ব্যয়পরিমাণকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা, ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ

এবং সরকারী ব্যয় ও সরকারী বিনিয়োগ। এই দুই জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয় ও বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা যাইতে পারে।

১। ব্যক্তিগত ব্যয় ও বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য সরকার নিম্নলিখিতভাবে অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে।

(ক) সরকার উচ্চহারে কর স্থাপন করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রচলিত অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। (খ) সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। (গ) সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিয়াও অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। (ঘ) অনেক সময় অর্থের মালিকগণ যাহাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও অন্য নানাজাতীয় অর্থকে আটক রাখে। (Freezing or Blocking liquid assets). এইরূপে সরকার যদি কর বা ঋণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ নিজে পুনরায় ব্যয় না করে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস পায়।

২। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা যাইতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করিলে লোকের ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া তাহাদের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করিবে।

৩। ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া ফাটকা ব্যবসায়িগণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করা মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার একটি অন্যতম উপায়। ব্যবসায়িগণ যাহাতে অধিক ধার না পাইতে পারে সেজন্য সুদের হারও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪। উৎপাদন-পরিমাণ বিশেষ করিয়া ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। যুদ্ধকালে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপাদনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলেই দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা সম্ভব হয়।

৫। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারও কাগজী মুদ্রার কিয়দংশ নষ্ট করিতে পারে।

ইহা সম্ভব না হইলে নূতন নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া ধারের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি যদি চরম হয় তাহা হইলে মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আর কোন আস্থা থাকে না। সেইজন্য অনেক সময় সরকার পূর্বতন মুদ্রা-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিতে পারে। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব দূর হইয়া মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতি পুনরায় আস্থা জন্মে।

মুদ্রা-কুঞ্চন—Deflation.

যখন দ্রব্য ও কাজের পরিমাণের অনুপাতে অর্থপরিমাণ হ্রাস পায় এবং অর্থপরিমাণ হ্রাসের ফলে মূল্যের পতন ঘটে তখন এই অবস্থাকে মুদ্রা-কুঞ্চন বলা হয়। মুদ্রা-কুঞ্চন মুদ্রা-স্ফীতির বিপরীতার্থবোধক। মুদ্রা-কুঞ্চনের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।

মুদ্রা-সংকোচন—Disinflation.

অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক কালে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যও যদি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই মূল্যবৃদ্ধিকে স্বাভাবিক স্তরে আনিবার জন্য সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে। মুদ্রা-কুঞ্চন ও মুদ্রা-সংকোচনের ফলে উভয়ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস পায় বটে, কিন্তু মুদ্রা-কুঞ্চন ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের সংগে সংগে উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পায় ও কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে। অপরপক্ষে মুদ্রা-সংকোচনের ফলে উপরি-উক্ত অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব প্রতিরোধ করা হয়। সরকার পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থানুসারে এরূপভাবে মুদ্রা-সংকোচন নীতি পরিচালনা করেন যাহাতে মুদ্রা-কুঞ্চনের কুফলগুলি দূর হয়।

মুদ্রা-বিকোচন—Reflation.

মুদ্রা-কুঞ্চনের প্রতিষেধক হিসাবে মুদ্রা-বৃদ্ধিকরণ ঘটে। যখন দ্রব্য ও কাজের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইবার ফলে মূল্য হ্রাস পায় তখন মূল্যহ্রাস নিরোধ করিবার জন্য অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

মূল্য-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—Effects of changes in the price-level.

মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সকলের উপর সমান হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর মূল্যের পরিবর্তন বিভিন্নভাবে ফলপ্রসূ হয়। সমাজে একই লোক ক্রেতা, বিক্রেতা, পাওনাদার, দেনাদার, পরিচালক ও করদাতা হিসাবে কাজ করিতে পারে। মূল্যের পরিবর্তনে সে পাওনাদার হিসাবে হয়ত লাভবান হইতেছে, কিন্তু দেনাদার হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মূল্য-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ হয় তাহা নিম্নে আলোচিত হইল :

১। দেনাদার ও পাওনাদার—Debtors and creditors.

মূল্যবৃদ্ধির ফলে পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দেনাদার লাভবান হয়। কারণ মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে পাওনাদার যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়াছিল, মূল্যবৃদ্ধির পরে দেনাদার ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ ই পাওনাদারকে প্রত্যর্পণ করে। মূল্য-বৃদ্ধির ফলে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার জন্য পাওনাদার পূর্বপরিমাণ অর্থ পাইলেও সেই অর্থদ্বারা সে পূর্বপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং দেনাদার পূর্বপরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেও দ্রব্যের হিসাবে কম প্রদান করে। পক্ষান্তরে মূল্য হ্রাস পাইলে পাওনাদার লাভবান হয়, কারণ পূর্বপরিমাণ অর্থদ্বারা বর্তমানে সে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

২। শ্রমিক সম্প্রদায়—The working class.

মূল্যবৃদ্ধির ফলে মজুর শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় মজুরি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। মজুরির হার বৃদ্ধি পাইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির ফলে মজুরকে অধিক মূল্যে কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে মজুরের অনেক প্রয়োজনীয়-দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

পক্ষান্তরে মূল্য হ্রাস হইলেই সংগে সংগে মজুরি হ্রাস হয় না। মজুরগণ কমমূল্যে অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া লাভবান হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, উচ্চ মূল্যকালে মজুরের স্বার্থ ব্যাহত হয় ও স্বল্প মূল্যকালে মজুর লাভবান হয়। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, মূল্য বৃদ্ধিকালে মজুর শ্রেণী এক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অপর দিক দিয়া লাভবান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলা যাইতে পারে যে, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ অধিক মুনাফার আশায় শিল্প ও ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করেন। ফলে শ্রমিকের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকগণ অনায়াসে এই সময়ে কর্মসংস্থান করিতে পারে। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধিকালে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। অপরপক্ষে যখন মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে তখন মুনাফার পরিমাণও হ্রাস পায় এবং এইজন্য ব্যবসায়িগণ ব্যবসায় সংকোচ করে। ফলে কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে এবং বেকার সমস্যার আবির্ভাব হয়।

৩। উৎপাদক ও ব্যবসায়ী—**Producers and Businessmen.**

মূল্যবৃদ্ধিকালে উৎপাদক ও ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ লাভবান হইয়া থাকেন। উৎপাদকগণ প্রধানতঃ তিনটি কারণে লাভবান হন। প্রথমতঃ, উৎপাদকগণ মূলধন ধার করেন, সুতরাং তাঁহারা দেনাদার বলিয়া উচ্চ মূল্যকালে লাভবান হন। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামাল প্রভৃতি উৎপাদনের অনেক সহায়ক সামগ্রী তাঁহারা মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করেন। তৃতীয়তঃ, মূল্য বৃদ্ধি হইলেও তাঁহারা পূর্বনির্ধারিত স্বল্প হারে মজুরি প্রদান করেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহাদের উৎপাদন-খরচা প্রায় পূর্বের মতই থাকিয়া যায়, অথচ তাঁহারা বর্তমান উচ্চমূল্যে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফা লাভ করেন। অপর পক্ষে মূল্য হ্রাস পাইলে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ, পূর্ব-অবস্থিত মূল্যের ভিত্তিতে তাঁহাদের উৎপাদন-খরচা স্থিরীকৃত হইলেও উৎপাদিত দ্রব্য তাঁহাদের বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়।

৪। নির্দিষ্ট আয়ের লোক—**Persons with fixed incomes.**

মূল্য বৃদ্ধি পাইলে যাহাদের আয় নির্দিষ্ট তাহারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের আয় বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তাহাদের জীবনধারণের মান খর্ব হয়, ফলে তাহাদের কর্মদক্ষতা ব্যাহত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একজন উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাসিক বেতন যদি আড়াইশত টাকা হয় এবং তাহাকে যদি মাসে মণপ্রতি ১৫৲ টাকা মূল্যে দুই মণ চাউল ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে চাউলের জন্য তাহাকে ৩০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এখন চাউলের মূল্য যদি বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে তাহাকে চাউলের জন্য মোট ৫০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা ২০৲ টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে। চাউলের মূল্যের ন্যায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের

মূল্যও যদি বৃদ্ধি পায় এবং এই মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে যদি তাঁহার বেতনবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শিক্ষকোচিত জীবনধারণের মান বজায় রাখিয়া নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে, মূল্য হ্রাস পাইলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকের সুবিধা হয়। তাঁহারা স্বল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন।

৫। করদাতা—Taxpayer.

মূল্যবৃদ্ধিকালে করদাতাগণের সুবিধা হয়, কারণ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে করদাতাগণ অর্থের হিসাবে সমপরিমাণ কর প্রদান করিলেও দ্রব্যের হিসাবে কম পরিমাণ প্রদান করে। তবে এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মূল্যবৃদ্ধিকালে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও শেষ পর্যন্ত করের হারও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের দেয় করের হার বৃদ্ধি পাইলেও করভার (Burden of tax) বৃদ্ধি পায় না। অপর পক্ষে মূল্যহ্রাসকালে করদাতার অর্থের হিসাবে কর সমপরিমাণ হইলেও দ্রব্যের হিসাবে অধিক পরিমাণ কর দিতে হয়, সুতরাং করভার বৃদ্ধি পায়।

৬। সরকারী ঋণের ভার—Burden of Public Debt.

মূল্যবৃদ্ধিকালে সরকার ও সমাজের পক্ষে সরকারী ঋণভারের লাঘব হয়। সরকারকে এই ঋণের জন্য বাৎসরিক যে পরিমাণ সুদ অর্থহিসাবে প্রদান করিতে হয়, অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাইবার ফলে তাহার দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ জিনিসপত্র ক্রয় করা যায়। যাহারা সরকারকে ঋণ প্রদান করে তাহারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তাহারা পূর্বপরিমাণ অর্থ দ্বারা বর্তমানে পূর্বপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। মূল্যপতনকালে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঋণদাতা লাভবান হয়।

৭। সমাজের উপর মূল্য-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—Effects of price-changes on society.

মূল্য-পরিবর্তনের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি উভয়ই সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা নষ্ট করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে যতটা ক্ষতিকর মূল্য-

হ্রাস ততটা ক্ষতিকর নহে। মূল্যবৃদ্ধির সর্বাধিক কুফল হইল সমাজে অসম ধনবণ্টন-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। মূল্য-বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র শ্রেণী বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হয় এবং এইজন্য শ্রমিক-মালিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে।

মূল্য হ্রাস পাইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংকুচিত হয়, ফলে কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে। ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী মূল্যের ফলে এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যখন শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হয় এবং এই মন্দার অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে, মূল্যের উত্থান বা পতন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, মূল্যের স্থিতাবস্থা রক্ষা করাই হইল সরকারের কর্তব্য। মূল্যের যদি উত্থান পতন ঘটে তাহা হইলে এই উত্থান-পতনের একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা প্রয়োজন এবং উত্থান-পতন মন্থরগতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থমূল্য—

অর্থমূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে। এক একক অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে, তাহা দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, অপর পক্ষে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, অর্থমূল্য বা অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা এবং দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থমূল্য হ্রাস পাইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

সূচক সংখ্যা—

অর্থমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সূচক সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকরা কত পরিবর্তন হইল তাহা সূচক সংখ্যা সাহায্যে স্থির করা যায়। সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রয়োজন হয়। (১) একটি নির্দিষ্ট কালকে ভিত্তি হিসাবে ধরিতে হয়। (২) কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ফর্দ এবং এই দ্রব্যগুলির চল্‌তি দর সংগ্রহ করিতে হয়। (৩) পরবর্তী যে কালের মূল্যপরিবর্তন স্থির করিতে হয়, ভিত্তিকালের মূল্যের সহিত পরবর্তী কালের দ্রব্যগুলির মূল্যের তুলনা করিয়া শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্থির করিতে হয়। (৪) সর্বশেষে পরবর্তী কালের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই হইল সূচক সংখ্যা। ভিত্তিকালের সূচক সংখ্যা হইতে এই সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। সূচক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত নির্ভুলভাবে গঠন করিতে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির উপযোগিতা অনুসারে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সূচক সংখ্যার কার্যকারিতা—

১। সূচক সংখ্যার সাহায্যে দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ স্থির করা যায়।

২। জীবনযাত্রার খরচের হ্রাস-বৃদ্ধিও সূচক সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ-যোগ্য।

৩। এতদ্ব্যতীত সূচক সংখ্যার সাহায্যে মজুরি, আমদানী, রপ্তানী, কর্ম-সংস্থান প্রভৃতি পরিবর্তনের পরিমাপ করা যায়।

অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব—

অর্থের মূল্য অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় অর্থের চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব অনুসারে অর্থমূল্য ও অর্থপরিমাণের সম্পর্ক বিপরীতমুখী অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় অর্থমূল্যও সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। আবার, অর্থপরিমাণ যে অনুপাতে হ্রাস পায় অর্থমূল্যও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দ্রব্যমূল্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দ্রব্যটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্য হ্রাস পায় কিন্তু সমানুপাতিক হয়

না, কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে অর্থমূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি অর্থের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সমানুপাতিক হয়। ইহার কারণ হইল যে, অর্থের চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

ফিসার একটি সমীকরণ দ্বারা অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুদ্রাস্ফীতি—

যখন বিনিময়ের মাধ্যমের অর্থাৎ টাকাকড়ির চাহিদার তুলনায় সমগ্র অর্থ-পরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, এই বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। মজুরিবৃদ্ধির ফলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। সরকারী আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পূরণের জন্যও অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে।

(১) মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধিতে দরিদ্র লোকের অসুবিধা হয়। (২) মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। (৩) ইহার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পায় এবং তাহারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।

মুদ্রাস্ফীতির নিরোধের উপায়—

১। উচ্চহারে করস্থাপন, ২। ঋণ-গ্রহণ, ৩। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ আটক রাখা, ৪। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করা, ৫। ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা, ৬। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

মূল্য-পরিবর্তনের ফলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে পাওনাদার, মজুর, নির্দিষ্ট আয়ের লোক ও কর-গৃহীতা হিসাবে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ সমপরিমাণ অর্থ মূল্যবৃদ্ধির ফলে কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। আবার মূল্য হ্রাস পাইলে উপরিস্থ সম্প্রদায়ের লোকজন লাভবান হয়, কারণ সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা তাহারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

মূল্য-পরিবর্তনের ফল—

মূল্যবৃদ্ধিকালে দেনাদার, ব্যবসায়ী, করদাতা প্রভৃতি লাভবান হয় কারণ তাহারা সমপরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেও দ্রব্যের হিসাবে কমপরিমাণ দ্রব্য প্রত্যর্পণ করে। আবার, মূল্য হ্রাস পাইলে এই সম্প্রদায়গুলির লোকজনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্যের স্থিরতাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নাবলী

1. Indicate the factors that determine the general price-level of a country. (C. U. 1944)

2. What are the evils of inflation ? What measures would you recommend to check it effectively ? (C. U. 1949)

3. What are Index Numbers ? How are they prepared ? Briefly discuss the utility and the limitations of Index Numbers. (C. U. 1957)

4. Define 'Inflation' and explain its effects on production, price-level and distribution. (C. U. 1951, 1962)

5. State the relation between the quantity of money and the level of prices. (C. U. 1955)

6. What are the difficulties you would have to face in constructing an index number for measuring the changes in the value of money ? (C. U. B. Com. 1955)

7. How do you measure changes in the value of money ? What are the main difficulties of such measurement ? (C. U. B. Com. 1957)

8. Explain the causes of moneytary instability. (C. U. B. Com. 1958)

9. Explain the meaning of 'demand for money' and 'supply of money' in the context of the Quantity theory of Money. (C. U. B. Com. 1962)

— —

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাংক ব্যবসায়

(Banking)

আধুনিককালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাংক-ব্যবসায়ের গুরুত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাংক হইল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহা টাকা-পয়সা লইয়া কারবার করে। ব্যাংক টাকাপয়সা সৃষ্টি করে এবং টাকাপয়সার চাহিদা ও যোগান অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই অর্থ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতিকল্পে যোগান দেয়। ব্যাংকের এই কার্যের ফলে যাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে যাহারা উৎপাদনকার্যে অর্থ বিনিয়োগ করিতে সক্ষম তাহাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এইরূপে ব্যাংক একদিকে মূলধনের মালিক ও অপরদিকে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়িগণের মধ্যে যোগ্যসূত্র স্থাপন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত বর্তমান যুগে ব্যাংকগুলি অন্য নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং এই বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ব্যাংক দেখা যায়।

ব্যাংকের প্রকার ভেদ—Types of Banks.

১। সেভিংস্ ব্যাংক—Savings Bank.

স্বল্প-আয়ের লোকজন যাহাতে তাহাদের স্বল্প আয় হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে এইজন্য এই ব্যাংকগুলির সৃষ্টি হয়। ইহারা জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহ প্রদান করে। এই ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার লয়। ভারতে পোস্টঅফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট যে ব্যাংক আছে তাহারা শুধু টাকা জমা লয়, কিন্তু টাকা ধার দেয় না।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক—Central Bank.

আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় এবং এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল একটি দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল ও নিয়ামক। দেশের সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্তরের স্থিতাবস্থা রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকলাপ পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

৩। কৃষিব্যাংক—Agricultural Banks.

কৃষিব্যাংকগুলি প্রধানতঃ কৃষিকার্যে ঋণ দান করিয়া সাহায্য করে। কৃষিকার্যে সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষিকার্যে সাময়িক কালের জন্য কতকগুলি চল্‌তি খরচ আছে, যথা, বীজ-ক্রয়, সার-ক্রয়, দিনমজুরের পারিশ্রমিক প্রদান করা ইত্যাদি। এই জাতীয় খরচ সংকুলান করিবার জন্য কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন হয় এবং এই ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে (ক) সমবায় ব্যাংক (Co-operative Bank) সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাংকগুলি স্বল্পমেয়াদে অল্প সুদে কৃষকদের ঋণ দান করিয়া থাকে। নূতন জমি ক্রয় করিয়া বা সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া বা নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। সমবায় ব্যাংকগুলির মূলধনের পরিমাণ স্বল্প বলিয়া তাহারা একসংগে অধিক মূলধন বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ঋণ দান করিতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য (খ) জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Bank) সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। বিদেশীয় বিনিময়-ব্যাংক—Foreign Exchange Banks.

যে সকল ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা লেনদেন করে, তাহাদের বিনিময় ব্যাংক বলা হয়। যাহারা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করে বা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে, তাহাদের বিলে বাট্টা লইয়া টাকা দেওয়া হইল বিনিময়-ব্যাংকের প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যাংকের অনুরূপভাবে এই ব্যাংকগুলিও লোকের টাকা আমানত রাখে এবং লোককে টাকা ধার দেয়।

৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাংক—Industrial Banks.

শিল্প-পরিচালনা ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়বিধ

ঋণের প্রয়োজন হয়। শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-সহায়ক ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। ভারতে এই জাতীয় ব্যাংকের অভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক—Commercial Banks.

এই ব্যাংকগুলির প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া সাহায্য করা। এতদ্ব্যতীত ইহারা লোকের টাকা আমানত রাখা, টাকা ধার দেওয়া বা হুণ্ডির বিনিময়ে অগ্রিম টাকা দেওয়া প্রভৃতি কার্য করে।

নিকাশী ঘর—Clearing House.

নিকাশী ঘরকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ জনসাধারণের সহিত নিকাশী ঘরের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা জনসাধারণের টাকা আমানত রাখে না বা জনসাধারণকে টাকা ধার দেয় না।

নিকাশী ঘর হইল স্থানীয় ব্যাংকগুলির একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন সমবেত হইয়া তাঁহাদের চেক-বিনিময় ও হিসাব স্থির করিয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা আদান-প্রদান করেন। ("A clearing house is a general organization of the banks of a given place, having for its main purpose the offsetting of cross-obligations in the form of cheques.") প্রত্যেক ব্যাংকই প্রতিদিন অন্য ব্যাংক হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য মক্কেলের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক চেক পাইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যাংক অন্য ব্যাংক হইতে আদায় করিবার জন্য কিছু সংখ্যক চেক পায় এবং এই প্রত্যেক ব্যাংক হইতে আদায় করিবার জন্য অপরাপর ব্যাংকগুলিও কিছু সংখ্যক চেক পাইয়া থাকে। সুতরাং সকল ব্যাংকই একদিকে যেরূপ পাওনাদার অপরদিকে সেইরূপ দেনাদার। এখন এই সমস্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমবেত হইয়া চেকের মারফতে তাঁহাদের দেনা-পাওনার হিসাব করেন। ধরা যাউক যে, নিকাশী ঘরের হিসাবে দেখা গেল সেণ্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থপরিমাণ হইল ৫,০০০ টাকা

আবার ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থপরিমাণ হইল ৫,২০০ টাকা। নিকাশী ঘরে এই উভয় ব্যাংকের দেনা-পাওনার হিসাব হইয়া দেখা গেল যে, ইউনাইটেড ব্যাংক সেণ্ট্রাল ব্যাংকের নিকট মাত্র ২০০ টাকা বেশী পাইবে। এরূপক্ষেত্রে উভয় ব্যাংকের মধ্যে কার্যতঃ কোন আর্থিক আদান-প্রদান না হইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাংক ইউনাইটেড্ ব্যাংককে মাত্র অতিরিক্ত পাওনা দুইশত টাকা প্রদান করে। উভয় ব্যাংকের দেনা ও পাওনার সমতার জন্য ঋণের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৫,০০০ টাকার আর আদান-প্রদানের কোন প্রয়োজন হয় না। উপরি-উক্ত উদাহরণে মাত্র দুইটি ব্যাংকের দেনা-পাওনা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিকাশী ঘরে স্থানীয় সমুদয় ব্যাংকেরই পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক দেনা-পাওনার ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিমাণ দেনা-পাওনা শোধ হইয়া যায়। অতি অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনাই অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয়। যে অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনা অপরিশোধিত থাকে তাহাও অর্থে প্রদান না করিয়া চেক দ্বারা প্রদান করা হয় এবং সমস্ত ব্যাংকেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটা আমানত থাকে বলিয়া চেক দ্বারা অন্য ব্যাংকগুলির এই আদান-প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মারফতেই করা হয়। দিনের শেষে যে ব্যাংক দেনাদার হয় সেই ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত হইতে ঐ দেনার পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়া পাওনাদার ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে আমানত থাকে তাহাতে জমা করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, নিকাশী ঘর প্রবর্তনের ফলে টাকা-পয়সা বহন করিবার বা স্থানান্তর করিবার আর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মারফতে হিসাবপত্রের পরিবর্তন সাধন করিয়া কোটী কোটী টাকার দৈনিক আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সাধারণতঃ নিকাশী ঘরের কার্য পরিচালনা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালনার নীতি—Principles of Commercial Banking.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ঋণ

গ্রহণ করিয়াই কারবার করে। চাহিবামাত্র দিবার অংগীকারে অথবা নির্দিষ্টকাল পরে প্রত্যর্পণ করিবার অংগীকারে এই ব্যাংকগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহ করে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া ইহারা দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ দিতে পারে না বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-দিনের জন্য ধার-করা অর্থ আটক রাখিতে পারে না। আমানতকারী নির্ধারিত সময়ে তাঁহার টাকা ফেরত না পাইলে ব্যাংকের প্রতি তাঁহার আস্থা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ের প্রকৃত মূলধন অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যাংকের সততার উপর আস্থা শিথিল হয়। এইজন্যই ব্যাংকের পক্ষে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিয়া ইহার কার্য পরিচালনা করা উচিত। নীতিগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। এই জাতীয় ব্যাংক কখনই কোন কারণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিবে না। কারণ, তাহা হইলে আমানতকারী টাকা চাহিবামাত্র প্রদান করা সম্ভব হয় না।

২। এই ব্যাংক কোন একজন ব্যক্তিকে বা কোন একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে ইহার মূলধনের অধিকাংশ ধার দিবে না। কারণ, এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সময়মত ধার পরিশোধ করিতে না পারিলে ব্যাংকের সুনাম ও স্থায়িত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। প্রতিদিন ব্যাংক হইতে টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য যে পরিমাণ চাহিদা হয়, সেই অনুপাতে ব্যাংকের নগদ টাকা রাখা উচিত। আকস্মিক কারণে অধিক পরিমাণ টাকার চাহিদা পূরণ করিবার জন্য ব্যাংকের আমানত এরূপভাবে বিনিয়োগ করিতে হয় যে, অতিরিক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে ব্যাংক এই বিনিয়োগ-পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ সহজেই পাইতে পারে।

এইজন্যই বলা হয় যে, ব্যাংক-পরিচালকের পক্ষে হুণ্ডি ও অন্য জাতীয় বন্ধকীর পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হওয়া আবশ্যক। ("The art of banking lies in being able to distingush between a Bill of Exchange and a Mortgage.") হুণ্ডির বিনিময়ে অর্থাৎ হুণ্ডি বন্ধক রাখিয়া ব্যাংক যে টাকা ধার দেয় তাহা অধিকাংশক্ষেত্রেই ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় পাওয়া যায়। জরুরী অবস্থায় ব্যাংক এই বন্ধকী হুণ্ডি পুনরায় বন্ধক

রাখিয়া (Rediscounting) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ধার পাইতে পারে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী লেন-দেনের ক্ষেত্রে হুণ্ডি এমনই একটি বন্ধকী দ্রব্য যাহার বিনিময়ে যখন তখন নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে হুণ্ডি-ক্রয়ে অর্থ-বিনিয়োগ করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু জমি, বাড়ীঘর, বা অন্য জাতীয় স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে সে অর্থ আদায় করিতে দীর্ঘ সময় অতীত হয় এবং এজন্য অনেক সময় আইনের সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কারবারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে অন্য জাতীয় বন্ধকী দ্রব্য অপেক্ষা হুণ্ডিতে মূলধন বিনিয়োগ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণের যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপরও ব্যাংক ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে—"Successful banking depends largely on the management of the reserve." ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থ বলিলে বুঝা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ঐ ব্যাংকের আমানত পরিমাণ সমেত ব্যাংকে অবস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ। ব্যাংক অন্যের টাকা আমানত রাখে এবং এই আমানতের জন্য ব্যাংকের সুদ দিতে হয়। সুতরাং এই আমানতের টাকা ব্যাংক যদি বিনিয়োগ না করিয়া শুধুমাত্র ব্যাংক তহবিলে জমা রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে এই অর্থ অনুৎপাদনক্ষম অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহাতে ব্যাংক নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমানতের টাকা নিরর্থকভাবে ব্যাংকে জমা রাখিলে একদিকে ব্যাংকের যেরূপ লোকসান হয়, অপরদিকে এই আমানতের টাকার সঞ্চিত অংশ যদি খুব কম হয়, তাহা হইলেও ব্যাংকের বিপদাশংকা থাকে। কারণ, আমানতকারিগণ চেক দ্বারা টাকা উঠাইতে চাহিলে ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহা হইলে ব্যাংক টাকা দিতে অক্ষম হয় এবং এই অক্ষমতার ফলে ব্যাংক হইতে টাকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যায় এবং ব্যাংক ফেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ব্যাংক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যে, এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অত্যধিক হইবে না, আবার প্রয়োজনের তুলনায় অতি কমও হইবে না। ব্যাংক-পরিচালকগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানারূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ স্থির করিয়া থাকেন এবং এই সঞ্চিত অর্থপরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার উপরেই তাঁহাদের মুনাফার পরিমাণ এবং ব্যাংকের সুনাম ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

ব্যাংক ইহার সুনাম ও স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে ইহার সমগ্র মূলধন নিম্নলিখিত-ভাবে বিনিয়োগ করে।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক ব্যাংকই কিছু পরিমাণ—অন্ততঃপক্ষে আমানতের শতকরা দশভাগের এক ভাগ নগদ টাকা হিসাবে সঞ্চিত রাখে। সাধারণতঃ এই সঞ্চিত অর্থ ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোটে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সকল ব্যাংকেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে হয় এবং প্রত্যেক ব্যাংকেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত এই অর্থপরিমাণ ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিলের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ যে-কোন সময়ে পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আমানতের কিছু অংশ ব্যাংক চাহিবামাত্র ফেরত পাইবার প্রতিশ্রুতিতে অথবা স্বল্পমেয়াদের জন্য ঋণ দিয়া থাকে। এই জাতীয় ঋণগুলিও নগদ টাকার মত, কারণ এই ঋণগুলি চাহিবামাত্র পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, আমানতের একটি অংশ ব্যাংক হুণ্ডির বিনিময়ে ধার দিয়া থাকে এবং এই ধার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, ব্যাংক সরকারী বা অন্য নিরাপত্তামূলক বন্ধকী পত্রের বিনিময়ে টাকা ধার দিয়া থাকে। এইজাতীয় বিনিয়োগে আদৌ কোন ঝুঁকি থাকে না।

এতদ্ব্যতীত ব্যাংক চড়া সুদে ইহার মক্কেলগণকে ধার দিতে পারে বা আমানতকারীকে তাহার আমানত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধার (overdraft) দিতে পারে। সময়মত আদায়ের অনিশ্চয়তার জন্য এই জাতীয় বিনিয়োগে ব্যাংক উচ্চহারে সুদ ধার্য করে।

ব্যাংক কি ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে?—Can banks create credit deposits ?

ব্যাংক সাধারণতঃ ইহার আমানতকারীদের নিকট হইতে নগদ অর্থ জমা রাখিয়া আমানত সৃষ্টি করে। আমানতকারিগণ চেক দ্বারা মধ্যে মধ্যে এই আমানত টাকা তুলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য এক উপায়ে ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। যখন কোন ব্যবসায়ীর অর্থের প্রয়োজন হয়,

তখন ব্যবসায়ী কোন ব্যাংকের দ্বারস্থ হইয়া ধার পাইবার জন্য আবেদন করে। এই আবেদনপত্রকে প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory note) বলা হয় এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্য একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি জামিনস্বরূপ এই প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ব্যাংক আবেদনকারীর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলে এই প্রতিশ্রুতিপত্রের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর প্রার্থিত ধার-পরিমাণ হইতে চল্‌তি হারে সুদ কাটিয়া রাখিয়া আবেদনকারীকে টাকা ধার দেয়। কিন্তু এরূপ ধারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ধারের সমগ্র পরিমাণ অর্থ নগদ প্রদান না করিয়া আবেদনকারীর নামে ব্যাংক একটি আমানতের হিসাব প্রবর্তন করে। আবেদনকারীকে একটি আমানত বই ও একটি চেক বই দেওয়া হয় এবং তদ্দ্বারা আবেদনকারী তাহার প্রয়োজন মত নগদ টাকা আমানতকারীর ন্যায় চেক দ্বারা তুলিতে পারে। সুতরাং নগদ আমানতকারী ব্যাংক হইতে যে সুবিধা পায়, ধার-দ্বারা-সৃষ্ট আমানতের অধিকারীও সেই সুবিধা পাইয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ধারদ্বারাও ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

ব্যবসায়িগণ একদিকে যেরূপ দেনাদার অন্যদিকে সেইরূপ পাওনাদার। তাঁহারা অন্যের নিকট হইতে যখন বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অথবা অন্য কোন বাবদ অর্থ পাইয়া থাকেন তখন সেই অর্থ নগদই হউক আর চেকেই হউক ঐ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। এইরূপে ব্যাংক হইতে ধার-করা অর্থ শোধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, ব্যবসায়ীর ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ও ব্যাংকে তাহার জমার পরিমাণ সমান হইয়াছে। এরূপক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে আর নূতন করিয়া ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করিতে হয় না। দেনা ও পাওনা সমান হইয়া ঋণ পরিশোধ হয়। যদি ব্যাংকের কিছু পাওনা থাকে তাহা হইলে ব্যবসায়ী তাহা নগদ অর্থে শোধ করে এবং পুনরায় উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে ব্যাংক হইতে টাকা ধার লয়। এইরূপে ব্যাংকগুলি ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করে এবং এই আমানতের বলে ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

ডাঃ ক্যানান ও ডাঃ লিফ্‌ উপরি-উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ধারদ্বারা আমানত সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ব্যাংকের নাই, এই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইল ব্যাংকের আমানতকারিগণ। ব্যাংক ইহার অভিজ্ঞতা হইতে জানে যে, সব আমানতকারী একসংগে সমগ্র

আমানত পরিমাণ তুলিতে চায় না। সুতরাং ব্যাংক সমগ্র আমানত পরিমাণ হইতে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করিবার জন্য একটি অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ স্বল্পমেয়াদের জন্য ঋণ দিয়া থাকে। আমানতকারিগণ যদি একসংগে সমস্ত আমানত তুলিত, তাহা হইলে ব্যাংক এইরূপে ধার দিতে পারিত না। তাই বলা হয় যে, ব্যাংক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করে না, পরন্তু আমানতের যে-পরিমাণ আমানতকারিগণ না তুলিয়া লন সেই পরিমাণ ধার দিয়া থাকে। এইরূপ ধার দেওয়া ব্যাপারে আর একটি কারণে অসুবিধা হয় না, কারণ ঋণদাতা, ঋণগৃহীতা সকলেই ক্রয়-ক্ষমতার উপর অধিকার পাইলেই সন্তুষ্ট হন। কেহই নগদ টাকা চান না। নিকাশী ঘরের মারফতে আবার এই পারস্পরিক দেনা-পাওনার বেশীর ভাগই নগদ টাকার আদান-প্রদান ব্যতীতই শোধ হইয়া যায়।

ধারদ্বারা আমানত সৃষ্টির সীমা—Limits to the creation of credit deposit.

ব্যাংক ধারদ্বারা আমানত সৃষ্টি করিতে পারিলেও এই আমানত সৃষ্টি করিবার কতকগুলি অন্তরায় আছে। ব্যাংক অবাধে আমানত সৃষ্টি করিতে পারে না।

প্রথমতঃ, ব্যাংক যদি উপযুক্ত জামিন বা বন্ধকী দ্রব্য না পায় তাহা হইলে ধার দিতে পারে না। সুতরাং যে-পরিমাণে জামিন বা বন্ধকী দ্রব্য পাওয়া যায়, ব্যাংক তদতিরিক্ত পরিমাণ ধার দিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজারী কারবারের (open market operation) উপরও ব্যাংকের ধার দেওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারী কারবার দ্বারা অন্যান্য ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে এবং এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকের ধার দিবার ক্ষমতারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ব্যাংকের সঞ্চিত তহবিল-পরিমাণের উপরই ধার দিবার পরিমাণ নির্ভর করে। ব্যাংক যদি সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ হ্রাস করে, তাহা হইলে ইহাকে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। সুতরাং ব্যাংক ইহার নিরাপত্তার জন্য কি পরিমাণ সঞ্চিত তহবিল রাখিবে তাহার উপরই ধারের পরিমাণ নির্ভর করে।

এতদ্ব্যতীত অনেক সময় দেখা যায় যে, জনসাধারণ চেক ব্যবহার না করিয়া নগদ টাকা ব্যবহার করিতে অধিকতর অভ্যস্ত। এরূপক্ষেত্রেও ব্যাংক ইহার সঞ্চিত তহবিলের ভিত্তিতে অধিক পরিমাণ ধার দিতে পারে না।

ব্যাংকের কার্য ও উপযোগিতা—Functions and utility of Banks.

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাংকগুলি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাংকগুলি যে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে তাহা সম্যক্ পর্যালোচনা করিলে উহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

১। ব্যাংক জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ দ্বারাই ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে। আমানত দুই প্রকারে সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে বিহিত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নামে আমানত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংক ইহার মক্কেলগণকে ধার দেয় এবং ধারের অর্থ দ্বারা আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানতের টাকাও নগদ আমানতের ন্যায় চেক দ্বারা পাওয়া যায়।

২। ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য হইল ধার দেওয়া। ব্যাংক জনসাধারণের যে অর্থ আমানতরূপে জমা রাখে, সেই আমানতী অর্থ আবার অন্য লোককে ধার দেয়। ব্যাংক তিন প্রকারের ধার দিয়া থাকে। জিনিসপত্র বা অন্য কোন দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া ধার দিতে পারে, হুণ্ডি বা প্রতিশ্রুতিপত্রের বিনিময়ে ধার দিতে পারে কিংবা আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অগ্রিম দিতে পারে।

৩। ব্যাংক নোট বা চেক সৃষ্টি করিয়া অর্থ পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট সৃষ্টি করিবার অধিকারী।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাংক বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেয়। এক দেশের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক অন্য দেশের অর্থে পরিবর্তিত হয়।

৫। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক অন্যান্য নানাবিধ কার্য সম্পাদন করে। মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে ব্যাংক ইনসিওরের প্রিমিয়াম্ দেয়, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় করে এবং মক্কেলের অন্যত্র পাওনা টাকা আদায় করে। ব্যাংক উইল বা দানপত্রের

অছি হিসাবে কার্য করে এবং মক্কেলগণের অলংকার, দলিলপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে।

ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্যতালিকা পর্যালোচনা করিলেই এই প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়। ব্যাংক সুদ প্রদান করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যাংক পরোক্ষ-ভাবে জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত আমানত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। এইরূপে ব্যাংক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া মূলধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাংকের অস্তিত্ব না থাকিলে মূলধনের মালিক তাহার মূলধন সার্থকভাবে বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হইত না, অপরপক্ষে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী মূলধনের অভাবে তাহাদের কর্মক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারিত না। ব্যাংক ইহার কর্মতৎপরতার দ্বারা মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করে এবং মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক নোট, চেক প্রভৃতি ঋণপত্র সৃষ্টিদ্বারা অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপাদন-কার্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন শুধুমাত্র বিহিত অর্থদ্বারা সে প্রয়োজন সংকুলান হইত না। সুতরাং ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থের অভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হইত। ব্যাংকগুলি উৎপাদকগণের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-যুক্ত এবং উৎপাদকগণকে ঋণদাণ করিয়া যে পরিমাণ সাহায্য করে, সরকার কর্তৃক উৎপাদকগণকে সে পরিমাণ সাহায্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুপরিচালিত ব্যাংক-ব্যবস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা যাইতে পারে।

ব্যাংকের দেনা-পাওনার হিসাব—Balance-sheet of a Bank.

ব্যাংকের দেনা-পাওনার হিসাব বলিলে ব্যাংকের আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় তথ্য বুঝায়। জনসাধারণের অবগতির জন্যই ব্যাংক এই আয়-ব্যয় সম্বলিত তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এই তথ্যগুলি প্রকাশ না করিলে ব্যাংকের সততা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। এইজন্যই ব্যাংকগুলি তাহাদের বাৎসরিক দেনা-পাওনার হিসাব প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি

সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি ১৫ দিনে তাহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে। আয়-ব্যয়ের এই হিসাব দুই সারিতে দেওয়া হয়। বামদিকে থাকে ব্যাংকের দেনা বা ব্যয়ের হিসাব (Liabilities) আর দক্ষিণদিকে থাকে পাওনা বা আয়ের (Assets) হিসাব। নিম্নে ব্যাংকের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব দেওয়া হইল।

দেনা (Liabilities)	পাওনা (Assets)
১। আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up capital)	১। ব্যাংকে মজুত নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ (Cash in hand and balances with the Central Bank)
২। সঞ্চিত তহবিল ও অন্যান্য সঞ্চয় (Reserve Fund and other Reserves)	২। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট প্রাপ্য পরিমাণ (Balances with other Banks)
৩। চল্‌তি আমানত (Current deposits)	৩। যে ধারগুলি চাহিবামাত্র বা স্বল্প-মেয়াদে পাওয়া যায় (Money at call and short notice)
৪। স্থায়ী আমানত (Time deposits)	৪। বাট্টাধার্য বিলসমূহ (Bills discounted)
৫। বিলের মাধ্যমে মক্কেলগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঋণগ্রহণ (Acceptances for Customers)	৫। সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ পরিমাণ (Investment in Government Securities)
	৬। মক্কেলগণকে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ পরিমাণ (Advances to Customs)
	৭। ব্যাংকের গৃহ ও আসবাব-পত্রাদি (Premises and Furniture)

ব্যাংকের দেনা-পাওনার প্রত্যেকটি দফা বিশ্লেষণ করিলে ব্যাংকের আয়-ব্যয় সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য স্পষ্টতর হয়।

প্রথমে দেনার প্রত্যেকটি দফার আলোচনা করা হইল—

১। আদায়ীকৃত মূলধনের অর্থ হইল ব্যাংকের অংশীদারগণ শেয়ার বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

২। সঞ্চিত তহবিল বলিতে ব্যাংক জরুরী অবস্থায় অর্থের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে পরিমাণ সঞ্চয় রাখে তাহাকে বুঝায়। আধুনিককালে প্রত্যেক ব্যাংকেই এইরূপ একটি সঞ্চিত তহবিল থাকে এবং এই সঞ্চিত তহবিলই ব্যাংকের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

৩। চল্‌তি আমানতের টাকা ব্যাংকের আমানতকারিগণ সময় না দিয়া যখন তখন দাবী করিতে পারে।

৪। স্থায়ী আমানতের টাকা ব্যাংককে সময় না দিয়া আমানতকারিগণ তুলিতে পারে না। এই টাকা তুলিতে গেলে ব্যাংককে ৭ দিন হইতে ১ মাস পর্যন্ত সময় দিতে হয়।

৫। দেনার পঞ্চম দফার অর্থ হইল যে, ব্যাংক তাহার মক্কেলগণের উপর ধার্য হুণ্ডিসমূহ গ্রহণ করিয়া ঐ হুণ্ডিগুলির মূল্য দিতে প্রতিশ্রুত হয়। মক্কেলগণ মূল্য প্রদান না করিলে ব্যাংকেরই ঐ গৃহীত হুণ্ডির মূল্য দিতে হয়।

পাওনার দিকের—

১। প্রথম দফা হইল ব্যাংকে মজুত নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ। এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকের আয়ত্তাধীন এবং এই অর্থ দ্বারাই ব্যাংকের নিরাপত্তা সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়।

২। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট প্রাপ্য অর্থও অনেক পরিমাণে নগদ অর্থের কার্য করে।

৩। তৃতীয় দফার টাকাগুলি চাহিবামাত্র অথবা অতি স্বল্প দিনের মধ্যে আদায় করা যায়। সুতরাং এগুলিও প্রায় নগদ টাকার মত কাজ করে।

৪। ব্যাংক হুণ্ডি ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে তাহা সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে ফেরত পায়। ব্যাংক হুণ্ডি-ক্রয়ে এরূপভাবে অর্থ বিনিময় করে যে, যখনই ব্যাংকের উপর অধিক পরিমাণ টাকার চাহিদা হয় তখনই এই হুণ্ডি-মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া নগদ মূল্য পাওয়া যায়। সুতরাং

এইরূপ স্বল্পমেয়াদী হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাংকের পক্ষে লাভজনক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। সরকারী ঋণপত্র ও অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারপত্রেও ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে। এই জাতীয় বিনিয়োগ হইতে ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট আয় পাইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই ঋণপত্র অথবা শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া ব্যাংক টাকার অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারে।

৬। ব্যাংক অনেক সময় ইহার বিশ্বাসী মক্কেলগণকে জামিন লইয়া বা বন্ধক রাখিয়া কিংবা বিনা জামিনে বা বিনা বন্ধকে অগ্রিম ধার দেয়। এই ধার অনধিক ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়। এই জাতীয় ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক কারবার, কারণ এই জাতীয় ধারে উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়।

৭। ব্যাংকের গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূম্যাদি, আসবাবপত্র প্রভৃতি হইল ব্যাংকের স্থায়ী মূলধন। এতদ্ব্যতীত কারবার পরিচালনাকালে অন্যান্য যে-সমস্ত সম্পত্তি বা দ্রব্যের উপর ব্যাংকের অধিকার জন্মে সেগুলিও ব্যাংকের স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

(Central Bank)

আধুনিক যুগে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তরকালে প্রত্যেক দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় উপস্থিত হয় তাহা দূর করিয়া মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনিবার একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের সমগ্র ক্রয়-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখে এবং সরকারের অর্থসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক অব্ ইংলণ্ড সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি এত প্রাচীন না হইলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালনা নীতি—Principles of Central banking.

সাধারণ ব্যাংক পরিচালনা নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালনা নীতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, অন্যান্য ব্যাংকগুলি প্রধানতঃ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। ইহারা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে-কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমগ্র দেশের অর্থসম্বন্ধীয় স্বার্থের রক্ষক বলিয়া মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকলাপ সরকারী বিধি-নিষেধ দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং এই ব্যাংক জনস্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কারবারে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। ইহাই হইল দেশের সমগ্র ধার-পরিমাণের উৎস। অন্যান্য ব্যাংকগুলি ধারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরই নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই এই ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অন্যান্য ব্যাংকগুলি যেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভর করিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেরূপ অন্য কোন উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে পাবে না। সুতরাং দেশের অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বের সীমা নাই।

তৃতীয়তঃ, দেশের অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারের একমাত্র অবিসংবাদী অধিকর্তা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বলিষ্ঠ নীতি থাকা একান্ত আবশ্যক। এই নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দলনিরপেক্ষভাবে বা বিশেষ কোন স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া তাহার নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করা কর্তব্য। দেশের অর্থসম্বন্ধীয় স্বার্থ-সংরক্ষণই হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একমাত্র কর্তব্য এবং এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া স্বাধীনভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগঠন—Constitution of Central Banks.

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগঠনের মধ্যে এত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় যে, ইহাদের সংগঠন সম্পর্কে সর্ববাদিসম্মত কোন নীতি নাই। সংগঠনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এককভাবে কোন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই আদর্শ স্থানীয় বলা যায় না। কোন কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক অংশীদারী কারবারী ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, কোনটি বা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। আবার, কোথায়ও বা রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগঠন যাহাই হউক না কেন, কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংকই একেবারে রাষ্ট্র-প্রভাবমুক্ত নহে। আধুনিককালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নানাভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যাংক পরিচালনার নীতি-নির্ধারণে ও প্রধান প্রধান পদে নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত মুনাফা বণ্টন-ব্যাপারেও

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দেখা যায়। রাষ্ট্র স্বয়ং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুনাফার একটি অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য—Functions of Central Banks.

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কোন কোন লেখক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধার-নিয়ন্ত্রণ কার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ইহাকে শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা হইল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যেকটি কার্যই এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কার্যগুলি এত অংগাংগিভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, ইহার কোন একটিও উপেক্ষণীয় নহে।

দেশের সমগ্র বিহিত অর্থ ও বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যমের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তা হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিহিত অর্থ পরিমাণ ও বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখিবার প্রয়াস পায়। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে এবং এই ক্ষমতাগুলি নিম্ন-লিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

(১) নোট-প্রচলন ক্ষমতা, (২) অন্যান্য ব্যাংকগুলির ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, (৩) রাষ্ট্রের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, (৪) স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণমান চালু রাখা, (৫) শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে কার্য করা এবং (৬) ঋণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কার্য, (৭) অর্থের বহির্মূল্য সংরক্ষণ কার্য, (৮) অন্যান্য ক্ষমতা, যথা, 'নিকাশী ঘর' হিসাবে কার্য বা 'কৃষি ঋণদাতা' হিসাবে কার্য ইত্যাদি।

১। পূর্বে নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা প্রায় সকল ব্যাংকেরই ছিল। এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত। এইজন্য অন্যান্য ব্যাংকগুলির নোট-প্রচলনের অবাধ ক্ষমতা সংকুচিত করিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই এই নোট-প্রচলন ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট-প্রচলনের

একচেটিয়া অধিকার হওয়াতে সমগ্র দেশব্যাপী একরূপ নোট চালু দেখিতে পাওয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি জনসাধারণের মনে অধিকতর আস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দিবার ক্ষমতা তাহাদের নগদ অর্থসঞ্চয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলির এই নগদ সঞ্চয়ের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত নোট ও প্রতীক মুদ্রায় রাখিতে হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহার নোট-প্রচলন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমগ্র বিহিত অর্থপরিমাণ ও ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণতঃ জনসাধারণ-সম্পর্কিত কোন ব্যাংক-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় না। এই ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলির ব্যাংক হিসাবে কার্য করে। অন্যান্য ব্যাংকগুলির সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিন রকমের কার্য করিয়া থাকে: (ক) অন্যান্য ব্যাংকগুলির আমানতি টাকার একটি অংশ নগদ টাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হয়। ইংলণ্ডে অন্যান্য ব্যাংকগুলি তাহাদের সঞ্চিত নগদ তহবিলের এক ভাগ তাহাদের সুবিধার জন্য প্রথাগতভাবে ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডে জমা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থায় অন্যান্য ব্যাংকগুলির পক্ষে তাহাদের সঞ্চিত তহবিলের শতকরা ৩ হইতে ১৩ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ভারতেও তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি তাহাদের আমানতি টাকার শতকরা ২ হইতে ৫ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিতে বাধ্য। (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা—ইহার হস্তেই সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। অন্যান্য ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিল যখন শেষ হয় এবং অন্য কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকই তাহাদের ধার দিয়া থাকে। এই ধার সাধারণতঃ বাট্টা-ধার্য বিলের উপর পুনরায় বাট্টা ধার্য (Rediscount) করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য-পুষ্ট হইয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলি তাহাদের স্বল্পসঞ্চিত তহবিলের ভিত্তিতে অনায়াসে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় সক্ষম হয়।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের অর্থসম্পর্কিত কার্যকলাপ পরিচালনা করে। আধুনিককালে সকল দেশের সরকারই কর

ধার্য করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে এবং এই সংগৃহীত অর্থ নানা উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। সরকারী এই আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলে অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয় উপস্থিত হইতে পারে। সরকারী আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় তদুদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই সরকারী সমগ্র দেনা ও পাওনার আদান-প্রদান হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী হিসাবপত্র রাখে, সরকারী ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করে এবং সরকারী অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জিম্মায় থাকে।

৪। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণমান চালু রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলির শেষ পর্যায়ের ঋণ-দাতা হিসাবে কার্য করে এবং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অসীম বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যাংকগুলি যখন নগদ টাকার অভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা তাহাদের বাট্টা-ধার্য প্রথম শ্রেণীর হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বন্ধক রাখিয়া বা অন্য কোন স্বল্পমেয়াদী বন্ধকীর বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ধার লইতে পারে এবং এই ধারের সাহায্যে তাহারা তাহাদের নিরাপত্তা ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবসায়ে যে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও বিপদাশংকা আছে, একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া এইগুলি দূর করিতে পারে।

৬। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Credit control) করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অন্যান্য ব্যাংকগুলি তাহাদের প্রাপ্ত আমানতের ভিত্তিতে নতুন আমানত সৃষ্টি করিয়া দেশের মোট অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দিয়া এই নূতন আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী না হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যাংকগুলি ধার দিয়া প্রয়োজনের তুলনায় যদি অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করে তাহা হইলে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অপরপক্ষে, ধারের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে মুদ্রা সংকোচ ঘটে। ফলে জাতীয় উৎপাদন ও আয় হ্রাস পাইয়া বেকার সমস্যা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল দেশের সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী এবং সমগ্র ব্যাংক

ব্যবস্থার অধিকর্তা। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যাহা সঠিকভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্য পরিচালনা করিতে পারে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে পারে, যথা, খোলা বাজারী কারবার; নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন, বাছাই করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

৭। প্রত্যেক দেশের অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য আদান-প্রদান চলে। দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যদি ঠিক না থাকে তাহা হইলে বিদেশের সহিত আদান-প্রদানের বিশেষ অসুবিধা হয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশের সরকার নিজ দেশের অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির করিয়া দেয় এবং যাহাতে এই বৈদেশিক বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য অপরিবর্তিত রাখিয়া বহির্মূল্য যাহাতে স্থায়ী থাকে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

৮। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশী ঘরের কার্য করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলির দেনা-পাওনা অতি সহজেই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

নোট-প্রচলন নীতি—Principles of Note-issue.

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নোট-প্রচলন সম্পর্কে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অবলম্বিত হয়, যথা, মুদ্রানীতি (Currency Principle) এবং ব্যাংকনীতি (Banking Principle)।

মুদ্রানীতি—Currency Principle.

মুদ্রানীতির সমর্থকগণ বলেন যে, যেহেতু নোট মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, সেইহেতু প্রচলিত নোট-পরিমাণের সমপরিমাণ ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত রাখা আবশ্যক। জনসাধারণ নোট ভাংগাইতে আসিলে যাহাতে অনায়াসে ধাতব মুদ্রা পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নীতি অনুসারে যত পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলন করা হয়, ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের ধাতব মুদ্রা সঞ্চিত রাখা হয়।

মুদ্রানীতি অনুসারে নোট প্রচলিত হইলে মুদ্রা-ব্যবস্থার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বর্ধিত হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থার

প্রধান অসুবিধা হইল যে, প্রয়োজন অনুসারে এই ব্যবস্থার দ্বারা অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। ধাতুর যোগানের উপর নির্ভর করে বলিয়া অর্থপরিমাণ প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ করা যায় না।

ব্যাংকনীতি—Banking Principle.

অপরপক্ষে ব্যাংক নীতির সমর্থকগণ বলেন যে, যে পরিমাণ মূল্যের নোট বাজারে প্রচলন করা হয় তাহার অনুপাতে স্বল্পপরিমাণ ধাতব মুদ্রা সঞ্চিত রাখিলেও চলিতে পারে, কারণ প্রচলিত সব নোটই এক সংগে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তিত হইবার জন্য উপস্থিত করা হয় না। সুতরাং ১০০৲ টাকার নোট প্রচলন করিলে অভিজ্ঞতা অনুসারে ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকার ধাতব মুদ্রা সঞ্চিত রাখিলেই নোটের পরিবর্তনশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

এই ব্যবস্থায় চাহিদা অনুসারে মুদ্রা-সম্প্রসারণ সহজসাধ্য হয়, কারণ ৩০ বা ৪০টি ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে ১০০টি নোট প্রচলন করা যায়। কিন্তু অন্যদিকে ধাতব মুদ্রার সঞ্চিত পরিমাণ হ্রাস পাইলে অর্থপরিমাণের উপর তাহার সমানুপাতিক অপেক্ষাও অধিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যদি সঞ্চিত ধাতব মুদ্রা হইতে ৩০ বা ৪০টি অপসারিত হয় তাহা হইলে তাহার পরিবর্তে ১০০টি কাগজী নোট অপসারণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ফলে, মূল্যস্তর অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত ৩০ বা ৪০টি ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া যখন ১০০টি নোট চালু করা হয় তখন এই একশত নোটের ৩০ বা ৪০ খানি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি পরিবর্তনের জন্য আর কোন ধাতব মুদ্রা থাকে না।

কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, নোট-প্রচলন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও কোন পদ্ধতিতেই প্রচলিত নোটমূল্যের সমপরিমাণ মূল্যের ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না।

নোট-প্রচলন পদ্ধতি—Systems of Note-issue.

১। বিনা সঞ্চয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ নোট-প্রচলন পদ্ধতি—Fixed fiduciary System.

এই পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনা সঞ্চয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ

মূল্যের নোট প্রচলন করিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ নোট প্রচলন করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কোন ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত রাখিতে হয় না। সরকারী ঋণপত্র বন্ধকী রাখিয়াই এই পরিমাণ নোট প্রচলন করা যায়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত নোট প্রচলন করিতে হইলেই সমপরিমাণ মূল্যের ধাতব মূল্য গচ্ছিত রাখিতে হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পিল্ কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যাংক সম্পর্কিত আইনের বলে ব্যাংক অব্ ইংলণ্ড কোনরূপ ধাতব মুদ্রা গচ্ছিত না রাখিয়াও ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বিনা সঞ্চয়ে এই নোট-প্রচলনের সীমা শেষ পর্যন্ত ৩০০ শত মিলিয়ন পাউণ্ডে বৃদ্ধি করা হয়।

এই পদ্ধতির দ্বারা মুদ্রা-ব্যবস্থার নিরাপত্তা সৃষ্টি হইলেও ইহার প্রধান ত্রুটি হইল যে, এই ব্যবস্থায় অনাবশ্যকরূপে বহু পরিমাণ স্বর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলেও প্রয়োজন অনুসারে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না—কারণ উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত না রাখিয়া কোন নোট প্রচলন করা যায় না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আইন সাময়িকভাবে বাতিল না করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রচলন করা এই ব্যবস্থায় সম্ভব নহে।

২। বিনা সঞ্চয়ে সর্বাধিক পরিমাণ নোট-প্রচলন পদ্ধতি—Maximum fiduciary System.

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী দেশে এই পদ্ধতি অনুসারে নোট প্রচলন করা হইত। এই পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিনা সঞ্চয়ে একটা সর্বাধিক পরিমাণ নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। নোট-প্রচলন ক্ষমতার এই সর্বাধিক সীমা সাধারণতঃ চাহিদা-পরিমাণের ঊর্ধ্বে স্থিরীকৃত হয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে এই সীমাও বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থায় অনাবশ্যকরূপে স্বর্ণ আটক রাখিতে হয় না।

৩। নোটের অনুপাতে সঞ্চয় পদ্ধতি—Proportional Reserve System.

এই ব্যবস্থায় নোট-প্রচলন পরিমাণের শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। নোট-প্রচলনের পরিবর্তে সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ শতকরা

২৫ হইতে ৪০ ভাগ হইতে পারে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে, একটি স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে ৩ খানা নোট প্রচলন করা যাইতে পারে, সুতরাং এই ব্যবস্থায় মুদ্রাপরিমাণ সম্প্রসারণ করা সহজসাধ্য। কিন্তু মুদ্রাসংকোচন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার বিশেষ কুফল লক্ষিত হয়। সঞ্চয়-পরিমাণ হইতে একটি মুদ্রা অপসারিত হইলে সংগে সংগে ৩ খানি নোট অপসারিত করিতে হয়, নতুবা অপর দু'খানি নোট অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। একটি স্বর্ণমুদ্রা অপসারণের ফলে ৩ খানি নোট অপসারিত হইলে মূল্যস্তরের উপর ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই ব্যবস্থায় মূল্যের আকস্মিকভাবে গুরুতর পতন ঘটে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি অনুসারে নোট প্রচলন করা হইত।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে, নোটের অনুপাতে যে পরিমাণ জমা রাখা হয় সেই জমা-পরিমাণের একটি অংশ বিদেশী অর্থ, বিদেশী হুণ্ডি বা বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থে রাখা হয়। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ইহার সঞ্চিত তহবিলের একটি অংশ স্টার্লিং-এ রাখিতে পারে।

৪। ন্যূনতম সংরক্ষণ পদ্ধতি—Minimum Reserve System.

এই ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিয়া যে কোন পরিমাণ নোট প্রচলন করিতে পারে। ১৯৫৬ সালে একটি নূতন আইন পাস করিয়া ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক বর্তমানে ২০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ বা স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিয়া যে-কোন পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলন করিতে পারে। এই পদ্ধতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক।

নোট-প্রচলন পরিমাণের সহিত স্বর্ণ-সঞ্চয় পরিমাণের সম্পর্ক—Relation between the amount of Note-issue and Gold reserve.

পূর্বে দেশে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন প্রচলিত নোটগুলি যাহাতে বিহিত মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায় তজ্জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত। আধুনিক যুগে স্বর্ণমানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত

হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত নোটগুলিকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতা স্বর্ণ-সঞ্চয় পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর যখন দেশের সমগ্র পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে, তখন স্বর্ণ-সঞ্চয় পরিমাণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া ইহার নোট-প্রচলন ক্ষমতা খর্ব করা কোনমতে সমীচীন নহে। মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা-সৃষ্টির ও জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ-সঞ্চয় প্রয়োজন, সেই পরিমাণ স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে মজুত রাখা বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত স্বর্ণ মজুত রাখা বা না-রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিনা সঞ্চয়ে একটা সর্বাধিক পরিমাণ নোট-প্রচলন ক্ষমতা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বর্ণমান অন্তর্হিত হওয়ার সংগে সংগে নোট পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ মজুত রাখিবার এখন আর কোন সার্থকতা নাই। বৈদেশিক আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্য কিন্তু পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। প্রতিকূল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি দেশের পক্ষে বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হয় এবং বর্তমান যুগে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রাখা বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধার-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি—Methods of credit control.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখা। মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক ধার দেওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই উপায়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বাট্টার হারের হ্রাস-বৃদ্ধি—**Manipulation of the Bank rate.**

যে হারে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ধার দেয় অথবা হুণ্ডির উপর বাট্টা ধার্য করে, তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ধার্য বাট্টার হার (Bank rate or

Discount rate) বলা হয়। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ধার্য এই সুদের হার অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক ধার্য সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থানুসারে ইহার সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করে।

(ক) বৈদেশিক বিনিময়ের হারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—**Influence of the Bank rate on foreign exchange.**

যখনই প্রতিকূল বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশ হইতে স্বর্ণ-রপ্তানির সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহার সুদের হার বৃদ্ধি করে। সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বিদেশী পাওনাদারগণ তাহাদের পাওনা টাকা আদায় না করিয়া উচ্চ সুদ পাইবার আশায় দেনাদার দেশেই তাহাদের পাওনা টাকা রাখিয়া দেয়। ফলে, স্বর্ণ-রপ্তানি স্থগিত থাকে এবং উচ্চহারে সুদ পাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশীগণ ঐদেশে স্বর্ণ আমদানি করেন। ইহাতে শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল বাণিজ্যের অবস্থা দূরীভূত হইয়া অনুকূল বাণিজ্যের অবস্থা ফিরিয়া আসে।

(খ) আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—**Influence of the Bank rate on internal price-level.**

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টার হার পরিবর্তন করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া মূল্যস্তর হ্রাস করিতে পারে এবং সুদের হার হ্রাস করিয়া মূল্যস্তর বৃদ্ধি করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক উচ্চহারে সুদ ধার্য হইলে অন্যান্য ব্যাংকগুলি এই উচ্চ সুদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ধার করিতে ইতস্ততঃ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ধার না লইলে অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে বাজারে ধারের পরিমাণও হ্রাস পাইয়া বাজারে প্রচলিত অর্থপরিমাণ (ক্রয়-ক্ষমতা) হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন লোকে সাধারণতঃ দৈনন্দিন ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অধিক পরিমাণ সঞ্চয় করিতে উৎসুক হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক চড়াহারে সুদ ধার্য হইলে বাজারে প্রচলিত অর্থপরিমাণ উপরি-উক্ত কারণসমূহের সমবায়ে হ্রাস পায়। ফলে মূল্যস্তরও হ্রাস পায়।

পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে

ধার করিতে প্রলুব্ধ করিয়া বাজারে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মূল্যস্তরের উত্থান সম্ভব করে।

২। খোলা বাজারী কারবার—Open market operations.

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টার হার পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে সত্যবটে, কিন্তু এই অন্যান্য ব্যাংকগুলির নিজস্ব সঞ্চিত তহবিল যদি পর্যাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের ধার লইবার জন্য আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হইতে হয় না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহার সুদের হার বৃদ্ধি করিয়াও অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন সুদের হার বৃদ্ধি করিয়াও অন্যান্য ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হয়, তখন ইহা খোলা বাজারী কারবারে প্রবৃত্ত হয়। খোলা বাজারী কারবারের অর্থ হইল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহার বন্ধকীপত্র বাজারে বিক্রয় করে অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাংকগুলির নিকট হইতে ধার লয় অথবা অন্যান্য ব্যাংকের বন্ধকীপত্র ক্রয় করে অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে ধার দেয়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ধার্য চড়াসুদ ধার-নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক চড়াসুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট ইহার বন্ধকীপত্র বিক্রয় করে। চড়া সুদের জন্য অন্যান্য ব্যাংকগুলি তাহাদের সঞ্চিত তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বন্ধকীপত্রে বিনিয়োগ করে। কারণ, অন্যান্য ব্যাংকগুলি অন্যত্র ধার দিয়া যে হারে সুদ পাইতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদপেক্ষা অধিক হারে সুদ দেয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই প্রত্যক্ষ বিক্রয়-কার্য দ্বারা বাজার হইতে উদ্বৃত্ত পরিমাণ অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা হয়। ফলে মূল্যস্তর হ্রাস পায়।

অপর পক্ষে মূল্যস্তর যখন হ্রাস পায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন অন্যান্য ব্যাংকগুলির নিকট হইতে বন্ধকীপত্র ক্রয় করে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে অর্থ অন্যান্য ব্যাংকগুলিতে হস্তান্তরিত হয় এবং এই ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ইহাদের ধার দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে, বাজারে অধিক পরিমাণ অর্থ চালু হয় ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। সুতরাং খোলা বাজারী কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক

ধার্য সুদের হার কার্যকরী করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বাজারের স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার যেরূপ প্রভাবিত হয়, খোলা বাজারী কারবারও তদ্রূপ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয় পদ্ধতিই হইল একে অপরের পরিপূরক।

৩। অন্যান্য ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত পরিমাণের পরিবর্তন—**Variation of the Reserve ratio.**

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে সব সময়ে খোলা বাজারী কারবারে প্রবৃত্ত হওয়া হয়ত সম্ভব হয় না। অত্যধিক চড়া দরে বন্ধকীপত্র ক্রয় করা অথবা অতি স্বল্পদরে বন্ধকীপত্র বিক্রয় করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে লাভজনক না'হইতে পারে। এইজন্য অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারী কারবারে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক গচ্ছিত রাখিবার আমানত পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক যদি বুঝিতে পারে যে, অন্যান্য ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই তপশীলী ব্যাংকগুলি অবাঞ্ছনীয়রূপে ধার প্রদান করিতেছে তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাংক এই তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিবার পরিমাণের অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া ইহাদের সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ হ্রাস দ্বারা পরোক্ষভাবে ইহাদের ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সাধারণতঃ তপশীলী ব্যাংকগুলির স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচভাগ রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হয়। কিন্তু এই ব্যাংক-গুলির সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাংকগুলিকে তাহাদের স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচভাগের পরিবর্তে শতকরা সাত অথবা আট ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে নির্দেশ দিতে পারে। এইরূপে উহা তপশীলী ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিল-পরিমাণ হ্রাস করিয়া ধার দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন দেশেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

৪। বাছাই করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ—**Selective credit control.**

উপরি-ব্যাখ্যাত তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু এই ধার-পরিমাণ কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা

হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ধার করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলি এই ধারের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করিবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ধারের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধার প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধারের আবেদনগুলিকে বাছাই করিয়া শুধু সেই ক্ষেত্রেই ধার মঞ্জুর করে যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধার দেওয়া সমীচীন মনে করে। যে সমস্ত ব্যাংক সংভার বিনিময়ে বিনিয়োগ করিবার জন্য ফাটকা ব্যবসায়িগণকে মুক্তহস্তে ধার দেয়, সেই সমস্ত ব্যাংকের হুণ্ডির বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধার দেয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের জন্য যে ধারের প্রয়োজন হয় তাহাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এইরূপে কিস্তিবন্দী হিসাবে ক্রয় করিবার জন্য যে ধার করা হয়, সে সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে না। এই উপায় দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে ধার লইতে উৎসাহিত করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধার লইতে নিরুৎসাহ করে।

৫। নৈতিক প্ররোচনা—Moral persuasion.

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইল সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার অভিভাবকস্বরূপ, সুতরাং অন্যান্য ব্যাংকগুলি স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি একটা আনুগত্য স্বীকার করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ইহার উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে অসংযতভাবে ধার প্রসারণ করিতে নিবৃত্ত রাখে।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরি-উক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া অনেকক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে ধার নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতে দেশীয় ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের আওতার বাহিরে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এই জাতীয় ব্যাংকগুলির ধার দেওয়ার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা-বাজারী কারবার করিয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিল বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু দেশে যদি মূলধন যথাযথভাবে বিনিয়োগের সুবিধা না থাকে তাহা হইলে ধার-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং সেই কারণে মূল্যস্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

১। ব্যাংক অব্ ইংলণ্ড—Bank of England.

ব্যাংক অব্ ইংলণ্ড হইল ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাংক একটি অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পিলের ব্যাংক চার্টার আইন অনুসারে এই ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাংকটি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়।

ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডের কার্য দুইটি পৃথক বিভাগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। নোট-প্রচলন বিভাগ (Note-issue Department) নোট প্রচলন করে। ১,৪৫০,০০০, পাউণ্ড পর্যন্ত বিনা সঞ্চয়ে নোট প্রচলন করিতে পারে, কিন্তু এই পরিমাণের অতিরিক্ত নোট প্রচলন করিতে হইলে নোট-মূল্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। বর্তমানে অবশ্য নোটের পরিবর্তে আর স্বর্ণমুদ্রা দিবার বাধ্যবাধকতা নাই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপরাপর কার্য ব্যাংক বিভাগ (Banking Department) কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই ব্যাংক সরকারী ব্যাংক হিসাবেও কায করে। ব্যাংকের বাট্টা-হারের পরিবর্তন ও খোলা-বাজারী কারবার করিয়া এই ব্যাংক ধার-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের গচ্ছিত আমানতের অনুপাত পরিবর্তন (Variation of the reserve ratio) করিতে পারে না। কারণ ইংলণ্ডের অন্যান্য ব্যাংকগুলির পক্ষে তাহাদের আমানতের কোন অংশই ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডে রাখিবার আইনানুমোদিত বাধ্যবাধকতা নাই। তবে কাজের সুবিধার জন্য সকল ব্যাংকই কিছু টাকা ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডে জমা রাখে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডের ধার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্যকোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক অপেক্ষা কম নহে। কারণ ইংলণ্ডের ব্যাংক ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ঐতিহ্য অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাংকগুলি ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ইংলণ্ডের ব্যাংক-ব্যবস্থায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকের পরিবর্তে কয়েকটি বৃহৎ ব্যাংক দেখা যায়। সুতরাং ব্যাংক অব্ ইংলণ্ডের পক্ষে অল্পসংখ্যক ব্যাংকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়াছে। বিদেশী বিনিময়ের হার ও স্টার্লিং-এর সহিত ভিন্ন দেশীয় মুদ্রার মূল্য এই ব্যাংকই নিয়ন্ত্রণ করে।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা—Federal Reserve System of the United States.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের ন্যায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হয় নাই। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ আইন অনুসারে সমগ্র দেশটিকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল, যে-সমস্ত ব্যাংক বিভিন্ন রাজ্যের আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নহে। কেবলমাত্র জাতীয় ব্যাংকগুলি অর্থাৎ যে ব্যাংকগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছে তাহারাই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হয়। প্রত্যেক সদস্য ব্যাংকের ইহার এলাকাস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করিতে হয়।

এই ১২টি ব্যাংক ইহাদের নিজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (Federal Reserve Board) সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সভা বর্তমানে গভর্ণরদের সভা (Board of Governors) নামে অভিহিত হয়। সাতজন সদস্য লইয়া গভর্ণরদের সভা গঠিত হয় এবং তাঁহারা সকলেই সিনেট্ সভার অনুমোদনক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চৌদ্দ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। গভর্ণরদের সভার হস্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বহু ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে এবং কার্য্যত এই সভাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্থান পূরণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকের জন্য নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালক-মণ্ডলী (Board of Directors) আছে।

গভর্ণরদের সভা বাট্টার হার পরিবর্তন, খোলা-বাজারী কারবার প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ করে।

সদস্য ব্যাংকগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, ১। ফেডারাল্ রিসার্ভ সিটিতে অবস্থিত সদস্য ব্যাংক, ২। অন্য শহরে অবস্থিত ব্যাংক ও ৩। মফঃস্বলের সদস্য ব্যাংক। এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ব্যাংকগুলিরই তাহাদের এলাকাস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাহাদের সমগ্র আমানতের একটি নির্ধারিত পরিমাণ গচ্ছিত রাখিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর সদস্য ব্যাংকগুলির চল্‌তি

আমানতের শতকরা ১৩ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য ব্যাংকগুলির চল্‌তি আমানতের ১০ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ ও তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য ব্যাংকগুলির চলতি আমানতের ৭ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়। গভর্ণরদের সভা প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই নির্ধারিত পরিমাণের পরিবর্তন করিতে পারে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইহার আমানত-পরিমাণের শতকরা ৩৫ ভাগ স্বর্ণে অথবা বিহিত অর্থে মজুত রাখিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি দুই প্রকার নোট প্রচলন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সরকারী কোষাগারে সরকারী ঋণপত্র জমা রাখিয়া একপ্রকার নোট প্রবর্তন করিতে পারে (Federal Reserve Bank notes)। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ জমা রাখিয়া নোট প্রবর্তন করিতে পারে (Federal Reserve notes)। একটি ক্রমবর্ধমান হারে কর দিবার প্রতিশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি গভর্ণরদের সভার অনুমোদনক্রমে ৪০ ভাগের কম পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিয়াও নোট প্রবর্তন করিতে পারে।

৩। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক—The Reserve Bank of India.

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ, এই ব্যাংক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এই ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। বর্তমানে এই ব্যাংক একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর ও দশজন পরিচালক লইয়া গঠিত একটি সভার দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের কার্য দুইটি পৃথক বিভাগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। প্রথম বিভাগটি নোট-প্রচলন বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগটি ব্যাংক-ব্যবসায় সম্পর্কিত বিভাগ বলিয়া অভিহিত হয়। ভারতে নোট প্রবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল এই নোট-প্রচলন বিভাগ। এই বিভাগ স্বর্ণ ও বিদেশী ঋণপত্র মজুত রাখিয়া তৎপরিবর্তে নোট প্রচলন করে। কিন্তু মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ও মজুত বিদেশী ঋণপত্রের পরিমাণ কোনক্রমেই যথাক্রমে ১১৫ কোটী ও ২০০ কোটী টাকার কম হইতে পারিবে না।

ব্যাংক বিভাগটি ব্যাংক সম্পর্কিত নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে। এই বিভাগটি আমানত গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আমানতের কোন সুদ দিতে পারে না। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত তিন মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য হুণ্ডির ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃ বাট্টা ধার্য করিতে পারে, সরকারী ঋণপত্র দ্বারা সমর্থিত হুণ্ডি এবং ১৫ মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য কৃষিজাত পণ্য দ্বারা সমর্থিত হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। উপযুক্ত বন্ধক রাখিয়া চাহিবামাত্র আদায়যোগ্য অথবা তিন মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য ঋণ দান করিতে পারে। এই ব্যাংক ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকারের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যগুলিও করিতে পারে :—

(১) তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির নিকট কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় করিতে অথবা ইহাদের নিকট হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ ক্রয় করিতে পারে।

(২) দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থরক্ষাকল্পে ধার নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে খোলা-বাজারী কারবার ও তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলির রিজার্ভ ব্যাংকে জমার পরিমাণের পরিবর্তন করিতে পারে।

(৩) ভারতের মানমুদ্রা টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার অপরিবর্তিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যাংক বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে।

(৪) সরকারী ব্যাংক হিসাবে সরকারের প্রাপ্য পাওনা গ্রহণ করে, সরকার কর্তৃক দেয় অর্থ প্রদান করে, সরকারী উদ্বৃত্ত অর্থ গচ্ছিত রাখে ও সরকারী ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(৫) এতদ্ব্যতীত কৃষিঋণ সম্পর্কিত সমস্যা অনুশীলন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক একটি কৃষিঋণ বিভাগ স্থাপিত করিয়াছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অভাব দেখা যায়। দেশীয় ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের আওতার বাহিরে বলিয়া ইহাদের উপর রিজার্ভ ব্যাংক কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখা রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে এখনও সম্ভব নহে।

সংক্ষিপ্তসার

আধুনিককালে ব্যাংক-ব্যবসায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেন-দেন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকের উপর নির্ভর করে। ব্যাংক টাকা ধার দিবার জন্যই জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা কর্জ করে।

ব্যাংকের প্রকারভেদ—

১। সেভিংস ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ টাকা আমানত রাখে কিন্তু ধার দেয় না। ২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে এবং সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্য ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করে। ৩। কৃষিব্যাংক দুই জাতীয় হইতে পারে, যথা, সমবায় ব্যাংক ও জমি-বন্ধকী ব্যাংক। ইহারা যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করে। ৪। বিনিময় ব্যাংক-গুলি প্রধানতঃ এক দেশের অর্থ অন্য দেশের অর্থে পরিবর্তিত করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে সাহায্য করে। ৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাংকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করে। ৬। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি চলতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করে।

নিকাশী ঘর—

ব্যাংকগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা আর্থিক আদান-প্রদান না করিয়াও নিকাশী ঘরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। ব্যাংকগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের সমগ্র দেনা ও পাওনার হিসাব করেন। দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান হইলে কোনপ্রকার আর্থিক আদান-প্রদান করিতে হয় না। দেনা-পাওনার পার্থক্য হইলে চেক দ্বারা ঐ পার্থক্য-পরিমাণের আদান-প্রদান হয়। নিকাশী ঘরের কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ব্যাংকেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটা জমা থাকে। চেক দ্বারা ব্যাংক-গুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনার যে আদান-প্রদান হয়, তাহাও অন্যান্য ব্যাংকগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জমার সহিত শুধু যোগ বা বিয়োগ করা হয়।

এইরূপে নিকাশী ঘরের সাহায্যে অর্থের আদান-প্রদান না করিয়াও পারস্পরিক দেনা-পাওনা শোধ হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালনার নীতি—

১। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে অধিক ধার দেওয়া সমীচীন নহে।

২। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান যুক্তিযুক্ত নহে।

৩। দৈনিক চাহিদা পূরণ করিবার জন্য আমানতি অর্থ সুবিবেচনার সহিত বিনিয়োগ করিতে হয়। আমানত অর্থ এরূপভাবে বিনিয়োগ করা উচিত যে, ব্যাংকে মজুত অর্থপরিমাণ অত্যল্প বা অত্যধিক না হয়, অথচ চাহিদা পূরণ করিবার জন্য অনায়াসে যাহাতে ধার দেওয়া অর্থ ফেরত পাওয়া যায়।

ব্যাংক কর্তৃক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি—

সাধারণতঃ নগদ অর্থ জমা রাখিয়া ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক ধার দিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। কোন ব্যবসায়ী টাকা ধার চাহিলে ব্যাংক সমগ্র ধারপরিমাণ হইতে সুদ বাদ দিয়া ঐ ধার দ্বারা ব্যবসায়ীর নামে একটি আমানতের হিসাব সৃষ্টি করে। ব্যবসায়ী এক সময়ে সমস্ত ধার-পরিমাণ অর্থ না লইয়া প্রয়োজন মত চেক দ্বারা উঠাইয়া লয়। ব্যবসায়ীও তাহার অন্যান্য পাওনা টাকা ঐ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে। ধার পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ব্যবসায়ীর ব্যাংক-সম্পর্কিত দেনা ও জমার টাকা যদি সমান হয়, তাহা হইলে লেন-দেন আপনা হইতেই শোধ হয়। দেনা ও জমার টাকার পার্থক্য হইলে এই পার্থক্য পরিমাণই ব্যবসায়ীকে দিতে হয়। এইরূপে ধার দিয়া ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যাংকগুলি ধার দিয়া যে আমানত সৃষ্টি করে, এই আমানত-সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকগুলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ব্যাংকগুলির নগদ আমানতকারিগণ একসংগে তাঁহাদের গচ্ছিত অর্থ তুলিয়া লন না বলিয়া ব্যাংকগুলি ঐ আমানতি টাকা অন্য লোককে ধার দিতে পারে।

ব্যাংকের কার্য ও উপযোগিতা—

১। ব্যাংক উদ্বৃত্ত অর্থ-সংগ্রহ করিয়া আমানত সৃষ্টি করে। ব্যাংক নগদ অর্থ জমা লইয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে এবং ধার দিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

২। ব্যাংক ধার দেয়। বন্ধকীর বিনিময়ে, হুণ্ডির উপর বাট্টা ধার্য করিয়া এবং নগদ আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অগ্রিম দিয়া ব্যাংক ধার দেয়।

৩। ব্যাংক নোট, চেক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া অর্থ পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেয়।

৫। মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংক অন্য বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে, যথা, মক্কেলের পাওনা টাকা আদায় করা, দেনা শোধ দেওয়া, মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি।

ব্যাংক জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া আমানতি টাকা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে ধার দেয় ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়করূপে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক—

সমগ্র দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অধিকর্তা হিসাবে যে ব্যাংক কাজ করে, তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া হইল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে এবং সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মালিক হইল দেশের সরকার এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির কার্য পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য—

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১। কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিবার একচেটিয়া অধিকার এবং সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত অন্যান্য মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই বাজারে চালু হয়। অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে ঋণদান বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিয়া ঋণের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করে।

২। ইহা সরকারী ব্যাংক হিসাবে কার্য করে। সরকারী দেনা ও পাওনা বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার ইহা নিষ্পন্ন করে।

৩। ইহা অন্যান্য ব্যাংকগুলির ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংকগুলি তাহাদের আমানতের কিয়দংশ এই ব্যাংকে জমা রাখে ও প্রয়োজনমত ধার পায়।

৪। দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের হার রক্ষা করে।

1. What is a Bank ? What are its services to society for which you consider it useful ? (C. U. 1950)

2. Discuss the functions of Central Banks. (C.U. 1955)

3. Describe how banks create credit. (C. U Sup. 1955)

4. Enumerate the functions of Central Banks. What methods do they adopt to control credit ? (C.U. B. Com. 1956)

5. Indicate the importance of the Clearing House system in modern banking. (C. U. 1951)

6. In what sense is it true to say that the main function of a bank is to exchange its own credit for its customer's credit ? What limits, if any, are there to the bank's power of creating credit ? (C. U. 1932)

7. "Banks are peculiar in this respect, that they are the only business institutions that boast of the volume of their debts." Critically examine this statement.

8. Discuss the different methods for the regulation of the Note Issue. Which of them you prefer and why ? (C. U. 1957)

9. Comment on the statement that the loans of a bank create deposit. (C. U. 1958)

10. "Loans make deposits". Discuss this statement. (C. U. B. Com. 1961)

11. Describe the different methods employed by Central Banks to control credit. (C. U. 1960, 1962)

12. What are the considerations which guide a sound and prudent Banker in determining the amount, composition and character of his Reserve. (C. U. B. Com. 1962)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়

(International Trade and Foreign Exchange)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি—Nature of International Trade.

যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও কার্যের বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়-কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থ। সুতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য বিনিময়-কার্যে অসুবিধা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি—Basis of International Trade.

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-নীতির সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতির মূলগত পার্থক্য না থাকিলেও কয়েকটি কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতির স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শ্রম-বিভাগই হইল আভ্যন্তরীণ বিনিময়-কার্যের প্রধান কারণ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন-ক্ষমতার আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে। সকল দেশই যদি সমান সুবিধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে আর আন্তর্জাতিক বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না। ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির

জন্যই একটি দেশ অপর দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম খরচায় ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া অন্যান্য দেশ উক্ত দ্রব্যগুলি ঐ দেশ হইতে ক্রয় করে। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্য-উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা আছে বলিয়া ভারতে ধান, পাট, চা প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় কম। কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী করা সম্ভব হইলেও দক্ষ শ্রমিক ও উপযুক্ত যান্ত্রিক বিশেষজ্ঞের অভাবে এইগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী হয়। এইজন্য ভারত বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া সেই দেশগুলি হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করে। ফলে উভয় দেশই লাভবান হয়। সুতরাং শ্রম বিভাগ ও বিশেষজ্ঞতা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পার্থক্য—Difference between International trade and Domestic trade.

বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য ঘটে, তাহা প্রধানতঃ ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ নীতির ভিত্তিতে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহার প্রধান কারণ হইল শ্রম ও মূলধনের দেশান্তরে গতিশীলতার অভাব (Immobility of Labour and Capital)। জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি বিভেদের জন্য এক দেশের শ্রমিক সাধারণতঃ ভিন্ন দেশে যাইতে অনিচ্ছুক। শ্রমিকের ন্যায় মূলধনের মালিকগণও বিদেশের নানা অনিশ্চয়তার জন্য দেশান্তরে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করিতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক হয়। সুতরাং দেশাভ্যন্তরে শ্রম ও মূলধনের যে পরিমাণ গতিশীলতা দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা তদপেক্ষা অনেক কম। শ্রম ও মূলধনের এই গতিশীলতার অভাবের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই দ্রব্য উৎপাদন-খরচার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে কোন দেশ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনে অধিকতর সুবিধার অধিকারী, আবার কোন দেশ অপেক্ষাকৃত কম সুবিধার অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাবের কারণ ব্যতীতও নৈসর্গিক কারণেও দেশগুলির আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার পার্থক্য ঘটিতে পারে। কোন দেশ আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন কোন দেশ নানাজাতীয়

খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারে। এই সমস্ত নৈসর্গিক সুবিধা বা অসুবিধা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরযোগ্য নহে বলিয়া দেশগুলির আপেক্ষিক সুবিধা বা অসুবিধাগুলি সমান নহে।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রত প্রত্যেকটি দেশই হইল স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই কারণে বাণিজ্যরত দেশগুলি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে তাহাদের বাণিজ্য-নীতি নির্ধারণ করিতে পারে। ফলে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যগুলির অবাধ আমদানী বা রপ্তানী ব্যাহত হইতে পারে। কিন্তু একই দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রব্যের অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণতঃ এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না।

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির পৃথক আলোচনা করা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা তত্ত্ব—Theory of Comparative Costs.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতিতে নির্ধারিত হয়, ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। আভ্যন্তরীণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দেশাভ্যন্তরে শ্রম ও মূলধনের অবাধ গতিশীলতার জন্য সকল প্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থায়ই উৎপাদনের উপাদানগুলির পারিশ্রমিক সমান হয় এবং উৎপাদনের এই উপাদানগুলির সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মূল্য শেষ পর্যন্ত দ্রব্যগুলির উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে চাহিদা ও সরবরাহ সূত্রের প্রভাব উপেক্ষণীয় না হইলেও, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের আপেক্ষিক গতিশীলতার অভাবের জন্য চাহিদা ও সরবরাহের সূত্র-প্রয়োগের একটু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

উৎপাদন-খরচার পার্থক্যই হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান কারণ। উৎপাদন-খরচার এই পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা, (ক) উৎপাদন-খরচার সম্পূর্ণ পার্থক্য (Absolute differences in costs), (খ) উৎপাদন-খরচার সমান পার্থক্য (Equal differences in costs), ও (গ) উৎপাদন-খরচার আপেক্ষিক পার্থক্য (Comparative differences in costs)।

প্রথম ও তৃতীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর, কিন্তু দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদন-খরচা যদি সমান হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাট-উৎপাদনে ভারতের সম্পূর্ণ সুবিধা আছে এবং সেইজন্য অন্যান্য দেশগুলি তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে ভারত হইতে পাট ক্রয় করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধানতঃ উৎপাদন-খরচার আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই শুরু হয় এবং এই আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই চালু থাকে। কোন দেশের উৎপাদন-খরচার সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও ইহা সমস্ত দ্রব্যগুলিই দেশে উৎপাদন না করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ড অপেক্ষা অল্প খরচে দুগ্ধজাত সামগ্রী ও মেশিন উভয়ই প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ড হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্য ক্রয় করে। ইহার কারণ হইল যে, দুগ্ধজাত দ্রব্য অপেক্ষা মেশিন তৈয়ারী ব্যাপারে ইংলণ্ড অধিকতর সুবিধার অধিকারী। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য উৎপাদন-খরচার আপেক্ষিক পার্থক্যের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় এবং এই আপেক্ষিক পার্থক্য বলিতে একই দেশে উৎপাদিত দুইটি দ্রব্যের উৎপাদন-খরচার পার্থক্য বুঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা তত্ত্বের ধারণা আরও স্পষ্ট করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে। একই উৎপাদন-খরচায় ভারতে ১৫ মণ পাট এবং ২০ মণ চাউল উৎপাদন করা যায় এবং ঐ একই খরচায় পাকিস্তানে ২০ মণ পাট এবং ১৫ মণ চাউল উৎপাদন করা যায়। এরূপক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভারতের চাউল-উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা আছে এবং পাকিস্তানের পাট-উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা আছে। সুতরাং ভারতের পক্ষে চাউল রপ্তানী করিয়া পাট আমদানী করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে পাট রপ্তানী করিয়া চাউল আমদানী করা অধিকতর সুবিধাজনক। যদি ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করে, তাহা হইলে সমগ্র উৎপন্ন পাট-পরিমাণ হইবে ১৫ + ২০ = ৩৫ মণ এবং সমগ্র চাউল-পরিমাণ হইবে ২০ + ১৫ = ৩৫ মণ। কিন্তু ভারত যদি শুধু চাউল উৎপাদন করে এবং পাকিস্তান শুধু পাট উৎপাদন করে, তাহা হইলে সমগ্র পাট-পরিমাণ হইবে ২০ + ২০ = ৪০ মণ এবং সমগ্র চাউল-পরিমাণও হইবে ২০ + ২০ = ৪০ মণ। এই ব্যবস্থায় পাট ও চাউলের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

এরূপক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চাউল ও পাটের বিনিময়ের হার উভয় দেশের উৎপাদন-খরচার আপেক্ষিক পার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। উপরি-উক্ত উদাহরণ অনুসারে চাউল ও পাটের মূল্য ১৫ মণ পাট=২০ মণ চাউল এবং ২০ মণ পাট=১৫ মণ চাউল, এই অনুপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। যদি ধরা যায় যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৭ মণ চাউলের পরিবর্তে ১৬ মণ পাটের বিনিময় হইতেছে এবং যদি কোন কারণে পাকিস্তানে ভারতের চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ভারতে পাকিস্তানের উৎপন্ন পাটের চাহিদা বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে পাকিস্তান অধিক পরিমাণ পাট অর্থাৎ ১৬ মণের স্থলে ১৭ মণ পাট দিয়া ভারত হইতে ১৭ মণ চাউল সংগ্রহ করিবে। অপরপক্ষে, পাকিস্তানে যদি ভারতের চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি না পায় এবং ভারতে যদি পাকিস্তানের পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ভারতও অধিক পরিমাণে চাউল অর্থাৎ ১৮ মণ চাউল দিয়া পাকিস্তান হইতে ১৬ মণ পাট ক্রয় করিবে। এইরূপে উভয় দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার এই আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচার পার্থক্যের সীমার মধ্যে এরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে যাহাতে শেষ পর্যন্ত ভারত কর্তৃক আমদানীকৃত সমুদয় পরিমাণ পাটের মূল্য এবং ভারত হইতে রপ্তানীকৃত সমুদয় পরিমাণ চাউলের মূল্য সমান হয়।

আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয় এবং যখন বহুদেশের মধ্যে বহুদ্রব্যের বিনিময় হয় তখনও এই আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা তত্ত্বের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করা যাইতে পারে :

(ক) শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাবের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচার পার্থক্য হয়, সেই আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়।

(খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময়যোগ্য দ্রব্যগুলির মূল্য আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচার সীমার মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। (The international values of goods, i.e. the ratios of

exchange will depend upon the intensity of reciprocal demand within the limits imposed by comparative costs.)

(খ) বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই বিনিময়ের হার এইরূপ হইবে, যাহাতে দীর্ঘ-মেয়াদে একটি দেশের রপ্তানীকৃত সমস্ত দ্রব্যমূল্য ইহার আমদানীকৃত সমস্ত দ্রব্যমূল্যের সমান হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—Advantages of International trade.

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশগুলি ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

২। যে দেশে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচা অধিক, সে দেশ দেশাভ্যন্তরে উক্তদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে যে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সর্বাধিক সুবিধা আছে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সু-ব্যবহার হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের মূল্য সর্বত্র সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উৎপাদক সংঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়।

৫। দুর্ভিক্ষের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশে পর্যাপ্ত

পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করা সম্ভব হয়।

৬। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকগুলি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও ভাবেরও আদান-প্রদান হয়। ফলে, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক বিরোধের সম্ভাবনা দূর করে।

অসুবিধা—Disadvantages.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষবিমুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি অসুবিধাও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করে। ইহার ফলে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হয় যে, যুদ্ধ ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে ঐ দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইলে আমদানী-কৃত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির অভাবে প্রথম দেশটির বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার ঘটিতে পারে না। দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার না হইলে স্থানীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

৩। অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশে মদ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্যের আমদানী হয়। এই অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি ব্যবহারের জন্য দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে আমদানী করে, সে দেশ যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, যে দেশ বিদেশে রপ্তানী করে সে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফার আশায় অত্যধিক পরিমাণে রপ্তানী করিবার ফলে দেশের খনিজ, বনজ প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত সম্পদগুলি নিঃশেষিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের

চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই উৎপাদন-কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কোন কারণে বিদেশী চাহিদা হ্রাস পাইলে অত্যুৎপাদন (over-production) সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

৫। অর্থনৈতিক অসুবিধা ব্যতীতও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতিপয় অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়-ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কাঁচামাল ক্রয় করিবার ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশগুলি নূতন নূতন বাজার অন্বেষণ করে। বাজার অন্বেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে অনেক সময় যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার পরিমাপ—Measurement of the gains from International trade.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রত দেশগুলি পারস্পরিক আদান প্রদান দ্বারা লাভবান হয় বটে কিন্তু লাভের পরিমাণ সকল দেশের সমান হয় না। লাভের পরিমাণ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে :

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা লাভের পরিমাণ প্রথমতঃ বাণিজ্যরত দেশগুলির উৎপাদন-খরচার অনুপাতের (Cost ratios) উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-খরচার অনুপাতের পার্থক্য যতই বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ ততই বেশী হয়। যদি ভারতের ধান্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পাকিস্তানের পাট-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকেরও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উভয় দেশই এই দুইটি দ্রব্যের বিনিময় দ্বারা অধিকতর লাভবান হইবে। সুতরাং উভয় দেশের শ্রমিকের আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার উপরেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ নির্ভর করে।

২। দ্বিতীয়তঃ, লাভের পরিমাণ বাণিজ্যের শর্ত (terms of trade) দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাণিজ্যের শর্ত বলিতে বুঝা যায়, যে-হারে একদেশের পণ্যদ্রব্য অন্যদেশের পণ্যদ্রব্যের সহিত বিনিময় করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্কে প্রদত্ত উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, এই উভয়

দেশের মধ্যে চাউল ও পাটের বিনিময়ের শর্ত হইল ১৭ মণ চাউলের পরিবর্তে ১৬ মণ পাট।

৩। এই বাণিজ্যের শর্ত আবার পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতার (intensity of reciprocal demand) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া লাভের পরিমাণ স্থির করে। উপরি-উক্ত উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, পাকিস্তানে যদি ভারতের উৎপন্ন চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সংগে ভারতে যদি পাকিস্তানে উৎপন্ন পাটের চাহিদা বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে পাকিস্তান অধিক পরিমাণ পাটের বিনিময়ে ভারত হইতে ১৭ মণ চাউল সংগ্রহ করিবে। সুতরাং দেখা যায় যে, যে-দেশের রপ্তানীর চাহিদা অপরিবর্তনীয় (Demand for exports inelastic) কিন্তু আমদানীর চাহিদা পরিবর্তনীয় (Demand for imports elastic), সে-দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা অধিকতর লাভবান হয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্যের শর্ত এই দেশের অনুকূল হয়।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাণ বাণিজ্যরত দেশগুলির আর্থিক আয়ের মান (Level of money income) দ্বারা পরিমাপ করা যায়। আর্থিক আয়ের এই মান দ্বারা বাণিজ্যরত দেশগুলির মধ্যে কোন্ দেশটি সর্বাধিক লাভবান হইতেছে তাহাও নির্ধারণ করা যায়। যদি কোন দেশের রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ইহার আর্থিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানী দ্রব্যের উৎপাদন-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরির হার বৃদ্ধি না পাইলে শ্রমিকগণ নিম্ন মজুরির শিল্পগুলি হইতে উচ্চ মজুরির শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে সমগ্র দেশের মজুরির সাধারণ হার বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দেশের আর্থিক আয়ের মান বৃদ্ধি পাইলেও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকিবে এবং এই কারণে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্য ভোগ-ব্যবহার দ্বারা জনসাধারণ অধিকতর লাভবান হইবে: পক্ষান্তরে, যে দেশে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত

পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অধিক হয়, সে দেশের আর্থিক আয়ের মান হ্রাস পায়, কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর শ্রমিকের মজুরির হার ও নিয়োগ-ক্ষেত্রের সংকীর্ণতার প্রভাব—Effect of rates of Wages and Non-Competing groups on International trade.

বিভিন্ন দেশে মজুরির হার বিভিন্ন হয়। কোন দেশে মজুরির হার বেশী, আবার কোথায়ও বা মজুরির হার কম। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যেখানে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে উৎপাদন-খরচা কম হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে দেশের উৎপাদন-খরচা কম, সে দেশ আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা তত্ত্ব অনুসারে অধিকতর লাভবান হয়। কিন্তু উপরি-উক্ত যুক্তি সর্বক্ষেত্রে সত্য নহে। কারণ, মজুরির হার কম হইলেই যে উৎপাদন-খরচা কম হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মজুরির এই নিম্নহার যদি শ্রমিকের আপেক্ষিক দক্ষতার অভাব সূচিত করে, তাহা হইলে এই আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার অভাবের জন্যই উৎপাদন-খরচা অধিক হয়। ভারতের শ্রমিকের মজুরির হার ইংলণ্ডের শ্রমিকের মজুরির হার অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু ভারতের শ্রমিকের মজুরির হার কম বলিয়া ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত কোন বিশেষ সুবিধার অধিকারী নহে, পরন্তু উচ্চ মজুরি হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে ইংলণ্ড কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। ইহার কারণ হইল যে, ইংলণ্ডের শ্রমিক ভারতের শ্রমিক অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনদক্ষ। সুতরাং অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়াই ইংলণ্ডের শ্রমিক উচ্চহারে মজুরি পায় এবং এই জন্যই উচ্চহারে মজুরি প্রদান করিয়াও ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হয় না। শ্রম যদি উৎপাদনক্ষম হয় তাহা হইলে উচ্চহারে মজুরি প্রদান করিলেও এই উচ্চহারের মজুরি প্রদান সার্থক হয় (Economy of high wages)। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মজুরির হার অপেক্ষা মজুরের উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা অধিকতরভাবে প্রভাবিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রমিকের নিয়োগ-ক্ষেত্রের সংকীর্ণতার জন্য কোন কোন দেশে শিল্পবিশেষের শ্রমিকগণ নিম্নহারে মজুরি পাইয়া থাকে;

কিন্তু ভিন্ন দেশে অনুরূপ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ উচ্চহারে মজুরি পায়। এরূপ ক্ষেত্রে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যে-দেশে শ্রমিকগণ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে, সে দেশে ঐ জাতীয় শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য হইলে মজুরির হার হ্রাস পায় ও উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচাও কম হয়। উৎপাদন-খরচা কম হইলে সেই দেশ যে-দেশে উচ্চ মজুরির জন্য উচ্চ উৎপাদন-ব্যয় হয় সেই দেশে কমমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। এইরূপে যে-দেশ শ্রমিকগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে মজুরি দিতে পারে সে-দেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

কিন্তু বাণিজ্যে রত সকল দেশেই যদি এইরূপ সংকীর্ণ নিয়োগ-ক্ষেত্রে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব বর্তমান থাকে, তাহা হইলে কোন দেশই উৎপাদন-খরচার এই আপেক্ষিক সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকতর লাভবান হইতে পারে না। কার্যতঃ দেখা যায় যে, সকল দেশেই প্রায় একই পদ্ধতিতে সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর স্থান নির্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংকীর্ণ নিয়োগ-ক্ষেত্রে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্বের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি বা প্রকৃতি বিশেষ ব্যাহত হয় না।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন-দেনের উদ্বৃত্ত—Balance of Trade and Balance of Accounts.

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিতে একটি দেশে আমদানীকৃত ও দেশ হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের সম্পর্ক বুঝায়। দেশের আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্যকেই বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) বলা হয়। একটি দেশ যদি অধিকমূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ও কমমূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে দেশে আমদানী করে তাহা হইলে সে দেশের আমদানীর মূল্য (Value of imports) অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য (Value of exports) বেশী হইয়া সে-দেশ পাওনাদার হয়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Favourable Balance of Trade) এবং রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Adverse Balance of Trade) বলা হয়। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইলে সে-দেশ দেনাদার দেশে পরিণত হয়।

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য যখন পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীতে সীমাবদ্ধ থাকে তখন আমদানী ও রপ্তানীর এই তালিকা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Visible Items of trade) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দুইটি দেশের আদান-প্রদান শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পণ্যদ্রব্য ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে নানা প্রকারের লেন-দেন চলে। এই নানা প্রকারের লেন-দেনগুলি হইল :—

(১) বিদেশ হইতে গৃহীত মূলধনের আসল ও সুদ প্রদান।

(২) বিদেশীগণকে দেশের কোন কর্মে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেন্সন প্রদান।

(৩) বিদেশী জাহাজ ব্যবহার করিলে তাহার মাশুল প্রদান।

(৪) বিদেশী ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাজের মূল্য বাবদ অর্থ-প্রদান।

(৫) ভ্রমণ ও শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

(৬) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অথবা অপর দেশকে সাহায্য বাবদ দেয় অর্থ।

জিনিসপত্রের আমদানী ও রপ্তানী ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত নানা প্রকারের লেন-দেন হইয়া থাকে। জিনিসপত্রের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত দেনা-পাওনার যে হিসাব রাখা হয় তাহাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Invisible Items of trade) বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, জিনিসপত্রের মূল্য ব্যতীতও নানা কারণে দুইটি দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা থাকিতে পারে। দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবকে লেন-দেনের উদ্বৃত্ত (Balance of Accounts or Payments) বলা হয়।

আমদানী-রপ্তানী সমতা—Equality of Imports and Exports.

আমদানী ও রপ্তানীর সমতা বলিতে : (১) একটি দেশের দৃশ্যমান আমদানী ও দৃশ্যমান রপ্তানীর সমতা বুঝায় না বা (২) কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই আমদানী ও রপ্তানী সমতা প্রাপ্ত হইবে তাহাও বুঝায় না। 'আমদানী-রপ্তানীর সমতা'র প্রকৃত তাৎপর্য হইল যে, শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেনা-পাওনার হিসাবের ভিত্তিতে একটি দেশের বিদেশে মোট দেয় ও বিদেশ হইতে মোট প্রাপ্য অর্থের মূল্য পরিমাণ সমান হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,

জিনিসপত্র ব্যতীত একটি দেশের অপর দেশের সহিত অন্য নানাবিধ লেন-দেন হয়। জিনিসপত্রের মূল্য ব্যতীতও আরও অনেক বাবদে বিদেশ হইতে টাকা পাওয়া যায় অথবা বিদেশে টাকা পাঠাইতে হয়। একটি দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমগ্র পরিমাণ আমদানী মূল্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমগ্র পরিমাণ রপ্তানী মূল্যের সহিত শেষ পর্যন্ত সমান হইবেই। রপ্তানী মূল্য ও আমদানী মূল্যের মধ্যে যদি কোন তারতম্য ঘটে তাহা হইলে অন্য বাবদে দেনা-পাওনা দিয়া তাহা পূরণ হয়।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই লেন-দেন কি ভাবে সমতা প্রাপ্ত হয়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হওয়ার ফলে যদি কোন দেশের পাওনা অর্থপরিমাণ দেনার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে দেনাদার দেশ স্বর্ণ দ্বারা পাওনাদার দেশের ঋণ পরিশোধ করিবে। বিদেশ হইতে স্বর্ণ আগমনের ফলে পাওনাদার দেশের ব্যাংকগুলির সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্যাংকগুলি সুদের হার হ্রাস করিয়া অধিক পরিমাণ ধার দিবে। ব্যাংকের এই সুলভ ধার দেওয়ার জন্য মূলধনের বিনিয়োগ ও লোকের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইয়া মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত আমদানী-রপ্তানী সমতা প্রাপ্ত হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময়ের হার নির্ধারণ—Determination of the Rate of Exchange.

যে-হারে এক দেশের অর্থ অন্য দেশের অর্থের সহিত বিনিময় করা যায়, তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার বলা হয়। বাণিজ্যরত দেশগুলিতে স্বর্ণমান মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণের মূল্যের ভিত্তিতে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। বাণিজ্যরত দেশগুলির এক বা একাধিক দেশে যখন কাগজী-মান প্রচলিত থাকে তখন স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এই বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময়ের হার নির্ধারণ—Rate of Exchange under Gold Standard.

দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রাস্থিত স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতেই বিনিময়ের

হার নির্ধারিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে মান বা প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য স্থির হইত এবং সরকারী নিয়মানুসারে যে-কোন লোক ঐ নির্দিষ্ট মূল্যে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণের পরিবর্তে মুদ্রা বা মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত অবাধভাবে স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী করা যাইত। যে মূল্যে বিদেশী অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করিলে সমপরিমাণ স্বর্ণ আদান-প্রদানের সামিল হয়, সেই মূল্যকে স্থির মূল্য (Par value) বা টাকশালের মূল্য (Mint par of exchange) বলা হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড মুদ্রায় যে পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ছিল মার্কিন দেশের ৪.৮৬৬ ডলারে ঠিক সেই পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত এবং ফরাসী দেশের ২৫.২২১৫ ফ্রাংকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত। এইজন্য ইংলণ্ড ও মার্কিণ দেশের মধ্যে বিনিময়ের টাকশালের দর ছিল ১ পাউণ্ড = ৪.৮৬৬ ডলার এবং ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের মধ্যে ঐ দর ছিল ১ পাউণ্ড = ২৫.২২১৫ ফ্রাংক।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে হারে দুইটি দেশের মধ্যে অর্থের বিনিময় হয় তাহা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে টাকশালের দর অপেক্ষা কিছু বেশী বা কম হইয়া থাকে। একটি উদাহরণ দ্বারা বিনিময়ের এই টাকশালের দরের উত্থান-পতন স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে এবং কোন এক সময়ে ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইয়াছে। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক হওয়ার অর্থ হইল যে, মার্কিন দেশকে রপ্তানীর মূল্য বাবদ ইংলণ্ডকে অর্থ প্রদান করিতে হইবে এবং এই অর্থ স্বর্ণ দ্বারা দিতে হইবে। ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশের মধ্যে বিনিময়ের টাকশালের দর হইল ১ পাউণ্ড = ৪.৮৬৬ ডলার। মার্কিন দেশের ক্রেতাগণের ইংলণ্ডে স্বর্ণ পাঠাইতে হইলে প্রতি পাউণ্ডে মাশুল, বীমা খরচ প্রভৃতি স্বর্ণ পাঠাইবার আনুষংগিক খরচা বাবদ অতিরিক্ত .১ ডলার খরচ করিতে হয়। সুতরাং প্রতি পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য মার্কিন ক্রেতাগণকে ৪.৮৬৬ + .১ ডলার = ৪.৯৬৬ ডলার দিতে হইবে। মার্কিন ক্রেতাগণ ইংলণ্ডে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ ও অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক বা অন্য বিক্রেতাগণের নিকট হইতে ৪.৯৬৬ ডলার হার পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ড ক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু

এক পাউণ্ডের জন্য যদি তাহাদের ৪·৯৬৬ ডলার অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয় তাহা হইলে তাহারা পাউণ্ড ক্রয় না করিয়া ·১ ডলার অতিরিক্ত খরচা করিয়া স্বর্ণ পাঠাইবে। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার টাকশালের দর+স্বর্ণ পাঠাইবার আনুষংগিক খরচার উর্ধ্বে যাইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী যদি অধিক হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ক্রেতাগণ প্রতি পাউণ্ডে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা বাদ দিয়া অর্থাৎ ৪·৮৬৬—·১ ডলার অর্থাৎ ৪·৭৬৬ ডলার ক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। বিনিময়ের হার টাকশালের দর—স্বর্ণ পাঠাইবার আনুষংগিক খরচের নিম্নে যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ক্রেতাগণ ডলার ক্রয় না করিয়া স্বর্ণ পাঠাইবে। দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হারের উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমাকে যথাক্রমে স্বর্ণ-রপ্তানী সীমা (Gold exporting point) ও স্বর্ণ-আমদানী সীমা (Gold importing point) বলে।

দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার এই উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমার মধ্যে নির্ধারিত হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়ের এই হার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিনিময়ের হার কখন স্বর্ণ-রপ্তানী ও স্বর্ণ-আমদানী সীমার বাহিরে যাইতে পারে?—When do the rates of exchange go beyond the specie points ?

সাধারণতঃ বিনিময়ের হার এই স্বর্ণ রপ্তানী ও আমদানী করিবার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হয় কিন্তু, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনিময়ের হার এই সীমার বাহিরেও নির্ধারিত হইতে পারে।

(ক) যদি বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য স্বর্ণ পাইবার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে দেশী ক্রেতাগণ বিদেশী অর্থ ক্রয় করিবার জন্য রপ্তানী সীমার অধিক হারে মূল্য দিতে বাধ্য হয়।

(খ) যদি জরুরী কারণে দেশে নগদ অর্থ বা স্বর্ণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দেশীয় বিক্রেতাগণ বিদেশী ক্রেতাগণ কর্তৃক স্বর্ণ প্রেরণ করা পর্যন্ত

অপেক্ষা না করিয়া আমদানী সীমা অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের হুণ্ডি বিক্রয় করিতে পারে।

(গ) যুদ্ধের সময় স্বর্ণের আদান-প্রদানে বিশেষ ঝুঁকি থাকে বলিয়া অনেক সময় বৈদেশিক লেন-দেন বিনিময় হারের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমার কম-বেশী হইতে পারে।

বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তনের কারণ—Causes of the fluctuations of the rate of exchange.

পূর্বেই বলা হইয়াছে বৈদেশিক হুণ্ডির সাহায্যে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার আদান-প্রদান হয়। বৈদেশিক হুণ্ডির চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক পরিমাণের উপরই বিনিময় হারের উত্থান-পতন নির্ভর করে। হুণ্ডির চাহিদা ও সরবরাহ আবার নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে।

(ক) বাণিজ্যিক অবস্থা—Trade conditions.

যখন আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হয় তখন রপ্তানীকারক দেশের অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিময়ের হার ঐ দেশের অনুকূল হয়। অপর পক্ষে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক হইলে বিনিময়ের হার প্রতিকূল হয়।

(খ) ব্যাংক-ব্যবসায় সম্পর্কিত অবস্থা—Banking conditions.

ঋণ-শোধ, সুদ-প্রদান, বিদেশে বিনিয়োগ বা বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য দ্বারা ব্যাংকের মাধ্যমে এক দেশের সহিত অপর দেশের যে আর্থিক লেন-দেন হয়, তজ্জন্যও বৈদেশিক বিনিময় হারের উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে।

(গ) মুদ্রা-ব্যবস্থা—Currency conditions.

যখন কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় তখন এই হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যের অর্থের চাহিদাও হ্রাস পায়। ইহার ফলে বিনিময়ের হার ঐ দেশের প্রতিকূল হয়।

কাগজীমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ—Rate of exchange under paper standard.

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়ের হার বাণিজ্যরত দেশগুলির প্রামাণিক

মুদ্রাস্থিত স্বর্ণের অনুপাতে স্থির হয় এবং এই বিনিময় হার স্বর্ণ রপ্তানী ও আমদানীর সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হইতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যরত দেশগুলিতে যদি স্বর্ণমানের পরিবর্তে কাগজীমান প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতে আর বিনিময়ের হার নির্ধারিত হইতে পারে না। যুদ্ধের পরবর্তী-কালে যখন প্রায় সকল দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজীমান প্রবর্তন করিল তখন হইতে এক নূতন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নির্ধারিত হইতে আরম্ভ হইল।

সমান ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিনিময়ের হার নির্ধারণ সূত্র—Purchasing power parity theory.

এই মতবাদটি সুইডেন দেশের ধনবিজ্ঞানী গাষ্টাভ ক্যাসেল্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। ক্যাসেলের মতে কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়ের হার বাণিজ্য-রত দেশগুলিতে প্রচলিত মূল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ ক্রয়-শক্তির অনুপাতে বিদেশী অর্থের মূল্য স্থির হয়। যখন ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিদেশী অর্থের দর স্থির হয়, তখন সেই দর স্থায়ী হইতে পারে। এই সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, বৈদেশিক বিনিময়ের চলিত হার এরূপ হইবে যে, একই পরিমাণ অর্থ যদি ঐ চলিত হারে বৈদেশিক অর্থের সহিত বিনিময় করা হয় তাহা হইলে উভয় দেশেই সমান পরিমাণ দ্রব্য ও কাজ ক্রয় করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মার্কিন দেশে ৪ ডলার ব্যয় করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায় তাহা যদি ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া পাওয়া যায় তাহা হইলে মার্কিন দেশ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিনিময়ের হার হইবে ৪ ডলার = ১ পাউণ্ড, অথবা ভারতে যে দ্রব্যটির জন্য ১৫ টাকা ব্যয় হয় তাহা যদি ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ডে পাওয়া যায় তাহা হইলে এই উভয় দেশের বিনিময়ের হার হইবে ১৫ টাকা = ১ পাউণ্ড অর্থাৎ টাকা প্রতি ১ শিলিং ৪ পেন্স। বাণিজ্য-রত দেশগুলির অর্থের ক্রয়শক্তির হিসাবে যে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয় তাহাকে সমান ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিনিময়-হার নির্ধারণ বলা হয়। সমান ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময়ের হারই হইল স্বাভাবিক বা স্থির বিনিময় হার। যত সময় পর্যন্ত বাণিজ্যরত দেশগুলির অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ মূল্যস্তরের কোন পরিবর্তন না ঘটে তত সময় পর্যন্ত এই স্থির বিনিময় হারের

কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকশালের দরের ন্যায় ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময়ের হারও স্থির থাকে না। অর্থের ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের সহিত এই বিনিময়ের হারেরও পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারিত হইবার পরবর্তী কালে যদি মার্কিন দেশের মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকে ও ইংলণ্ডের মূল্যস্তর দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে ক্রয়-শক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময়ের নূতন হার হইবে ২ পাউণ্ড = ৪ ডলার অর্থাৎ ১ পাউণ্ড = ২ ডলার। কারণ, ইংলণ্ডে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হওয়ার জন্য এবং মার্কিন দেশে দ্রব্যমূল্য অপরিবর্তিত থাকার জন্য ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য অর্থাৎ পাউণ্ডের ক্রয়-ক্ষমতা অর্ধেক হইয়াছে।

সমান ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারণ-কালে একটি বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। যে সমস্ত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, শুধুমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে বিনিময় হার স্থির হয় না। সমান ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারণ ক্ষেত্রে বাণিজ্যরত দেশগুলির সাধারণ প্রচলিত মূল্যস্তরের ভিত্তিতেই এই বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতীতও প্রচলিত মজুরির হার, পরিবহন-খরচ, পণ্যশুল্ক প্রভৃতি দ্বারাও এই বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেন-দেন পদ্ধতি—Payments in International trade.

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে যে দেনা-পাওনা হয় তাহা কিভাবে পরিশোধিত হয় তাহা জানা আবশ্যক। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন উভয় দেশই উভয় দেশ হইতে দ্রব্য ও কাজ ক্রয় করে এবং উভয় দেশই উভয় দেশে দ্রব্য ও কাজ বিক্রয় করে। পারস্পরিক এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে উভয় দেশেরই পরস্পরের সম্পর্কে একটা দেনা-পাওনা হয়। এখন প্রশ্ন হইল কিভাবে এই আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধ করা হয়। অর্থ দ্বারা এই দেনা-পাওনা শোধ করা সম্ভব নয়, কারণ ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া ভারতের টাকা ইংলণ্ডের বিক্রেতা গ্রহণ করিবে না এবং ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং ভারতের বিক্রেতা গ্রহণ করিবে না।

এরূপ ক্ষেত্রে পারস্পরিক দেনা-পাওনা শোধ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতে স্বর্ণ প্রেরণ করিতে হইবে এবং ভারত হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণ প্রেরণ করিতে হইবে। সুতরাং দুইবার স্বর্ণ প্রেরণ করিবার ব্যয় ও অন্যান্য আনুষংগিক ব্যয় ও অসুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত বিক্রেতাগণকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্য সময়ক্ষেপ করিতে হয় এবং ঐ সময়ে যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাওনা থাকে তাহার কোন সুদ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে দেনা-পাওনা হয় তাহা হুণ্ডির সাহায্যে পরিশোধ করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে হুণ্ডির দ্বারা কিভাবে এই আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধিত হয় তাহা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একজন ভারতীয় রপ্তানীকারক **ক** একজন ইংরাজ আমদানীকারক **খ**-এর নিকট ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫০০০৲ টাকার মূল্যের পাট বিক্রয় করিয়াছে। যুগপৎ একজন ইংরাজ রপ্তানীকারক **গ** একজন ভারতীয় আমদানীকারক **ঘ**-এর নিকট ৫০০০ পাউণ্ড মূল্যের মেশিন বিক্রয় করিল। এখন ইংরাজ আমদানীকারক **খ**কে ভারতীয় রপ্তানীকারক **ক**কে ক্রীত পাটের মূল্য দিতে হইবে এবং ভারতীয় মেশিন আমদানীকারক **ঘ**কে ইংরাজ রপ্তানীকারক **গ**কে মেশিনের মূল্য দিতে হইবে। অর্থ বা স্বর্ণ দ্বারা এই দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবার অসুবিধার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অসুবিধাগুলির জন্যই ভারতীয় রপ্তানীকারক **ক** ইংরাজ আমদানীকারক **খ**-এর উপর বিক্রীত পাটের মূল্য বাবদ হুণ্ডি কাটিল। **খ**-এর উপর এই হুণ্ডি ভারতীয় আমদানীকারক **ঘ** **ক**-এর নিকট হইতে ক্রয় করিল। ইহার ফলে **ক**কে ইংলণ্ডে বিক্রীত পাটের মূল্যের জন্য সময়ক্ষেপ করিতে হইল না এবং ভারতীয় অর্থে তাহার মূল্য পাইল। **ঘ** **ক**-এর নিকট হইতে ক্রীত হুণ্ডিটি তাহার ইংরাজ পাওনাদার **গ**-এর নিকট ক্রীত মেশিনের মূল্য বাবদ পাঠাইয়া দিল। **গ** ঐ হুণ্ডিটি ইংরাজ আমদানীকারক **খ**-এর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহার নিকট হইতে ইংলণ্ডের অর্থে তাহার পাওনা আদায় করিল। সুতরাং এই একটি হুণ্ডির আদান-প্রদান দ্বারা দুইটি দেনা অর্থাৎ (১) **ক**-এর নিকট **খ**-এর দেনা ও (২) **গ**-এর নিকট **ঘ**-র দেনা শোধ হইল এবং উভয়েই নিজ নিজ দেশীয় অর্থে তাহাদের বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইল। ইংলণ্ড হইতে ভারতে এবং ভারত হইতে ইংলণ্ডে দুইবার

স্বর্ণ প্রেরণ ও তাহার আনুষংগিক অসুবিধা ও অতিরিক্ত ব্যয় সংকোচ হইল। ব্যবসায়িগণ সময়ক্ষেপ না করিয়া বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইয়া পুনরায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে সক্ষম হইল।

বাস্তবজীবনে আন্তর্জাতিক এই আদান-প্রদান ব্যাংকের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। **ক** মাল বিক্রয় করিয়া **খ**-এর উপর হুণ্ডি কাটে এবং **গ** মাল বিক্রয় করিয়া **ঘ**-এর উপর হুণ্ডি কাটে। **ক** ব্যক্তিগতভাবে **ঘ**-এর নিকট এই হুণ্ডি বিক্রয় না করিয়া ব্যাংকে জমা দেয় এবং **ক** যদি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয় তাহা হইলে ব্যাংক বাট্টা বাদ দিয়া **ক**কে হুণ্ডির মূল্য প্রদান করে। ব্যাংক তখন ইহার শাখা ব্যাংকের অথবা প্রতিনিধির মারফৎ ঐ হুণ্ডির মূল্য আদায় করে। যাহারা বিদেশে ঋণ পরিশোধ করিতে চাহে তাহারা ব্যাংক হইতে ড্রাফ্‌ট বা ব্যাংকের হুণ্ডি ক্রয় করে। এই ড্রাফ্‌ট বিদেশী প্রতিনিধির উপর দেওয়া হয় এবং প্রতিনিধি ব্যাংক হইতেই এই ড্রাফ্‌টের মূল্য দেওয়া হয়। সুতরাং হুণ্ডির আদান-প্রদানের জন্য আর বিদেশে অর্থ প্রেরণের কোন আবশ্যক হয় না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনার সমতার অভাবের কারণ ও ইহার প্রতিকার—Causes of Disequilibrium in balance of payments and its correctives.

একটি দেশের বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনায় প্রায়ই সমতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। দেনা অপেক্ষা পাওনা অধিক হইতে পারে অথবা পাওনার তুলনায় দেনা অধিক হইতে পারে। একটি দেশের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা আলোচনাকালে কিসের উপর এই আমদানীর ও রপ্তানীর পরিমাণ নির্ভর করে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধির ফলে, অথবা চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে কিংবা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কোন দেশের রপ্তানী পরিমাণ হ্রাস পায় এবং আমদানী পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে বা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সেই দেশের পাওনা অপেক্ষা দেনা অধিক হইয়া আন্তর্জাতিক লেন-দেনে সমতার অভাব উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, কোন দেশ যদি বিদেশে উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী না করিয়া বিদেশ হইতে ক্রমাগত নানাপ্রকার সেবাকার্য গ্রহণ করে তাহা হইলেও লেন-দেনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। জার্মান দেশকে

যেরূপ বাধ্যতামূলকভাবে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল, সেরূপ ক্ষেত্রেও বাণিজ্যের লেন-দেনের সমতা হইতে পারে না। বাণিজ্যে সমতার অভাব হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয় উপস্থিত হয়। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বহির্বাণিজ্যে লেন-দেনের সমতা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। লেন-দেনের সমতার অভাব হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১। রপ্তানী বৃদ্ধি—Increasing exports.

কোন সময়ে যদি একটি দেশের পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশী হয় তাহা হইলে লেন-দেনের সমতার অভাব ঘটে। দেনা-পাওনার সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা আবশ্যক হয় এবং এই জন্য মজুরির ও সুদের হার হ্রাস করা অপরিহার্য হয়। মূল্য হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় মুদ্রা সংকোচনেরও প্রয়োজন হইতে পারে।

২। আমদানী নিয়ন্ত্রণ—Checking imports.

দেশ হইতে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বিদেশের সহিত দেনা-পাওনার যেরূপ সমতা আনয়ন করা যায়, বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। দেনা-পাওনার যদি গুরুতর পার্থক্য ঘটে তাহা হইলে রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী নিয়ন্ত্রণ যুগপৎ এই উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লেন-দেনের সমতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়। আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করা।

৩। মুদ্রামূল্য হ্রাস করা—Devaluation.

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশী মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়। দেশী মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইলে বিদেশিগণ সম পরিমাণ অর্থ দ্বারা বর্তমানে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে দেশী মুদ্রার মূল্য অর্থাৎ ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাইবার ফলে বিদেশজাতদ্রব্য ক্রয় করিতে দেশী মুদ্রা অধিক দিতে হয়। এইজন্য আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পায়। এইরূপে একদিকে রপ্তানী বৃদ্ধি ও অপর দিকে আমদানী

হ্রাস পাওয়ার ফলে অনুকূল বাণিজ্যের অবস্থার সৃষ্টি হয় ও শেষ পর্যন্ত লেন-দেনের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। সরকার কর্তৃক লেন-দেন নিয়ন্ত্রণ—Exchange control by the Government.

যতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল ততদিন পর্যন্ত স্বয়ং-ক্রিয় পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার সমতা প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু স্বর্ণমান চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হইবার পরবর্তী কাল হইতে আন্তর্জাতিক লেন-দেনের সমতা রক্ষাকল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে বৈদেশিক বিনিময়ের হারের স্থিরতা নষ্ট হইয়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা আনয়ন করিয়াছিল। বিনিময় হারের উত্থান-পতন রহিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার বিনিময়ের হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নানাভাবে এই হার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি—Methods of Exchange Control.

বর্তমানে প্রায় সকল দেশের সরকারই নানা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কাযকরীভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সমতা হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে সরকার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১। হস্তক্ষেপ দ্বারা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—Intervention by the Government.

সরকার যদি মনে করে যে, বিনিময় হারের স্বাভাবিক সমতা-প্রাপ্ত হার অপেক্ষা অন্য হার হইলে সুবিধা হয় তাহা হইলে সরকার নিজেই এই বৈদেশিক বিনিময় মূল্য প্রয়োজনমত হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকার নিজে বিদেশীয় মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ পদ্ধতিদ্বারা স্বল্পকালের জন্য বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

২। নিরোধ দ্বারা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—Restriction.

এই ব্যবস্থার দ্বারা সরকার নিজে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মারফৎ যাবতীয় বৈদেশিক আদান-প্রদান কার্য পরিচালিত করে। বৈদেশিক লেন-দেন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অনেক সময় বহুবিধ নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করিতে হয়। সরকার নিয়ম করিয়া সকলকেই বিদেশ হইতে প্রাপ্ত মুদ্রা সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে। কি হারে বিদেশ হইতে মুদ্রা আমদানী হইবে তাহাও সরকার স্থির করিতে পারে এবং অনেক সময় একই মুদ্রার বিভিন্ন বিনিময় হার স্থির করিয়া দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সরকার আইন করিয়া সরকারের বিনা অনুমতিতে (Licence) আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করিতে পারে।

৩। চুক্তি—Agreements.

অনেক সময় দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশ অর্থ-সংক্রান্ত পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই চুক্তি আবার তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা,

(ক) প্রতিপণ-চুক্তি—Barter agreement.

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি দেশের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হয় যে, আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য দ্বারা পরিশোধিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থের কোন লেন-দেনের প্রয়োজন হয় না। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য প্রদত্ত হয়। সোভিয়েত রুশিয়া, প্রজাতন্ত্র চীন প্রভৃতি দেশগুলি সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(খ) পরিশোধ চুক্তি—Payment agreement.

এই জাতীয় চুক্তির ফলে দুইটি দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের দেনা-পাওনার পার্থক্য স্বর্ণ বা অপর কোন দেশের মুদ্রায় দেওয়া চলে। আবার অনেক সময় পাওনাদার দেশ দেনাদার দেশ হইতে অর্থ আদায় না করিয়া পর বৎসর দেনাদার দেশ হইতে অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিয়া পাওনা মিটাইয়া ফেলে।

(গ) নিকাশী ব্যাংকের সাহায্যে দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবার চুক্তি—Clearing agreement.

দুইটি দেশের মধ্যে এরূপ চুক্তি হইতে পারে যে, উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবার ভার ন্যস্ত করা হয়। উভয় দেশের ক্রেতাগণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দেশীয় অর্থে পণ্যমূল্য জমা রাখে। উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট বিনিময় হারে পণ্যের মূল্য হিসাব করিয়া যদি দেখে যে, জমা দেওয়া অর্থে একটি দেশের অপর দেশ হইতে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না হয় তাহা হইলে অন্য উপায়ে (স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া বা কোন তৃতীয় দেশের মুদ্রায়) বিদেশী পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থায় বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কাম্য না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অনেক সময় একটি দেশ লাভবান হইতে পারে। বিনিময় হারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন ও তজ্জনিত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাস করা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা একটি দেশ ইহার সুবিধামত আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে শিল্পায়নের জন্য এই পদ্ধতিতে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আধুনিক কালে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইয়া উঠে।

বাণিজ্য নীতি—Commercial Policy.

অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—Free Trade vs. Protection.

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেশগুলি দুইটি নীতি অনুসরণ করে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য নীতি ও (২) সংরক্ষণ নীতি।

১। অবাধ বাণিজ্য নীতি—

অবাধ বাণিজ্যের মূল নীতি হইল এক দেশ হইতে অন্য দেশে জিনিস-পত্র আমদানী-রপ্তানীর কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। এই নীতি অনুসারে দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। সুতরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা দান বা বিদেশী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে

অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলেও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু রাজস্ব আদায় উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যেব উপর শুল্কস্থাপনা কোন মতেই অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী বলা যায় না।

অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমর্থক হইল ইংলণ্ড। এই নীতি অনুসরণ করিয়া শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগে ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাহার বাণিজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ডের পক্ষে এই নীতি অবলম্বন তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ হইলেও বৃটিশ সরকার যখন এই অবাধ বাণিজ্য নীতি বিজিত ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিল তখন এই নীতি ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রধান কারণস্বরূপ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ড কর্তৃক অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিবার বিরুদ্ধে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ফরাসী, জার্মান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতে সংরক্ষণ নীতির উদ্ভব হয় এবং ঐ দেশগুলি বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করে। বৃটিশ-শাসিত ভারতও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকভাবে এই নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এমন কি অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রধান সমর্থক ইংলণ্ডও শেষ পর্যন্ত তাহার অবাধ বাণিজ্য নীতির সংস্কার সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমানে সকল দেশই অল্পবিস্তর পরিমাণে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে।

২। সংরক্ষণ নীতি—

দেশী উৎপাদকগণকে বিশেষ সুবিধা দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশজাত আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনই হইল সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনে যেরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটা জাতির পক্ষে অপরিহার্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দেশের পক্ষে শিল্পোন্নতি দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাও তদ্রূপ অপরিহার্য। একমাত্র দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার দ্বারা একটা দেশ স্বাবলম্বী হইতে পারে। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইল দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়। সুতরাং একমাত্র সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া এই অন্তরায় দূর করা সম্ভব।

সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি—Forms of Protection.

দেশী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। নিম্নে প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলির সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

১। আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক—Customs Duties.

সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তন্মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কই হইল সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থানুসারে বিদেশ হইতে (ক) আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Import duties)। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য বিশেষ বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ। শুল্কের পরিমাণ যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্য সংকুচিত হইতে পারে অথবা একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইলে এবং দেশে যদি ঐ দ্রব্যের কোন উপযুক্ত বিকল্প সামগ্রী না থাকে তাহা হইলে অধিক হারে শুল্ক ধার্যের ফলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাইলেও ক্রেতাগণ অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। দেশ হইতে যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় সে উদ্দেশ্যেও অনেক সময় (খ) রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Export duties)। শুল্কের পরিমাণ যখন পণ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপে ধার্য করা হয় তখন তাহাকে ওজন অনুসারে শুল্ক (Specific duty) বলা হয়। পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাপে শুল্ক ধার্য করা হইলে তাহাকে মূল্যানুসারে শুল্ক (*Advalorem* duty) বলা হয়।

২। সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য—Bounties and Subsidies.

অনেক সময় সরকার বিদেশী দ্রব্যের উপর কর স্থাপন না করিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে এককালীন অথবা তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য করে। বিদেশী দ্রব্য যদি অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা দেশের সমগ্র চাহিদা পূরণ করিবার পক্ষে দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইজন্য বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য না করিয়া দেশী শিল্পকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার উভয় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্যের উপর স্বল্প হারে কর ধার্য করা হয় এবং এই ধার্য কর

দেশীয় শিল্পগুলিকে অর্থসাহায্য বাবদ দেওয়া হয় অথবা এই শিল্পগুলির প্রসারের জন্য ব্যয় করা হয়।

৩। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্য-পরিমাণের একটা আনুপাতিক অংশকে বিনা শুল্কে দেশে আসিতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আনুপাতিক অংশের অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া দেশী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা যায় এবং পরোক্ষভাবে এই ব্যবস্থা দেশী শিল্পের উন্নতির সহায়ক হয়।

রাষ্ট্র-পরিচালিত বহির্বাণিজ্য—State Trading.

অধুনা অনেক দেশের বহির্বাণিজ্য ক্রমশই রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জাতীয় চীন প্রভৃতি দেশের সমগ্র বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনাগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে সর্বাধিক পরিমাণ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র স্বয়ং বহির্বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর কালে জার্মান সরকার কর্তৃক সমগ্র বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও আরও অন্যান্য অনেক দেশে বহির্বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়া ব্যক্তি-সংঘ দ্বারা পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়াছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বহির্বাণিজ্যের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিয়া রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যাহা ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত বহির্বাণিজ্যে সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্র জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-সমূহকে অধিকতরভাবে কার্যকরী করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বহির্বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক পারস্পরিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হইবে এবং এই রাষ্ট্রনৈতিক

প্রভাব অনগ্রসর বা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য হয়ত অনেক দেশের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে হইতে পারে।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Free Trade.

অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থকগণ তাঁহাদের মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়া থাকেন।

১। অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে প্রকৃত ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ সম্ভব হয় এবং প্রত্যেকটি দেশ ইহার আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত করিতে পারে। এইরূপে পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্ভব হয় এবং দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

২। অবাধ বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেকটি দেশ সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত থাকিবে যে যে দ্রব্য উৎপাদনে ইহা সর্বাধিক সুবিধার অধিকারী। ফলে, সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও দেশগুলি সস্তায় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

৩। অবাধ বাণিজ্যের অবর্তমানে সংরক্ষণ-নীতি অনুসৃত হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সাধারণ ক্রেতার স্বার্থ হানি হয়। সংরক্ষণের আওতায় একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হইয়া মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Protection.

সংরক্ষণের নীতির পক্ষে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয় তন্মধ্যে প্রধান প্রধান যুক্তি হইল :

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি—**National Self-sufficiency argument.**

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যক্তির পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া যেরূপ অপরিহার্য একটি দেশের পক্ষেও আত্মনির্ভরশীলতা তদ্রূপ অপরিহার্য। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য যদি একটি দেশের পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় তাহা হইলে সে দেশকে মন্দভাগ্য দেশ বলা যাইতে পারে। খাদ্য, পরিধেয়, দেশলাই প্রভৃতি দ্রব্যগুলির

উৎপাদনে প্রত্যেক দেশেরই স্বাবলম্বী হওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা সমর্থনযোগ্য।

২। বিভিন্ন রকমের শিল্পগঠনের যুক্তি—**Diversification of Industries argument.**

উপরি-উক্ত যুক্তি হইতে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য সর্ববিধ শিল্প সংগঠন করা প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাংক প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। নতুবা যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হইলে দেশের লোকের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং নানা জাতীয় শিল্পের সংগঠন করিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি—**Defence Industries argument.**

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংরক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন। আত্মরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করা অপরিহার্য। যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, নানা জাতীয় এসিড প্রভৃতি শিল্প দেশের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৪। অল্পদরে বিদেশজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি—**Anti-dumping argument.**

বিদেশী বিক্রেতাগণ যখন তাহাদের স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বল্প দরে দেশের মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেশীয় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে, তখন সংরক্ষণ-নীতি কার্যকরী করিয়া বিদেশী অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত।

৫। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি—Infant Industries argument.

সংরক্ষণ-নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তি। একটি শিশুর সহিত একটি বয়স্ক লোকের প্রতিযোগিতায় যেরূপ শিশুর পক্ষে পরাজয়ের কারণ ঘটে একটি শিল্পে অনগ্রসর ও অনভিজ্ঞ দেশের পক্ষেও একটি শিল্পোন্নত

অভিজ্ঞ দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় তদ্রূপ পরাজয় ঘটে। প্রতিযোগিতা যদি সমান সমান স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে উভয় পক্ষই লাভবান হইতে পারে; অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দুর্বলকেই পরাজয় বরণ করিতে হয়। এই কারণে ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে শিল্পোন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। নতুবা এই দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যে কোন দিনই তাহাদের শিল্পোন্নতি করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না। শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে এই সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। শিল্পোন্নতির সংগে সংগে অবশ্য সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে। শিশুশিল্প সংরক্ষণের আসল নীতি হইল: নবজাত শিশুকে পরিচর্যা কর, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে রক্ষা কর এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোককে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে দাও (Nurse the baby, protect the child and free the adult.)। এই নীতির তাৎপর্য হইল যে, শিল্পের শৈশবাবস্থায় পূর্ণ সংরক্ষণের প্রয়োজন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযোগিতা-সামর্থ্যের একান্ত অভাব থাকে। শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন-সম্পর্কে সমধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোন দিনই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে না। শেষ পর্যায়ে শিল্পটি যখন অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় তখন ইহাকে সংরক্ষণ-বিমুক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হয়। এইরূপে সংরক্ষণ দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ব্যতীতও সংরক্ষণের পক্ষে আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা হয় কিন্তু এই যুক্তিগুলির সারবত্তা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যুক্তিগুলি হইল:—

৬। দেশের অর্থ দেশে রাখিবার যুক্তি—**Keeping money at Home.**

বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করিলে দেশের অর্থ দেশে থাকে এবং ফলে দেশ দরিদ্র হয় না। কিন্তু এরূপ যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশিগণ দেশ হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য আমদানী দ্রব্যের দ্বারা

পরিশোধ করিতে পারে না। যদি বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হয় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দেশ হইতে রপ্তানীও রহিত হইবে।

৭। বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের যুক্তি—Balance of trade argument.

এই যুক্তি অনুসারে বলা হয় যে, সংরক্ষণ দ্বারা আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার করিলে অনুকূল বাণিজ্যজাত উদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব। ফলে দেশে অধিক ধনাগম হয়। কিন্তু এ যুক্তির কোন মূল্য নাই, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একটি দেশের সমগ্র দেন-পাওনা শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে।

৮। মজুরি বৃদ্ধির যুক্তি—Wages argument.

সংরক্ষণ দ্বারা বিদেশী দ্রব্য আমদানী রহিত হইলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। নূতন নূতন শিল্পের প্রসারের ফলে মূলধন ও শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এবং মজুরির হারও বৃদ্ধি পায়। এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধুমাত্র সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মজুরির হার বৃদ্ধি পায় না। শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধির উপরেই মজুরির হার বিশেষভাবে নির্ভর করে।

৯। কর্মসংস্থান যুক্তি—Employment argument.

এই যুক্তি অনুসারে বলা হয় যে, সংরক্ষণ দ্বারা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিলে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইলে সংরক্ষিত শিল্পগুলির প্রসার লাভের ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইয়া বেকার সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আমদানী হ্রাস পাইলে স্বভাবতই রপ্তানী হ্রাস পাইয়া রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পগুলি সংকুচিত হইবে। ফলে, সংরক্ষিত শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইলেও রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে।

রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পগুলি সংকুচিত না হয় তজ্জন্য দেশগুলি দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেক সময় আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া সেই শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থদ্বারা রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পকে সাহায্য করা হয়। আবার অনেক সময় রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বাবদ পাওনা অর্থ দেশে না আনিয়া বিদেশে ঐ অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগ করা হয়।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against protection.

১। সংরক্ষণের ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং ক্রেতাগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত শিল্প সংরক্ষণের আওতার বাহিরে থাকে তাহাদের ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হয়।

২। সংরক্ষিত শিল্পগুলি একবার সুবিধা পাইলে তাহাদের উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সাধারণতঃ অবহেলা করে। ইহার ফলে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়।

৩। সংরক্ষণের ফলে অনেক সময় বড় বড় একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়িগণ অনেক সময়ে তাহাদের অপরিমিত অর্থের বলে আইন-সভার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের স্বার্থের অনুকূল সংরক্ষণ-নীতি দীর্ঘস্থায়ী করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দোষটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

৪। ধনবণ্টন ব্যবস্থায় সংরক্ষণ নীতির প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংরক্ষণের ফলে ধনী ব্যবসায়িগণ অধিকতর ধনবান হয় এবং ফলে ধনবান ও নির্ধনের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়।

৫। সংরক্ষণ-নীতির দ্বারা দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। ইহার ফলে বিরোধ ঘটে এবং কালক্রমে এই অর্থনৈতিক সম্পর্কজাত বিরোধ প্রলয়ংকর যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলে।

আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান—International Monetary Institutions.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষার্ধে ব্রেটন্ উড্‌স্ নামক স্থানে মিত্রশক্তিবর্গের অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বাণিজ্য ও বিনিময়ের সুবিধার জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দুইটি আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান দুইটির একটি হইল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) বা সংক্ষেপে ইহাকে I. M. F. বলা হয়। অপরটি হইল পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank of Reconstruction and Development.)

১। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার—International Monetary Fund.

পৃথিবীর যে-কোন দেশই আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডারের সদস্য হইতে পারে। সদস্য হইতে গেলে প্রত্যেক দেশকেই একটি নির্দিষ্ট বরাদ্দ অনুসারে এই ভাণ্ডারে চাঁদা দিতে হয় এবং এই চাঁদা স্বর্ণ এবং দেশীয় মুদ্রায় দিতে হয়। এই ভাণ্ডারের মোট তহবিলের পরিমাণ হইল ৮৮০০০ লক্ষ ডলার। কোন দেশের দেয় চাঁদার বরাদ্দের শতকরা ২৫ ভাগ অথবা সরকারী হিসাব অনুযায়ী উক্ত দেশের সমগ্র স্বর্ণ পরিমাণ ও মার্কিন ডলার পরিমাণের ২০ ভাগ এই দুইটি পরিমাণের মধ্যে যেটি কম, সে পরিমাণ স্বর্ণ প্রত্যেক দেশকে দিতে হয়। এই ভাণ্ডারের প্রধান প্রধান সদস্যগুলিকে নিম্নলিখিত হারে চাঁদা দিতে হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—২৭৫০ মিলিয়ন ডলার, ইংলণ্ড—১৩০০, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র—১২০০, চীন—৫৫০, ফরাসীদেশ—৪৫০ ও ভারত—৪০০ মিলিয়ন ডলার।

এই ভাণ্ডার পরিচালনা করিবার প্রকৃত ক্ষমতা বারজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী সংস্থার (Executive Committee) হস্তে ন্যস্ত আছে। এই সংস্থাই একজন প্রধান পরিচালক (Managing Director) নিযুক্ত করে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি লইয়া এই ভাণ্ডারের সাধারণ পরিচালনা সভা (Board of Governors) গঠিত হয়।

কার্য—Functions.

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান কার্য হইল বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময় হার স্থির রাখিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি ও প্রসার অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করা। এই ভাণ্ডারের সদস্য হইবার শর্ত অনুসারে প্রত্যেক সদস্য দেশকেই স্বর্ণের বা ডলারের সহিত তাহার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ের হার জানাইয়া দিতে হয় এবং এই পূর্বনির্ধারিত হারেই সে দেশের বৈদেশিক আদান-প্রদান করিতে হয়। কিন্তু প্রয়োজন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট বিনিময় হারের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত ও বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক হারেও পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

করিয়া বিদেশী বিনিময় হার খুসীমত পরিবর্তন করিত। ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা উপস্থিত হইত। কিন্তু বর্তমানে এই অর্থ ভাণ্ডার বিনিময় হারের প্রতিযোগিতামূলক হ্রাস-বৃদ্ধি দূর করিয়া প্রয়োজনানুসারে বৈদেশিক বিনিময় হারের সুশৃংখল পরিবর্তন সম্ভব করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই অর্থভাণ্ডার কোন দেশকে ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্যের প্রতিকূল অবস্থায় সাহায্য করিতে পারে। এই সাহায্যের ফলে দেনাদার দেশকে আর বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে হয় না। অবশ্য এই অর্থভাণ্ডার হইতে কোন্ দেশ কত সাহায্য পাইতে পারে তাহার একটা সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন সীমা আছে। তৃতীয়তঃ, এই অর্থ-ভাণ্ডারের মধ্যবর্তিতায় একটি দেশ ইহার নিজস্ব মুদ্রা বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাফল্য বহুল পরিমাণে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে এই সহযোগিতার মনোভাবের একান্ত অভাব দেখা যায়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা সমীচীন নহে।

২। পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংক—International Bank for Reconstruction and Development.

ব্রেটন্ উড্‌স্ সম্মেলনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাব অনুসারে আন্তর্জাতিক ব্যাংক সৃষ্টি হয়। এই ব্যাংক **বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)** নামেও পরিচিত। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইল ১০০০ কোটি ডলার এবং প্রয়োজন মত এই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ব্যাংকের প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য হইল ১০০০০ ডলার। সদস্যগণকে প্রত্যেক শেয়ারের শতকরা দুই ভাগ স্বর্ণ অথবা ডলারে দিতে হয় এবং আঠার ভাগ দেশীয় মুদ্রায় দিতে হয়। অবশিষ্ট আশী ভাগ প্রয়োজন মত আদায় করা হইবে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সদস্যই এই বিশ্ব ব্যাংকেরও সদস্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পরিচালনা ব্যবস্থার অনুরূপভাবেই এই ব্যাংক পরিচালিত হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলি ও অনুন্নত দেশ-

গুলিকে অর্থ সাহায্য করা। এই ব্যাংক বিভিন্ন দেশের সরকার ও বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকা ধার দেয়। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ধার পাইতে হইলে সেই দেশের সরকারকে ধারের জন্য জামিন থাকিতে হয়। ভারতের টাটা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাংক হইতে প্রচুর পরিমাণে ধার পাইয়াছে। সাধারণতঃ, উন্নয়নমূলক কার্যের জন্যই এই ব্যাংক টাকা ধার দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাংকের অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করিয়াছে এবং এ পর্যন্ত এই ব্যাংক যে পরিমাণ ধার দিয়াছে তাহার বেশীর ভাগই হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, বিশ্ব ব্যাংক মার্কিন দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে বিদেশে বিনিয়োগ করিবার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—

দুইটি দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। এরূপক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন দেশবাসী হয় এবং বিভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থের বিনিময় প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধন ও শ্রমিকের গতিশীলতার অভাব, এবং নৈসর্গিক কারণে দেশগুলির মধ্যে উৎপাদন-খরচার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই উৎপাদন-খরচার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময়যোগ্য দ্রব্যগুলির মূল্য আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচার সীমার মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার এরূপ হয় যাহাতে দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের রপ্তানীকৃত সমস্ত দ্রব্যমূল্য ইহার আমদানীকৃত সমস্ত দ্রব্যমূল্যের সমান হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা—

১। একটি দেশ অপর দেশ হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। ২। অপর দেশ হইতে সস্তায় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। ৩। ভৌগোলিক

শ্রম-বিভাগের উৎপত্তি হয় এবং বিশেষত্বশীলতার সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায়। ৪। পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার ফলে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অসুবিধা :—১। দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট করে। ২। বিদেশজাত দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতে পারে না। ৩। বিদেশী চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থায় অত্যুৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। ৪। দেশগুলির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

সুবিধার পরিমাপ—

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করে :

১। বাণিজ্যরত দেশগুলির আপেক্ষিক উৎপাদন-খরচা, ২। বাণিজ্যের শর্ত, ৩। পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতা, ৪। দেশগুলির আয়ের মান।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন-দেনের উদ্বৃত্ত—

আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্যই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য বেশী হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলা হয়, আবার রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর মূল্য অধিক হইলে ইহা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলিয়া কথিত হয়। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও অনেক প্রকার আদান-প্রদান হয়, ঋণগ্রহণ, সুদ-প্রদান, জাহাজের মাশুল, ব্যাংক প্রভৃতির কাজের মূল্য, ক্ষতিপূরণ বা দান ইত্যাদি। দুইটি দেশের মধ্যে এই দেনা-পাওনার সমগ্র হিসাবকে লেন-দেনের ঃ বলা হয়।

আমদানী ও রপ্তানীর সমতা—

আমদানী ও রপ্তানীর সমতা বলিতে শুধুমাত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর সমতা বুঝায় না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য হইল যে, দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের সমগ্র দেনা-পাওনার হিসাব সমান হইতেই

হইবে। সমান না হইলে একটি দেশ পাওনাদার দেশ হইবে এবং অপর দেশ দেনাদার দেশ হইবে। দেনাদার দেশ হইতে ঋণ-পরিশোধ বাবদ অর্থ পাওনাদার দেশে গিয়া ঐ দেশের মূল্য বৃদ্ধি করিবে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে ঐ দেশের আমদানী বৃদ্ধি পাইবে ও রপ্তানী হ্রাস পাইবে। ফলে, দেশটি দেনাদার দেশে পরিণত হইবে এবং ঐ দেশ হইতে অর্থ পুনরায় পাওনাদার দেশে যাইবে। এইরূপে মূল্য-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উভয় দেশের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বিনিময়ের হার নির্ধারণ—

যে হারে একদেশের অর্থ অন্যদেশের অর্থের সহিত বিনিময় করা যায়, তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার বলা হয়। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতেই বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। যদি একটি দেশের মান-মুদ্রায় যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে অপর একটি দেশের মুদ্রায় যদি তাহার দ্বিগুণ স্বর্ণ থাকে তাহা হইলে প্রথম দেশটির দুইটি মুদ্রার সহিত দ্বিতীয় দেশের একটি মুদ্রার বিনিময় হইবে এবং এই হারকে টাকশালের মূল্য বলা হয়। কিন্তু কার্যতঃ দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার এই টাকশালের মূল্যের কিছু উপরে বা কিছু নিম্নে থাকে। বিনিময় হারের এই উচ্চ ও নিম্ন সীমা এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার আনুষংগিক খরচ যোগ দিয়া বা বিয়োগ করিয়া পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক অবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তনের সংগে বিনিময়ের হারেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কাগজীমান ব্যবস্থায় বিনিময়ের হার স্বর্ণমানের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই ব্যবস্থায় উভয় দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির ভিত্তিতে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়।

অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—

বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে দেশগুলি সাধারণতঃ দুইটি বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য-নীতি ও (২) সংরক্ষণ-নীতি।

১। অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয় না। একমাত্র রাজস্ব আদায় উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোনপ্রকার শুল্ক ধার্য করা হয় না।

২। সংরক্ষণ-নীতির ক্ষেত্রে রপ্তানী ও বিশেষ করিয়া আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিদেশী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া অথবা দেশী শিল্পকে অর্থ সাহায্য করিয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে এই উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সংরক্ষণ-নীতি বলবৎ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—

১। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক দেশই এই শ্রম-বিভাগের সমস্ত সুবিধা পাইতে পারে।

২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, ২। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-গঠনের যুক্তি, ৩। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি, ৪। অল্পদরে বিদেশজাত দ্রব্য-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি, ও ৫। শিশুশিল্প-সংরক্ষণ যুক্তি।

প্রশ্নাবলী

1. Explain how an excess of either imports or exports tends to correct itself. (C. U. 1941)

2. Indicate the limits of the fluctuations of the rates of foreign exchange under (a) Gold Standard and (b) Paper Standard. (C. U. 1949)

3. State the principles of Comparative Costs as applied to foreign trade and illustrate your answer with examples.

4. What is a balance of payment? How does the balance of payment affect the foreign rate of exchange? (C. U. 1955)

5. Discuss the nature of the gains obtained from international trade. (C. U. 1948)

6. Enumerate the influences that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange. (C. U. 1957)

7. Write brief explanatory notes on the objects and mechanism of Exchange Control. (C. U. B. Com. 1957)

8. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determines international specialisation and trade. (C. U. B. Com. 1957)

9. Show how the rate of exchange between two countries on inconvertible paper standard is determined. (C. U. 1959)

10. Discuss the view that differences between home trade and foreign trade are differences of degree rather than of kind. (C. U. 1960)

11. Discuss the effects of the fall in the exchange rate of a country upon its balance of payments. (C. U. 1961)

12. What, in your opinion, are the basic factors that lead to trade between countries ? (C. U. B. Com. 1961)

13. Distinguish between free trade and protection. State and examine the Infant industry argument for protection. (C. U. 1962)

14. Enumerate the principal items in the balance of payments. By what measures can an adverse balance of payments be corrected ? (C. U. 1962)

15. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determines international specialisation of production as well as trade.

(C. U. B. Com. 1962)

সপ্তম অধ্যায়

বেকার সমস্যা ও পূর্ণ নিয়োগ

(Unemployment and Full Employment)

বর্তমান যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হইল বেকার সমস্যা। যে সমস্ত দেশে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সে সমস্ত দেশে বেকার সমস্যা দুষ্ট ব্যাধির ন্যায় সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কর্মসংস্থানের অভাব হেতুই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। বেকারদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কর্মহীন (Voluntary unemployment) থাকে, আবার অনেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থাৎ চেষ্টা করিয়াও কর্ম সংস্থান করিতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহারা কর্মহীন (Involuntary unemployment) থাকে। বেকারদের মধ্যে অনেকে শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যহেতু কর্মক্ষম নহে, আবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে শ্রম-বিমুখ হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত শ্রেণী কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া বেকার সংখ্যাভুক্ত হয় না কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বেকারগণ সমাজে পরজীবী বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেক দেশেই কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, রুগ্ন ও বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা কর্মের অযোগ্য। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুক, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি এক দল লোক থাকে যাহারা সুস্থকায় ও কর্মক্ষম, কিন্তু তাহারা সমাজে পরজীবী হিসাবে বাস করে। বেকার বলিতে সাধারণতঃ সেই সমস্ত লোককে বুঝায় যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু প্রচলিত মজুরির হারে তাহারা কর্ম সংস্থান করিতে পারে না।

বেকার সমস্যার প্রকার ভেদ—Types of unemployment.

বেকার সমস্যা নানাভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন কারণে এই বিভিন্ন ধরণের বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়।

১। ঋতুগত বেকার সমস্যা—Seasonal unemployment.

কোন কোন শিল্পব্যবসায়ে সমস্ত বৎসরব্যাপী কাজের পরিমাণ সমান থাকে

না। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অন্য সময়ে কাজের চাপ অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পায়। ফলে, কাজের অভাবে ঐ সময়ে শ্রমিকগণ বাধ্য হইয়াই বেকার থাকে। কৃষি ও গৃহনির্মাণ কার্যে এই ঋতুগত বেকার সমস্যা অত্যধিক পরিমাণে দেখা যায়। চাষের ও শস্যসংগ্রহের নির্দিষ্ট কাল ব্যতীত অন্য সময়ে কৃষকগণ প্রায়ই কর্মহীন হইয়া থাকে।

২। সাময়িক বেকার সমস্যা—Casual unemployment.

অনেক সময় আবার দেখা যায় যে, কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হইলে শ্রমিকগণের মধ্যে সাময়িক কালের জন্য বেকার সমস্যা দেখা দেয়। বন্দর শ্রমিকগণকে (Dock Labourers) অনেক সময় এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কোন কারণে বহির্বাণিজ্যের প্রসার হ্রাস পাইলেই এই শ্রমিকগণের আর কর্মসংস্থান হয় না, আবার বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে তাহারা সম্পূর্ণভাবে কর্মে নিযুক্ত থাকে।

৩। বাণিজ্যচক্র-জনিত বেকার সমস্যা—Cyclical unemployment.

ব্যবসায়-বাণিজ্যের চক্রবৎ উত্থান-পতন ঘটিতে দেখা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছু দিন পর্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া ভালভাবে চলিতে থাকে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু ব্যবসায়ের এই উন্নত অবস্থায় হঠাৎ মন্দা দেখা যায়। ইহার ফলে দ্রব্যমূল্যের নিম্নাভিমুখী গতি হয় ও ব্যবসায়িগণ তাহাদের ব্যবসায় সংকোচ করে। ফলে, এই সময়ে শ্রমিকের কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে।

৪। যান্ত্রিক কারণে বেকার সমস্যা—Technological unemployment.

অনেক সময় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শ্রমিকগণের পক্ষে নূতন পদ্ধতিতে নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা অনেক সময় তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সুতরাং উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিবার অসামর্থ্য-হেতু তাহাদের কর্মচ্যুত হইতে হয়।

৫। সামঞ্জস্যের অভাব হেতু সাময়িক বেকার সমস্যা—Frictional unemployment.

শ্রমিকের গতিশীলতার অভাব হেতু কিংবা কাঁচামালের অভাব হেতু

অথবা কর্মসংস্থান-সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে শ্রমিকের অজ্ঞতার জন্য সাময়িক কালের জন্য এই জাতীয় বেকার সমস্যা দেখা যায়।

বেকার অবস্থার কারণ—Causes of Unemployment.

একটি দেশে নানাকারণে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। উপরি-আলোচিত বিভিন্ন জাতীয় বেকার অবস্থা বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে এবং চাহিদা ও সরবরাহের এই পরিবর্তনের জন্য উক্তদ্রব্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক-গণের কর্মসংস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত দ্রব্য বৎসরে মাত্র একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে উৎপাদন করা যায়, যথা, ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি, সেই সমস্ত দ্রব্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকগণ অন্য সময়ে বেকার থাকে। গ্রীষ্মকালেই বরফ ও নানা জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অন্য সময়ে এই জাতীয় দ্রব্যের আর তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। সুতরাং এই কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণের কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে।

যান্ত্রিক কারণেও অনেক সময় বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে পূর্বে যে কার্য বহুসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে সম্পাদিত হইত বর্তমানে তাহা যন্ত্রসাহায্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়। ফলে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়। আবার উৎপাদন-ব্যবস্থার নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলে পুরাতন পদ্ধতিগুলি পরিত্যক্ত হয়, ফলে পুরাতন পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শ্রমিকগণ কর্মহীন হয়। যন্ত্রচালিত যান-বাহনাদি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবহার প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ঘোড়ার গাড়ীর চালকগণের মধ্যে বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে।

বাণিজ্যচক্র-জনিত বেকার সমস্যার কারণ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে পর্যায়ক্রমে সহসা খুব উন্নতি ও সহসা খুব মন্দা অবস্থার আবির্ভাব।

শ্রমিকের গতিশীলতার অভাবের জন্য অনেক সময় বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে।

অনুন্নত দেশগুলিতে অনেক সময় পূর্ণ কর্মসংস্থানের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। দেশে যদি ভূমি, খনিজ, বনজ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকে

তাহা হইলে কর্মক্ষম সমগ্র জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয় না। আবার দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে উন্নত করা না যায় তাহা হইলেও বেকার সমস্যার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

বেকার অবস্থা সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে পূর্বতন ধনবিজ্ঞানিগণের মত হইল যে, শ্রমিক সংঘগুলি কৃত্রিম উপায়ে মজুরির হার উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ রাখে এবং এইজন্য যখন মূল্যপতনের ফলে মালিকের লভ্যাংশ হ্রাস পায় তখন মালিক স্বভাবতই অধিক সংখ্যক শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখিতে পারে না। ফলে, শ্রমিকগণের কর্মসংস্থানের অভাব ঘটে। কিন্তু বর্তমানে কেইন্‌স্ কর্তৃক উপরি-উক্ত মতবাদ অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বেকার সমস্যা সম্পর্কে কেইন্‌সের মতবাদ—Keynsian Theory of Unemployment.

কেইন্‌সের মতে বেকার সমস্যা একটি নির্ধারিত হারে মজুরি গ্রহণ করিয়া শ্রমিকের কাজ করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ-যোগ্য শ্রমিকসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকের কাজের চল্‌তি চাহিদার পরিমাণের স্বল্পতাই হইল বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। সমাজ কর্তৃক শ্রমিকের কাজের জন্য যে-পরিমাণ চাহিদা হয়, সেই চাহিদার পরিমাণ দ্বারাই শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সীমা নির্ধারিত হয়। দুইটি কারণে সমাজ কর্তৃক শ্রমিকের কাজের চাহিদা হয়, যথা, (১) ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা ও (২) বিনিয়োগের জন্য চাহিদা। জনসাধারণ তাহাদের সমগ্র আয়ের যে পরিমাণ ভোগ-ব্যবহার ও বিনিয়োগের জন্য ব্যয় করে তাহার উপরই কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে-পরিমাণে লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, সে অনুপাতে ভোগ ব্যবহারের জন্য লোকের ব্যয় বৃদ্ধি পায় না। অধিকন্তু আয়ের অনুপাতে ভোগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষতঃ ভোগ-ব্যবহার ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রবৃত্তি অপেক্ষা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সঞ্চয়ের এই অত্যধিক আগ্রহের ফলে ভোগ-ব্যবহার ক্ষেত্রের ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ভোগ-ব্যবহার ক্ষেত্রের ব্যয়ের এই স্বল্পতা পূরণের জন্য উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ব্যয় করা

আবশ্যক হয়, নতুবা কর্মসংস্থানের অভাব হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে ভোগ-ব্যবহার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ একরূপ সীমাবদ্ধ, অপর পক্ষে উৎপাদন-ক্ষেত্রে নূতনভাবে অধিকতর পরিমাণে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর এবং এই নূতনভাবে ব্যয় করিলে অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগ করিলে প্রযুক্ত মূলধন হইতে প্রাপ্য প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং মূলধন বিনিয়োগ করিবার ক্ষেত্রের অভাবের জন্যই সমগ্র সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান সম্ভব নহে। এই অবস্থায় সমগ্র শ্রমিক-সংখ্যার এক অংশের পক্ষে কর্মহীন থাকা অবশ্যম্ভাবী।

বেকার সমস্যার প্রতিকার—Remedies.

বর্তমানে বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সকল দেশই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, কারণ, দেশে বেকার সমস্যার বর্তমানে কোনপ্রকার প্রগতিমূলক কার্য আরম্ভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়।

প্রথমতঃ, সাময়িক বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের শিল্পসমূহের পুনর্গঠনের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ঋতুগত বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংক-পরিচালনা নীতি ও ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাণিজ্যচক্র-জনিত বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সামঞ্জস্যের অভাব হেতু যে বেকার অবস্থা দেখা যায়, তাহা শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিয়া দূর করা যাইতে পারে। এইজন্য শিক্ষার বিস্তার, অল্পখরচে স্থানান্তর গমনের সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত শ্রমিক নিয়োগকারী সংসদ (Labour exchange) প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিকগণকে কর্মসংস্থান-সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, বেকার সমস্যা যখন ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয় তখন সরকারের পক্ষে নানাপ্রকার গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করা সমীচীন। রাস্তা-ঘাট, সেতু, পার্ক, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা কার্যে বহু সংখ্যক লোক কর্মসংস্থান করিতে সমর্থ হয়।

উপরি-উক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোক সব সময়েই

বেকার থাকে। এই সমস্ত লোকের জন্য উন্নত দেশগুলির সরকার বেকার বীমার (Unemployment insurance) ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক, মালিক ও সরকারপ্রদত্ত সাহায্যপুষ্ট একটি তহবিল সৃষ্টি করা হয়। বেকার অবস্থায় শ্রমিকগণ এই তহবিল হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান—Full Employment.

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিতে ইহা বুঝায় না যে, দেশের সমস্ত লোকেরই কর্ম-সংস্থান হইয়া বেকার সমস্যা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রকৃত তাৎপর্য হইল যে, এই অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে খুব কমসংখ্যক লোকই কর্মহীন থাকে এবং এই জাতীয় কর্মহীনতা কোনরূপ উৎকট সামাজিক সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হয় না। এক বৃত্তি বর্জন করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন বা নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কারণে সাময়িক কালের জন্যই এই জাতীয় বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। যাহারা উপরি-উক্ত কারণে সাময়িক কালের জন্য কর্মহীন হয় তাহারা যদি অনতিবিলম্বে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানে সক্ষম হয় তাহা হইলে এই সমস্ত লোকের সাময়িক কর্মহীনতার দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

বেকার সমস্যার কারণ সম্পর্কে কেইন্‌সের মতবাদ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে তিনটি উপায়ে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

১। ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি—Stimulating Consumption.

কেইন্‌স্ বলেন যে, ভোগ-ব্যবহারের জন্য চাহিদার অপ্রাচুর্য হইল বেকার সমস্যার একটি অন্যতম কারণ। যদি ভোগ-ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে শ্রমিকগণের কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের ভোগ-ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য কেইন্‌স্ বলেন যে, করধার্য নীতির সাহায্যে সরকার যদি দরিদ্রের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

২। বিনিয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি—Stimulating Investment.

দ্বিতীয়তঃ, বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কর্মসংস্থান করা যাইতে পারে। বেসরকারী বিনিয়োগ-পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সরকারের

পক্ষে আয়করের হার হ্রাস করা প্রয়োজন। যাহাতে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ হ্রাস না পায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৩। ঘাটতি ব্যয়—Deficit Financing

দেশের সরকার যদি গঠনমূলক কার্যে অধিক পরিমাণ ব্যয় করে কিংবা ভোগ-ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পারিবারিক ভাতা বা বৃত্তি প্রদান করে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়। গঠনমূলক কার্যের জন্য এবং ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করিবার জন্য সরকারের যে ব্যয় হয় তাহা সরকার বে-সরকারী বিনিয়োগ-পরিমাণ অব্যাহত রাখিয়া ঋণগ্রহণ দ্বারা সংকুলান করিতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে বে-সরকারী বিনিয়োগ-পরিমাণ ও ভোগ-ব্যবহারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য মন্দার সময় সরকারের পক্ষে গঠনমূলক কার্যে অধিক পরিমাণ ব্যয় করা অথবা জনসাধারণের ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করা সমীচীন। এই উদ্দেশ্যে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া (নোট প্রচলন) সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করাকে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়। ইহার সুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে সরকার বিনা সুদে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য এইরূপ ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। অপর পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যে যখন সুসময় উপস্থিত হয় তখন সরকারী ব্যয় হ্রাস করা ও উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুসময়ে যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায় হয় তাহা দ্বারা মন্দার সময়ে যে ঘাটতি ব্যয় করা হয় তাহা পূরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে সরকার মন্দার সময়ে যদি নির্ভয়ে উপরি-উক্ত নীতি অবলম্বন করে তাহা হইলে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রমিকের গতিশীলতা না থাকিলে উপরি-উক্ত নীতি অবলম্বন করিয়াও পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব না হইতে পারে। শ্রমিকের গতিশীলতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, অত্যধিক পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হয় এবং সরকারী ঋণের ভার বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হইল ভবিষ্যতে করভার বৃদ্ধি পাওয়া। এই আশংকার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার বাধা-প্রাপ্ত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বেকার সমস্যা—

বেকার বলিতে সেই সমস্ত লোককে বুঝায় যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু প্রচলিত মজুরির হারে কর্মসংস্থান করিতে পারে না। একটি দেশে নানা জাতীয় বেকার সমস্যা দেখা যায়। যথা, ঋতুগত বেকার সমস্যা, বাণিজ্য-চক্র-জনিত বেকার সমস্যা, যান্ত্রিক কারণে বেকার সমস্যা ইত্যাদি।

বেকার সমস্যার কারণ—

নানা কারণে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণগুলি হইল—

১। শ্রমিকের গতিশীলতার অভাব, ২। বাণিজ্যচক্র-জনিত মন্দার আবির্ভাব, ৩। চাহিদা ও সরবরাহের ঋতুগত পরিবর্তন, ৪। যান্ত্রিক কারণ, ৫। শ্রমিকের দক্ষতার অভাব প্রভৃতি।

বেকার সমস্যার প্রতিকার—

১। শিল্পের পুনর্গঠন, ২। ব্যাংকনীতি ও ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, ৩। শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি, ৪। শ্রমিক নিয়োগকারী সংসদ প্রতিষ্ঠা, ৫। সরকার কর্তৃক গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করা।

প্রশ্নাবলী

1. What are the different types of unemployment that occur in modern society? How should we try to cure the evil? (C. U. 1952)

2. Analyse the different types of unemployment. What are the causes of unemployment? (C. U. 1955)

3. What is meant by "Full employment"? Examine the methods by which full employment may be secured.

4. Classify the principal types of unemployment and suggest some possible remedies. (C. U. B. Com. 1957)

5. Distinguish between different types of unemployment and suggest some remedies for solving the problem of unemployment. (C. U. 1959)

অষ্টম অধ্যায়

বাণিজ্যচক্র

(Trade Cycle)

ব্যক্তিগত জীবনে পর্যায়ক্রমে যেরূপ সুসময় ও অসময় উপস্থিত হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ উন্নতি ও অবনতি পরিদৃষ্ট হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি উত্থানপতন-বন্ধুর পথে পরিচালিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধারাবাহিক উন্নতি বা ধারাবাহিক অবনতি কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই উত্থান-পতনশীল গতি ব্যবসায় বা বাণিজ্যচক্র নামে অভিহিত হয়। এক সময় ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বাধিক পরিমাণ প্রসার লাভ করে, ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই উন্নত অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আকস্মিকভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। মন্দার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইরূপে ব্যবসায়-বাণিজ্যে পর্যায়ক্রমে সুসময় ও অসময় উপস্থিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই দ্বিমুখী গতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, যখন ইহার গতি উর্ধ্বাভিমুখী হয় অর্থাৎ যখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তখন ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা দেখা যায়। মূল্যবৃদ্ধি ও অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানই হইল এই সময়কার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপর পক্ষে বাণিজ্যের গতি যখন নিম্নাভিমুখী হয় অর্থাৎ বাণিজ্যে যখন মন্দা উপস্থিত হয় তখন সর্বক্ষেত্রেই কর্মতৎপরতা হ্রাস পায়। মূল্যহ্রাস ও বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি হইল এই অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাণিজ্যচক্রের গতি বিশ্লেষণ করিলে ইহার দুইটি বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, উন্নতি ও অবনতি। বাণিজ্যের এই উন্নত ও অবনত অবস্থার দুইটি শেষ সীমা আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য যখন অবনতির শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয় তখন ধীরে ধীরে ইহার গতি বিপরীতমুখী হইতে থাকে অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। এইরূপে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং উন্নত অবস্থার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। উন্নত অবস্থার এই শেষ প্রান্ত হইতে পুনরায় ইহার গতি বিপরীতমুখী

হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই মন্দা বৃদ্ধি পাইয়া অবনতির শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়—Phases of Trade cycle.

ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই উত্থান-পতন—তেজী-মন্দা ভাবকে চক্র বলা হয়। তাহার কারণ হইল যে, একটি চক্র যেরূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অবিরাম গতিতে ঘুরিতে থাকে ব্যবসায়-বাণিজ্যও তদ্রূপ সুসময় অসময় অর্থাৎ তেজী ও মন্দার মধ্য দিয়া আবর্তিত হয়। বাণিজ্যের এই গতি পথের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কোন বিরতি থাকে না। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'-র মত বাণিজ্যচক্রের গতিপথ অবিরাম আবর্তিত হইতেছে। ধনবিজ্ঞানিগণ বাণিজ্যচক্রের চারিটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করেন। যেহেতু বাণিজ্যচক্র বিরামহীন গতিতে আবর্তিত হইতেছে, সেইহেতু ইহার কোন প্রারম্ভ বা শেষ নাই। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের গতিপথ বিশ্লেষণ যে-কোন স্তর হইতে করা যাইতে পারে। বাণিজ্যচক্রের চারিটি স্তরকে যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে :

১। মন্দা হইতে উন্নতি—Recovery or Revival

ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা সুরু হইয়া শেষ পর্যন্ত এই মন্দা বৃদ্ধি পাইয়া অবনতির শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে দ্রব্যমূল্যের পতন বন্ধ হয়, তারপর মূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবস্থার এই পরিবর্তনে ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার হয় ও তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে। ফলে, নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হয় ও শ্রমিকের আয় বাড়ে। আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে এবং ধীরে ধীরে উৎপাদন পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২। চূড়ান্ত উন্নতি বা সমৃদ্ধি—Boom or Prosperity.

ব্যবসায়ে একবার মুনাফা আরম্ভ হইলে ব্যবসায়িগণ আশাবাদী হইয়া নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে। অধিক মূলধন ও অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়. এই অবস্থায় ব্যবসায়ীর মুনাফা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন দ্রুত

গতিতে বৃদ্ধি পায় ও মূল্যস্তরও বাড়িতে থাকে। ব্যবসায়ের ঊর্ধ্বগতির এই শেষের অবস্থাকে সমৃদ্ধির চূড়ান্ত অবস্থা বলা হয়।

৩। অবনতি—Recession.

ব্যবসায়ে এই চূড়ান্ত উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রথম হয়ত দুই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যুৎপাদনের ফলে কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। কারবারের এই অবস্থায় ব্যাংক সাধারণতঃ সুদের হার বৃদ্ধি করে ও নূতন ধার দিতে ইতস্তত করে। এই অবস্থায় অনেক ব্যবসায়ী টাকার অভাবে স্বল্পমূল্যে বাজারে মাল ছাড়িতে বাধ্য হয়। ফলে, লাভের পরিবর্তে লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইরূপে ব্যবসায়িগণের মনে ধীরে ধীরে নিরাশার সঞ্চার হইয়া ব্যবসায়ের প্রসার সংকুচিত হয়।

৪। চূড়ান্ত অবনতি বা সংকট—Depression or Slump.

ইহার পর আসে চতুর্থ বা শেষ স্তর। একবার ব্যবসায়ী মহলে নিরাশার মনোভাব সঞ্চারিত হইলে ইহা ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। উৎপাদন পরিমাণ কমিতে থাকে, ফলে লোক ছাঁটাই আরম্ভ হয়। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে যাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অবনতির চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু ব্যবসায় চক্রের গতির কোন ছেদ নাই। তাই চূড়ান্ত অবনতির স্তর হইতে আবার ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে চলিতে থাকে। নিম্নলিখিত রেখা-চিত্রের সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের গতির বিভিন্ন পর্যায় দেখান হইল :
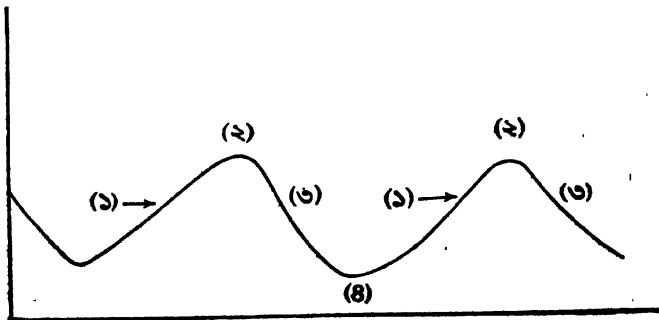
(১) উন্নতি (Revival) পর্যায়।

(২) সমৃদ্ধি (Prosperity) পর্যায়।
(৩) অবনতি (Recession) পর্যায়।
(৪) সংকট (Depression) পর্যায়।

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of a Trade cycle.

বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রেই প্রায় একই সময়ে এই উন্নতি বা অবনতি দেখা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন ক্ষেত্রে একবার উন্নতি বা অবনতি ঘটিলে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহা সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নানাজাতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য যেরূপ সম্পর্কযুক্ত ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যও তদ্রূপ আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ। এই কারণে একটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বা অবনতির প্রতিক্রিয়া অপর দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতির উপর অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। সুতরাং বর্তমান যুগের বাণিজ্যচক্রকে আন্তর্জাতিক প্রভাব-সম্পন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই উত্থানপতন-বন্ধুর গতি অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও অবনতি উৎপাদন-ক্ষেত্রের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উত্থান-পতনের তীব্রতা সর্বত্র সমান নাও হইতে পারে। চতুর্থতঃ, বাণিজ্যচক্র অদৃষ্টপূর্ব বা আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্যচক্রের কারণ—Causes of Trade cycles.

বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। নিম্নে এই কারণগুলির বিশদ আলোচনা করা হইল।

১। আবহাওয়া সম্পর্কিত মতবাদ—Climatic Theory.

জেভন্‌স্ প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণের মতে কৃষিজাত উৎপন্ন-পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যই বাণিজ্যচক্র ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, ফসলের এই হ্রাস-বৃদ্ধি সৌর কলঙ্ক (Sun-spot) দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিয়মিতরূপে প্রায় প্রতি দশ বৎসর অন্তর এইরূপ সৌর কলঙ্ক দেখা যায়। যখন সৌর কলঙ্কগুলি বৃদ্ধি পায় তখন সূর্য হইতে অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপ বিকীর্ণ হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের

উৎপাদন বহুলপরিমাণে নৈসর্গিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং কৃষিজাত দ্রব্য মানুষের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যতীতও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাঁচামাল সরবরাহ করে। সুতরাং কৃষিই হইল আদি ও সর্বপ্রধান শিল্প। সৌর কলঙ্কের নিমিত্ত কম উত্তাপ বিকীর্ণ হওয়ার ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যখন সৌর কলঙ্কগুলি হ্রাস পায় তখন সূর্য হইতে অধিক পরিমাণ উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

উৎপন্ন ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধি বাণিজ্যচক্রের গতি প্রভাবিত করিলেও ইহা বাণিজ্যচক্রের একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্যচক্রের অন্যান্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উপরি-উক্ত মতবাদে সেগুলিরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই কারণে এই মতবাদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। অতি-সঞ্চয় বা অত্যল্প ভোগ মতবাদ—**Over-saving or under-consumption Theory.**

ধনবিজ্ঞানী হব্‌সন্‌ কর্তৃক বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ হইল অতি-সঞ্চয় অথবা অত্যল্প ভোগ। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বণ্টন-ব্যবস্থার অসমতা, যাহার ফলে সমগ্র জাতীয় আয়ের অধিকাংশ মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কেন্দ্রীভূত হওয়ার আশুফল হইল সমাজের অধিকাংশ লোকের ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয় করিবার ক্ষমতার অভাব। এইজন্য ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের অধিকাংশ পরিমাণের মালিক-গণ তাহাদের অর্থ ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয় না করিয়া উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। ফলে, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের অভাবহেতু উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ অবিক্রীত থাকে। ফলে, ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মন্দা উপস্থিত হয়।

উপরি-উক্ত মতবাদের সাহায্যে ব্যবসায়ে মন্দার উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারা গেলেও সমগ্রভাবে বাণিজ্যচক্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে,

ভোগ্যবস্তুর মূল্যপতন দ্বারাই বাণিজ্যচক্রের আবির্ভাব সূচিত হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাণিজ্যচক্রের আবির্ভাবের প্রারম্ভে উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর মূল্যপতন ঘটিয়া থাকে।

৩। অতি-বিনিয়োগ মতবাদ—Over-investment Theory.

ধনবিজ্ঞানী হায়েকের মতে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়-পরিমাণ অপেক্ষা যখন বিনিয়োগ-পরিমাণ অধিকতর হয় তখন বাণিজ্যচক্র শুরু হয়। সঞ্চয়-পরিমাণ ও সুদের পরিমাণ সমতা প্রাপ্ত হইয়া যে সুদের হার নির্ধারিত হয়, সেই হারই হইল সুদের স্বাভাবিক হার। কিন্তু ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতার আধিক্যহেতু অনেক সময় সুদের হার এই স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম হওয়ার ফলে বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় যে, শিল্পব্যবস্থাপনা-ক্ষেত্রে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাস্তব মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগ-পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্পতর হওয়ার ফলে ব্যাংকগুলি ঋণদান-পরিমাণ সংকোচ করিতে বাধ্য হয়। ফলে, শিল্প-বাণিজ্য প্রয়োজনীয় ঋণ না পাওয়ায় হঠাৎ সংকটের সম্মুখীন হয়। ব্যাংকগুলি যদি পূর্বের মত শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ঋণদান করিতে পারিত, তাহা হইলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হইত না।

হায়েক্-প্রদত্ত মতবাদ কেইন্‌স্ কর্তৃক অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ব্যাংক কর্তৃক ঋণদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে যে বাণিজ্যচক্র উপস্থিত হয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকন্তু অনেক সময় ব্যাংক ইহার ঋণদান-পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা হ্রাস করিতে সাহায্য করে।

৪। অর্থসম্পর্কিত মতবাদ—Moneytary Theory.

হট্রি প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণের মতে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সংকোচন ও প্রসারণই হইল বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ। ব্যাংকগুলি ঋণ প্রদান করিয়া ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ব্যাংক হইতে সহজলভ্য ঋণ পাওয়ার ফলে ব্যবসায়িগণ উৎপাদকগণকে অধিক পরিমাণ পণ্যদ্রব্য সরবরাহের আদেশ দান করে। উৎপাদকগণ বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে স্থায়ী ও চলতি মূলধন এবং শ্রমিক নিযুক্ত করে। এইরূপে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি শুরু হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে বিক্রয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও লোকের

আর্থিক আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যাংকগুলির নগদ সঞ্চিত পরিমাণ যখন হ্রাস পায়, তখন তাহারা ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করে ও পূর্বপ্রদত্ত ঋণ আদায় করিতে থাকে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ধার-করা অর্থের সাহায্যে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছিল তাহারা এই অবস্থায় তাহাদের মজুত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফলে দ্রব্যমূল্য হঠাৎ হ্রাস পায়। উৎপাদকগণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের নূতন কোন আদেশ পায় না। ফলে, তাহাদের উৎপাদন-ব্যবস্থা সংকোচ করিতে হয় এবং শ্রমিক ছাটাই করিতে হয়। শ্রমিক-ছাটাইয়ের ফলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় ও লোকের আর্থিক আয় হ্রাস পায়। এইরূপে আর্থিক কারণে বাণিজ্যচক্র উন্নত অবস্থার প্রান্ত হইতে অবনত অবস্থার প্রান্তে উপস্থিত হয়।

এই মতবাদ অনুসারে ব্যাংকের ঋণদান নীতিই বাণিজ্যচক্রের জন্য দায়ী বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু কি কারণে ব্যাংকগুলি প্রথম পর্যায়ে দ্বিধাহীনভাবে ঋণদান করে তাহা এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই সুসময় ও অসময় কেন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘটে, এ মতবাদ তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারে না।

৫। মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ—Psychological Theory.

এই মতবাদ অনুসারে ব্যবসায়িগণের মানসিক দুর্বলতাই বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ বলিয়া ধরা হয়। ব্যবসায়িগণের মানসিক দুর্বলতার কারণ হইল তাহাদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে ব্যবসায়িগণ কখনও অত্যধিক পরিমাণে আশান্বিত হইয়া নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্যে অবতীর্ণ হন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের কর্মতৎপরতা সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন এবং কর্মতৎপরতা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হন। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংকুচিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন ক্ষেত্রে একবার এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাবজনিত নিরুৎসাহ মনোভাব প্রবেশ করিলে, তাহা সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের এই মন্দা সংকটে পর্যবসিত হয়।

ব্যবসায়িগণ আশান্বিত হইয়া কেন ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন, আবার কেনই বা ব্যবসায় সংকোচন করেন—এই মতবাদ ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না।

৬। আধুনিক মতবাদ—Recent Theory.

কেইন্‌স্ নিম্নলিখিতরূপে বাণিজ্যচক্রের গতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুসময়ে ব্যবসায়িগণের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যধিক পরিমাণে আশাবাদী হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে। প্রতিমাত্রা বিনিয়োগের ফলে আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে আয়বৃদ্ধি যখন শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শ্রমিকের অভাব হেতু নূতন নূতন উৎপাদনের সহায়ক উপাদান-উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত সামগ্রীর আধিক্যের জন্য মুনাফার পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। উপরি-উক্ত দুইটি কারণে ব্যবসায়িগণের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। যখন ব্যবসায়িগণ দেখে যে, তাহাদের বিনিয়োগ-পরিমাণ হইতে আয় আশানুরূপ অপেক্ষা অনেক কম হইতেছে তখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হইয়া ব্যবসায় সংকোচ করে। ফলে, আয় আরও হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। এইরূপে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি যখন নিম্নাভিমুখী হয় তখন যে-হারে বিনিয়োগ-পরিমাণ হ্রাস পায় তদপেক্ষা অধিক হারে আয়-পরিমাণ হ্রাস পায়। এইরূপে শেষ পর্যায়ে বাণিজ্যে সংকট উপস্থিত হয়।

কালক্রমে স্থায়ী মূলধনের একাংশ যখন অব্যবহার্য হয় এবং সংকট কালের মজুত অতিরিক্ত মাল যখন নিঃশেষিত হয়, তখন ধীরে ধীরে পুনরায় স্থায়ী মূলধন ও ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবসায়িগণের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা হয় এবং এই আশায় ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করে। কেইন্‌স্ বলেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতনের এই পুনরাবৃত্তি প্রায়শঃ একটি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ঘটিয়া থাকে। কারণ স্থায়ী মূলধনের অপচয় হইতে এবং ভোগ্যবস্তু নিঃশেষিত হইতে সর্বকালেই প্রায় একই সময় অতিবাহিত হয়।

৭। স্যুম্‌পিটারের উদ্ভাবন মতবাদ—Schumpeter's Innovation Theory.

স্যুম্‌পিটারের মতে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভাবন

(Innovation) দেখা যায়, তাহার ফলেই বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় নূতন পদ্ধতি চালু হইলেই অধিকতর পরিমাণ-মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ-মূলধন বিনিয়োগের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। উন্নততর উপাদান-পদ্ধতির সহায়ক কোন নূতন যন্ত্র তৈয়ারী করিতে গেলে প্রয়োজনীয় উৎপাদনগুলির মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই নূতন যন্ত্রটি উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যায় যে, নূতন উদ্ভাবনের সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, অপর পক্ষে উদ্ভাবনটি উৎপাদনে প্রযুক্ত হইলে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। এইরূপে নূতন উদ্ভাবনের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমৃদ্ধি ও সংকটের মধ্য দিয়া আবর্তিত হয়।

স্যুম্পিটারের মতে নূতন উদ্ভাবন বলিতে নিম্নলিখিত যে কোন অবস্থা বুঝাইতে পারে : ১। কোন নূতন উৎপাদন পদ্ধতির-প্রচলন, ২। ব্যবসায়-সংগঠনে কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ৩। কোন নূতন বিক্রয় স্থলের সৃষ্টি, ৪। কোন নূতন দ্রব্যের উৎপাদন।

বাণিজ্যচক্রের প্রতিকার—Remedies of Trade Cycle.

বাণিজ্যচক্র-সম্পর্কে বিশদ আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের চক্রবৎ এই উত্থান ও পতন অর্থনৈতিক জীবনের গতিকে ব্যাহত করে। বাণিজ্যচক্রের প্রভাবমুক্ত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে স্বাভাবিক ও সাবলীল হইতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন ধনবিজ্ঞানী বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রধান কথা হইল যে, বাণিজ্যচক্র কি কারণে ঘটে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে না পারিলে ইহার প্রতিকার করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন লেখক বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই এই কারণের ভিত্তিতেই প্রতিকার-ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১। অর্থসম্পর্কিত প্রতিকার—Monetary remedies.

যে সমস্ত লেখক বাণিজ্যচক্র সংঘটনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাকে দায়ী করেন তাঁহারা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন দ্বারা বাণিজ্যচক্রের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। দেশের অর্থসম্পর্কিত ব্যবস্থার কর্ণধার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহার সুদের হার-বৃদ্ধি ও

ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাঞ্ছিত সম্প্রসারণ রোধ করিতে পারে। পক্ষান্তরে মন্দার সময় সুদের হার হ্রাস করিয়া ও ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করিতে পারে।

২। সমাজতান্ত্রিক প্রতিকার—Socialistic remedies.

সমাজতান্ত্রিক লেখকগণের মতে বাণিজ্যচক্রের একমাত্র কারণ হইল বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়িগণ তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সেই জন্যই বাণিজ্যচক্র উপস্থিত হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-কর্তৃত্বের পরিবর্তে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে বেকার সমস্যা দূরীভূত হইবে এবং বর্তমান অসম বণ্টন-ব্যবস্থাও অন্তর্হিত হইবে। যে সমস্ত দেশের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, সে সমস্ত দেশে বাণিজ্যচক্র, বেকার সমস্যা, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতি দেখা যায় না।

৩। বাণিজ্যচক্র-প্রতিষেধক রাজস্বনীতি—Contra-cyclical Fiscal policy.

সরকার শুধুমাত্র ইহার আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া বাণিজ্যচক্রের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। কেইন্‌সের মতে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিতে হইলে সরকারের পক্ষে একটা সুনির্ধারিত রাজস্বনীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। বেকার সমস্যা আলোচনাকালে এ সম্পর্কে কেইন্‌সের মতবাদ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেইন্‌স্ ও তাঁহার অনুগামিগণের মতে সরকারের রাজস্বনীতি এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে মন্দার সময়ে লোকের ভোগব্যবহারের প্রবৃত্তি (Propensity to consume) ও বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ের সুসময়ে এই প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। মন্দার সময়ে সরকার গঠনমূলক কার্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করিবে এবং ব্যবসায়ের সুসময়ে তাহাকে এই ব্যয় সংকোচ করিতে হইবে। মন্দার সময়ে প্রয়োজন হইলে সরকার একদিকে ঋণ গ্রহণ করিয়া ঘাটতি ব্যয় সংকুলান করিবে, অপর-দিকে করভার হ্রাস করিয়া বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে। ব্যবসায়ের সুসময়ে সরকার আবার বিপরীত নীতি অবলম্বন করিবে।

বাণিজ্যচক্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে হইলে উপরি-উক্ত কোন একটি মাত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমগ্রভাবে একটা

সুনির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী রূপদান করিতে হইবে। এজন্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, অর্থসম্পর্কিত সমগ্র ব্যবস্থা প্রভৃতির নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আধুনিককালের বাণিজ্যচক্র আন্তর্জাতিক প্রভাব-সম্পন্ন। সুতরাং কার্যকরীভাবে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিতে হইলে উৎপাদন, বিনিময়, মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

বাণিজ্যচক্র—

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উত্থান-পতনশীল গতি বাণিজ্যচক্র নামে অভিহিত হয়। ব্যবসায়ের প্রসারের সময় মূল্য বৃদ্ধি পায় ও কর্মসংস্থান হয়, কিন্তু ব্যবসায়ের অবনতিকালে মূল্য হ্রাস পায় ও বেকার সমস্যা দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে এই উন্নতি ও অবনতিই হইল বাণিজ্যচক্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই উন্নতি ও অবনতি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্যচক্রের কারণ—

১। আবহাওয়া সম্পর্কিত মতবাদ, ২। অতি-সঞ্চয় বা অত্যল্প ভোগ মতবাদ, ৩। অতি-বিনিয়োগ মতবাদ, ৪। অর্থসম্পর্কিত মতবাদ, ৫। মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ, ৬। আধুনিক মতবাদ।

বাণিজ্যচক্রের প্রতিকার—

১। অর্থসম্পর্কিত প্রতিকার অর্থাৎ আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং ইহা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে।

২। সমাজতান্ত্রিক প্রতিকার : বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা বাণিজ্যচক্রের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা সম্ভব।

৩। বাণিজ্যচক্র-প্রতিষেধক রাজস্বনীতি : প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী কেইন্‌সের মতে সরকার একটি সুনির্ধারিত রাজস্বনীতি প্রবর্তন দ্বারা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করিতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. What are cyclical fluctuations ? Discuss their causes. Mention some measures that have been suggested for the effective control of such fluctuations. (C. U. 1943)

2. Account for the periodicity of business cycles. (C. U. 1953)

3. Examine the main features of business cycles and mention some measures that may be adopted to control these cycles. (C. U. B. Com. 1952)

4. Describe the phases of a typical business cycle. What remedial measures would you suggest for controlling these cycles ? (C. U. B. Com. 1955)

5. What are "business cycles" ? Describe briefly the course of a typical business cycle. (C. U. 1960)

———

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

(Public Finance)

আধুনিক যুগে সরকারী আয়-ব্যয় ধনবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রসম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র এখন শুধু আইন-শৃংখলার রক্ষক অসীম শক্তির আধার বলিয়া পরিগণিত হয় না। বর্তমানে রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং বর্তমান কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যকলাপাদি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বার্থসাধক কর্তব্যপালনের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্র নানা উপায়ে আহরণ করিয়া নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থসংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থের ব্যয়-পদ্ধতির উপর সামাজিক অগ্রগতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

সরকারী আয়-ব্যয়ের দুইটি প্রধান অংশ হইল: (১) সরকারী আয় (Public Income) ও (২) সরকারী ব্যয় (Public Expenditure)। এতদ্ব্যতীত (৩) সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণও (Public Debt) সরকারী আয়-ব্যয়ের একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ সরকারী আয়-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করে তখন ইহাকে একজাতীয় আয় বলা যাইতে পারে। অপরপক্ষে সরকার যখন সুদ ও আসল ঋণ পরিশোধ করে তখন তাহা সরকারী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৪) আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ও এই হিসাব পরীক্ষা করাও সরকারী আয়-ব্যয়ের আর একটি অংশ (Financial Administration) বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের পার্থক্য—Distinction between Public Finance and Private Finance.

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি যেরূপ ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের

পরিমাণের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপাদিও তদ্রূপ রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সর্বত্র সমান নহে। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিদৃষ্ট হয়।

১। ব্যক্তিগত আয়ের একটা সীমা আছে। কোন ব্যক্তিই নিজ খুসীমত তাহার আয় বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই ব্যয় করা একান্ত অপরিহার্য। ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আয় বৃদ্ধি করা অতি অল্পক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, তাই ব্যক্তি আয় অনুসারে ব্যয় করে (Cuts his coat according to his cloth and not the other way round)। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হয়। করধার্য করিবার ও অন্য নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রায় অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র ব্যয় অনুসারে ইহার আয় নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ রাষ্ট্র পূর্বে ইহার সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তদনুসারে বিভিন্ন উৎস হইতে আয় আহরণ করিয়া আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে।

সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের এই পার্থক্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ব্যয়াধিক্য ঘটিলে ব্যক্তিও নানা-ভাবে তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। আবার রাষ্ট্রের পক্ষেও সবসময়ে ইচ্ছামতভাবে আয় বৃদ্ধি দ্বারা ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের করপ্রদান সামর্থ্যের একটা সীমা আছে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে এই সীমা-বহির্ভূত পরিমাণ কর আদায় করিয়া ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব নহে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয়বিধ আয়-ব্যয়ের মধ্যে শুধু মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা কোন মূলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

২। প্রয়োজন ক্ষেত্রে সরকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যয় সংকুলান করিতে পারে। ব্যক্তি শুধু একটিমাত্র উৎস অর্থাৎ দেশের মধ্যে অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ধার পাইতে পারে।

৩। ব্যক্তি তাহার বিভিন্ন ব্যয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য উপযোগিতাগুলির

তুলনামূলক বিচার করিয়া সাধারণতঃ তাহার আয় এরূপভাবে ব্যয় করে যে, প্রতিমাত্রা ব্যয়ের উপযোগিতা সমান হয় অর্থাৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমান-প্রান্তিক উপযোগিতা-নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিমাত্রা ব্যয় হইতে প্রাপ্য এই সম্ভাব্য উপযোগিতার এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কম উপযোগী কার্যের জন্যও অধিক পরিমাণ ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাষ্ট্র ভালমন্দ বিচার না করিয়া অবিবেচনার সহিত ব্যয় করে তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। অর্থ ব্যয় করিবার কালে সরকারও সাধ্যমত ব্যয়ের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যয় করে। ব্যক্তির পক্ষে এই ব্যয় ফলপ্রসূ না হইলেও সমগ্র সমাজের স্বার্থের অনুকূল বলিয়াই সরকার এইরূপ ব্যয়ে ব্রতী হয়।

৪। ব্যক্তিগত জীবন স্বল্পস্থায়ী, অপরপক্ষে রাষ্ট্র চিরন্তন প্রতিষ্ঠান এবং সেইজন্য রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের স্বার্থের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ব্যক্তির দৃষ্টি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানের উপরই অধিক পরিমাণে সন্নিবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপভাবে ব্যয় করে যাহাতে ব্যয়িত অর্থের সুখ-সুবিধা সে জীবদ্দশায় ভোগ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র ইহার সমগ্র আয় এরূপভাবে ব্যয় করে যাহাতে বর্তমান সমাজের সুখ-সুবিধা সৃষ্টি করা ব্যতীতও ভবিষ্যৎকালে জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে ভারত সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহার সুফল ভবিষ্যৎ যুগের ভারতীয়গণ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

৫। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে যেরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্ভব, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সেরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্ভব নহে। আয় বৃদ্ধি করিয়া ব্যক্তি তাহার ব্যয়ের তথা জীবনযাত্রার মানের কিছু পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু এই পরিবর্তনও সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিন্তু আয়-ব্যয়ের অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভবপর। সরকারের পরিবর্তনের সংগে সংগে সরকারী আয়-ব্যয়ের নীতি ও পরিমাণের অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। জার শাসনের সময় রুশ দেশের সরকারী আয়-ব্যয়

ও সাম্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার আয়-ব্যয়ের মধ্যে চলিত কথায় বলিতে গেলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। বৃটিশ ভারতের আয়-ব্যয় ও স্বাধীন ভারতের আয়-ব্যয়ের পার্থক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়।

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যক্তির পক্ষে আয় অনুসারে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র যদি ঠিক আয় অনুসারে ব্যয় করে তাহা হইলে বহু গঠনমূলক ও জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। পরন্তু রাষ্ট্র সুদূরদর্শিতার সহিত ব্যয় বৃদ্ধি করিলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, রাষ্ট্রের তথা সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে ব্যয়াধিক্য তাহার অবনতির কারণ হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যয়াধিক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের উন্নতির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উদ্দেশ্য—Aims of Public Finance.

১। পূর্বতন মতবাদ—Older Views.

সরকারী আয়-ব্যয়-সম্পর্কে পূর্বতন মতবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র সর্বাধিক পরিমাণে সংকুচিত করাই ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্যই তাঁহাদের মতে সরকারী আর্থিক ব্যবস্থায় আয় ও ব্যয় সংকোচনকে তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্গণ উপরি-উক্ত মতবাদ অসার ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সু-পরিকল্পিত করস্থাপন ও ব্যয়বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের নানাবিধ হিতসাধন করা সম্ভব।

বর্তমানে সরকারী আয়-ব্যয়-সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রচলিত দেখা যায়।

২। সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা নীতি—Principle of maximum Social Advantage.

এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, সরকার তাহার আয় ও ব্যয় এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সমাজের সর্বাধিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। সরকার কর-স্থাপন ও ঋণগ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং এই সংগৃহীত অর্থ সরকারী

ব্যয়ের মাধ্যমে পুনরায় সমাজে বণ্টিত হয়। সুতরাং সরকারী এই আয়-ব্যয়ের প্রধান তাৎপর্য হইল যে, সরকার একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ আহরণ করিয়া অপর শ্রেণীকে প্রদান করে অর্থাৎ সরকারী আয়-ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থ হস্তান্তরিত হয়। সরকার কর্তৃক অর্থ হস্তান্তরের যে ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হয় সেই ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

বিষয়টি আরও একটু প্রণিধানপূর্বক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সরকারী আয়-ব্যয় কি পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হইলে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে সে সম্পর্কে ডাল্টনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ডাল্টন বলেন যে, করস্থাপন ও ব্যয়ক্ষেত্রে সরকার নিম্নলিখিত তিনটি নীতি অনুসরণ করিলে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

(ক) প্রথমতঃ, সরকার এরূপভাবে ব্যয় করিবে যাহাতে ব্যয়ের ভার আপাততঃ কষ্টকর হইলেও ভবিষ্যতে এই ব্যয়ের দ্বারা সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যও সরকারী ব্যয় অবশ্যকরণীয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সরকার এরূপভাবে করধার্য করিবে যাহাতে জনসাধারণের উপর করভার সর্বাপেক্ষা লঘু হয়।

(গ) তৃতীয়তঃ, করভার এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোনমতে ব্যাহত না হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপরই দেশের উৎপাদন-দক্ষতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং করস্থাপন কালে সরকারের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৩। পূর্ণ কর্মসংস্থান নীতি—**Principle of Full Employment.**

সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ হইল যে, সরকারী আয়-ব্যয় এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যাহাতে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সরকারী করধার্য নীতি ও ব্যয়নীতি এরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যাহার ফলে সর্ববিধ বিনিয়োগ-পরিমাণ ও ভোগ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সমগ্র শ্রমিকসংখ্যার কর্মসংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়—Public Expenditure

সরকার প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া আয়ের উপায় অনুসন্ধান করে। সুতরাং সরকারী আয় আলোচনার পূর্বে ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যসমূহ জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Public Expenditure.

১। সরকারী ব্যয় নানাভাবে শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। সরকারী ব্যয়ের উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ডাল্টন সরকারী ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বহিরাক্রমণ হইতে জনসাধারণের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় ও (২) নানাবিধ সেবামূলক কার্য দ্বারা সামাজিক জীবনের অগ্রগতির জন্য ব্যয়। এতদ্ব্যতীত ডাল্টন সরকারী ব্যয় অন্যপ্রকারে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, যথা, (ক) দান (Grants) ও (খ) ক্রয়মূল্য (Purchase prices)। সরকার যখন প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে কোন কিছু দাবী করে না তখন তাহাকে দান বলা হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান (subsidies), বৃদ্ধ বয়সের ভাতা প্রদান প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সরকার যখন বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করে তখন তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়। সরকারী কর্মচারিগণের বেতন প্রদানের জন্য ব্যয় এই পর্যায়ভুক্ত।

২। অধ্যাপক প্লেহ্ন সরকারী ব্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) যে ব্যয়ের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ পার্থক্যমূলক সুবিধা পায়, যথা, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা, (১) যে ব্যয়ের দ্বারা সমস্ত নাগরিকই উপকৃত হয়, যথা, সাধারণ শাসনখাতে ব্যয়, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ব্যয় ইত্যাদি। (৩) আর একজাতীয় সরকারী ব্যয় যাহাকে উপরি-উক্ত দুই ব্যয়ের সমন্বয় বলা যাইতে পারে অর্থাৎ যে ব্যয় দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ ও জনসাধারণ যুগপৎ সুবিধা পায়, যথা, বিচার-ব্যবস্থার জন্য ব্যয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্য ব্যয় ইত্যাদি।

৩। অধ্যাপক পিগু সরকারী ব্যয়কে (১) আসল ব্যয় (Real expenditure) ও (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer expenditure) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। যখন সরকার কোন সেবামূলক কার্য গ্রহণ করিয়া

তৎপরিবর্তে অর্থ প্রদান করে তখন এই জাতীয় ব্যয়কে আসল ব্যয় বলা হয়। পুলিশ বা বিচারকের কার্যের জন্য যে বেতন দেওয়া হয় তাহা আসল ব্যয় বলিয়া কথিত হয়, কারণ পুলিশ ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিগণ তাহাদের সেবামূলক কার্যের প্রতিদান হিসাবেই বেতন পাইয়া থাকে। কিন্তু সরকার যখন বেকার ব্যক্তিগণকে বা বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য করে তখন এই অর্থসাহায্য হস্তান্তরিত ব্যয় বলিয়া অভিহিত হয়। এই ব্যয়ের জন্য সরকার কোন সেবামূলক কার্য পায় না।

৪। অনেক সময় সরকারী ব্যয় (১) উৎপাদনক্ষম ব্যয় (Productive expenditure) ও (২) অনুৎপাদনক্ষম ব্যয় (Unproductive expenditure) নামে অভিহিত হয়। সরকার গঠনমূলক কার্যের জন্য যে ব্যয় করে এবং যে ব্যয় দ্বারা ভবিষ্যতে একটা অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহাকে সাধারণতঃ উৎপাদনক্ষম ব্যয় বলা হয়। যে ব্যয় দ্বারা কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না তাহাকে অনুৎপাদনক্ষম ব্যয় বলা হয়। সাধারণতঃ যুদ্ধ-জনিত ব্যয়কে এই পর্যায়ভুক্ত করা হয়। আবার সরকারী এমন ব্যয় আছে, যথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে ব্যয়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে কোনরূপ ফলপ্রসূ না হইলেও ভবিষ্যতে সামাজিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

৫। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়কে (১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয় (Expenditure by the Federal or Central Government), (২) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ব্যয় (Expenditure by the State or Provincial Government) ও (৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যয় (Local expenditure) ভাগে ভাগ করা হয়।

উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া—Effect of Public expenditure on Production.

অনেকের ধারণা যে, সরকারী ব্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরর্থক হয় এবং এই কারণে তাহারা সরকার কর্তৃক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সরকারী ব্যয়ই নিরর্থক হইতে পারে না, পরন্তু সু-পরিকল্পিত সরকারী ব্যয় নানাদিক দিয়া সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক বলিয়া

বিবেচিত হয়। ডাল্‌টনের মতে সরকারী ব্যয় নিম্নলিখিতভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে।

(ক) সরকারী ব্যয় লোকের কর্মক্ষমতা ও সঞ্চয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সরকার যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয় করে তখন লোকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও তাহারা বর্ধিত কর্মক্ষমতার দরুণ বর্ধিত আয় উপার্জন করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়।

(খ) সরকার যে সমস্ত ব্যয় দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে সেই সমস্ত ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের যে শুধু কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, তাহাদের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্যও সরকারী ব্যয়কে নিছক নিরর্থক ব্যয় বলা সমীচীন নহে। এই জাতীয় ব্যয় দ্বারা সরকার জনসাধারণের জীবন ও ধনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা স্থায়ী করিয়া জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নততর হইয়া দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(গ) সরকারী ব্যয় সু-পরিচালিত হইলে অনেকক্ষেত্রে দেশের বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। রাষ্ট্র অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া (granting bounties or subsidies) দেশে নানাবিধ শিল্পগঠনে সাহায্য করিতে পারে।

বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া—Effect of Public expenditure on Distribution.

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে অত্যধিক পরিমাণ ধনবৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা স্থায়ী করিবার জন্য ধনবৈষম্য হ্রাস করা একান্ত অপরিহার্য। রাষ্ট্র ইহার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থা দূর করিতে পারে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ধনীর নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া দরিদ্রের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের অনেক রাষ্ট্র বর্ধিতহারে আয়কর, মৃত্যুকর, উত্তরাধিকার-কর প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সংগৃহীত অর্থ বৃদ্ধবয়সের ভাতা, বেকার ভাতা প্রভৃতি প্রদান করিয়া দরিদ্রকে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ধনবৈষম্যের ফল কিয়ৎ

পরিমাণে দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যয় অনেক সময় আবার ধনী-দরিদ্র-নির্বিচারে সকলকে সমান সুবিধা প্রদান করে। রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ নির্মাণ এবং জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্র সকলকেই সমান সুবিধা প্রদান করে।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র যদি ধনিগণের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করিয়া দরিদ্রকে প্রদান করাকে ধনবৈষম্য দূর করিবার একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক অগ্রগতির পথ বহুলপরিমাণে রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়। ধনিগণকে যদি অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সঞ্চয়-পরিমাণ হ্রাস পাইলে উৎপাদনের উপর তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে, ধনোৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইয়া বণ্টনযোগ্য ধনের অভাব হয়। সুতরাং ধনিগণের নিকট হইতে করধার্য করিয়া অর্থ আহরণপূর্বক দরিদ্রকে প্রদান করিবার নীতি অবাধভাবে প্রযোজ্য নহে।

রাষ্ট্রীয় আয়—Public Income.

সরকারী আয় বলিতে সরকার করস্থাপন করিয়া এবং অন্য নানা উৎস হইতে যে আয় সংগ্রহ করে, তাহাকেই সরকারী আয় বলা হয়। সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হইল :

১। কর—Tax.

রাষ্ট্রের দ্বারা নাগরিকগণের সাধারণভাবে মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যাবলীর ব্যয় সংকুলানের জন্য অধিবাসিগণ ব্যক্তিগতভাবে বা মিলিতভাবে তাহাদের সম্পদের যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে প্রদান করে, তাহাকেই 'কর' বলা হয়। ("Taxes are general compulsory contributions of wealth levied upon persons, natural or corporate, to defray the expenses incurred in conferring a common benefit upon the residents of the State."—Plehn)

কর-সম্পর্কে উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে উহার দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে কর প্রদান করিতে

হয় অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই কর প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, কর প্রদান করিয়া করদাতা সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিদান দাবী করিতে পারে না। সরকার ব্যক্তিবিশেষকে সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে কর আদায় করে না; কর আদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনগণের সাধারণভাবে মঙ্গলসাধন করা। সুতরাং কর-ব্যবস্থার দ্বারা করদাতার ও সরকারের মধ্যে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ সমানুপাতিক আদান-প্রদান সূচিত হয় না। (No direct *quid pro quo* between the tax-payer and the public authority.)

কর ব্যতীত সরকারী আয়ের অন্যান্য উপাদান হইল—

২। খরচা—Fee.

ব্যক্তিবিশেষের জন্য সরকার বিশেষ কাজ করিয়া সেই কাজের মূল্যবাবদ যে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাকে 'ফি' বলা হয়। সরকার বিচারকার্য পরিবেশনের নিমিত্ত বিচারপ্রার্থী জনগণের নিকট হইতে খরচা আদায় করে। এই খরচাকে আদালত-খরচা (Court fee) বলে। দলিলপত্র আইনসংগতভাবে অনুমোদিত করিতে হইলে সরকারকে তাহার খরচা-বাবদ অর্থ প্রদান করিতে হয় (Registration fee)।

৩। মূল্য—Price.

ব্যক্তির ন্যায় সরকারও অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। অধুনা প্রায় সকল দেশেই রেল, ডাক ও তার বিভাগ সরকারী পরিচালনাধীন। এই সমস্ত উৎস হইতে যে আয় হয়, তাহাকে মূল্য বলা হয়।

৪। জরিমানা ও অর্থদণ্ড—Fine and Penalty.

বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অর্থদণ্ড দিতে হয়। অবশ্য ইহা সরকারী আয়ের একটি নগণ্য উৎসমাত্র।

৫। বিশেষ করস্থাপন—Special Assessment.

অনেক সময় সরকার-সম্পাদিত কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই বিশেষ সুবিধার মূল্য হিসাবে সরকার বিশেষ-সুবিধা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করে। এই

আয়কে বিশেষ কর বলা হয়। শহরাঞ্চলে সরকার কর্তৃক উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে জমি বা বাড়ীর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে জমির মালিক বা গৃহস্বামীর নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করা হয়। এই কর উন্নয়নজাত সুবিধার অনুপাতে ধার্য হয়।

৬। রাষ্ট্রীয় ঋণ—Public Loans.

অনেক সময় সরকার দেশ অথবা বিদেশ হইতে ধার গ্রহণ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করে।

সরকারী আয়ের উপরি-উক্ত উৎসগুলির মধ্যে করই হইল আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং ইহার বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

করধার্যের নীতি—Canons of Taxations.

সরকার কর্তৃক যে কর ধার্য হয়, তাহা সরকার খুসীমত ধার্য করিতে পারে না। কতকগুলি নীতি অনুসারে এই কর ধার্য করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী য়্যাডাম্ স্মিথ্ করধার্য করিবার কয়েকটি নীতির উল্লেখ করেন। বর্তমান যুগেও করধার্য-ব্যাপারে উক্ত নীতিগুলি অনুসৃত হইয়া থাকে। য়্যাডাম্ স্মিথ্-প্রদত্ত নীতিগুলি হইল :

১। সামর্থ্য বা সমতার নীতি—Canon of Ability or Equality.

সমতার নীতি অনুসারে বলা হয় যে, প্রত্যেক নাগরিক তাহার সামর্থ্যানুসারে সরকারকে কর প্রদান করিবে। রাষ্ট্র নাগরিকগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের যেরূপ আয় হয়, তাহাকে তদনুযায়ী কর দিতে হয়। এই নীতির দ্বারা য়্যাডাম্ স্মিথ্ ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, কর প্রদান করিতে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সকল নাগরিকেরই সেই ত্যাগস্বীকার যেন সমান হয়। য়্যাডাম্ স্মিথের এই নীতির সরলার্থ হইল যে, প্রত্যেকেই তাহার আয় অনুসারে কর প্রদান করিবে এবং এইজন্য তিনি তাঁহার পুস্তকের একস্থলে বলিয়াছেন যে, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর অধিক কর দিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি ক্রমবর্ধমান হারে কর (Progressive taxation) ধার্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

২। নিশ্চয়তার নীতি—Canon of Certainty.

এই নীতির অর্থ হইল যে, করদাতার দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সরকার খুসীমত কর আদায় করিতে পারিবে না। দেয় করের পরিমাণ, সময় ও প্রণালী করদাতাকে সঠিকভাবে জানাইতে হইবে।

৩। সুবিধার নীতি—Canon of Convenience.

এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, সরকার কর্তৃক কর এরূপভাবে আদায়ীকৃত হইবে যে, করদাতার কোন অসুবিধা না হয়। কর দিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাহাতে করদাতার কর প্রদান করিতে সুবিধা হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে করপ্রদান নীতি বা বৎসরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে করপ্রদান নীতি প্রবর্তিত হইলে করদাতার সর্বাপেক্ষা কম অসুবিধা হয়।

৪। ব্যয়-সংকোচের নীতি—Canon of Economy.

করধার্য-ব্যাপারে সরকারের দিক দিয়া এই নীতিটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। করধার্য করিবার উদ্দেশ্যই হইল ব্যয়-সংকুলান করিবার জন্য আয় করা। কিন্তু এই কর আদায় করিতে যদি অত্যধিক পরিমাণে ব্যয় হয়, তাহা হইলে আয়ের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে হ্রাস পায়। সুতরাং এরূপভাবে করধার্য করা উচিত যাহাতে আদায়ীকৃত কর-পরিমাণের বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের তহবিলে জমা হয়। যে কর আদায় করিতে অত্যধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে, সে কর বর্জন করা উচিত। এইজন্যই স্বল্প আয়ের উপর সরকার সাধারণতঃ আয়কর স্থাপন করে না। কারণ, স্বল্প আয় হইতে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইবে, আদায় করিবার খরচা হয়ত তদপেক্ষা অধিক হইতে পারে।

য়্যাডাম্ স্মিথ্-প্রদত্ত উপরি-উক্ত নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম নীতিটি অর্থাৎ সমতার নীতিটি করধার্য ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। করধার্যের নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই নীতিটি সবদিক দিয়াই সমর্থন যোগ্য। নিশ্চয়তা ও সুবিধার নীতি দুইটির তত্ত্বগত কোন তাৎপর্য না থাকিলেও কর-আহরণ-ব্যবস্থায় ইহাদের সমধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

চতুর্থ নীতিটি অর্থাৎ ব্যয়-সংকোচের নীতিটি বর্তমান যুগে সকল সরকার কর্তৃকই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কর-ব্যবস্থায় কর আদায় করিবার খরচা শুধু কম হইলেই যথেষ্ট নহে, কর এরূপভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে ভবিষ্যৎ আয়ের উৎসও রুদ্ধ না হয়।

য়্যাডাম্ স্মিথের পরবর্তী যুগের লেখকগণ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য আরও দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। নীতি দুইটি হইল:

৫। সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা নীতি—Canon of Elasticity.

আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যয় স্থিতিশীল নহে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যয় পরিবর্তনশীল। সুতরাং আয়ের প্রধান উৎস অর্থাৎ করসমূহ সংকোচ-প্রসারক্ষম হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি পাইলে যাহাতে অন্ততপক্ষে কয়েকটি করের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা সহজসাধ্য হয়, সেজন্য কর-ব্যবস্থায় এই নীতিটির প্রয়োগ অনুভূত হয়। প্রয়োজনক্ষেত্রে সরকার আয়কর, বিক্রয়কর প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। টাকা প্রতি একপয়সা কর বৃদ্ধি করিলে ব্যক্তির উপর গুরু করভার পতিত হয় না, অথচ সরকারের তহবিলে কোটি কোটি টাকা জমা হয়।

৬। উৎপাদনশীলতার নীতি—Canon of Productivity.

এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কর-ব্যবস্থা এরূপ হইবে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইতে পারে। এই নীতিটির তাৎপর্য হইল যে, সরকার বহুসংখ্যক কর স্থাপন করিয়া অধিক পরিমাণ কর আদায় করিবার চেষ্টা করিবার পরিবর্তে অল্পসংখ্যক কর স্থাপন করিয়া যাহাতে অধিক পরিমাণ কর আদায় হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি কর এরূপভাবে ধার্য হইবে যে, কর হইতে অধিক পরিমাণ আয় হয় অথচ ভবিষ্যৎ আয়ের পথ রুদ্ধ না হয়। সুতরাং কর ধার্য করিবার পূর্বে সরকারের পক্ষে করটির উৎপাদন-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর—Direct and Indirect Taxes.

প্রত্যক্ষ করের বৈশিষ্ট্য হইল যে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে এই কর আদায়

হয়, শেষ পর্যন্তও সেই একই ব্যক্তিকে এই করভার বহন করিতে হয়। করদাতা করভার দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপর চাপাইতে পারে না। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, করদাতা শেষ পর্যন্ত করভার অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে পারে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য বুঝিতে হইলে করের আপাত ভার (Impact) ও শেষ ভার (Incidence) সম্পর্কে ধারণা করিতে হইবে। যাহার নিকট হইতে কর আদায় হয় সে-ই করের আপাত ভার বহন করে। কিন্তু করের এই আপাত ভারবহনকারী অর্থাৎ করদাতা দ্রব্যটির মূল্যবৃদ্ধি করিয়া বা অন্ত উপায়ে সে যে পরিমাণ কর প্রদান করিয়াছে তাহা অপর লোকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে করদাতা করের আপাত ভার বহন করিলেও শেষ পর্যন্ত এই ভার অপর ব্যক্তির স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় (Shifting)। সুতরাং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই করের ভার (Incidence) বহন করিয়া থাকে। যে করের আপাত ভার ও শেষ ভার একই ব্যক্তি বহন করে, যেখানে করভার অপরের স্কন্ধে চাপান সম্ভব নহে, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়, যথা, আয়কর। আয়কর প্রদান করিয়া করদাতা এই কর অন্য কাহারও নিকট হইতে আদায় করিতে পারে না। সুতরাং করের আপাত ভার ও শেষ ভার তাহাকে বহন করিতে হয়। কিন্তু যে করভার করদাতা আপাততঃ বহন করিলেও শেষ পর্যন্ত অন্যের স্কন্ধে চাপাইতে পারে, তাহা হইল পরোক্ষ কর, যথা, আমোদ-প্রমোদ কর (Amusemeut tax), আমদানি শুল্ক (Import duties) ইত্যাদি। সরকার চিত্রগৃহের স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে আমোদ-কর আদায় করিয়া থাকে। স্বত্বাধিকারী প্রবেশমূল্য অর্থাৎ টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করে। সুতরাং এই করের আপাত ভার বহন করে চিত্রগৃহের স্বত্বাধিকারী, কিন্তু শেষ ভার বহন করে দর্শকগণ। এইজন্য এই করকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

প্রত্যক্ষ করের গুণ—Merits of Direct Taxes.

১। প্রত্যক্ষ করের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা সামর্থ্যানুযায়ী ধার্য করা যায়। সুতরাং এই কর ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। এই কর 'নিশ্চয়তা নীতি' অনুসারে ধার্য করা সম্ভব। করদাতাকে

কি পরিমাণ কর প্রদান করিতে হইবে তাহা সে পূর্বেই জানিতে পারে, কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে।

৩। প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ কর অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ এই করের হারের পরিবর্তন করিয়া সরকার অধিক পরিমাণ অর্থ আহরণ করিতে পারে।

৪। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা করভার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে। করদাতাগণ যদি করপ্রদান সম্বন্ধে সজাগ থাকে তাহা হইলে তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিকতর উৎসুক হয়।

অপগুণ—Demerits.

১। করধার্যের মূলনীতি হইল যে, রাষ্ট্রের অধিবাসীমাত্রই রাষ্ট্রকে কর প্রদান করিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর দ্বারা রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় করা সম্ভব নহে, কারণ ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

২। এই কর আদায় করিবার জন্য সরকার করদাতার অপ্রিয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ করভার বৃদ্ধি পাইলেই জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়।

৩। আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর স্থাপনের ফলে দেশে দুর্নীতি, মিথ্যাচার প্রভৃতি দোষের সৃষ্টি হয়। লোকে কর ফাঁকি দিবার জন্য নানাপ্রকার অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা নিরোধ করিতে হইলে সরকারের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

৪। উচ্চহারে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই করের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও ব্যাহত হয়।

৫। প্রত্যক্ষ কর-স্থাপনের ক্ষেত্রে যে প্রণালীতে করের হার নির্ধারিত হয়, তাহা সব সময়েই যে সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অনেকক্ষেত্রেই করের হার বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া ধার্য করা হয়।

পরোক্ষ করের গুণ—Merits of Indirect Taxes.

১। পরোক্ষ করের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর

নিকট হইতেই আদায় করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষেও এই কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নহে।

২। পরোক্ষ করের আর একটি সুবিধা হইল যে, করদাতা বুঝিতে পারে না যে, সে কর প্রদান করিতেছে, সুতরাং কর-প্রদানজনিত যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা করদাতা বুঝিতে পারে না। সেইজন্য শাসনকর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর অধিকতর পছন্দ করে। কারণ প্রত্যক্ষ করের ন্যায় পরোক্ষ কর সরকারকে জনগণের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলে না।

৩। পরোক্ষ কর অনেকক্ষেত্রে সমাজ-উন্নয়নের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। মাদকদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতির ভোগ-ব্যবহারের উপর করধার্য করিয়া সরকার এই সমস্ত অনিষ্টকর দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার হ্রাস করিতে পারে।

৪। করদাতার পক্ষে পরোক্ষ কর প্রদান করা অধিকতর সুবিধাজনক। একসংগে অধিক পরিমাণ কর প্রদান করিতে হয় না। ক্রেতা যে পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহাকে সেই অনুপাতে কর দিতে হয়।

অপগুণ—Demerits.

১। পরোক্ষ করের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা সামর্থ্যানুসারে ধার্য করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অনেকক্ষেত্রে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপর অধিক কর-ভার পতিত হয়।

২। পরোক্ষ কর আদায় করা সাধারণতঃ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

৩। কতিপয় বিশেষক্ষেত্র ব্যতীত পরোক্ষ কর হইতে আয়ের পরিমাণও পর্যাপ্ত নহে।

৪। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা করপ্রদান সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে না, সুতরাং ইহার দ্বারা নাগরিক চেতনার উন্মেষ হয় না।

আনুপাতিক হারে কর ও ক্রমবর্ধমান হারে কর—Proportional and Progressive Tax.

যখন আয়ের পরিমাণ-নির্বিচারে সকল আয়ের উপর সমান হারে করধার্য করা হয়, তখন এই করকে আনুপাতিক কর বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি শতকরা ৫৲ টাকা করধার্য করা হয় তাহা হইলে ১০০

টাকায় ৫৲ টাকা কর, ২০০৲ টাকায় ১০৲ টাকা, ৩০০৲ টাকায় ১৫৲ টাকা কর দিতে হয়। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেককে আয়ের অনুপাতে কর দিতে হয়। আয় অনুসারে প্রত্যেকের দেয় করপরিমাণ সমান না হইলেও প্রত্যেককে সমান হারে অর্থাৎ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কর দিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইল যে, সমান হারে করধার্য করা কি যুক্তিযুক্ত? এই ব্যবস্থার দ্বারা কি সামর্থ্য বা সাম্যনীতি অনুসৃত হয় বলা চলে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই ব্যবস্থায় সকলকেই সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ সমান হারে কর দিতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এ কথা সত্য নহে। যে ব্যক্তির আয় অধিক তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কম, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির আয় স্বল্প তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা অধিক। সুতরাং অধিক-আয়ের লোকের করদান ক্ষমতা স্বল্প আয়ের লোকের করদান ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক, এইজন্য স্বল্প ও অধিক আয়ের লোকদিগকে সমান হারে কর প্রদান করিতে হইলে স্বল্প-আয়ের লোকের অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং করভার অধিকপরিমাণে স্বল্প-আয়ের লোকের উপর পতিত হয়। সুতরাং সমান হারে করধার্য নীতি সামর্থ্য বা সমতা নীতিদ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে না।

করভার যাহাতে সামর্থ্য বা সমান ত্যাগস্বীকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এইজন্য প্রগতিশীল করস্থাপন করা হয়। প্রগতিশীল করের অর্থ হইল যে, আয়ের পরিমাণ বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে করের হারও বৃদ্ধি পায়। প্রায় সকল দেশেই আয়কর (Income-tax) এই নীতি অনুসারে ধার্য করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি ১০০৲ টাকা হইতে ১,০০০৲ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৪৲ টাকা করধার্য করা হয়, ১,০০১৲ হইতে ২,৫০০৲ পর্যন্ত শতকরা ৬৲ টাকা, ২,৫০১৲ হইতে ৪,০০০৲ পর্যন্ত শতকরা ৮৲ টাকা করধার্য হয় এবং এইরূপে আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি বর্ধিতহারে করবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান হারে কর বা প্রগতিশীল কর বলা হয়। অনেকে এই নীতিকেই ন্যায়সংগত নীতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এমন অনেক কর আছে যাহা এই নীতি অনুসারে ধার্য করা হয় না। বিক্রয়-করের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হয় না।

ক্রমবর্ধমান হারে করের পক্ষে যুক্তি—Arguments for progressive Taxation.

প্রগতিশীল করের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবতারণা করা হইয়া থাকে।

১। এই করের প্রধান সমর্থন হইল যে, ইহা করদাতার সামর্থ্যানুসারে ধার্য করা সম্ভব হয়। যেহেতু ধনিগণের করপ্রদান ক্ষমতা দরিদ্রের কর-প্রদান ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর, সেইহেতু দরিদ্র অপেক্ষা ধনীকে বর্ধিতহারে কর দিতে হয় এবং একমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারা কর-ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয়।

২। প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় সকল করদাতারই ত্যাগস্বীকার সমান হয়। ১,০০০৲ টাকা আয়ের লোকের নিকট এক টাকার যে উপযোগিতা, ১০০৲ টাকা আয়ের লোকের নিকট ১৲ টাকার উপযোগিতা তদপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং উভয়কেই যদি শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে কর প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে ১,০০০৲ টাকা আয়ের লোক অপেক্ষা ১০০৲ টাকা আয়ের লোকের ত্যাগস্বীকার অধিক হয়। সুতরাং ত্যাগস্বীকারে সাম্যনীতি প্রবর্তিত করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করা অপরিহার্য।

৩। ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করিবার পক্ষে হব্সন্ প্রদত্ত যুক্তি হইল যে, যাহারা অধিক পরিমাণ আয় করে তাহাদের আয়ের অধিক অংশ হইল অনুপার্জিত আয় অর্থাৎ তাহারা বিনা আয়াসে খাজনা, একচেটিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা অথবা শোষণ দ্বারা এই আয় প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, স্বল্প আয় পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করিতে হয়। সুতরাং অর্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়ের উপর করধার্য করিবার ক্ষেত্রে অনুপার্জিত আয়ের উপর বর্ধিতহারে করস্থাপন করা ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। ন্যূনতম গড় ত্যাগস্বীকারের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও পিগুর মতে প্রগতিশীল করই হইল যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন যে, যখন একজন দরিদ্র লোক কর প্রদান করে তখন তাহার ত্যাগস্বীকার সর্বাধিক হয়। কারণ, এই কর প্রদান না করিতে হইলে এই ব্যক্তি করের জন্য প্রদত্ত অর্থদ্বারা তাহার একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। সুতরাং কর প্রদান দ্বারা সে একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইল। অপরপক্ষে

ধনী যখন কর প্রদান করে তখন তাহার কোন ভোগ-বিরতি হয় না। সে উদ্বৃত্ত অর্থ হইতেই কর প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং দরিদ্র ব্যক্তিগণ কর প্রদান করিলে ভোগ-বিরতির দ্বারা সমাজের যে পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, ধনিগণ কর প্রদান করিলে গড়ে সমাজের তদপেক্ষা অনেক কম ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়।

৫। বেকার সমস্যা আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, ধনিগণ তাহাদের আয়ের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্র ধনীর নিকট হইতে করস্থাপনের মাধ্যমে এই উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া উন্নয়ন-মূলক কার্য দ্বারা দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে পারে।

৬। নৈতিক দিক দিয়াও প্রগতিশীল কর সমর্থনযোগ্য। ইহার দ্বারা যে শুধু ধনবৈষম্য দূরীভূত হয় তাহা নহে। সবলের কর্তব্য হইল দুর্বলকে সাহায্য করা। সুতরাং ধনীর অর্থ নির্ধনের সেবায় ব্যয় হওয়া ন্যায়সংগত।

ক্রমবর্ধমান হারে করের বিপক্ষে যুক্তি—Arugments against progressive Taxation.

১। ক্রমবর্ধমান হারে করস্থাপনের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বাজারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কালে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে মূল্যের কোনরূপ তারতম্য হয় না। সুতরাং করধার্য করিবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

২। করের হারবৃদ্ধি দ্বারাই যে ধনীর করপ্রদান ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হয় ইহা সর্বক্ষেত্রে সত্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করের হার সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া ধার্য করা হয়।

৩। প্রগতিশীল কর ধার্যের ফলে দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্য ব্যাহত হয়।

৪। প্রগতিশীল কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে করদাতৃগণ অনেক সময় অসাধু উপায় অবলম্বন করে। ইহাতে দেশের নৈতিক জীবনের মান খর্ব হয়।

প্রত্যাবর্তনশীল কর—Regressive Tax.

প্রগতিশীল করের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই করভার দরিদ্র অপেক্ষা ধনীকে

অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। বিপরীতভাবে প্রত্যাবর্তনশীল করের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই করভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয় অর্থাৎ স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকেরই এই কর অধিক পরিমাণে দিতে হয়। কাপড়, লবণ, দেশলাই প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর করধার্য হইলে ধনী, দরিদ্র সকলকেই প্রায় সমপরিমাণ ব্যবহার করিতে হয় এবং এই জন্য সমপরিমাণ কর দিতে হয়। সমপরিমাণ কর প্রদান করিলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের ত্যাগস্বীকার অধিক হয়।

স্বল্প-পরিমাণ বর্ধিতহারে কর—Degressive Tax.

আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত যে করের হার ধীরে ধীরে অর্থাৎ স্বল্প হারে বর্ধিত হয়, তাহাকে স্বল্প-পরিমাণ বর্ধিতহারে কর বলা হয়। এই কর প্রগতিশীল করের পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু পার্থক্য হইল যে, এই করের হার প্রগতিশীল করের হারের ন্যায় দ্রুতগতিতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইয়া ধীরে ধীরে স্বল্প পরিমাণে বর্ধিত হয়।

করধার্যের বিভিন্ন নীতি—Principles of Taxation.

রাষ্ট্র কি নীতি অনুসারে নাগরিকগণের নিকট হইতে কর আদায় করিবে, এ সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রধান প্রধান মতবাদগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

১। ন্যূনতম গড় ত্যাগস্বীকার নীতি—Principle of the Least Aggregate Sacrifice.

এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কর-ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে সমাজের গড় ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হয়। করস্থাপন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমাজের সর্বাধিক পরিমাণ সুবিধা করা। সুতরাং কর-ব্যবস্থার দ্বারা নাগরিকগণকে যাহাতে সর্বাপেক্ষা কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, একমাত্র সেই ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজের সর্বাধিক সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর উপর ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করা হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একটা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে ধনীর উপর ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়।

২। উপকার নীতি—Benefit Theory.

এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে পরিমাণ উপকার পাইয়া থাকে, নাগরিকগণকেও তদনুপাতে রাষ্ট্রকে কর দেওয়া উচিত। এই নীতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিকাংশ আয়ই সাধারণ মংগলবিধানের জন্য ব্যয়িত হয়, কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপকারের জন্য ব্যয়িত হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যকলাপ দ্বারা বিভিন্ন নাগরিক কি পরিমাণে উপকৃত হয় তাহা নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। ধনী অপেক্ষা দরিদ্রই রাষ্ট্রীয় ব্যয় দ্বারা অধিকতর উপকৃত হয় এবং এই নীতি অনুসারে করধার্য করা হইলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকেই অধিক পরিমাণ কর দিতে হয়।

৩। সেবামূলক কার্যের খরচা-নীতি—Cost of Service Principle.

এই নীতির সারমর্ম হইল যে, নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে সমস্ত সেবামূলক কার্য গ্রহণ করে, সেই সমুদয় সেবামূলক কার্যের খরচার অনুপাতে কর প্রদান করা উচিত। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে এই নীতি অনুসারে কর স্থাপন করা সম্ভব নহে। রেল, ডাক, তার, বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রদত্ত সেবামূলক কার্যের খরচার ভিত্তিতে করধার্য সম্ভব হইলেও দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষেত্রের খরচা অনুসারে করধার্য করা সম্ভব হয় না।

৪। সামর্থ্য নীতি—Ability to Pay Theory.

য়্যাডাম্ স্মিথ্ তাঁহার করধার্য নীতিগুলি আলোচনাকালে এই নীতিটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার সামর্থ্যানুসারে কর দিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে করধার্য হইলে সমাজের গড় ত্যাগস্বীকারও ন্যূনতম হয়। কর-ব্যবস্থায় এই নীতিটি ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যক্ষেত্রে এই নীতিটির প্রয়োগে অনেক-গুলি অসুবিধা দেখা যায়।

সাধারণতঃ, কর প্রদান করিবার সামর্থ্য তিনটি উপায়ে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, সম্পত্তির ভোগস্বত্বের ভিত্তিতে কর ধার্য করা যাইতে

পারে। যাহারা অধিক পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের নিকট হইতে অধিকহারে কর আদায় করা যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে চিকিৎসক, আইন-জীবী প্রভৃতি সম্পত্তির মালিক না হইয়াও অন্য উপায়ে প্রভূত পরিমাণ উপার্জন করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির মালিক অপেক্ষা এই সকল ব্যক্তির কর-প্রদান ক্ষমতা অধিকতর হইলেও ইহারা সম্পত্তির মালিক না হওয়ার দরুণ অনায়াসে কর ফাঁকি দিতে পারেন। সুতরাং সম্পত্তির মালিকানার দ্বারা কর-প্রদান ক্ষমতা নির্ধারণ করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারাও করপ্রদান ক্ষমতা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ব্যয়ের ভিত্তিতে করপ্রদান ক্ষমতা নির্ধারিত হইলে অনেক সময় কর-ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার সম্ভব হয় না। কারণ, স্বল্প-আয়ের লোককেও অনেক সময় পারিবারিক নানাকারণে অধিক-আয়ের লোক অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিতে হয়। এরূপক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা করধার্য হইলে দরিদ্রের উপর গুরু করভার পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, ও মুখ্যতঃ, বর্তমানে আয়ের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হয়। এই নীতিই বর্তমানে ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু আয়-ভিত্তিক কর-স্থাপন নীতিও সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিবিহীন নহে। কারণ, (ক) অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। (খ) সমান-আয়ের ব্যক্তিগণের দায়িত্ব-পালন জনিত ব্যয়ের পরিমাণ সমান নাও হইতে পারে। (গ) সমপরিমাণ আয় উপার্জন করিবার জন্য সমান পরিশ্রম বা সমান ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং আয়ের ভিত্তিতে কর ধার্য করিলে যে কর-ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার করা হয়, ইহা অবিসংবাদী সত্য নহে।

আয়-ভিত্তিক কর-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড ষ্ট্যাম্প নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(ক) ব্যক্তি যে নির্দিষ্টকালে (এক বৎসরে) উপার্জন করে সেই উপার্জন কালেই তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা উচিত। কারণ, পরবর্তী কালে ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে।

(খ) ব্যক্তির উপার্জন-পরিমাণ হইতে তাহার স্থায়ী মূলধনের অপচয় নিবারণের খরচ বাদ দিয়া কর ধার্য করা যুক্তিসংগত।

(গ) আয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ আয় ব্যক্তির স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ অথবা সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত—বিচার করিয়া করপ্রদান সামর্থ্য নির্ধারণ করা উচিত। অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে উপার্জিত আয় অপেক্ষা অধিক হারে কর ধার্য করা ন্যায়সংগত।

(ঘ) করদাতার পরিবারের পোষ্যসংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কর ধার্য করা উচিত। আয়করের ক্ষেত্রে অনেক দেশে বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তির স্বল্পতর আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়।

সুপরিচালিত কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Characteristics of a good tax System.

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সরকার অনুসৃত করধার্য নীতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থার উপর করধার্য নীতির প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং সরকার কর্তৃক এরূপভাবে করধার্য নীতি পরিচালিত হওয়া উচিত, যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি কোনরূপে ব্যাহত না হয়। এই উদ্দেশ্যে কর ধার্য করিবার কালে সরকার কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। এই নীতিগুলির, যথা, সামর্থ্য, নিশ্চয়তা, সুবিধা ব্যয়-সংকোচ, সংকোচ-প্রসারক ক্ষমতা, উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কর ধার্য করিলে কর-ব্যবস্থাকে সুপরিচালিত বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Direct and Indirect) উভয়বিধ করের অবস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা ধনী, নির্ধন সকলকেই রাজস্ব প্রদান করিতে হয় এবং কর-ব্যবস্থা সমগ্রভাবে উৎপাদনক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ, করভার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে এরূপভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যাহাতে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। চতুর্থতঃ, এরূপভাবে কর ধার্য করা উচিত যাহাতে সমাজের দিক দিয়া অত্যল্প ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন হয় এবং সরকারের দিক দিয়া কর আদায় করিবার খরচ ন্যূনতম হয়। সু-পরিচালিত কর-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ব্যবস্থায় ঐকিক কর (Single tax) স্থাপিত না হইয়া বহুবিধ কর (Plural tax) ধার্য হয়।

কর-প্রদান সামর্থ্য—Taxable Capacity.

একটি দেশের অধিবাসিগণ সরকারকে যে পরিমাণ কর প্রদান করিতে সক্ষম, তাহা দ্বারাই করপ্রদান সামর্থ্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এই করপ্রদান সামর্থ্য সঠিকভাবে পরিমাপ করা দুরূহ ব্যাপার, কারণ করপ্রদানের সামর্থ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, জাতীয় আয় হইতে স্থায়ী মূলধনের অপচয়-নিরোধের খরচ এবং জনসাধারণের কর্ম-ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার খরচ বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা দ্বারাই কর-প্রদান সামর্থ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, উপরি-উক্ত ঐ দুই জাতীয় খরচ কি ভিত্তিতে স্থির করা হইবে? যে ভিত্তিতেই করা হউক-না কেন এই উদ্বৃত্তের পরিমাপ সর্ব অবস্থায় অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে না। অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ এবং তৎসঙ্গে করপ্রদান সামর্থ্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

ডাঃ ডাল্‌টন্ দুই প্রকার করপ্রদান সামর্থ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, শর্তশূন্য বা অন্যনিরপেক্ষ (absolute) করপ্রদান সামর্থ্য ও আপেক্ষিক (relative) করপ্রদান সামর্থ্য। সমাজের উপর কোনরূপ অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিয়া যে পরিমাণ কর আদায় করা যায়, তাহাকে ডাল্‌টন্ শর্তশূন্য করপ্রদান সামর্থ্য বলিয়াছেন। আপেক্ষিক করপ্রদান সামর্থ্যের অর্থ হইল যে, সাধারণ ব্যয়খাতে দুই বা ততোধিক সংগঠন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার কি পরিমাণ করপ্রদানে সক্ষম।

করপ্রদান সামর্থ্য এত বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল যে, ইহার সঠিক পরিমাপ করা একরূপ অসাধ্য। যে সমস্ত অবস্থার উপর এই করপ্রদান সামর্থ্য নির্ভর করে, সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

প্রথমতঃ, করপ্রদান সামর্থ্য লোকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালীন অবস্থায় জাতীয় সরকারকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে লোকে অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই সময়ে লোকের করপ্রদান সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জনসংখ্যার উপরও করপ্রদান সামর্থ্য নির্ভর করে। জনসংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া সরকারী আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ধনবণ্টন ব্যবস্থার দ্বারাও করপ্রদান সামর্থ্য বহুল-পরিমাণে প্রভাবিত

হয়। দেশে ধনবৈষম্য না থাকিলে ধার্য করপরিমাণ হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইলে ধনিগণের উপর বর্ধিত হারে কর ধার্য করিয়া অধিক পরিমাণ কর আদায় করা সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, করপ্রদান সামর্থ্যের উপর সরকারী ব্যয়ের উদ্দেশ্যের প্রভাব অপরিসীম। সরকার যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ-ঘাট-নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে বা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য কর ধার্য করে, তাহা হইলে করদাতাগণ কর-প্রদানে অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়। কিন্তু অনুৎপাদক ব্যয়ের ক্ষেত্রে করদাতার করপ্রদান ইচ্ছা স্বভাবতই হ্রাস পায়। পঞ্চমতঃ, করস্থাপন পদ্ধতির উপরও করপ্রদান সামর্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। সরকার যদি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রভৃতি নানাজাতীয় কর ধার্য করে এবং করভার যদি সামর্থ্যানুসারে সমাজের সকল শ্রেণীর উপর বণ্টিত হয় তাহা হইলে করপরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর করস্থাপনের প্রতিক্রিয়া—Effects of taxation on Production.

ডাঃ ডাল্‌টন্ উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর করস্থাপনের প্রতিক্রিয়া তিন দিক দিয়া বিচার করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, কর্ম-ক্ষমতা ও সঞ্চয়-ক্ষমতার উপর (Effects on the ability to work and save) করস্থাপনের প্রতিক্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, যদি লোকের পারিশ্রমিক বা প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য হয় তাহা হইলে স্বভাবতই তাহার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। একমাত্র অতি দরিদ্র ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়াও একটা উদ্বৃত্ত আয় থাকে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর ধার্য হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই জন্য আয়কর নির্ধারণের একটা সর্বনিম্ন সীমা স্থির করা হয়, যাহাতে স্বল্প-আয়ের লোকের সঞ্চয়ে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

দ্বিতীয়তঃ, করভার অনেক সময়ে সঞ্চয়ের ও কাজ করিবার প্রবৃত্তি (Effects on the willingness to work and save) হ্রাস করে। লোকের অধিক আয় হইলে যদি আয়ের একটি অংশ করহিসাবে দিতে হয় তাহা হইলে লোকের কাজ করিবার উৎসাহ হ্রাস পায়। উপার্জন হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও হ্রাস পায়। সঞ্চয় ও কাজ করিবার প্রবৃত্তির উপর কর-

প্রবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অনেক ধনবিজ্ঞানী বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কর প্রদানের জন্য করদাতার আয় হ্রাস পাইলে করদাতা তাহার পূর্ব আয় বজায় রাখিবার জন্য অধিক যত্নবান হইবে। ফলে তাহার কর্ম-প্রেরণা বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের পোষ্যপরিজন পালন করিতে হয় এবং যাহারা ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় পাইবার উদ্দেশে বর্তমানে সঞ্চয় করে তাহাদের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত যুক্তি প্রযোজ্য হইলে সর্বক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য নহে। অনুপার্জিত আয় অথবা আকস্মিক আয়ের উপর কর ধার্য হইলে অবশ্য সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা কর্মোৎসাহ তাদৃশ হ্রাস পায় না। উত্তরাধিকার বা মৃত্যুকরের ক্ষেত্রেও বলা চলে যে, যে হেতু সম্পত্তির মালিকের জীবদ্দশায় এই কর প্রদান করিতে হয় না, সেই হেতু এই কর ধার্যের ফলে তাহার কর্মপ্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায় না।

তৃতীয়তঃ, করস্থাপনের ফলে অনেক সময় অর্থ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বা এক ব্যবসায় হইতে অন্য ব্যবসায়ে স্থানান্তরিত হয় (Effects on the distribution of capital)। এক স্থানে যদি উচ্চহারে কর ধার্য করা হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই সে স্থানের পুঁজিপতিরা অন্য স্থলে তাঁহাদের পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে যদি কোন বিশেষ শিল্পের উপর উচ্চহারে কর ধার্য হয়, তাহা হইতে শিল্পপতিগণ অধিক মুনাফা পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য শিল্পে তাঁহাদের মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারেন। কর-ব্যবস্থার দ্বারা মূলধনের এই গতিশীলতা অনেক সময় সামাজিক স্বার্থের অনুকূল হয়। মদ্য প্রস্তুতের উপর কর ধার্য করিলে মদ্যব্যবসায়ী যদি শর্করা-শিল্পে বা বয়ন-শিল্পে তাহার মূলধন স্থানান্তরিত করে, তাহা হইলে সমগ্রভাবে সমাজে কল্যাণ সাধিত হয়।

বণ্টন-ব্যবস্থার উপর করস্থাপনের প্রতিক্রিয়া—Effect of taxation on Distribution.

আধুনিক বহু ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে, কর-ব্যবস্থা সু-নিয়ন্ত্রিত করিয়া বর্তমান সমাজের ধনবৈষম্য হ্রাস করা যাইতে পারে। বিলাস দ্রব্যের উপর কর, মৃত্যুকর, প্রগতিশীল আয়কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া ধনিগণের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করিয়া দরিদ্রগণের উন্নতি-কল্পে ব্যয় করা যাইতে পারে।

কিন্তু সরকারের করধার্য নীতি যদি এরূপভাবে পরিচালিত হয়, যাহাতে করভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পরিমাণে পতিত হয়, তাহা হইলে ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে। করব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, ধনিগণের পক্ষে অধিক পরিমাণ কর দেয় হইলেও করধার্যের ফলে তাহাদের কর্মোৎসাহ বা সঞ্চয়ের ইচ্ছা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ঋণ—Public Debt.

ব্যক্তির ন্যায় সরকারও অনেক সময় তাহার ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। সরকার যদি নিজ নাগরিকগণের নিকট হইতে অথবা অপর দেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তখন সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণকে সরকারী ঋণ বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তির মতই সরকার ঋণ গ্রহণ করিলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ ও ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রীয় ঋণ—Private and Public debt.

প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত ঋণের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ঋণগ্রহণ ব্যাপারে ঋণ-গ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঋণ-দাতার উপর নির্ভর করিতে হয়। ঋণ প্রদান করিবার জন্য ঋণগ্রহীতা ঋণ-দাতাকে বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণকে ঋণ-প্রদানে বাধ্য করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাধ্যতামূলক কিন্তু সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক নহে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির পক্ষে তাহার জীবদ্দশায় ঋণ পরিশোধ করিতে হয় বা বিশেষ ক্ষেত্রে এই ঋণের ভার পুত্রের উপর পতিত হয়। রাষ্ট্র চিরন্তন প্রতিষ্ঠান —ইহার মৃত্যু নাই। সুতরাং রাষ্ট্র অতি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া সম্ভব নহে।

চতুর্থতঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের নিকট হইতে অথবা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে দেশবাসী অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ঋণ পাওয়া সম্ভব নহে।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র প্রয়োজনক্ষেত্রে কাগজীমুদ্রা প্রচলন করিয়া তাহার ব্যয়

নির্বাহ করিতে পারে কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এরূপ প্রচেষ্টার ফলে তাহার কারাবাস অবধারিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ—Classification of Public Debt.

রাষ্ট্রীয় ঋণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে, যথা—

১। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ—Internal and External Debts.

ঋণের উৎসের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ঋণ উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সরকার যখন দেশের লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তখন তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলা হয়। আবার, ঋণ যখন বিদেশ হইতে সংগৃহীত হয়, তখন তাহা বৈদেশিক ঋণ নামে অভিহিত হয়।

২। উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদনক্ষম বা মৃতভার ঋণ—Productive ,and uproductive or dead-weight Debts.

যে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি থাকে এবং ঋণের সুদ গচ্ছিত সম্পত্তির আয় হইতে প্রদান করা সম্ভব হয়, তাহাকে উৎপাদনক্ষম ঋণ বলা হয়। অপর পক্ষে অনুৎপাদনক্ষম ঋণের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি গচ্ছিত থাকে না এবং এই ঋণের সুদ সরকারের সাধারণ রাজস্ব তহবিল হইতে প্রদান করা হয়।

৩। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ—Unfunded or Floating and Founded Debts.

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংজ্ঞা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সমস্ত ঋণ অতি স্বল্পকালের মধ্যে পরিশোধ করা হয়, তাহাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলা হয়, যথা ট্রেজারি বিল। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ-সময়ের বহু পরে পরিশোধ করা হয়।

৪। ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক ঋণ—Voluntary and Forced Loans.

সরকার সাধারণতঃ জনসাধারণকে ধার দিতে বাধ্য করে না। জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত সরকারকে ধার দিয়া থাকে। কিন্তু কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে ঋণপ্রদানে বাধ্য করিতে পারে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতেছিল তাহাদের অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রদানের পরও যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত

তাহা সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইত। এই উদ্বৃত্ত অর্থ অবশ্য পরে মালিকগণকে প্রদান করা হইত।

৫। মৃতভার, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ঋণ—Dead-weight, Passive and Active Debts.

মিসেস্ হিক্স্ রাষ্ট্রীয় ঋণকে (ক) মৃতভার ঋণ (Dead-weight debt) (খ) নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive debt) ও (গ) সক্রিয় ঋণ (Active debt) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। মৃতভার ঋণ হইল অনুৎপাদনক্ষম ঋণ। ইহার দ্বারা কোন উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদিত হয় না। নিষ্ক্রিয় ঋণের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আর্থিক আয় পাওয়া যায় না কিন্তু ইহার দ্বারা পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার সেবামূলক কার্য পাওয়া যাইতে পারে। ঋণগ্রহণের অর্থ দ্বারা যদি চিকিৎসালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপিত হয় তাহা হইলে এই ঋণ গ্রহণের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। সক্রিয় ঋণ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনকার্যে সাহায্য করে এবং ইহার দ্বারা আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায়।

৬। প্রশাসনিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রীয় ঋণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ (Central loan), প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ (Provincial loan) এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ (Local loan) এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য—Objectives of Public Debt.

জনকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বহুপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সর্বক্ষেত্রে কর ধার্য করিয়া আহরণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই কার্যগুলি সম্পাদন করিতে হয়। কোন আকস্মিক বা অদৃষ্টপূর্ব বিপদ্‌কালে রাষ্ট্রের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা থাকে না। কারণ, কর ধার্য করিয়া ধার্য কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ। দেশে যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা হইলেও ঋণ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণপূর্বক সরকার মুদ্রাস্ফীতি অন্ততঃ আংশিকভাবে নিরোধ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত দেশে নানাবিধ গঠন ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে ব্যক্তির হস্তে যে অর্থ নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহা সরকারী

পরিচালনায় সক্রিয় হইয়া উৎপাদনক্ষম হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তির সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণের মতে সু-পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ঋণ-ব্যবস্থার দ্বারা বিনিয়োগ ও ভোগ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়।

সু-পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ঋণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইলেও সরকার কর্তৃক অবাধভাবে ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ঋণের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা না করিয়া সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা উচিত নহে। আভ্যন্তরীণ ঋণ সমর্থনযোগ্য হইলেও বিদেশী ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জন করা উচিত। কারণ এই ঋণ জাতীয় আয়ের একটি অংশ দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। সুতরাং ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দেশ দরিদ্রতর হয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া—Effects of Public Debt.

সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ তিন দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণের প্রতিক্রিয়া সর্বত্র সমান নহে।

১। উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া—Effects on production.

(ক) আভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে অর্থ শুধু হস্তান্তরিত হয়। রাষ্ট্র কর ধার্য করিয়া ঋণের আসল পরিমাণ ও সুদ প্রদান করে। ইহার ফলে সমাজের একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ অন্যশ্রেণীর হস্তে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য রাষ্ট্র অনেক সময় ঋণদাতাগণের উপরই কর ধার্য করিয়া আদায়ীকৃত কর দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ইহার ফলে সমাজের অন্য কোন শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় না। সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া বহুল পরিমাণে ঋণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।

সরকার যদি উন্নয়ন কার্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে করদাতার বর্ধিতহারে কর প্রদান করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনুৎপাদনক্ষম ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি

না পাইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এরূপক্ষেত্রে করভার বৃদ্ধি পাইলে সামাজিক স্বার্থ ব্যাহত হয় ও দেশ দরিদ্রতর হয়।

(খ) বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা অংশ আসল ঋণ-পরিমাণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান করিতে ব্যয়িত হয়। ফলে জাতীয় আয়-পরিমাণ হ্রাস পায়।

২। বণ্টনের উপর রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া—Effects on Distribution.

রাষ্ট্রীয় ঋণের অধিকাংশ পরিমাণই ধনিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ধার-করা অর্থ দ্বারা দরিদ্র অপেক্ষা ধনী অপেক্ষাকৃত অধিক উপকৃত হয়। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে কর স্থাপন করিয়া থাকে। ইহার ফলে ধনিগণ অধিকতর ধনবান ও দরিদ্রগণ দরিদ্রতর হওয়ায় সমাজে চরম ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যদি এই ধার-করা অর্থ বিত্তহীন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে ধনবৈষম্য কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে।

৩। মূল্যস্তরের উপর রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রতিক্রিয়া—Effects on price level.

সরকার যদি অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ব্যাংকগুলি এই সর্বাধিক নিরপত্তামূলক সরকারী ঋণপত্র গচ্ছিত রাখিয়া অধিক পরিমাণ ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এই ঋণ যদি উৎপাদন-কার্যে যথাযথভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে নানাবিধ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা সম্ভব হয়।

ঋণভারের পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পার্থক্য—Distinction between Internal and External debts from the point of view of their Burden.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকার আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজের উপর এই উভয়বিধ ঋণের ভার সমানভাবে পতিত হয় না। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঋণ পরিশোধ

করিবার উদ্দেশ্যে সরকার এক শ্রেণীর নিকট হইতে করস্থাপন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্য শ্রেণীকে প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান করে। ইহাতে সমগ্রভাবে সমাজের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার (Direct money burden) বহন করিতে হয় না। সরকার কর্তৃক ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ-পরিশোধের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হইল অর্থের হস্তান্তর। কিন্তু সরকার কর্তৃক এই অর্থ-হস্তান্তরের ফলে দেশের ধনবণ্টন-ব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কারণ ধনিগণই সাধারণতঃ সরকারকে ঋণ প্রদান করিতে সক্ষম, কিন্তু সরকার ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের উপর কর ধার্য করিয়া ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রকৃত ভার (Real burden of public debt) ধনী অপেক্ষা দরিদ্রগণকেই অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। ইহার ফলে দরিদ্রের অর্থ ধনীর নিকট হস্তান্তরিত হয়।

বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার ঋণপরিমাণের উপর নির্ভর করে। ঋণের পরিমাণ যত বেশী হইবে, আসল ও সুদ সহ সেই পরিমাণ অর্থ বিদেশে প্রদান করিতে হইবে। ইহার ফলে সমগ্র জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া সমাজের অর্থনৈতিক মঙ্গল-পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে ঋণের প্রকৃত ভার বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক ঋণের প্রকৃত ভারের তারতম্য আবার অনেক পরিমাণে ঋণ-পরিশোধ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক ঋণ যদি প্রধানতঃ ধনিগণের উপর কর স্থাপন করিয়া পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ঋণের প্রকৃত ভার হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে দরিদ্রগণের নিকট হইতেই যদি এই ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ঋণের প্রকৃত ভার বৃদ্ধি পায়।

ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি—Methods of Debt Repayment.

রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অথবা ঋণভার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যথা—

১। উদ্বৃত্ত আয়ের সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করা—Utilisation of Budget Surplus.

সরকারী রাজস্ব হইতে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে এই উদ্বৃত্ত

দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাবে কদাচিৎ উদ্বৃত্ত আয় দেখা যায় এবং যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাও ঋণ পরিশোধার্থে ব্যয়িত না হইয়া গঠনমূলক কার্য বা করভার হ্রাস করিবার জন্য ব্যয় করা হয়।

২। পরিবর্তন—Conversion.

এই উপায়ে সরকার সাধারণতঃ ঋণভার হ্রাস করিয়া থাকে। বাজারে যদি সুদের হার হ্রাস পায় তাহা হইলে সরকার উচ্চহারে সুদ দিবার অংগীকারে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল সেই ঋণের জন্য দেয় সুদের হার হ্রাস করিতে পারে। ঋণদাতা নিম্নহারে সুদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে সরকার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারে অথবা বর্তমানে নিম্নহারে ধার করিয়া অতীতের চড়াসুদে ধার-করা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

৩। ঋণ পরিশোধার্থে স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি—Sinking Fund.

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ঋণ এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাধারণ পদ্ধতিতে এই ঋণ পরিশোধ করা দুঃসাধ্য। এইজন্য ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রায় সকল দেশের সরকারই এক স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিয়াছে। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থির করিবার সময়ই ঋণ পরিশোধের জন্য রাজস্বের একটি অংশ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। বর্তমানে এই অর্থ আর জমা করিয়া রাখা হয় না। প্রতি বৎসরই এই অর্থ দ্বারা ঋণ কিয়ৎপরিমাণ শোধ করা হয়, ফলে আসল ঋণ-পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া দেয় সুদের পরিমাণও হ্রাস পায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে অনেক ক্ষেত্রে এই ঋণ-পরিশোধ তহবিলে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সাধারণ ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং এইজন্য এই পদ্ধতি ঋণ-পরিশোধের সন্তোষজনক উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

৪। ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার—Repudiation.

যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই পদ্ধতিটি ঋণ-পরিশোধের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোন সরকার যদি ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে এই জাতীয় সরকারের উপর জনসাধারণের ও অপর দেশের কোন আস্থা থাকে না। এই সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে ঋণ সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়। বিপ্লবের পরবর্তী কালে সোভিয়েত সরকার জার

সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণগুলি পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে। এইরূপ অস্বীকৃতির ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তিক্ত হয়।

৫। পুঁজির উপর কর ধার্য—Capital Levy.

প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সরকারের ঋণ-পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, স্বাভাবিক উপায়ে সেই বিরাট ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। এইজন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী আয়ের উপর কর স্থাপনের পরিবর্তে ব্যক্তির সমস্ত উৎস হইতে প্রাপ্ত মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ব্যক্তির একটা ন্যূনতম আয় নিষ্কর রাখিয়া তদতিরিক্ত আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর স্থাপন দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

পুঁজির উপর কর ধার্যের স্বপক্ষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা অতি সত্বর ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় এবং ইহার ফলে সমাজকে বহুদিন ধরিয়া সুদের ভার বহন করিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, যুদ্ধের সময় সাধারণ লোক ও শ্রমিক শ্রেণী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর পক্ষে ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অত্যধিক পরিমাণে লাভবান হয়। সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর উচ্চহারে সুদ ধার্য দ্বারা তাহাদিগকে অন্ততঃপক্ষে অর্থের দিক দিয়া কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্য করা যায়।

পুঁজির উপর কর ধার্যের প্রস্তাব যুক্তিসম্মত হইলেও এই ব্যবস্থাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অনেক অসুবিধা আছে। ধনী ব্যবসায়িগণ যুদ্ধের সময় আদৌ কোন ত্যাগস্বীকার করেন নাই এ যুক্তিও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থায় মূলধনের মালিক ও পেশাদারী অধিক আয়ের লোকের মধ্যে অবাঞ্ছিত পার্থক্য করা হয়। পেশাদারী লোকের আয় অধিক হইলেও মূলধনের মালিক নন বলিয়া তাহাকে কর প্রদান করিতে হয় না, অথচ সমপরিমাণ পুঁজির মালিককে কর প্রদান করিতে হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অবশ্যম্ভাবীরূপে হ্রাস পাইবে।

সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা—Justification for Public borrowing.

কর ধার্য করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে সরকার যে রাজস্ব আদায় করে, তাহা ব্যয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু অবাধভাবে ঋণ গ্রহণ করা সরকারের পক্ষেও যুক্তিযুক্ত নহে। যতদূরসম্ভব কর ধার্য করিয়া সরকারের পক্ষে ব্যয় সংকুলান করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সরকার যদি কর ধার্য করিবার শেষসীমায় উপনীত হয়, তাহা হইলে অবশ্য ঋণগ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ধনবিজ্ঞানিগণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ করিয়া আয় বৃদ্ধি করা সমর্থন করেন।

১। কোন অদৃষ্টপূর্ব কারণে যদি ব্যয়াধিক্য ঘটে, তাহা হইলে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ঘাটতি (Deficit) পূরণ সরকারের পক্ষে অপরিহার্য হয়। কারণ, কর ধার্য করিয়া অর্থসংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সরকারী ব্যয় যদি জরুরী-প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা জরুরী সমস্যার সমাধান করা যায়।

২। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি আপৎকালীন অবস্থায় যে অপরিমিত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অর্থ শুধুমাত্র কর ধার্য করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এরূপ বিশেষ অবস্থায়ও সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ সমর্থনযোগ্য।

৩। সরকার কর্তৃক গঠনমূলক কার্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করাও সমর্থনযোগ্য। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা উৎপাদনক্ষম ঋণ বলিয়া অভিহিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ যদি যথাযথভাবে উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণের সুদ ও আসল পরিমাণ ঋণ অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে সহজেই পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

৪। এতদ্ব্যতীত নাগরিকগণের সাধারণ মঙ্গল-বিধানার্থেও সরকার ঋণ করিতে পারে। নাগরিকগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্য নানাবিধ সাধারণ সুবিধার জন্য সরকার যে পরিমাণ ব্যয় করে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে ফলপ্রসূ না

হইলেও পরোক্ষভাবে নাগরিক জীবনের মান-উন্নয়নে সাহায্য করে। সুতরাং এরূপক্ষেত্রেও সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ সমর্থনযোগ্য।

যুদ্ধের ব্যয়—War Finance.

যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য লোকবল ও নানাজাতীয় দ্রব্যসম্ভার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনবল ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অর্থের উপরই নির্ভর করে। অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে প্রয়োজনীয় সৈন্য, রসদ ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে যে দুইটি প্রলয়ংকর সর্বনাশা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহার ব্যয়পরিমাণ কেবলমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রের সংখ্যা দ্বারাই পরিমাপ করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল যে, যুদ্ধ-পরিচালনার এই ব্যয় করধার্য দ্বারা সংকুলান হইবে অথবা ঋণগ্রহণ দ্বারা সংকুলান হইবে।

যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য কর ও ঋণের আপেক্ষিক সুবিধা—Relative advantages of Taxes and Loans as methods of War Finance.

অনেকের মতে একমাত্র করধার্য করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা উচিত, পক্ষান্তরে অনেকের মতে ঋণগ্রহণ দ্বারা যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

কর ধার্য করিয়া যাঁহারা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা তাঁহাদের নীতি সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়া থাকেন:—

১। কর ধার্য করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান করিলে যুদ্ধের ব্যয় যথাসম্ভব কম হয়, কারণ জনসাধারণের কর প্রদান করিবার সামর্থ্যেরও একটা সীমা আছে।

২। কর ধার্য করিয়া ব্যয় সংকুলান করিলে মুদ্রা-স্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি-জনিত নানা কুফল দ্বারা ব্যাহত হইতে পারে না।

৩। যদি ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করা হয়, তাহা হইলে এই করভার সাধারণতঃ ধনীর উপর পতিত হইয়া তাহার অমিত ও অপরিমিত ব্যয় নিরোধ করিবে। এই করস্থাপনের ফলে দরিদ্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল মুদ্রাস্ফীতি এবং তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকের প্রকৃত আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু কর ধার্য করিলে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। সরকার দ্বারা করধার্যের ফলে শুধুমাত্র অর্থ হস্তান্তরিত হয়, অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

৫। কর ধার্য দ্বারা যুদ্ধের ব্যয় সংগৃহীত হইলে ব্যক্তি ব্যয়-সংকোচ করিতে বাধ্য হয়।

৬। করধার্যের ফলে যুদ্ধজনিত ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া ও করভার যুদ্ধকালীন যুগের লোকদিগেরই বহন করিতে হয়। যাহারা যুদ্ধের জন্য দায়ী সেই বর্তমান বংশধরদিগেরই যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে হয়। যাহারা যুদ্ধের জন্য আদৌ দায়ী নহে, সেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের যুদ্ধের জন্য কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয় না। নৈতিক দিক দিয়াও এ যুক্তি সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু করধার্যের সমর্থনে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির সারবত্তা অস্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, শুধুমাত্র কর ধার্য করিয়া বর্তমান যুগের দীর্ঘ-স্থায়ী, যান্ত্রিক ও আণবিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা আদৌ সম্ভব নহে। অত্যধিক পরিমাণ করধার্যের ফলে দেশে মূলধন সঞ্চয়ের অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

এতদ্ব্যতীত অত্যধিক করধার্যের ফলে সরকার যুদ্ধ-পরিচালনা কার্যে জন-সাধারণের সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইতে পারে। কোন যুদ্ধরত জাতীয় সরকারই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য শুধুমাত্র করধার্য দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবও নহে এবং নীতি হিসাবেও ইহা যুক্তিসম্মত নহে।

ঋণ গ্রহণ দ্বারা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের সমর্থকগণ বলেন যে—

১। করধার্যের ফলে সরকারের জনগণের নিকট অপ্রিয় হইবার যেরূপ ভয় থাকে, ঋণগ্রহণের সে দোষ নাই।

২। জনসাধারণ জানে যে, সরকারকে ধার দেওয়া হইল সর্বাধিক নিরাপত্তামূলক বিনিয়োগ-পদ্ধতি। সুতরাং বিনিয়োগ-পরিমাণের নিরাপত্তার জন্যও নির্ধারিত হারে সুদ পাইবার উদ্দেশ্যেও জনসাধারণ তাহাদের ব্যয় সংকোচ করিয়া সরকারকে ঋণ প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না।

৩। করধার্যের ফলে সঞ্চয়ে বাধা সৃষ্টি হয়, ফলে মূলধনের অভাবে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হয়। সরকার ঋণ গ্রহণ করিবার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া মূল্যস্তর বৃদ্ধি করিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু মূল্যস্তর বর্ধিত হইলে লোকে আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক কর্মতৎপর হয়। এতদ্ব্যতীত ঋণদ্বারা প্রাপ্ত অর্থ সরকার নানা জাতীয় দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের জন্য ব্যয় করে। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় ও লোকের কর্মসংস্থান ঘটে।

যুদ্ধপরিচালনার জন্য করধার্য ও ঋণগ্রহণ এই উভয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে, যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকারের পক্ষে নিছক একটি মাত্র পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করা বর্তমান যুগে অপরিহার্য। তবে এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকারের পক্ষে ঋণগ্রহণ নীতিটি যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহের মুখ্য উপায় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া করধার্য নীতির সহায়ক নীতি হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর সমীচীন।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য আধুনিক সরকারগুলি কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিয়া ঘাটতি পূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিটি বিশেষ বিচার-বিবেচনা ও সতর্কতা সহকারে অবলম্বন করা উচিত।

বাজেট—Budget.

বিগত বৎসরের রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ও আগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের তথ্য-সম্বলিত বিবরণী বাজেট নামে অভিহিত হয়। ইহা সরকারী আয়-ব্যয়ের একটা লিখিত হিসাব। কোন্ কোন্ উৎস হইতে কত আয় হয়, কি পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় হয় এবং কোন্ কোন্ খাতে কত ব্যয় হয়, তাহা বিশদভাবে এই

হিসাবে স্থান পায়। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্মিগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সরকারের অর্থমন্ত্রী আয়-ব্যয়ের এই হিসাব প্রস্তুত করেন এবং আইনসভায় এই হিসাব উপস্থাপিত করেন। আইনসভায় অনুমোদন লাভ করিয়া এই হিসাব আইনসিদ্ধ হয় এবং বাজেট্-নির্ধারিত পদ্ধতির আয়-ব্যয় কার্যকরী হয়।

যদি কোন আর্থিক বৎসরে সরকারী আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় অর্থাৎ আয় অপেক্ষা যদি ব্যয় স্বল্প বা অধিক না হয়, তাহা হইলে এই সমান আয়-ব্যয়ের হিসাব (১) পূর্ণসমতা-প্রাপ্ত হিসাব (Balanced Budget) নামে অভিহিত হয়। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হয়, তাহা হইলে এই হিসাবকে (২) উদ্বৃত্ত হিসাব (Surplus Budget) বলা হয়। আর যদি আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য ঘটে, তাহা হইলে এই হিসাবকে (৩) ঘাটতি হিসাব (Deficit Budget) নামে অভিহিত করা হয়।

পূর্বতন ধনবিজ্ঞানিগণের মতে আয়-ব্যয়ের পূর্ণসমতা-প্রাপ্ত হিসাব প্রস্তুত করা সর্বোৎকৃষ্ট সরকারী রাজস্ব নীতি বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মত-প্রাধান্যের জন্য তাঁহারা সরকারী আয়-ব্যয়ের পরিমাণ যথা-সম্ভব সংকোচ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। করধার্য ব্যাপারে তাঁহারা সঞ্চয়-পরিমাণ অপেক্ষা ভোগ-ব্যবহারের উপর কর স্থাপনার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ঘাটতি হিসাবের ক্ষেত্রে তাঁহারা করধার্য অপেক্ষা সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ দ্বারা ঘাটতি পূরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। একমাত্র গঠনমূলক কার্যের জন্য সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ তাঁহারা সমর্থন করিতেন এবং এই ঋণভার যথাসম্ভব অপসারণের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিতেন।

বর্তমান যুগে উপরি-উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান আয়-ব্যয়ের পূর্ণসমতা-প্রাপ্ত হিসাবের উপর আর কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কেইন্‌স্-প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণের মতে বাৎসরিক হিসাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের সমতা ঘটাইলেই যথেষ্ট নহে, আয়-ব্যয়ের এই সমতা দীর্ঘমেয়াদে বাণিজ্যচক্রের গতি অনুসারে আনয়ন করা বাঞ্ছনীয়। কেইন্‌সের মতে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমগ্র সরকারী ও বে-সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ণ কর্মসংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এরূপ অবস্থায় সরকার যদি আয়ের সহিত ব্যয়ের সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয়সংকোচ

করে তাহা হইলে পূর্ণ কর্মসংস্থান দূরের কথা ব্যয়সংকোচের ফলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে। সুতরাং সরকারের পক্ষে আয়-ব্যয়ে সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ব্যয়সংকোচ না করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। সরকার এরূপভাবে ব্যয় বৃদ্ধি করিবে যাহাতে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়। সুতরাং সরকারের রাজস্বনীতি শুধুমাত্র আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এই নীতি এরূপভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই নীতি কার্যকরী হয়। মন্দার সময়ে সরকার ঘাটতি ব্যয় দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনর্গঠনে সাহায্য করিয়া কর্মসংস্থান করিবে। অপরপক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুসময়ে যে উদ্বৃত্ত হিসাব হইবে তাহা হইতে মন্দার সময়ের ঘাটতি-ব্যয় পূরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ সরকারী আয়-ব্যয়ের সমতা-প্রাপ্ত বাৎসরিক হিসাবের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার কর্তৃক এই ঘাটতি ব্যয় কর-ধার্য, ঋণগ্রহণ ও কাগজী মুদ্রা প্রচলন দ্বারা নির্বাহ করা যাইতে পারে।

ঘাটতি ব্যয়—Deficit Financing.

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা (Balancing of the Budget) করাই ছিল সরকারের রাজস্ব নীতি। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রায় সব দেশেরই সরকার বুঝিতে পারে যে, বাণিজ্য-চক্র প্রতিরোধ করিতে হইলে এই নীতি বর্জন করা প্রয়োজন। বাণিজ্য-চক্রের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয় তাহা দূর করিতে হইলে সরকারের পক্ষে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত উন্নতির (Revival) কোন সম্ভাবনা নাই। একমাত্র ঘাটতি-ব্যয়ের সাহায্যে বাণিজ্য চক্র জনিত বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাণিজ্য-চক্র জনিত বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও পরবর্তী কালে এই পদ্ধতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই পদ্ধতি সচরাচর

অবলম্বন করা হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের পুনর্গঠন করিবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রীয় সরকারই ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সেই ব্যয় সংকুলান করিয়া থাকে। সুতরাং ঘাটতি-ব্যয় বর্তমানে সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থার একটি সুপরিচিত নীতি বলিয়া ধরা হয়।

সরকার যদি তাহার চলতি আয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় করে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়। সরকারী আয়ের উৎস হইল কর, সরকার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আয় এবং ঋণ গ্রহণ। এই তিনটি উৎস হইতে প্রাপ্ত সমগ্র আয় অপেক্ষা যে পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় তাহা ঘাটতি-ব্যয় বলিয়া গণ্য হয়। এখন এই অতিরিক্ত ব্যয় সরকার দুই প্রকারে সংকুলান করিতে পারে। প্রথমতঃ, সরকার তাহার সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয় করিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ধার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্য নূতন নোট সৃষ্টি করিয়া এই ধার দেয়। সরকারী সঞ্চিত তহবিলের অর্থ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সরকার কর্তৃক বাজারে চালু হইলে এই উভয়ে মিলিয়া অর্থ পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

সরকারী সঞ্চিত তহবিল হইতে যে পরিমাণ অর্থ তুলিয়া চালু করা হইয়াছে ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে—এই উভয়ের সমষ্টি হইল একটি নির্দিষ্ট বৎসরের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ।

ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি—**Arguments for Deficit Financing.**

ঘাটতি-ব্যয়ের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে, এই নীতি অবলম্বন করিয়া সরকার বাণিজ্য-চক্র জনিত আর্থিক সংকট প্রতিরোধ করিতে পারে। লোকের কর্মসংস্থান দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই হইল সরকারী আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ঘাটতি-ব্যয় অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। কারণ সরকারের সাধারণ আয় এত পর্যাপ্ত নহে যাহার দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। একমাত্র ঘাটতি

ব্যয়ের সাহায্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, দেশের অব্যবহৃত সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রেও ঘাটতি ব্যয়ের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। কৃষি, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নতির উৎসগুলির যথাযথ ব্যবহার দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে স্বল্প আয়াসে ও স্বল্প খরচে সংকুলান করা সম্ভব।

ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি—Arguments against Deficit Financing.

ঘাটতি ব্যয় একবার আরম্ভ হইলে সাধারণতঃ ইহার আর পরিসমাপ্তি ঘটে না। সরকার প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক দেশের সরকার চেষ্টা করে যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়বৈষম্য হ্রাস পায়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের ফলে ধনিগণ অধিকতর ধনী হয় এবং দরিদ্র দরিদ্রতর হয়। সুতরাং আয়বৈষম্য হ্রাস হওয়া দূরের কথা, ঘাটতি ব্যয় আয়বৈষম্য বৃদ্ধি করে। পরিশেষে বলা যায় যে, সরকার ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে যদি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে না পারে তাহা হইলে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া শুধু দ্রব্যমূল্যই বৃদ্ধি পাইবে, লোকের প্রকৃত আয় ও নূতন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করিতে হইলে ইহার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নতি কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়—

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির আয়-ব্যয় পরিচালনা-নীতির উপর সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের আলোচনা ধনবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা হয়। যথা, (১) রাষ্ট্রীয় আয়, (২) রাষ্ট্রীয় ব্যয় (৩) রাষ্ট্রীয় ঋণ ও (৪) আয়-ব্যয় ও ঋণ-ব্যবস্থা পরিচালনা।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের পার্থক্য—

(১) ব্যক্তি আয় অনুসারে ব্যয় করে, রাষ্ট্র সাধারণতঃ ব্যয় নির্ধারণ করিয়া তদনুসারে আয় নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) সরকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—উভয়বিধ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বদেশে অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) ব্যক্তিগত ঋণগ্রহণের উদ্দেশ্য হইল তাহার নিজের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। রাষ্ট্র অনেক সময় ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৪) ব্যক্তির পক্ষে ব্যয়াধিক্য তাহার অবনতির কারণ হইলেও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যয়াধিক্য অনেক সময় সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উদ্দেশ্য—

রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় যথাসম্ভব সংকোচ করাই ছিল পূর্বতন মতবাদ। বর্তমানে এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ বলেন যে, সরকার এরূপভাবে ইহার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার কাহারও মতে পূর্ণ কর্মসংস্থানই সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়—ইহার শ্রেণী বিভাগ—

রাষ্ট্রীয় ব্যয় নানা ভাবে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, (১) দান ও ক্রয় মূল্য ; (২) সাধারণ শাসনখাতে ব্যয়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জন্য ব্যয়, ও মিশ্র ব্যয় ; (৩) আসল ব্যয় ও হস্তান্তরিত ব্যয় ; (৪) উৎপাদনক্ষম ব্যয়, অনুৎপাদনক্ষম ব্যয় ও সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যয় ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় আয়—

সরকার নানা উৎস হইতে কর আহরণ করিয়া থাকে, যথা, কর, খরচা, অর্থদণ্ড, মূল্য, ঋণ ইত্যাদি। ইহার মধ্যে করই হইল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। সাধারণ মঙ্গলবিধানার্থে সরকার নাগরিকগণের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে, তাহাকে কর বলা হয়। করের

বৈশিষ্ট্য হইল যে, কর সকলেই দিতে বাধ্য এবং ইহার জন্য কেহ সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রতিদান পাইতে পারে না।

করধার্যের নীতি—

য়্যাডাম্ স্মিথ্ কর্তৃক চারিটি নীতি উল্লেখিত হইয়াছিল, যথা, সমতা, নিশ্চয়তা, সুবিধা ও ব্যয়-সংকোচের নীতি। বর্তমান ধনবিজ্ঞানিগণ আরও দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, সংকোচ-প্রসারের ক্ষমতা নীতি ও উৎপাদনশীলতার নীতি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর—

যে করের আপাত ও শেষ ভার একই ব্যক্তি বহন করে অর্থাৎ করদাতা করভার এড়াইতে পারে না, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়, যথা, আয়কর। যে করের আপাত ভার একজনে বহন করে কিন্তু শেষ ভার অপরে বহন করে অর্থাৎ করদাতা অন্যের নিকট হইতে প্রদত্ত কর আদায় করিতে পারে, তাহাকে পরোক্ষ কর বলা হয়, যথা, প্রমোদ-কর। প্রত্যক্ষ করের সুবিধা হইল যে, এই কর কর-ধার্যের নীতি অনুযায়ী স্থাপন করা যায়। সামর্থ্যানুসারে এই করের হার পরিবর্তন করিয়া সরকারী আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ কর নাগরিকগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহা সকল শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় করা যায় না। এই কর ধার্যের ফলে সরকার অপ্রিয় হয়। এই করধার্যের ফলে সঞ্চয় হ্রাস পায় ও কর ফাঁকি দিবার জন্য লোকে অসাধু পন্থা অবলম্বন করে।

পরোক্ষ করের প্রধান সুবিধা হইল যে, সকল শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব এবং এই কর প্রদান সম্পর্কে লোকে অবহিত নহে, সে জন্য তাহারা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। পরোক্ষ কর প্রদান করা অধিকতর সুবিধাজনক এবং এই কর ধার্য করিয়া সরকার মাদক দ্রব্য প্রভৃতির ভোগ-ব্যবহার নিরোধ করিতে পারে। কিন্তু এই করের অসুবিধা হইল যে, ইহা সামর্থ্যানুসারে ধার্য করা যায় না। ইহা আদায় করিতে অনেক ব্যয় হয় এবং এই কর প্রদান দ্বারা নাগরিকগণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় না।

আনুপাতিক হারে কর ও ক্রমবর্ধমান হারে কর—

যখন সকল আয়ের উপর সমান হারে কর ধার্য হয় তখন তাহাকে

আনুপাতিক হারে কর বলা হয়। শতকরা ২৲ টাকা কর ধার্য হইলে ১০০৲ টাকায় ২৲ টাকা, ২০০৲ টাকায় ৪৲ টাকা, ৫০০৲ টাকায় ১০৲ টাকা কর দিতে হয়। কিন্তু আয়বৃদ্ধির সহিত যখন করের হারও বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে ক্রমবর্ধমান হারে কর বলা হয়, যথা, আয়কর।

করভার যাহাতে সামর্থ্য বা সমান ত্যাগস্বীকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

সু-পরিচালিত কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—

১। করধার্যের নীতিগুলি অনুসারে কর ধার্য করা উচিত।

২। কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ করের অবস্থিতি প্রয়োজন।

৩। কর-ব্যবস্থা উৎপাদনক্ষম ও সংকোচ-প্রসারক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। বিভিন্ন শ্রেণীর উপর করভার সমানভাবে পতিত হওয়া উচিত।

৫। সমাজের দিক দিয়া ন্যূনতম ত্যাগস্বীকার এবং রাষ্ট্রের দিক দিয়া আদায়-খরচাও ন্যূনতম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। কর-ব্যবস্থায় বহুবিধ কর থাকা আবশ্যক।

রাষ্ট্রীয় ঋণ—

ব্যক্তির ন্যায় সরকারও ব্যয়-সংকুলানের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় ঋণ নানা ভাবে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া থাকে, যথা,

(১) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ, (২) উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদনক্ষম ঋণ, (৩) স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, (৪) ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক ঋণ ইত্যাদি।

ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য—

সরকার নানা উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, যথা,

(১) আকস্মিক বা অদৃষ্টপূর্ব বিপদকালে (২) মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে, (৩) গঠনমূলক কার্যে ব্যয় নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

ঋণ-পরিশোধ পদ্ধতি—

(১) উদ্বৃত্ত আয়ের সাহায্যে, (২) পরিবর্তন, (৩) স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিয়া, (৪) পুঁজির উপর কর ধার্য করিয়া।

কখন ঋণ-গ্রহণ সমর্থনযোগ্য—

(১) অদৃষ্টপূর্ব কারণে ব্যয়াধিক্যের ক্ষেত্রে, (২) যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে, (৩) গঠনমূলক কার্যের জন্য, (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য।

যুদ্ধের ব্যয়—

আধুনিক কালে যুদ্ধের ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু মাত্র করধার্য করিয়া বা শুধুমাত্র ঋণ গ্রহণ দ্বারা এই অপরিমিত ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব নহে। করধার্য নীতি ও ঋণগ্রহণ নীতি এই উভয় নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যুদ্ধের ব্যয় প্রধানতঃ করধার্যের দ্বারা সংকুলান করা উচিত। কর-পরিমাণ এই ব্যয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে সহায়ক উপায় হিসাবে রাষ্ট্র ঋণগ্রহণ নীতি অবলম্বন করিতে পারে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিয়াও যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. What is Public Finance? Is there any essential difference between public and private finance?

Discuss the legitimate purposes for which public debt may be incurred. (C. U. 1943)

2. Discuss the main purposes for which loans and taxes should be used by the state (C. U. 1940)

3. Discuss the main considerations which usually underlie the system of taxation in a country. (C. U. 8941)

4. Examine ths advantages and disadvantages of raising revenue by indirect taxes. (C. U. 1944)

5. What are Public Debts? Discuss the ways in which their burden can be diminished. (C. U. 1951)

6. On what general factors does the incidence of a tax on a commodity depend? Illustrate your answer with suitable examples. (C. U. 1962)

7. What are Public Debts ? How do they affect our economic life ? (C. U. 1953)

8. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the government.

(C. U. B. Com. 1956)

9. Write short notes on any two of the following :—

(a) Incidence of a tax ; (b) Taxable capacity ; (c) Deficit financing. (C. U. 1956)

10. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation. (C. U. B. Com. 1955, '57)

11. "Taxes are the price we pay for the services of government." Critically examine this statement.

(C. U. B. Com. 1948)

12. On what general factors does the incidence of a tax on a commodity depend ? Illustrate your answer with suitable example. (C. U. 1962)

দশম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

(Economic Systems)

ব্যক্তিগত সম্পত্তি—Private property.

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে এক বা একাধিক ব্যক্তির কোন বাহ্য পদার্থের উপর একচেটিয়া অধিকার বুঝায়, যে অধিকারের বলে উক্ত পদার্থের মালিক বা মালিকগণ পদার্থটি হইতে উদ্ভূত সমুদয় সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হয়। ("Property is a right vested in a human being or a limited number of human beings for appropriation, for his or their benefit, the various advantages from the possession of a physical subject matter.") বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও ইহা খুব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নহে। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একচেটিয়া ভোগদখলের ধারণা জন্মিতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। মানুষ যখন শিকারীর জীবন যাপন করিত তখন দলবদ্ধভাবে শিকারকার্য পরিচালিত হইত এবং এই দলবদ্ধ পশুপক্ষী সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেও শিকারীর অস্ত্রশস্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীযুগে মানুষ যখন পশুপালন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার সংস্থান আরম্ভ করিল, তখন সে ক্রমশই তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পালিতপশুর উপযোগিতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইল। এই অবস্থায় মানুষের পালিতপশু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইল। কালক্রমে মানুষ যখন দলবদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করিয়া পারিবারিক সংগঠন সৃষ্টি করিল তখন সম্পত্তির সাধারণ ভোগদখলের ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া পারিবারিক সম্পত্তির ধারণা উদ্ভূত হইল।

মানুষ যখন কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা সংস্থানের উপায় আবিষ্কার করিল তখন হইতেই মানুষের মনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বদ্ধমূল হইল।

কৃষিকার্যের প্রথম যুগে সমগ্র সমাজ জমির মালিকানা-স্বত্বের অধিকারী হইলেও কালক্রমে পারিবারিক সংগঠন ও পরবর্তীযুগে ব্যক্তিই জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হইল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মালিক একচেটিয়াভাবে ইহার ভোগদখল করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তির মালিকের অবর্তমানে তাহার উত্তরাধিকারিগণের এই সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার জন্মে। তৃতীয়তঃ, সম্পত্তির মালিক তাহার ইচ্ছামত এই সম্পত্তি দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে। কিন্তু এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগদখল ও হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে যুক্তি—Arguments for Private Property.

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার অনুকূলে বহু যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্লেটো কর্তৃক বর্ণিত সাম্যবাদের সমালোচনা প্রসংগে অ্যারিষ্টট্‌ল্ ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বিলোপের বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। অ্যারিষ্টট্‌ল্ বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অতি প্রাচীন ও মানুষের বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি যদি মঙ্গল-বিধায়ক না হইত, তাহা হইলে এতদিনে ইহার বিলুপ্তি ঘটিত। এই প্রতিষ্ঠানটি সহসা বিনষ্ট করিলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল দেখা দিবে।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, লোকের যদি নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের উপর ভোগদখলের অধিকার না থাকে তাহা হইলে তাহার কর্মপ্রেরণা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ যখন পরার্থপরতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দান করে তখনও এই দানের কর্তৃত্ব সে নিজের আয়ত্তে রাখে এবং দান করিয়া সে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে তাহা তাহাকে নূতন কর্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত মালিকানার অবর্তমানে এই কর্মপ্রেরণার উৎস অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূলধন একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তিগত মালিকানার অভাবে সঞ্চয় সম্ভব নহে ও সঞ্চয়ের অবর্তমানে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের সহিত সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Private property.

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে অসম ধন-বণ্টন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভের ফলে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির মালিকগণ গুণ বা যোগ্যতা-নির্বিচারে এই সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের উন্নতির অন্তরায় ঘটায়। যোগ্য ব্যক্তিগণ সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। যেখানে ধনবণ্টন-ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক উপায়ে এইরূপ বৈষম্যের সৃষ্টি হয় সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজের বিত্তহীন শ্রেণী মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোকের ক্রীতদাসে পর্যবসিত হইয়াছে। ভূমি ও মূলধন প্রভৃতির একচেটিয়া মালিকগণ তাহাদের মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থের বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করে। এইরূপে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে দাসত্বে পরিণত করে। উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্য সামগ্রীগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার ফলে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ একশ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে সম্পত্তির মালিকগণ ধনবান হইতে অধিকতর ধনবান হইতে থাকে ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া কথিত হয়।

ধনতন্ত্রবাদ—Capitalism.

মানুষের সমাজব্যবস্থায় বিত্তশালী ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব আদিম কাল হইতে পরিদৃষ্ট হইলেও ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি আধুনিককালে যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় সে-অর্থে ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পূর্ববর্তী যুগে পাওয়া যায়

না। ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি বর্তমান যুগে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যে-ব্যবস্থাকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার সমুদয় ত্রুটির জন্য দায়ী করা হয়। সুতরাং বর্তমান ধনতন্ত্রবাদ শব্দটি তিরস্কারসূচক বা অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনীত হয়। ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প-গুলির পরিবর্তে বিরাট আকারে উৎপাদনের নিমিত্ত বহু মূলধনের প্রয়োজন। সাধারণ মজুরশ্রেণীর এই মূলধন না থাকার জন্য অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি তাঁহাদের মূলধনের সহায়তায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমিকদের শ্রম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে দাসত্বে পরিণত করিয়া কালক্রমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হইল, তাহাই সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত। অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, এই ক্ষমতার বলে তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া শাসনব্যবস্থায়ও তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ফলে সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর এই ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদর্শ হিসাবে ধনতন্ত্রবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্যক্তিগতলাভের জন্য স্বাধীনভাবে উৎপাদনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ওয়েবস্ ধনতন্ত্রবাদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধনতন্ত্রবাদ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে শিল্প ও অন্যান্য আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজীবী উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনমজুরে পরিণত হয় এবং তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা—ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত জমি-জায়গা ও কল-কারখানার মালিক ও অগণিত শ্রমিকের পরিচালক মুষ্টিমেয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও ভোগের সামগ্রীগুলি যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নহে, উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে ভূমি ও শিল্পের মালিকগণ ধনবান হইতে অধিকতর ধনবান হইতে থাকেন ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন —এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থসংঘর্ষের সূত্রপাত করে। এই ব্যবস্থায় যে-কোন ব্যক্তি যে-কোনও উৎপাদনকার্যে স্বাধীনভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে। যে-কোন লোক ব্যক্তিগতলাভের উদ্দেশ্যে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া নিজ সম্পত্তি পরিচালনা করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদক যেরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা করিবার অধিকারী, ভোগের ক্ষেত্রেও ক্রেতা বা ভোগকারীও সেইরূপ অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী। ক্রেতা তাহার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইয়া চাহিদা ও যোগানের সমতা আনয়ন করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হইয়া অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিরাট পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা উৎপাদনকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহ করে তাহারা সাধারণতঃ এই ঝুঁকি বহন করে কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে তাহারা অসমর্থ। সুতরাং বিরাট পরিমাণ উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার নিমিত্ত নূতন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদিগকে সংগঠক বা পরিচালক বলা হয়। সংগঠকেরা ঝুঁকি বহন করেন না বলিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহারা ভ্রান্ত নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেও

অনেক সময় শ্রেণী-স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত ইহারা একতাবদ্ধ হয়। এই একতার ফলে শ্রমিকসঙ্ঘ, ক্রেতাসঙ্ঘ ও নানাজাতীয় উৎপাদক-সঙ্ঘের আবির্ভাব হইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল—Merits of Capitalism.

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন, এই ব্যবস্থায় উৎপাদকেরা ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া পারস্পরিক অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য উৎপাদক টিকিয়া থাকে। ক্রেতাগণ স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় ক্রেতাগণ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। দ্রব্যক্রয়-ব্যাপারে ক্রেতার পূর্ণস্বাধীনতার ফলে উৎপাদকগণ ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার এই স্বাধীন ক্রয়বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদনকার্য বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে হয়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদনে কম অপচয় হয়।

চতুর্থতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তিগত মুনাফা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি, অযোগ্যতা, পক্ষপাতিত্ব বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি প্রশ্রয় পায় না। কি ধনতান্ত্রিক কি গণতান্ত্রিক সকল ব্যবস্থায়ই সমর্থ পরিচালকের প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যাহারা যোগ্যতম তাহারা টিকিয়া থাকে ও পুরস্কৃত হয়। যোগ্যব্যক্তির পুরস্কার লাভকে গণতন্ত্র-বিরোধী আদর্শ বলা সমীচীন নয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল—Evils of Capitalism.

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল, ইহাতে সমাজে ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। ফলে দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ধনীর ক্রীতদাসে

পর্যবসিত হয়। ধনবৈষম্যের ফলে সাধারণ লোক ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ পায় না। সমান সুযোগের অভাবে যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারায় দরিদ্র ব্যক্তির জীবনধারণোপযোগী জীবিকা অর্জনেও অন্তরায় ঘটে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার যে স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়, কার্যক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের দ্বারা ক্রেতার ক্রয়স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে উৎপাদকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চমূল্য নির্ধারণ করিয়া ক্রেতাকে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করে। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত মুনাফার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের অধিকাংশ লোকের যাহা প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত দ্রব্য সব সময়ে উৎপাদিত হয় না। যে সমস্ত দ্রব্য যেভাবে উৎপাদন করিলে উৎপাদকের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনকার্য ঠিক সেইভাবেই পরিচালিত হয়। ফলে উৎপাদনকার্যে নানাবিধ অপচয় ঘটে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকারসমস্যা, ব্যবসায়চক্র ও শ্রমিক-মালিক-বিরোধ আবির্ভূত হয়। ফলে সামাজিক শান্তি ও প্রগতি ব্যাহত হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমটি হইল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু অনেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন সমর্থন করেন না। দ্বিতীয়টি হইল, মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত না করিয়া কতকগুলি বিশেষক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রবর্তন ও প্রয়োজনমত অন্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন দ্বারা ধনবৈষম্য প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অনেক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমানহারে আয়কর ও মৃত্যুকর এবং অনিষ্টকর দ্রব্য-উৎপাদনের উপর কর ধার্য করিয়াছে। বেকারসমস্যা, ব্যবসায়চক্র ও শ্রমিক-মালিক-বিরোধ অবসানকল্পে অনেক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও চীনদেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ব্যতীত এখনও পর্যন্ত অন্য কোন গণ-অভ্যুত্থান হয় নাই। তথাপি এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ক্রমবর্ধমান

গণ-অসন্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছেন।

সমাজতন্ত্রবাদ—Socialism.

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানবজীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের অধিকাংশ লোক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ-সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী। অপরপক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থাবান, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। সুতরাং ব্যক্তির সর্ববিধ কল্যাণ-বিধান করাই হইল উভয় দলের উদ্দেশ্য। কিন্তু একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় দলের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রম সমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া ইহা একটি রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, প্রধানতঃ তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি-জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপাদনের প্রধান

উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে যে ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা দেয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা সর্বসাধারণের হিতার্থে তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য উৎপাদনের উপাদান-গুলির উপর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অবসান ঘটাইতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের উদ্দেশ্য পরিচালিত সম্পদ্-উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে সমাজে প্রবর্তিত আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত করিয়া সামাজিক প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া ধনবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য বর্তমানে যে অধিকাংশ লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার অবসান ঘটিবে। পরন্তু অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পরিবর্তে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাসমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে—ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য-হ্রাস-বৃদ্ধি, ব্যবসায়চক্র, বেকারসমস্যা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানা-পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনে অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থা আনীত হইবে। রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই এই মতবাদ অল্পবিস্তর পরিমাণে প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ—Different Forms of Socialism.

সমাজতন্ত্রবাদীরা একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমাজতন্ত্রবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

১। **কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ—Utopian Socialism.**

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি

হয় না। তিনি 'রিপাব্লিক' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। প্লেটো কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক বন্ধন-মুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। শাসকশ্রেণী যাহাতে আপন-পর ভেদবুদ্ধি-মুক্ত হইয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন সেজন্য প্লেটো তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহবন্ধন দ্বারা পরিবার-সংগঠন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ-সাধন করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দ্বারা পরবর্তী যুগের যে সমস্ত লেখক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে টমাস্ মূরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর তাঁহার 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মূরের পরবর্তী কালে ফরাসী লেখক সেণ্ট সাইমন, ইংরাজ লেখক রবার্ট ওয়েন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতাবর্জিত নিছক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া এই সমস্ত দার্শনিকদের কাহারও পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই।

২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ—Scientific or Marxian Socialism.

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ মুখ্যতঃ কার্ল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস্ 'দাস ক্যাপিটাল' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পরবর্তীযুগের সমাজতন্ত্রবাদীরা মার্কসীয় নীতি দ্বারা বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতঃ তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হইল, উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র (Theory of Surplus Value); দ্বিতীয়টি হইল, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) এবং তৃতীয়টি হইল, শ্রেণী-সংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class Struggle)।

মার্কসের মতে একটি সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে উহা উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করা হইয়াছে তাহার উপর। যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উৎপাদন-খরচা হয় অধিক এবং সেইজন্য তাহার বিনিময়মূল্যও হয় অধিক। অপরপক্ষে, স্বল্পপরিশ্রম

দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়মূল্য কম। সুতরাং মার্কসের মতে সামগ্রী-মূল্যের একমাত্র নির্ধারক হইল সামগ্রী-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু শ্রমিকেরা যে পরিমাণ মজুরি পায় তাহা তাহাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ একটি সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিময় হয় তদপেক্ষা শ্রমিকেরা কম হারে মজুরি পায়। সামগ্রীর বিনিময়-মূল্য, যাহা প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ—এই উভয়ের পার্থক্যকেই মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্য আখ্যা দিয়াছেন। উৎপাদিত সামগ্রীর এই উদ্বৃত্ত মূল্য অন্যায়ভাবে মালিকগণ আত্মসাৎ করিয়া শ্রমিকদের তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমান থাকার জন্য মালিকগণ উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি, যথা—বিভিন্ন কৃষিজাত ও খনিজ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব এবং এই উপাদানগুলি মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া শ্রমিকগণ মালিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মূল্যের সামান্য একটি অংশ মালিকগণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহারা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মার্কসের মতে মুনাফা আইনসিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেন না দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর। যাহারা এই শ্রম প্রয়োগ করে মালিকেরা তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রযুক্ত শ্রমের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করে। উৎপাদনের এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে নূতন আকারে এক নূতন দাসত্বপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করিয়া অধিকতর ধনবান্ হইতেছে ও শ্রমিকগণ ক্রমশই অধিকতর নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এরূপ অসম ব্যবস্থা সমাজ-জীবনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে সমাজ-জীবনে এক সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, যাহার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে এরূপ নজীর দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মার্কস্ ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মার্কস্ বলেন,-মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাহার অর্থনৈতিক জীবনের একটা প্রতিবিম্বমাত্র অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কাঠামো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসমাত্র। এই **শ্রেণী-সংগ্রাম (Class War)**-ই হইল মার্কস্-প্রদত্ত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি। মার্কস্ বলেন, প্রত্যেক দেশে যে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীভেদ ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রাচীন রোমে প্যাট্রিসীয়, প্লিবীয় ও ক্রীতদাসশ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে ভূম্যধিকারী, অভিজাত ব্যারনশ্রেণী ও ভূমিহীন কৃষিভৃত্যশ্রেণী দেখা যায়। বর্তমান যুগে মালিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। অতীত যুগে যেরূপ প্যাট্রিসীয় ও ব্যারনশ্রেণী সমাজের সমস্ত সুখসুবিধার অধিকারী ছিল, বর্তমানেও সেইরূপ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী আধিপত্য ভোগ করে। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক রূপ হইল ধনতান্ত্রিক; ফলে সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের কাঠামোও সেইরূপে গঠিত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ধনিক মালিক তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন সমাজের সকল শ্রেণীর মংগলের জন্য পরিচালিত না হইয়া মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধিকল্পে পরিচালিত হইতেছে। ফলে সমাজ-জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে অন্যায়, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এইরূপে যুগে যুগে শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। মার্কস্ আশাবাদী ছিলেন। তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থার মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ উপ্ত আছে। কালক্রমে বিত্তবান্ ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইবে তখন বিত্তহীনেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিত্তবানের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে চরম আঘাত হানিবে সেই আঘাতের ফলে ধনতন্ত্রের বিনাশ ঘটিবে। মার্কসীয় মতবাদ ও পরবর্তী কালে লেনিন-প্রদত্ত মার্কসীয় মতবাদের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় চিন্তাবীরই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাকে দুইটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল বিপ্লব যুগ (Revolutionary Stage)

এবং দ্বিতীয়টি হইল বিপ্লবোত্তর যুগ (Post-Revolutionary Stage)। বিপ্লব যুগে ধনিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই যুগে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকগণ ধনিকশ্রেণীর নিকট হইতে বলপূর্বক সমুদয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবে। এই অবস্থায় প্রকৃত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক হইবে। কাজ অনুসারে বেতন নির্ধারিত হইবে এবং নির্ধারিত বেতন অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিবার ফলে এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাহার পরিশ্রমলব্ধ আয় হইতে বঞ্চিত হইবে না। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা কোন শ্রেণী-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বজনের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। এই শ্রেণীহীন অবস্থাকে বিপ্লবোত্তর যুগ বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রত্যেকে সামর্থ্যানুসারে কাজ করিবে ও প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় অর্থের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা বিলুপ্ত হইবে। এইরূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লোপ পাইবে।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা—Criticism of Marxian Socialism.

মার্কসীয় মতবাদের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনাগুলির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ তাঁহার উদ্বৃত্ত-মূল্য-সূত্রের অসারতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন 'শ্রম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। কারণ এরূপ বিভিন্ন ধরণের শ্রম আছে যাহাদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া এক মাপকাঠিতে তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। যদি বলা হয় যে, সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শ্রমই হইল প্রকৃত শ্রম, তাহা হইলেও এই জাতীয় শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়, কারণ অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদার তীব্রতা না থাকিলে সে শ্রমের মূল্য অধিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণে যোগান বা সরবরাহের প্রভাব আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। দ্রব্যের সরবরাহ দ্রব্যটির সহজপ্রাপ্যতা অথবা দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্য যত

অধিক দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান্ তাহা যে অধিক শ্রম প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহা সকল সময়ে সত্য নহে। সুতরাং একটি দ্রব্যের সরবরাহ যে সমস্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, সেগুলিকে মার্কসীয় সূত্র সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য যে সম্পূর্ণরূপে দ্রব্য-উৎপাদনে প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিযোগিতার হ্রাস-বৃদ্ধি, মূলধন, সঞ্চয়ের পরিমাণ, উৎপাদনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি নানা বিষয় মূল্যনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

মার্কস-প্রবর্তিত ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা যে একমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। মানুষ শুধু তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীবন ধারণ করে না, আরও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মানুষ যুগে যুগে বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। মার্কস্ মানব-ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এই দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, ধর্মসংগঠনের অভ্যুত্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই বা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবার প্রয়োজনও নাই। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি দেখা যায় সে সমস্ত দোষ-ত্রুটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বহুল পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইয়াছে এবং অনেক দেশে নিছক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা নিছক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে প্রয়োজনানুরূপ মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তনে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি মার্কসীয় নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান্ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয় নাই।

মার্কসীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হইলেও এ কথা সত্য যে, মার্কস তাঁহার উদ্বৃত্তমূল্য-তত্ত্ব প্রচার দ্বারা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা তাহাদের অধিকার

প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করেন। মার্কসের ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। তথাপি এ কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনজনিত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের ইতিহাসের গতিকে অনেক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট করিয়াছে। শ্রমিকেরা যে মালিকগণ কর্তৃক পূর্বে শোষিত ও নির্যাতিত হইত এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ করিতে বর্তমানে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য।

মার্কসের পরবর্তী সমাজতন্ত্রবাদিগণ মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও টীকা করিয়াছেন। তাহার ফলে মার্কসীয় নীতি নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা প্রধানতঃ দুই জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে—যথা, বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Evolutionary Socialism) ও বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ (Revolutionary Socialism) বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত; অপরপক্ষে, বিপ্লবপন্থীদের অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদী, সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী বলা হয়।

৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Collectivism.

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ দাবী করেন। ইহারা বলপ্রয়োগ-নীতি পরিহার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। ইহাদের মতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে; অপরপক্ষে, বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী কোন শ্রেণী থাকিতে পারিবে না। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা আইনসভা-প্রধান গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিত্ত-হীন শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধন করিবার পক্ষপাতী।

৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—State Socialism.

জার্মাণ লেখকগণ সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মূলতঃ, উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ করিতে অক্ষম, সুতরাং

রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রকেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রধান রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করেন। এইজন্য তাঁহারা উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। বৃদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিক-জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি শ্রমিক-কল্যাণকর নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিয়া শ্রমিকের কল্যাণসাধন করা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন।

৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ—Fabian Socialism.

জর্জ বার্ণাড শ প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ মনস্বীর হস্তে সমাজতন্ত্রবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদীদের মত ইঁহারাও জবরদস্তিমূলক উপায় দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যপ্রচারের মধ্য দিয়া জনমতকে সুশিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অধিকতর সমীচীন। এইজন্য ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা নূতন এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই অভিযানের ফলে ইংলণ্ডের জনমত কিছু পরিমাণে ধনতন্ত্রবিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদীরা অবশ্য সাহিত্যের মারফৎ প্রচারকার্য ছাড়া সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদী কর্তৃক প্রবর্তিত অনেকগুলি নীতি কার্যকরী করিয়াছেন।

৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ—Christian Socialism.

খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থার প্রধান কারণ হইল প্রতিযোগিতা। তাই তাঁহারা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকদের মধ্যে সমবায়পদ্ধতিতে উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন।

৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism.

এই মতবাদ তিনটি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, শ্রমই হইল ধনোৎপাদনের একমাত্র উপাদান; দ্বিতীয়তঃ, কৃষি শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের

উপায়গুলির মালিকানার অধিকারী হইল শ্রমিকেরা ; তৃতীয়তঃ, এই মালিকানাস্বত্ব-লাভের জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি ধংসাত্মক কার্য ন্যায়সঙ্গত। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীরা শ্রমিকসঙ্ঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকসঙ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। ইঁহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ বিশ্বাসী নহেন, সেজন্য ইঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ সর্বাত্মক ধর্মঘট চালাইয়া রাষ্ট্রসংগঠনকে বিপর্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিয়া ইঁহারা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে একমাত্র শ্রমিকসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই মতবাদ ফরাসী দেশে প্রাধান্য লাভ করে।

৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Guild Socialism.

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারা রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় আদৌ আস্থাবান্ না হইলেও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদীদের মত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা সমাজস্থিত বিভিন্ন সংগঠনগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা উৎপাদন-ব্যবস্থায় জাতীয়করণ স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার অভাবের নিমিত্ত উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত সমিতিগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সংগঠিত সমিতিগুলি ছাড়াও ইঁহারা সমাজের অন্য নানাবিধ সমিতিগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন অর্থনৈতিক সমিতিগুলির এবং সামাজিক অন্যান্য সমিতিগুলির সহযোগিতায় মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মংগলসাধন সম্ভব হয়। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের হস্তে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তাঁহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বণ্টন করিয়া মিতিগুলির হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছুক। জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সমিতিগুলির কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

এইরূপে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

১। সাম্যবাদ—**Communism.**

সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের পরিকল্পিত নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপেক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলপুষ্ট করিবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সাম্যবাদী দল গঠন করিয়া ধীরে ধীরে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার পর তাঁহারা বলপ্রয়োগপূর্বক ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক প্রভৃতি বিত্তহীনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সাম্যবাদিগণ ধনিক ও মালিকশ্রেণীকে নির্মূল করিয়া সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহার ফলে এমন এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইবে, তাহাতে কি উৎপাদনে কি উপভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে, কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। মানুষের সমগ্র জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে তাহার নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবে ও রাষ্ট্রনির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট মান অনুসারে তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। সন্তানসন্ততিগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বেকারসমস্যা, ব্যবসায়চক্র বা শ্রমিক-মালিক-বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোনরূপ বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না। অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মানুষ আর মুনাফার লোভে ধনোৎপাদন করিবে না। এইরূপে সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা

থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্ট্রসংগঠন বিলীন হইবে।

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলেও সাম্যবাদিগণ অ-রাষ্ট্র-তন্ত্রীদের ন্যায় রাষ্ট্রকে অচিরাৎ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। সাম্যবাদিগণ মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রসংগঠনের শক্তির সাহায্যে সাম্যবাদী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে মানুষ যখন পূর্ণ-সমাজচেতনা-সম্পন্ন হইবে, তখন রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিলুপ্ত হইবে। মানুষ হিতাহিতজ্ঞান-সম্পন্ন হইলে বহির্নিয়ন্ত্রণের আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হইবে না। সমাজতন্ত্রবাদিগণ শুধু উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, কিন্তু সাম্যবাদিগণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-প্রবর্তনের উগ্রসমর্থক। সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন—উভয়েরই বিনাশ সাধন করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদেবতার বেদীমূলে উপহার দিবার পক্ষপাতী।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদ—Bolshevism or Communism in the U. S. S. R.

একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অভিব্যক্তি দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মার্কস্-প্রবর্তিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া মার্কস্ সমাজতন্ত্রবাদের যে অভিনব রূপ দিয়াছিলেন, রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ নির্বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া সাম্যবাদের গোড়াপত্তন করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ পূর্বতন সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়া এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁহারা বলপ্রয়োগে জারতন্ত্রের সহিত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী ও ধনিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া যে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা মানুষের আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কস্-প্রবর্তিত নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জমি-

জায়গা, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে কিছুদিন পর দেশের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গেল, কারণ কৃষকশ্রেণী তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য-উৎপাদনে বিরত থাকিল। ইহা ছাড়া নবগঠিত সরকার পূর্বতন সংগঠক ও কারিগরদের সহযোগিতালাভে বঞ্চিত হইল। বিদেশ হইতেও প্রয়োজনের অনুরূপ উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী আমদানী করিবার সম্ভাবনা রহিল না। ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের অনুসৃত-নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক নববিধান প্রবর্তন করিয়া একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন করিলেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রুশীয় সাম্যবাদের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীনে অতিকায় বহরে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য বৃহদায়তনের যৌথ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কৃষকদের আপত্তিসত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে নির্মমভাবে তাহাদিগকে জমি-জায়গা ও গৃহ-পালিত পশুপক্ষিসহ এই যৌথ-কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে বাধ্য করা হয়। এইরূপে পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা সাম্যবাদিগণ কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়া দেশকে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন। দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে বেকারসমস্যা, ব্যবসায়চক্র, শ্রমিক-মালিক-বিরোধ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য কুফলগুলি দূর হইয়া জাতীয় জীবনের মান অনেক পরিমাণে উন্নত হইল। বহুদিনব্যাপী অন্যায়, অত্যাচার, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে রুশজাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, সাম্যবাদিগণ রাষ্ট্রপ্রবর্তিত সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার করিয়া জাতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। শিক্ষাবিস্তারের ফলে জাতীয় জীবন যখন কুসংস্কারমুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সাবলীল হইল তখন সাম্যবাদিগণ এই নূতনভাবে অনুপ্রাণিত জনগণের সাহায্যে গঠনমূলককার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্যা, খেলাধূলা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এরূপ

অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিলেন যে, শত্রু-মিত্র সকলেই চমৎকৃত হইল। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সাম্যবাদিগণকে অনেক নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করিতে হইয়াছে। সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাহীন বিরোধী পক্ষকে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে অপসারিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক বিবেচিত হইলে যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সাম্যবাদিগণ জাতীয় জীবনে যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির পর সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবন যখন নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন জনসাধারণ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের মূলনীতির প্রতি আস্থাবান হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করিল। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করিতে প্রথমতঃ কৃষকগণ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উপযোগিতা যখন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল তখন তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইহাতে যোগদান করিল। এইরূপে একদিকে বলপ্রয়োগ ও অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সাম্যবাদিগণ জনসাধারণকে যে শুধু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা নয়, পরন্তু জনসাধারণের মধ্যে এক স্বাভাবিক সমাজচেতনা ও গভীর দেশাত্মবোধের উন্মেষ করিয়া সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব করিয়াছেন।

মার্কসের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও পরবর্তী কালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ বাস্তবক্ষেত্রে মার্কসের নীতিকে বহুল পরিমাণে বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পারিবারিক সংগঠনকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারেন নাই। বিনিময়ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন ধরণের পরিশ্রমের মজুরি নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা ও দক্ষতার দ্বারা। সাধারণ শ্রমিক জীবনধারণের উপযোগী একটা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইলেও পারিশ্রমিকের পার্থক্য সোভিয়েত রাষ্ট্র হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ে যোগ্যতানুসারে পারিশ্রমিকের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। দেশে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রবর্তিত হইয়া উৎপাদন যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হইয়া যখন জনগণের

মধ্যে ভেদাভেদ তিরোহিত হইবে, তখন আর পারিশ্রমিকের পার্থক্য থাকিবে না। প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি পাইবে। মজুরির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদী ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা সম্ভব নয় বা অনুপার্জিত আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরজীবী হিসাবে সমাজে কেহ বাস করিতে পারে না।

মার্কসীয় মতবাদ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে মার্কস্ জগতের সকল দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রুশীয় সাম্যবাদিগণ পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদনীতি-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র তাঁহাদের নিজ দেশে এই নীতি কার্যকরী করিতেছেন। স্ট্যালিন কাজের লোক ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ-প্রবর্তনের অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া মার্কসীয় নীতি পরিহার করেন। রুশীয় সাম্যবাদ বর্তমানে কার্যতঃ জাতীয়তা-বাদে পর্যবসিত হইয়াছে।

সাম্যবাদী ব্যবস্থা-প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রচলিত লোকধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকে যে শুধু সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ করিয়াছিলেন তাহা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ধর্মসংগঠন-গুলিকে ধ্বংসও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের বর্তমান নীতি হইল সহনশীলতা। জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মসংগঠনে যোগদান করিতে পারে বা ধর্মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারকার্য চালাইতে পারে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও বর্তমানে বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হইয়া গঠিত হইয়াছে। পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে অন্যান্য দেশগুলির সহিত নানাপ্রকারে আদান-প্রদান করিতেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিরূপে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সোভিয়েত নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিয়া-

ছিলেন তাহা তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বর্তমানে স্বদেশের হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

রুশীয় সাম্যবাদের মূল্য নির্ধারণ—Evaluation of Russian Communism.

রুশীয় সাম্যবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এত অধিক প্রচারকার্য হইয়া থাকে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রচারকার্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক,—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পর্যন্তও বিদেশী পর্যটকেরা অবাধে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইত না। বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারী বিধি-নিষেধ অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত দেশে পর্যটকের পক্ষে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া তাহার জ্ঞাতব্য বিষয়সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য একথা সত্য যে, সোভিয়েত সরকার তাঁহাদের পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বিদেশী গুপ্তচরদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ রহিত করিবার জন্যই এই গণতন্ত্রবিরোধী বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সোভিয়েত সাম্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুরক্ত ভক্তগণ সোভিয়েত দেশকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি যাহা কিছু মানবজীবনে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সব কিছুই সোভিয়েত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সাম্যবাদের উগ্র বিরুদ্ধবাদীরা সোভিয়েত দেশকে নরকের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সোভিয়েত দেশে বিভীষিকার রাজত্ব বর্তমান। সাম্য, মৈত্রী দূরের কথা, সেখানে মানুষের কোন বিষয়েই স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। এই উভয় মতবাদই অজ্ঞতা ও অশিক্ষাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই চরম সাধুবাদ বা নিন্দাবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও বর্তমানে সোভিয়েত দেশসম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত সাম্যবাদসম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

বহু ভাষাভাষী, বহু জাতিসমন্বিত সোভিয়েত দেশকে একটি উপ-মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল আয়তনের, বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত উপ-মহাদেশ একটিমাত্র রাজনৈতিক দল অর্থাৎ সাম্যবাদী দল দ্বারা শাসিত

হয়। এদেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না—জবরদস্তিমূলক উপায়ে অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া সাম্যবাদী দল তাঁহাদের একাধিপত্য অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। সাম্যবাদী নেতৃগণ তাঁহাদের নীতি সমর্থনের জন্য বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ধনিক ও মালিকশ্রেণী-পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকরাজের পরিবর্তে কার্যতঃ দলীয় অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সক্রিয়ভাবে সাম্যবাদী দলে যোগদান করিয়াছে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোককেই এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুষ্টিমেয় লোক সাম্যবাদী দল পরিচালনা করিয়া দলের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যতদিন স্ট্যালিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাম্যবাদী দল বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। আর সাম্যবাদীদলের নেতা স্ট্যালিন এই বিশাল জনসংখ্যার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে এক-নায়কত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেরূপ কঠোর ও নির্মম উপায়ে সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় সংহতি ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন তাহা মানবধর্ম-বিরোধী বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত হীন ও অমানুষিক পন্থা অবলম্বন করা কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই সমর্থনযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্মসংগঠন, সামাজিক নানাবিধ প্রথা ও আচারসম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা না করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের অনুসৃত নীতি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সমষ্টির অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়াছেন। ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া সমষ্টির উৎকর্ষসাধন কতদূর সম্ভবপর সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সাম্যবাদী কার্যক্রম একমাত্র চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ না করিলেও কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত নাই।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্যবাদি-

গণ তাঁহাদের অনুসৃত কার্যক্রম দ্বারা সমগ্র সোভিয়েত নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার-শাসনের সময়ে দেশে জনসংখ্যার শতকরা আশীজন লোক নিরক্ষর ছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না। সাম্যবাদিগণ ক্ষমতাগ্রহণের পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া নেহাৎ অসমর্থ বৃদ্ধ ব্যতীত সমগ্র জনসংখ্যাকে লিখন-পঠনপটু করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী এমন কোন ক্ষুদ্র জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদের নিজস্ব জাতীয় লিপি ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে সাম্যবাদিগণ বিজ্ঞান-বিষয়সমূহে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ও কার্যকরী বিষয়সমূহে সোভিয়েত নাগরিকগণের ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিদেশী শত্রুমনোভাবাপন্ন পর্যটকেরাও তাহার স্তুতিগান না করিয়া পারেন নাই। নানাপ্রকার দুষ্কার্যের নিমিত্ত শাস্তিপ্রাপ্ত অসাধু ব্যক্তিদের চরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাদের সু-নাগরিক করিবার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ পতিত মানব পুনর্জীবন লাভ করিয়া সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে সাম্যবাদিগণ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। পতিতাবৃত্তি নিরোধ করা সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সোভিয়েত রাষ্ট্রে স্ত্রীজাতি আজ পুরুষের সমানাধিকারের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সমস্যা-গুলি সোভিয়েত সরকার এরূপ নিপুণভাবে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সংখ্যালঘু জাতিগুলি আজ রাষ্ট্রের প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃতিগত জীবনের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে সোভিয়েত সরকার যে অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহুপরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ

হইয়াছেন। প্রাচুর্য না হইলেও জনসাধারণকে অনশনের ভয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের জীবনধারণোপযোগী জীবিকার একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রে আজ বেকার সমস্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সোভিয়েত সরকার অর্থনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্পের যৌথ পরিচালনাব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষক ও শ্রমিকগণ আত্মসচেতন হইয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বহুপরিমাণে সজাগ হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা যে ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব, সোভিয়েত দেশে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজচেতনা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিকগণের দেশাত্মবোধও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোভিয়েত সরকার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহার পিছনে মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী আছে—একথা অনস্বীকার্য। এই বিরাট সাফল্য অর্জনের জন্য যে কত নির্মম অত্যচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কত শত লোক জীবন দান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যায়, অত্যাচার ও রক্তপাতের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ভারত, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিকে যে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহাও সভ্যমানবের কার্যকলাপের নিদর্শন। হিরোসিমা ও নাগাসেকি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্ত্য জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসাত্মক কার্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসিগণের উপর পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত রুশ জাতির অত্যাচারের উদ্দেশ্যের তুলনা করিলে রুশ জাতিকে বোধ হয় বিশেষ হীন প্রতিপন্ন করা যায় না। রাশিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সুতরাং সমধর্মী।

চৈনিক সাম্যবাদ—Chinese Communism.

বর্তমানে একমাত্র মহাচীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর অত্যাচারে এই অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। রুশীয় সাম্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই মৃতকল্প জাতি নবজীবন লাভ করিয়া তাহার 'মহাচীন' নাম সার্থক করিতে চলিয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর পূর্বতন জাতীয় সরকারের উচ্ছেদসাধন করিয়া সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক প্রজাতন্ত্রী সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ফরমোজা ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত মূল ভূখণ্ডের সহিত মহাচীনের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে আজ সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রেট বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি একুশটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিতে মহাচীন সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই নবগঠিত সরকার এখনও পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

রুশীয় সাম্যবাদীদের মতই চীনের সাম্যবাদিগণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁহারা চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা তাঁহাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী-জাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। চৈনিক সাম্যবাদিগণ নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বনীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাই তাঁহারা শান্তিকামী জাতিগুলির সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। রুশীয় সাম্যবাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও মহাচীন তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে নাই। প্রধানতঃ, সাম্যবাদীদল কর্তৃক সরকার গঠিত হইলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয় নাই বা পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে একেবারে বিতাড়িত করা হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা দ্বারা সার্বজনীন উন্নতিসাধন করিতে চান।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Socialism.

সমাজতন্ত্রবাদিগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির

অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতের সারবত্তা প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী অধিকতর ধনশালী হয়, অপরপক্ষে শ্রমজীবীরা ক্রমশই দরিদ্রতর হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে দরিদ্রের স্বার্থ যথোচিতভাবে সংরক্ষিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা-প্রবর্তনের ফলে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের পরিবর্তে প্রয়োজনের অনুরূপ সহযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, প্রতিযোগিতা-মূলক বিজ্ঞাপন ও কমমূল্যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি ও অপচয় দূরীভূত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণের মত ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ন্যায়ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি-জায়গা, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ্‌গুলি ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত না হইয়া জনসাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হইবে। এই ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংরক্ষিত হইবে।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা বলেন মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একমাত্র সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারাই এই সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষসাধন অধিকতর সহজসাধ্য হয়।

পঞ্চমতঃ, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বিফল হইবে। মানুষ যদি ভয় ও অভাবমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। অন্যনিরপেক্ষভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে অভাব-মুক্ত করিয়া তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ সুগম করিয়া দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মানুষের সহজাত সমাজচেতনাকে দৃঢ়তর করে। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রসার লাভ করিয়া

উৎপাদনক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি হইল 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। সুতরাং ইহা একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলির কার্যক্রম লক্ষ্য করিলে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রমাণিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ক্রমশই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Socialism.

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয় তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি হইল যে, সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাষ্ট্র মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট একটি সামাজিক সংগঠনমাত্র। কোন মানবীয় প্রতিষ্ঠানই নির্ভুল বা ত্রুটিহীন হইতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান্ বিবেচনা করিয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিয়া রাষ্ট্র-মালিকানা প্রবর্তিত হইলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা অন্তর্হিত হইবে। মানুষ যদি ইচ্ছানুযায়ী কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া সেই পরিশ্রমলব্ধ ফল স্বাধীনভাবে উপভোগ করিতে না পারে তাহা হইলে সে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে না। ফলে, ব্যক্তিত্ববিকাশের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া পদে পদে রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইবার ফলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া নিয়মানুবর্তী সৈনিকজীবনে পরিণত হইবে।

চতুর্থতঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণ সাধারণ মানুষকে যতটা সমাজচেতনাসম্পন্ন ও পরার্থপর বলিয়া মনে করেন, কার্যতঃ তাহা নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেক লোকের যে পরিমাণ পরার্থপর হইতে হয়, সাধারণ মানুষের নিকট তাহা আশা করা দুরাশামাত্র। মানব-চরিত্রের

এই সহজাত স্বার্থবুদ্ধির আধিক্যহেতু রুশীয় সাম্যবাদিগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃপ্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহার আদৌ কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। এই মতবাদের দ্বারা কর্মবিমুখতা, অযোগ্যতা ও দারিদ্র্য প্রশ্রয় পায়। অপরপক্ষে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি সংকুচিত হয়।

ফ্যাসীবাদ—Fascism.

প্রথম বিশ্বমহাসমরের অব্যবহিত পরে ইতালী দেশে ফ্যাসিস্ট মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। ফ্যাসিস্ট মতবাদের প্রবর্তক ও ফ্যাসিস্টদলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা গিয়াছিল, সে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে তৎকালীন ইতালীয় গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় ও জনসাধারণ সরকারের ক্ষমতায় ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়ে। রুশ বিপ্লবের অনুকরণে ইতালীর কৃষক ও মজুরশ্রেণী জমি ও কল-কারখানা দখল করিতে আরম্ভ করে। ইতালী দেশ যখন ক্রমশঃ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন মুসোলিনী ইতালীয় জনসাধারণের নিকট এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ প্রগতিমূলক কর্মসূচী উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ফ্যাসিস্ট মতবাদে দীক্ষিত করিতে সাফল্যলাভ করেন। এইরূপে মুসোলিনীর প্রভাবে ইতালী সাম্যবাদনীতি গ্রহণ না করিয়া ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। এই সময়ে ইতালীতে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনী তাঁহার অল্পসংখ্যক অনুচরের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি ও বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতালীর নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

ফ্যাসীবাদ শব্দটি একটি রোমান শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই শব্দটির অর্থ হইল 'একসঙ্গে একখানি কুঠারসহ আবদ্ধ কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড'। ইহাই ছিল প্রাচীন রোমে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নিদর্শন। ইতালীয় ফ্যাসিস্টদলও এই প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করে।

ফ্যাসিস্ট মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হইতে অভিন্ন এক সর্বাত্মক সংগঠন। রাষ্ট্ররূপ সংগঠন হইল সর্বশক্তির আধার—ইহার বিনাশ নাই। ফ্যাসীবাদিগণ সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান-পতনে জাতীয় জীবনের গতি কোনক্রমে ব্যাহত হয় না। ফ্যাসীবাদীরা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। ফ্যাসীবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের শাসন, সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাহীন। তাঁহারা নেতৃত্বে বিশ্বাসী ও সেইজন্য ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের কাঠামো মুখ্যতঃ অভিজাততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী। ফ্যাসীবাদীরা গণ-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে জাতীয় স্বার্থের একমাত্র রক্ষক হইল রাষ্ট্র, আর এই রাষ্ট্র সর্বতোভাবে জনসাধারণকে পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালিত হইবে মুষ্টিমেয় যোগ্যব্যক্তির দ্বারা।

ফ্যাসীবাদিগণ শান্তিবাদের উগ্রবিরোধী। ফ্যাসীবাদের জন্মদাতা মুসোলিনীর মতে যুদ্ধ করা জাতীয় জীবনের একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। যুদ্ধ বর্জন করিলে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। ফ্যাসীবাদ সাম্যবাদেরও বিরোধী। ফ্যাসীবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বিশ্বাস করেন না বা একটিমাত্র দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, ইহাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ফ্যাসীবাদীরা বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া উভয় ব্যবস্থার সুবিধাগ্রহণের পক্ষপাতী। এইজন্য মুসোলিনী জমি-জায়গা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্তে আনয়ন না করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, তজ্জন্য কঠোর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ফলে, একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা ব্যাহত হয় নাই, অপর দিকে সেইরূপ শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইতে দেওয়া হয় নাই।

মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অতি অল্পকালের মধ্যে ইতালী অনেক প্রগতিমলক কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইতালী তাহার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের নানাদিকে নানা উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইলেও ফ্যাসীবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইতালীয় জনসাধারণ এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিতে সমষ্টির উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া একমাত্র পশুবলের উপর মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ফ্যাসীবাদ সম্পূর্ণরূপে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যেরূপ আকস্মিকভাবে ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল ততোধিক আকস্মিকভাবে এই নীতিজ্ঞান-বিরোধী মতবাদের অবসান ঘটিল।

নাৎসীবাদ—Nazism.

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানীর জাতীয় জীবনে যে দুঃখ, দৈন্য ও গ্লানি দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিবিধানকল্পে নাৎসীবাদের আবির্ভাব হয়। সুতরাং ইতালীয় ফ্যাসীবাদ ও জার্মানীর নাৎসীবাদ এবং এই উভয় মতবাদের জন্মদাতাদ্বয়ের মধ্যে যে একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। নাৎসীবাদ মূলতঃ ফ্যাসীবাদের সমধর্মী হইলেও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নাৎসীবাদের জন্মদাতা হের হিট্‌লার জার্মান জাতি যে বিশুদ্ধ আর্যবংশ-সমুদ্ভূত—ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নাৎসীবাদ অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ফ্যাসীবাদীদের মতই নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিকার বিস্তারের পক্ষপাতী। একদলীয় শাসন ও দলীয় নেতার হস্তে সর্বময়কর্তৃত্ব সমর্পণ, ইহাই হইল নাৎসীবাদের মূলমন্ত্র। নাৎসী রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক, সর্বক্ষমতার আধার নাৎসীনায়ক হইলেন জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। নাৎসীবাদ সব দিক দিয়াই ফ্যাসীবাদের অনুরূপ। নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদের মতই এই সত্য প্রমাণিত করিয়া গেল যে. নীতিজ্ঞান-বিরোধী কোন মতবাদই স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না।

গান্ধীবাদ—Gandhism.

গান্ধীবাদ ভারতে তথা সমগ্র জগতে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে। বহুপূর্ব হইতেই রাজনীতি, ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছিল। গান্ধীবাদ মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধিকে রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে মহত্তর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। গান্ধীবাদ মূলতঃ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা হইল অহিংসা। কি সামাজিক, কি অর্থ নৈতিক, কি রাজনৈতিক জীবনে মানুষ হিংসা দ্বারা কখনও তাহার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে গান্ধীবাদ এই অহিংসানীতির উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা-প্রবর্তনের পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র কখনও হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গান্ধীজীর মতে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যে তথাকথিত গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেগুলি ধনিকশ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র। এইরূপ অন্যায় ও হিংসাত্মক ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে জনসাধারণ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং গান্ধীবাদে ক্ষমতা-প্রয়োগের কোন স্থান নাই। এইজন্য গান্ধীজী সমাজকে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীদের মত গান্ধীবাদ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আস্থাহীন। তাই গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের স্বাধীন সমাজ-গঠনের পক্ষপাতী। গান্ধীজীর মতে কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। সাম্য ও মৈত্রীভাব মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনও স্থায়ী হয় না।

অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে গান্ধীবাদ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আধুনিককালে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে অতিকায় কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে মানুষ এই যন্ত্রদানবের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য গান্ধীজী যন্ত্রবিরোধী ছিলেন। যন্ত্রবিরোধিতা গান্ধীবাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও উৎপাদনকার্যে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজী

অস্বীকার করেন নাই। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মানুষের দৈহিক শ্রমের লাঘব করে এবং যেগুলি শ্রমিকগণ অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে, সেগুলির ব্যবহার গান্ধীবাদ অনুমোদন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি উৎপাদনের নিমিত্ত ইস্পাত ও লৌহশিল্পের বড় কারখানা থাকা প্রয়োজন। এই জাতীয় দু-চারটি বড় আকারের শিল্পসংগঠন গান্ধীজীর অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বড় আকারের কারখানাগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রয়োজনীয়তাও গান্ধীবাদ সমর্থন করে। •অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি দূর করিয়া এরূপ একটা সহজ ও সরল উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, যে ব্যবস্থায় যন্ত্র ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রের মালিক ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য যেন মানুষকে শুধু ভোগের উপকরণ উৎপাদনের উপাদানে পর্যবসিত করিতে না পারে। বড় বড় কল-কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত হয়, তাহাতে শিল্পী মজুরি পাইলেও সৃষ্টির আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় শিল্পী যন্ত্রের একটি ক্রীড়নক হইয়া উৎপাদনের একটি গৌণ উপাদানে পরিণত হয়, সেরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থা কখনও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই হইল উৎপাদনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে উৎপাদন-ব্যবস্থা ভোগের উপকরণ উৎপাদন করিবার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, গান্ধীবাদ কখনই তাহা সমর্থন করে না।

গান্ধীবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কি অর্থনৈতিকক্ষেত্রে কি রাজনৈতিকক্ষেত্রে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংস আদর্শ-বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থা গঠন করিতে গেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ শিল্প সংগঠনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। সুতরাং যন্ত্রসহযোগে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দূর করা যায়। এইরূপে গান্ধীবাদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মধ্য দিয়া চিন্তাধারার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে নূতন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইয়াছে। এ দেশের প্রধান সমস্যা হইল অর্থনৈতিক দুর্গতি। এই দুর্গতি দূর করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে গান্ধীবাদ কতটা সহায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্য দেশ দূরে থাকুক, এমন কি তাঁহার স্বদেশ ভারতও উৎপাদন-ব্যবস্থায় গান্ধীবাদ গ্রহণ করে নাই। যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত অধিক উৎপাদন সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনোৎপাদন না হইলে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়।

গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি কতটা সম্ভব তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

বাস্তবক্ষেত্রে গান্ধীবাদ কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী এই হিংসাকুটিল ও সতত স্বার্থসংঘাতে লিপ্ত মানব-সমাজে এক শান্তিময় জীবনযাত্রার বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। রণোন্মত্ত মানুষের কানে শান্তির সে বাণী না পৌছিতে পারে, কিন্তু মানুষ যে-দিন রণক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িবে, সেদিন গান্ধীবাদ—'মা হিংসীঃ'—একমাত্র সত্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমগ্র মানবজাতি হিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে। নতুবা সমগ্র মানব-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

সংক্ষিপ্তসার

সমাজতন্ত্রবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে। এই মত অনুসারে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভবপর। তাই সমাজতন্ত্রবাদিগণ সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁহারা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিকক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে বদ্ধপরিকর।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ—সমাজতন্ত্রবাদ অতীতে ও বর্তমানে নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়; যথা—১। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ; ২। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র-

বাদ; ৩। সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ; ৪। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ; ৫। ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রবাদ; ৬। খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ; ৭। অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ; ৮। সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও ৯। সাম্যবাদ।

আধুনিক যুগে সাম্যবাদ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীব্যাপী তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মতবাদ মার্কসীয় নীতি—'উদ্বৃত্ত মূল্য' সূত্র ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়ায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে রুশীয় সাম্যবাদিগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহাদের অনুসৃত সাম্যবাদী নীতি বহুলাংশে পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া পরবর্তীকালে সাম্যবাদিগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতীয় জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাশিয়ার অনুকরণে মহাচীনেও সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক-শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতা-মূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার অপচয় নিরোধ করিয়া সহযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে অর্থনৈতিক জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩। উৎপাদনের উপাদানগুলির জাতীয়করণের দ্বারা সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৫। অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

বিপক্ষে যুক্তি—১। রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন সম্ভবপর নয়, কারণ রাষ্ট্রও ভুল করিতে পারে। ২। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফা না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে। ৩। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারিবে না। ৪। অত্যধিক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ফলে সমাজে কর্মক্ষমতা লোপ পাইয়া কর্মবিমুখতা দেখা দিবে।

নূতন মতবাদ—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও কয়েকটি নূতন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে, যথা, ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ ও গান্ধীবাদ।

প্রশ্নাবলী

1. How far do you agree with the Materialistic conception of History as expounded by Karl Marx? Give reasons for your answer. (C. U. Hon. 1954)

2. Indicate the distinguishing features of the Communist experiment in Soviet Russia. Explain in what important respects it deviates from the Marxian Socialism. (C. U. 1948)

3. What is wrong with Capitalism? How would you propose to remove its defects? (C. U. 1951)

4. Bring out the distinction between Capitalism, Socialism and Communism. (C. U. 1955)

5. Write a short note on the Socialist programme. (C. U. 1946)

6. Describe the chief economic advantages of a socialistic economic system and discuss the economic problems faced by it. (C. U. 1962)

একাদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(Economic Planning)

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ অভ্যুত্থানের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়, তাহার মূলকথা হইল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—যে ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অবাধ প্রতিযোগিতা। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কোন স্থান নাই এবং এই ব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন যে, একমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজ সর্বাধিক পরিমাণ লাভবান হইতে পারে। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও ধনবিজ্ঞানিগণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারাই দেশের সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ মংগল সাধন করা সম্ভব এবং এইজন্য তাঁহারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল হইতে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে পূর্বতন ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আধুনিক কালে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতিকার সম্ভব নহে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নহে, এজন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে সমগ্র সমাজের হিতসাধন হয় এবং রাষ্ট্রই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে সমগ্রভাবে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অনুকূলে অধুনা যে শক্তিশালী মতবাদ প্রায় সর্বত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার অনেক কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফলে সমাজে অত্যধিক পরিমাণে ধনবৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ

ধন উৎপাদিত হইলেও বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লোকের দুর্গতি দূর করা সম্ভব হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোকের হস্তেই উৎপাদিত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া উৎপাদক শুধু ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করে। মুনাফা বৃদ্ধি করিবার জন্য মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য। কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকায় কোন উৎপাদকই যদৃচ্ছা মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে না। এইজন্য উৎপাদকগণ মিলিতভাবে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস করে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত নূতন-নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে মূল্য হ্রাস পাইতে পারে, একচেটিয়া ব্যবসায়িগণ সে-সমস্ত পদ্ধতিগুলির প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টি করিয়া ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফল হইল বাণিজ্যচক্র ও বেকার-সমস্যা। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন-কার্য অধিক দিন সমানভাবে চলে না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের চক্রবৎ এই ঊর্ধ্ব ও নিম্নাভিমুখী গতির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে সাধারণ লোকের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ, ভারত, চীন প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইলে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুদূর-পরাহত হইবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী সরকারের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা অতি স্বল্পকালের মধ্যে সে দেশের যে সর্বাত্মক উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। সাম্যবাদী শাসনের পূর্বে রুশ দেশ ভারত অপেক্ষাও দরিদ্রতর ও অধিক অনুন্নত দেশ ছিল। সাম্যবাদী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহাদের পরিকল্পনানুযায়ী অর্থ-নৈতিক কার্যক্রমের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে সোভিয়েত দেশ আজ জগতের কৃষি ও শিল্পে উন্নত দেশগুলির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং জাতীয় আয়ও অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু দেশ আজ সোভিয়েত দেশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া

রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সন্ধান খুঁজিতেছে। এমন কি ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-পরিচালিত দেশ-গুলিতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রকটিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা—Definition of Economic Planning.

রাষ্ট্রনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণপূর্বক অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নয়নের জন্য যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আধুনিক কালে বহু রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস পাইতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কতকগুলি সাধারণ মূলনীতি থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থার পার্থক্যের জন্য পরিকল্পনাগুলি বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ অনুযায়ী যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা রুশ দেশের পরিকল্পনা হইতে নানা দিক দিয়া পৃথক। কার্যক্রমের দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলেও পরিকল্পনার নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বত্র প্রায় সমান। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক সম্পদ সুনির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশে এরূপভাবে উৎপাদন-কার্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার ফলে এই সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। "Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced, and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole'"
—Dickenson.

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু—Contents of Economic Planning.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কতকগুলি মূলনীতি থাকে। মূলনীতিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। মূল উদ্দেশ্য নির্ণয়—Determination of the Objectives.

প্রত্যেক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথমেই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়, কারণ নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিকল্পনাটিকে রূপদান না করিতে পারিলে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ও সংস্কৃতিগত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং দেশের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা। অনেক সময় আবার পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপেক্ষা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যুদ্ধোত্তর কালে বহু দেশে যুদ্ধজনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলিই পরিকল্পনার সাহায্যে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিশেষ তৎপর হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশগুলিতে পরিকল্পনা কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

২। অগ্রাধিকার নির্ণয়—Determination of Priorities.

পরিকল্পনাগুলি সাধারণতঃ একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়। এই বহুমুখী উদ্দেশ্যের কোন্‌টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা প্রথমেই স্থির করা হয় এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনা-কার্য পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এইরূপ পরিকল্পনানুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যগুলির পূর্বাপর সম্পর্ক স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

৩। লক্ষ্য নির্ণয়—Determination of Targets.

প্রত্যেকটি পরিকল্পনার কার্য একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিবার সংকল্প লইয়াই আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ পরিকল্পনাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার জন্য চার বা পাঁচ বৎসর সময় নির্ধারিত হয়। প্রতি বৎসর পরিকল্পনার কার্য কতদূর অগ্রসর হইলে নির্ধারিত সময়ের শেষে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে তাহা সঠিকভাবে স্থির করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ থাকে এবং সমগ্রভাবে পরিকল্পনাটির সাফল্য এই বিভিন্ন অংশগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

৪। সংগতি নির্ণয়—Assessment of Resources.

যে-কোন উদ্দেশ্যই হউক না কেন একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু পরিকল্পনা শুধু প্রস্তুত করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য থাকা চাই। পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য দেশের যাবতীয় সংগতি সম্পর্কে একটি নির্ভুল ধারণা করা একান্ত অপরিহার্য। পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, অর্থবল, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রভৃতি অপরিহার্য সহায়ক উপাদানগুলির নির্ভুল তালিকা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অনুপাতে দেশের সংগতি যদি স্বল্প হয়, তাহা হইলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং সামর্থ্যানুসারে পরিকল্পনা-কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

৫। প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ণয়—Determination of Administrative work.

পরিকল্পনার সাফল্য বহুল পরিমাণে পরিকল্পনা-কার্যে নিযুক্ত কর্মিবৃন্দের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনাটিকে রূপদান করিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী দেশে পাওয়া সম্ভব কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যদি কোন গলদ থাকে, তাহা হইলে সংগতি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নির্ধারিত লক্ষ্য স্থলে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য কর্মদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বাধীনচেতা কর্মীর প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি—Arguments for Planning.

১। পরিকল্পনার পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হইলে দেশের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব নহে, কারণ ব্যক্তিগত পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করা।

২। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা রাষ্ট্রনির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদনক্ষম। এই ব্যবস্থায় সমগ্রভাবে সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

৩। সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ধনবৈষম্য, বেকার সমস্যা, বাণিজ্যচক্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় কুফল পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টার সাহায্যে সোভিয়েত দেশ বর্তমানে একটি অত্যুন্নত দেশে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে। আগামী কতিপয় বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতেও রাশিয়ার অনুরূপ উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

৪। একমাত্র পরিকল্পনার সাহায্যেই অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক তথা সমগ্রভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভবপর। ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগ যেখানে পর্যাপ্ত নহে, সে সমস্ত স্থলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন পরিকল্পনা ব্যতিরেকে সমগ্রভাবে সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব।

৫। পরিকল্পনার আর একটি বিশেষ সুবিধা হইল যে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও ইহার সাহায্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জরুরী উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন কার্যের জন্য পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ বলিয়া বিবেচিত হয়। যুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে হইলেও অনেক সময় পরিকল্পনার সাহায্য লওয়া হয়।

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করাই হইল মানুষের ধর্ম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষ যেরূপ

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, সমষ্টিগত জীবনেও এই স্বাভাবিক নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমষ্টিগত জীবনে যদি অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে সুনিয়ন্ত্রিত সমবেত প্রচেষ্টা প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পরিকল্পনার বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Planning.

১।• অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান যুক্তি হইল যে, ইহার দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালন-ক্ষমতা খর্ব হয়। উৎপাদক তাহার ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না এবং ক্রেতাও তাহার রুচি অনুযায়ী খোলা বাজারে বাঞ্ছিত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। কারণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমগ্রভাবে পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, এই ব্যবস্থায় শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্যক উন্নয়ন সম্ভব নহে, কারণ এই ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারিবর্গের হস্তেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত থাকে। সুতরাং শিল্প ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতার অভাবে অনেক সময় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটিতে পারে। যদি অযোগ্য লোকের হস্তে শিল্পায়নের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো বিকল হয়।

৩। পরিকল্পনার আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের নির্ধারিত নীতি বা সিদ্ধান্ত যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে সমগ্র সমাজের উপর পতিত হইয়া সমাজ জীবনে বিশৃংখলা আনয়ন করে; অপরপক্ষে ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

৪। এতদ্ব্যতীত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহা ব্যয়বহুল এবং পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ব্যয়-

সংকোচের দিকে যেরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের অনুপ্রেরণার অভাবে ব্যয়সংকোচের জন্য প্রায়শঃ অনুরূপ কোন প্রচেষ্টা হয় না। দীর্ঘসূত্রতাও পরিকল্পনার একটি গলদ, কারণ একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সভা দ্বারাই সব কিছু নির্ধারিত হয়।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পরিকল্পনার অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই অধিক। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের হিতসাধন করা সম্ভবপর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি দূর করিয়া অত্যধিক পরিমাণে ধনবৈষম্য নিরোধ করিতে এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ। সোভিয়েত দেশ মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও জার-শাসনের সময় হইতে ,বর্তমান পরিকল্পনার সাহায্যে সে দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা শত্রুমিত্র সকলেই স্বীকার করেন। তবে এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পরিকল্পনাটি এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে পরিকল্পনাটি সহজেই কার্যকরী করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনাটি যদি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থবল ও জনবলের অনুপাতে বৃহত্তর ও জটিলতর হয় তাহা হইলে সে পরিকল্পনা কার্যকরী করা দুঃসাধ্য হয়। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কর্মদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বদেশপ্রেমিক অজস্র কর্মী একান্ত অপরিহার্য। যাঁহারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একমাত্র তাঁহারাই জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মবলি দিতে সক্ষম।

জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ—Nationalisation.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মত অভ্যুত্থানের ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যে ধন-তান্ত্রিকতার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুদয় হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন বিনিময় ও বণ্টন-প্রণালীতে যে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে অর্থনৈতিক জীবনে বাণিজ্যচক্র, বেকার সমস্যা, শ্রমিক-মালিক-বিরোধ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি আবির্ভূত হইয়া অর্থনৈতিক জীবনকে

পংগু করিয়া দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা আনয়নের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমগ্র উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে উৎপাদনের যাবতীয় উপাদান সমগ্র জাতির সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত এবং ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত না হইয়া রাষ্ট্র-মালিকানায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এইরূপে জমি-জায়গা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের একচ্ছত্র মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক হিত সাধিত হইবে।

জাতীয়করণের সুবিধা—Advantages of Nationalisation.

১। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে মুনাফা অর্জন অপেক্ষা সামাজিক হিতের জন্যই রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

২। ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে মুনাফার সমগ্র পরিমাণ ব্যক্তিগত আয় স্ফীত করিয়া সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে, অপর পক্ষে রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় মুনাফা সর্বসাধারণের আয় বলিয়া পরিগণিত হয় এবং এই আয় সাধারণ হিতার্থে ব্যয়িত হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা ধনবৈষম্য হ্রাস পায়।

৩। ব্যক্তিগত পরিচালনা-ক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া উৎপাদক শুধুমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে যাহাতে তাহার মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থায় ক্রেতা তাহার প্রয়োজনমত দ্রব্য না পাইতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্র সমাজের সমগ্র প্রয়োজন-পরিমাণ ও প্রয়োজনের তীব্রতা বিচার করিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন দ্বারা অধিকতর দক্ষতার সহিত বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে পারে।

৪। রাষ্ট্র-মালিকানায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব, স্বজন-বাৎসল্য প্রভৃতি যে সমস্ত দুর্নীতি দেখা যায় রাষ্ট্র-মালিকানায় সেই সমস্ত দুর্নীতি দূরীভূত

হইতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমষ্টিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কর্মিবৃন্দ দাসমনোবৃত্তি-বিমুক্ত হইয়া অধিকতর স্বাধীনভাবে ও খুসীমনে তাহাদের নির্ধারিত কর্তব্য-সম্পাদনে সক্ষম হয়। সুতরাং জাতীয়করণের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫। এই ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা দেখা যায় তাহা দূর করা সম্ভব হয়। অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জাতীয়করণ ব্যবস্থার দ্বারা এই অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা দূর করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার নানাবিধ অপচয় নিরোধপূর্বক উৎপাদন-খরচা হ্রাস করা সম্ভব হয়। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া সর্বসাধারণের ভোগবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অসুবিধা—Disadvantages.

১। রাষ্ট্রপরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের অনুপ্রেরণার অভাবে উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপক যেরূপ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে, বেতনভুক ব্যবস্থাপকের নিকট সেরূপ নিষ্ঠা ও দক্ষতা আশা করা যায় না।

২। দীর্ঘসূত্রতা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সরকারী কর্মচারিগণ ঝুঁকি গ্রহণ অপেক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। এই অত্যধিক সতর্কতা গ্রহণের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩। সরকারী পরিচালনাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, এই ব্যবস্থায় সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যকলাপ দলীয় রাজনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। দলীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, যাহাতে সমষ্টির স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪। সরকারী পরিচালনাধীন উৎপাদন-ব্যবস্থার আরও একটি ত্রুটি হইল

যে, এই ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর ভোট পাইবার উদ্দেশ্যে সরকার শ্রমিক সংঘগুলিকে অত্যধিক পরিমাণে প্রশ্রয় দান করে। শ্রমিক সংঘগুলি সরকারের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া যুগপৎ তাহাদের কার্যকালের সময় হ্রাস করে ও মজুরির হ্রাস বৃদ্ধি করে। ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

জাতীয়করণের সুবিধা-অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতীয়করণ নীতি অনেক দিক দিয়া জাতীয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়ক হইলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে এই নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ করা সমীচীন নহে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং মূল শিল্পগুলির ও জনহিতকর শিল্পগুলির ক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি অনুসরণ সমর্থনযোগ্য হইলেও অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি দেশের শিল্পোন্নতির কতদূর সহায়ক তাহা বিচার্য বিষয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী কুফল আছে—ইহা অনস্বীকার্য। উগ্র সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকগণের মতে একমাত্র জাতীয়করণ নীতির দ্বারাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমুদয় কুফল দূর করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভবপর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুফল প্রদান করিতে পারে না। এইজন্য বর্তমানে বহু সমাজ-বিজ্ঞানী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—এই উভয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা বর্জন না করিয়া এই উভয় ব্যবস্থার সমন্বয়ে এক মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্যচক্র, বেকার সমস্যা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি দূর করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য সৃষ্টি করিবার পক্ষে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বর্তমান যুগে পরিগণিত হয়। বিশেষ করিয়া বিপ্লবোত্তর যুগে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ফলে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনে সোভিয়েত দেশে যে অভাবনীয় উন্নতি

সাধিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহুদেশ আজ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার দ্বারা অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়াস পাইতেছে। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের যাবতীয় সম্পদ সুনির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র-নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশে এরূপভাবে উৎপাদন-কার্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার ফলে এই সুনির্ধারিত উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সর্বাধিক সংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্বে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্বল নির্ণয় করা প্রয়োজন।

জাতীয়করণ—

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সমর্থন করেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন হয়। ফলে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What do you mean by Economic Planning? "While planning eliminates the evils of capitalism, at the same time it destroys its advantages too." Do you agree? Give your reasons.

2. Argue the case for and against Nationalisation.

3. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise economy and a Planned economy. (C. U. 1957)

4. Write short notes on any three of the following :—

(a) Taxable Capacity; (b) Incidence of Taxation; (c) Mixed Economy; (d) Economic Planning.

(C. U. B. Com. 1962)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড